শয়তানের বেহেশত

২

শয়তানের বেহেশ্‌ত
২

মূল
আলতামাস

রূপান্তর
মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স

প্রথম প্রকাশ ❑ মে ২০০৫

শয়তানের বেহেশ্‌ত-২ ❑ আলতামাস

প্রকাশক ❑ মোহাম্মদ শিহাব উদ্দিন বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স

৫০ বাংলাবাজার পাঠকবন্ধু মার্কেট ঢাকা-১১০০, ফোন : ৭১১১৯৯৩

কম্পিউটার সেটিং ❑ বাড কম্প্রিন্ট ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ❑ সালমানি মুদ্রণ সংস্থা, চৌধুরী মার্কেট

৩০/৫ নয়াবাজার ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ ❑ শিল্পায়ন, গ্রন্থস্বত্ব ❑ প্রকাশক

মূল্য ❑ ১৫০.০০ টাকা

ISBN-984-839-056-01

সামান্য কৈফিয়ত

প্রিয় পাঠকের কাছে প্রথমেই করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আলাপে সাক্ষাতে ল্যান্ডফোনে হ্যান্ডফোনে এবং লাল খামে হলুদ খামে ক্রমাগত আশ্বাস দিয়ে গেছি যে, এই তো দিন কয়েকের মধ্যে শেষ করছি শয়তানের বেহেশতের দ্বিতীয় খণ্ড। সত্যি বলছি, ক্রিং ক্রিং শব্দের ভেতর দিয়ে ভেসে আসা আপনাদের অনুরোধের শব্দমালা আমাকে আপ্লুত করেছে ভীষণভাবে। একজন পাঠক যখন একজন অনুবাদকের লেখা নিয়ে কোন মন্তব্য রাখে–তা মন্দ হোক ভালো হোক – তার লেখার জন্য অধীর প্রতীক্ষায় থাকার কথা ব্যক্ত করে সে লেখক বা অনুবাদক তখন অভিভূত না হয়ে পারে না। অবশ্য কেউ কেউ এজন্য 'বিরক্ত' হওয়ার ভান করে। পাঠককে জানিয়ে রাখছি এটাও কিন্তু তার ভাললাগার প্রকাশকে ভনিতা করে চাপা দিয়ে রাখা।

আমি অভিভূত হয়েছি অনুপ্রাণিত হয়েছি এবং কালক্ষেপনের জন্য অনুতপ্তও হয়েছি পাঠকের বারবার তাগাদার কারণে। তাই কৈফিয়তের শব্দ ভাঙ্গিয়ে লজ্জা মোচনের লজ্জায় পড়তে চাই না। সত্যি বলছি, অনেকের আরোপিত এক ধরনের মানসিক জড়তাকে জয় করে শেষ করতে পেরেছি বলে দরবারে এলাহীতে অসংখ্য তাহমীদ ও তাসবীহ্।

প্রথম খণ্ডের মতো দ্বিতীয় খণ্ডও পাঠক দরবারে বিপুলভাবে গ্রহণীয় হবে এই প্রত্যাশাই আমার আগামী দিনের চলার পাথেয়।

মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

উ ৎ স র্গ

তামান্না ইয়াসীন

জীবন সফরের অবিচ্ছেদ্য

সফর সঙ্গিনী

আমার কল্যাণ-চিন্তায় যার

কাটে দিবা-যামিনী

– অনুবাদক

১

মুযাম্মিল আফেন্দী দেখলো, বিশাল একটি মেঠো জমি। চারদিক থেকে বিবর্ণ পাথুরি আকাশসমান উঁচু প্রাচীরে ঘেরা। শিকল পায়ে কয়দীরা নানান ধরনের কাজ করে যাচ্ছে। দৈত্যকায় কয়েকটি হাবশী কাফ্রী লোহার ডাণ্ডা নিয়ে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাউকে একটু আনমনা দেখলেই কয়েক ঘা বসিয়ে দিচ্ছে তার পিঠে। পর মুহূর্তেই বুক চেড়া আর্তচিৎকার বেরিয়ে আসছে সেই কয়দীর মুখ থেকে। কয়দীদের পরনে শুধু ছিড়া ফাটা নোংরা পাজামা। শরীরের ওপরের অংশ সম্পূর্ণ নগ্ন। দূর থেকেও ওদের পাঁজড়ের হাড়গুলো গোনা যাচ্ছিলো। ওদের একমাত্র কাজ হলো জানোয়ারের মতো বেগার খাটা আর গরুর মতো মার খাওয়া। মুযাম্মিলের কাছেই একটি কয়দী ছিলো। কয়দীটি ঘুরতেই সে আঁতকে উঠলো, তার পিঠ জুড়ে কে যেন কাচি দিয়ে আচড়িয়েছে। সারা পিঠে দগদগে ঘা।

মুযাম্মিল ভেতরে ভেতরে চরম এক ধাক্কা খেলো। হাসান ইবনে সবাকে হত্যা করে যদি বন্দী হতো কোন আফসোস ছিল না তার। হত্যা তো দূরের কথা তার সামনেও যেতে পারলো না সে। মুযাম্মিল এই ভেবে আরো কষ্ট পেলো, আহা! যে ইবনে আবিদ তাকে নিয়ে এসেছে আলমোত, এদের হাতে আরো আগেই ধরা পড়েছে। কিন্তু ইবনে আবিদ যে এখন হাসান ইবনে সবার সঙ্গে খোশ আলাপে মেতে উঠেছে তা তো মুযাম্মিলের জানার কথা নয়।

মুযাম্মিলের সামনে আরেকটি বিশাল দালান পড়লো। এটিও কালচে পাথরে নির্মিত। সেই দালানের উঁচু একটি দরজার সামনে নিয়ে যাওয়া হলো। দরজায় তালা ঝুলছে। চাবিওয়ালা প্রহরী এসে দরজা খুলতেই মুযাম্মিলকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো।

সামনে একটি সিঁড়ি পড়লো। ভূগর্ভের দিকে চলে গেছে সিঁড়িটি। মুযাম্মিলকে নিয়ে সিঁড়ি ভাঙ্গতে লাগলো ওরা। একজন সামনে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সিঁড়ি শেষ হলো একটি দেয়ালের গায়ে। সামনের লোকটি বায়ে ঘুরলো। একটু যাওয়ার পর আরো পাঁচ ছয়টি সিঁড়ি বেয়ে নামলো ওরা। সুড়ঙ্গের মতো গলি পথ ধরে চলতে লাগলো। মুযাম্মিলের মনে হলো ওরা তাকে পাতালে নিয়ে গিয়েও রেহাই দেবে না। কতবার যে ডানে বামে তাকে ঘুরানো হলো সে হিসাব ভুলে গেছে অনেক আগেই সে।

অবশেষে তাকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হলো সেখানে রয়েছে দু'দিক থেকে কামরার সারি। প্রতিটি কামরার সামনে ভেতরে এবং গলিমুখে মশাল জ্বলছে। মুযাম্মিলকে একটি অন্ধকার কামরার সামনে নিয়ে যাওয়া হলো। ভেতরে মশাল জ্বলছে ঠিক। কিন্তু মশালের আলো চারদিক আরো ভূতুড়ে করে তুলেছে। মুযাম্মিলের মাথা চক্কর দিয়ে উঠলো। দম আটকে আসতে লাগলো। মনে হলো কাছেই কোন লাশের নাড়ি-ভুড়ি

খুবলে খাচ্ছে মাংসাশী কোন প্রাণী। তার পা সেখানেই আটকে গেল। পেছন থেকে তার কোমরে দশা সই একটি লাথি পড়লো। পাথরের খটখটে মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো মুযাম্মিল। তার নড়াচড়ার শক্তি নিঃশেষ প্রায়। তাকে এবার জানোয়ারের মতো ঘেষটাতে ঘেষটাতে নিয়ে যেতে লাগলো ওরা।

যে দুই লোক ওকে নিয়ে এসেছে কয়েদখানার বাইরে তো ওরা মানুষের মতোই আচরণ করে। কিন্তু কয়েদখানায় ঢুকতেই ওরা জন্তু বনে গেছে। মুযাম্মিল ডানে বামে তাকিয়ে দেখলো, প্রতিটি কামরায় লোহার গারদের ভেতরে তিন-চারজন করে জীবন্ত কংকাল। সে ভেবে পাচ্ছিলো না এই লোকগুলো কি করে নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মুযাম্মিলকে আরেকদিকে মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। চাবিওয়ালা প্রহরী দৌড়ে এসে একটি কালো কুঠরীর গারদ খুললো। এবার সেই দুই লোক মুযাম্মিলকে দুই দিক থেকে ধরে স্বজোরে লোহার গারদের ভেতর ছুঁড়ে দিলো। স্যাঁতস্যাঁতে পাথরি দেয়ালের উপর গিয়ে আছড়ে পড়লো মুযাম্মিল। দেয়ালের সঙ্গে তার মাথা ঠুকে গেলো। কিছুক্ষণ সে উঠতে পারলো না। নিজেকে সামলে নিয়ে যখন সে উঠে বসলো তখন দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

তার মুখ মাথা মনে হলো অবশ হয়ে গেছে। মাথা থেকে কপাল উষ্ণজলের ধারা নামছে বলে সে অনুভব করলো। বেশিক্ষণ মাথা তুলে রাখতে পারলো না। হাঁটুর ওপর মাথা রাখলো, মাথা যখন উঠালো তখন তার পাজামা রক্তে ভিজে গেছে। একটু সময়ের মধ্যেই তার ভ্রূ, গালের খাজ, গলা ইত্যাদি জায়গা রক্ত জমাট বেঁধে গেলো। রক্ত আগের মতোই ঝরতে লাগলো।

মুযাম্মিল আফেন্দী অনেক্ষণ ধরে শোক স্তব্ধ হয়ে রইলো। আস্তে আস্তে তার মাথা কাজ করতে শুরু করলো। স্মরণ করতে চেষ্টা করলো এই কালো কুঠরী পর্যন্ত কিভাবে পৌঁছেছে সে। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে উঠলো সে চরম ভুল করেছে। তাদের সহজ ফাঁদে পা দিয়েছে। ইবনে আবিদ তাকে হাসতে হাসতে এই মরণ ফাঁদ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। নিজেকে সে ধিক্কার দিলো– যে হাসান ইবনে সবার সাধারণ এক চ্যালার কাছে হেরে যায় সে কি করে হাসান ইবনে সবাকে হত্যার দুঃসাহস করলো। তার আহমদ আওযালের কথা মনে পড়লো। আহমদ আওযাল বলেছিলো সুলতান মালিক শাহ ও নেযামুল মুলক হাসান ইবনে সবার হাতে নিহত হতে পারেন কিন্তু তাকে হত্যা করতে পারবেন না।

সে আরো শংকিত বোধ করলো, সুলতান ও নেযামুল মুলক জানেনই না যে, হাসান ইবনে সবা এখন কত বড় শক্তির অধিকারী। তার একটু আবেগ দেখেই সুলতান ও ওযীরে আযম তাকে হাসান ইবনে সবাকে হত্যা করতে পাঠিয়ে দিয়েছেন, হাসান ইবনে সবাকে তারা এতই মামুলি লোক ভেবেছিল। যে এলাকাতেই হাসান ইবনে সবা যায় সে এলাকার লোকদের হৃদয়ে রাজত্ব কায়েম করে সে।

অবিরাম ঝরেই যাচ্ছে রক্তের ধারা, লোহার গারদ ধরে কোন মতে উঠে দাঁড়ালো সে। গলা শুকিয়ে চৌচির হয়ে গেছে তার। কিন্তু সেখানে তাকে এক ঢোক পানি দেয়ার মতো কেউ ছিল না।

★★★★

আলমোতের আমীর মেহদী উলবী রাতের খাবারের পর হাসান ইবনে সবার সাক্ষাত পেলো। প্রহরীরা তাকে সসম্মানে বসিয়ে জানালো– ইমাম এখন ইবাদতে নিবিষ্ট, কিছুক্ষণ পর বাইরে আসবেন। হাসান যে ইবাদাতে নিবিষ্ট ছিলো সেটা হলো, মদ পান ও দুই রূপবতী মেয়েকে রসে বশকরণ কর্ম। তাকে জানানো হলো আলমোতের আমীর এসেছেন।

মেহদী উলবীকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখে হাসান ইবনে সবা মেহদী উলবীকে দেখা দিলো। মেহদী উলবী তাকে দেখেই রুকুর মতো ঝুকে পড়ে তার পা ধরে সালাম করলেন।

মেহদী উলবীর পরিচয় ; তিনি শুধু আলমোতের আমীর, তিনি কোন আলেম, আল্লাহওয়ালা বা কোন যোদ্ধা ছিলেন না। গড়পরতা আমীরদের মতোই তিনি নারী বিলাসী এক আমীর। সুন্দরী নারী আর সম্পদের মোহে বুঁদ হয়ে থাকাই তার কাজ। খাদীজাকে পেয়ে তিনি তাই সবকিছু ভুলে যান।

'হে ইমাম!' মেহদী উলবী অনুনয় করে বললেন– 'আপনি বলেছিলেন চিল্লা সাধনার জন্য আমাকে সুপথ দেখাবেন।'

'আপনি ভাল সময়ে এসেছেন' হাসান বললো গম্ভীর কণ্ঠে– 'গত রাতে আমাকে ইশারায় জানানো হয়েছে আপনি কোথায় বসে সাধনা করবেন। এটা হবে চল্লিশ দিনের চিল্লা।

'ইয়া ইমাম! আপনি যা বলবেন তাই করবো আমি।'

'গত রাতেই আমাকে সব দেখানো হয়েছে। যে কোন সময় আপনাকে ডাকবো তখনই আমার সঙ্গে জঙ্গলে যেতে হবে। সেখানে গিয়ে ইশারা পাওয়া যাবে কোন চিহ্নিত স্থানে আপনি বসবেন। সেখানে কী পড়বেন তাও বলে দেবো। তবে রাত জেগে সাধনা করতে হবে। অবশ্য দিনে ঘুমুতে পারবেন।

পরদিন দুপুরে মেহদী উলবীর কাছে হাসান খবর পাঠালো, এখনই যেন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চলে আসেন।

মেহদী উলবী ঘোড়া নিয়ে চলে এলেন। হাসান ইবনে সবা মেহদী উলবী ও আরো কয়েকজনকে নিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেলো। এই জঙ্গলটি শহরের লোকদের খুব পছন্দের। প্রকৃতির হাতেই ভেতরটা দারুণ করে সাজানো। জঙ্গলের এক দিকে সবুজ কয়েকটি টিলা জঙ্গলের চেহারাই পাল্টে দিয়েছে।

'হ্যাঁ এ জায়গা'– একটি জায়গাকে দেখিয়ে হাসান ইবনে সবা বললো– 'তবে আপনার তাঁবু কোথায় পাওয়া যাবে সে ইশারা এখনো পাওয়া যায়নি। একটি কবুতর উড়ে আসবে। কবুতর যেখানে বসবে সেখানেই আপনার তাঁবু ফেলা হবে। চিল্লাও পুরো করবেন ওখানে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে হাসান ইবনে সবা বলতে লাগলো– 'বলে দিন আল্লাহ... বলে দিন... হে আল্লাহ বলে দিন।

অনেকক্ষণ কেটে গেলো। মেহদী উলবী চরম অস্থির হয়ে উঠলেন। কোন পাখি দেখলেই কবুতর বলে চিৎকার করে উঠতেন। তারপর হতাশ হয়ে দেখছেন সেটি কবুতর নয়।

'ওই যে, দেখুন! ওটা নিশ্চয় কবুতর হবে'– একজন বলে উঠলো।

সবাই দেখলো, হ্যাঁ কবুতরই। তবে অন্যান্য পাখির মতো উড়ে আসছে না। মাটির দিকে নেমে আসছে। কবুতর উড়ছে না গড়িয়ে পড়ছে সেটা দেখার কারো ধৈর্য নেই তখন। কবুতর আসছে এটাই বড় কথা। কবুতর অবশেষে এক জায়গায় নামলো এবং একদিকে হেঁটে গেলো।

'এখানেই তাঁবু ফেলুন'– হাসান ইবনে সবা কবুতর নামার স্থানে পা রেখে মেহদী উলবীকে বললো– 'আর আপনার পাশে প্রহরীদের একটি তাঁবু থাকবে।'

★★★★

ধীরে ধীরে শেষে খবর ছড়িয়ে পড়লো, আলমোতের আমীর দুনিয়াবিমুখ হয়ে ঋষি পুরুষ হয়ে গেছেন। নির্জন জঙ্গলে তাঁবু ফেলে দিনরাত তিনি আল্লাহ আল্লাহ করেন। তবে তার তাঁবুর কাছে ধারে কাউকে যেতে দেয়া হয় না।

তাঁবুর চারদিকে সবসময় কয়েকজন করে প্রহরী থাকে। ওরা কাউকেই তাঁবুর আশে পাশে ঘেঁষতে দেয় না। কবুতর যেখানে নেমেছিলো সেখানে একটি জায়নামায বিছানো হয়েছে। সূর্যাস্ত হতেই মেহদী উলবী জায়নামাযে বসে যান এবং হাসান ইবনে সবার শেখানো মন্ত্র যপতে শুরু করেন।

হাসান ইবনে সবা মেহদী উলবীকে শক্ত করে বলে দিয়েছে, প্রথম দু'দিন দু'রাত শুধু পানি ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করা যাবে না। নিজের প্রয়োজনীয় সবকিছু ভুলে যেতে হবে। দুদিন এভাবে কাটাতে পারলে জঙ্গলের বৃক্ষও মেহদী উলবীর সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে। জঙ্গলে পায়চারীর সময় মেহদী উলবী যদি বাঘের সামনে পড়ে যায় বাঘও স্বসম্মানে তাকে রাস্তা দিয়ে দেবে।

'তৃতীয় দিন আমি স্বয়ং এখানে আসবো। জায়নামাযে কিছুক্ষণ বসে মুরাকাবা করবো, তারপর বলবো এই চিল্লা আপনাকে কী দেবে'– হাসান মেহদীকে এভাবেই বলে যায়।

মেহদী উলবীকে একথা বলার কেউ নেই যে, জঙ্গলের গাছের টিলার ওপর হাসান ইবনে সবা তার এক লোককে একটি কবুতর দিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়ে দেয়। লোকটি কবুতরের দুদিকের পাখনা চিকন সুতা দিয়ে বেঁধে দেয়। সেটি আর বেশি দূর উড়ে যাওয়ার উপযুক্ত থাকে না। লোকটি সময় মতো কবুতরটি জোরে উপরে ছুঁড়ে দিলো। কবুতরটি পাখা ঝাপটিয়ে উড়ে সামনে যেতে পারলো না। সোজা

নেমে গেলো জঙ্গলের দিকে। অলৌকিক কোন কিছু দেখার উত্তেজিত স্নায়ু নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেহদীর পূর্ণ মনোযোগের কেন্দ্র অলৌকিক পুরুষ হাসান ইবনে সবার দিকে তখন। এ অবস্থায় কবুতরের বিধিমালার কথা তো মেহদীর বুঝার কথা নয়।

হাসান ইবনে সবার এক চ্যালা মেহদী উলবীর তাঁবুর বাইরে থেকে শুধু পানি সরবরাহ করতো। পানির সঙ্গে থাকতো হাশীষ। প্রথম দিনের পর সেই হাশীষের মাত্রা আরো বাড়তে লাগলো।

দুদিন যাওয়ার পর হাসান ইবনে সবা তাকে উটের দুধ পানের অনুমতি দিলো, তবে শুধু দুধই, অন্য কিছু নয়। আর গোসল ও অন্যান্য প্রয়োজনে কাছের নদীতে যেতে পারবে।

চিল্লার সপ্তম দিনে হাসান ইবনে সবা মেহদীর কাছে সংবাদ পাঠালো আজ প্রায় মধ্য রাতের দিকে একটা পেচা ডেকে উঠবে। পেচার ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে জায়নামায থেকে উঠে জায়নামায উল্টিয়ে সেখানে মাটি খুড়বে। মাটি খুড়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে লিখিত কিছু পাওয়া যেতে পারে বা অন্য কিছুও পাওয়া যেতে পারে।

মধ্যরাত। মেহদী উলবী জায়নামাযে বসা। তার কানে হঠাৎ পেচার ডাক পৌঁছলে তাঁবুর বাইরে থেকে খাদেমটি দৌড়ে এলো। সেও জানতো আজ রাতে কি হবে? মেহদী উলবী সাথে সাথে জায়নামায সরালেন। খাদেম এসে সেখান থেকে সামান্য মাটি সরাতেই তার হাতে কী একটা যেন ঠেকলো। সে মেহেদীকে বললো, এটা গায়েবের থেকে এসেছে, আপনার হাতেই উঠান। আমার মতো নগণ্যের নাপাক হাত লাগানো ঠিক হবে না।

মেহদী খনন করা গর্তে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। তার হাতে উঠে এলো তিনটি চৌকোণ স্বর্ণের টুকরা। এক একটার ওজন প্রায় এক পোয়া হতে পারে। মেহদী উলবী বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলেন। তিনি নিশ্চিত হলেন এগুলো বেহেশতের গায়েবী খাজানা থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো তার এই চিল্লা-সাধনা সফল হতে চলেছে। তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। হাসান ইবনে সবার নির্দেশমতে গর্তটি ভরাট করে আবার জায়নামায বিছানো হলো। মেহদী খাদেমকে বললেন, সকাল হতেই সে যেন এগুলো ইমামের দরবারে পেশ করে।

সেদিন দুপুরেই মেহদী নদীতে গা ধুতে গিয়েছিলেন। এই ফাকে খাদেম মেহেদীর জায়নামাযের নিচের মাটি খুড়ে স্বর্ণের সেই টুকরোগুলো রেখে দেয়। আর মধ্যরাতের পেচার ডাক ডেকেছিল এই খাদেমই। সেই ডাক এতই নিখুঁত হয়েছিলো, মেহদী উলবী ডাক শুনেই চমকে উঠেন।

পরদিন সেই খাদেম স্বর্ণের টুকরোগুলো নিয়ে হাসান ইবনে সবার কাছে গেলো। 'ইয়া ইমাম! এই যে নিন! এই কাজেও আমরা সফল। এই যে সোনার টুকরো'- খাদেম বললো।

হাসান ইবনে সবার ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি খেলে গেলো। মুখের হাসিটা আরো কটু বিস্তৃত করে বললো,

'ঐ লোকের চিল্লা তো সফল হবে। কিন্তু ঐ লোক সফল হবে না। সে চিল্লার সাধনা যেদিন শেষ করে সেদিনই আলমোত নামক দুর্গ-শহরটি হবে আমাদের। তুমি ফিরে যাও তার পরবর্তী ধ্যানজপ শুরু করতে বলো।

★★★★

বড় একটি মসজিদ আছে আলমোত শহরে। লোকেরা এ মসজিদেই নামায পড়ে থাকে। মসজিদের খতীব যিনি তাকে সবাই ডাকে ইমাম শামী বলে। দূরদূরান্ত পর্যন্ত লোকেরা ইমাম শামীকে স্মরণ করে শ্রদ্ধাভরে।

কয়েক বছর আগে ইমাম শামী হজ্জ করতে গিয়ে কাবার সেবাতে মক্কাতেই রয়ে যান। একদিনের জন্যও লোকেরা তাকে ভুলতে পারে নি। তাদের ধারণা, তারা ইমাম শামীর মতে এত বড় একজন আলেমের সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত। মসজিদে আরেকজন খতীব আছেন। কিন্তু অশীতিপর বৃদ্ধ ইমাম শামীর সিকিভাগ জনপ্রিয়তাও তিনি পাননি।

যে রাতে মেহদী উলবীর পেচার ডাক শুনে স্বর্ণ আবিষ্কারের ঘটনা ঘটে সে রাতে হঠাৎ ইমাম শামী আলমোত পৌঁছেন। ফজরের সময় শহরের লোকেরা ইমাম শামীকে মসজিদে দেখে প্রকাশ্যেই উল্লাসবোধ করে। লোকেরা তো তাকে নিজেদের পীরের চেয়েও বেশি আস্থাভাজন মনে করতো। শুধু সিজদা ছাড়া সবকিছুই করতো তাকে শ্রদ্ধাস্বরূপ। সূর্য উঠার আগেই সারা শহর ছড়িয়ে পড়লো তাদের প্রিয় ইমাম এসেছেন।

শহরের লোকেরা তাকে দেখে যেমন আনন্দিত হলো, তিনি শহরের লোকদের দেখে ততটাই বিমর্ষিত হলেন। ফজরের সময় মসজিদে লোকদের উপস্থিতির সংখ্যা দেখেই তার মনে প্রথম খটকাটা লাগে। নামাযের পর তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য লোকেরা ভীড় জমালো। তিনি তখন শীর্ষস্থানীয় দু'জন মুসল্লীকে জিজ্ঞেস করলেন, মুসল্লী এত কম দেখছি কেন? জবাবে তিনি বেশি কিছু জানতে পারলেন না। শুধু এটুকু জানলেন, শহরে আরেকজন ইমাম এসেছেন। যিনি কখনো মসজিদে আসে না। তবে শোনা যায়, ঘরে সব সময় ইবাদতে মগ্ন থাকেন। আর লোকে তাকে শুধু ইমামই নয় নবীও মানতে শুরু করেছে।

ইমাম শামী নীরব রইলেন। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। কোন অনুসন্ধানে গেলেন না। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন শহরপ্রধান মেহদী উলবীর কাছে যাবেন, তাকেই জিজ্ঞেস করবেন মসজিদকে পরিত্যক্ত করে কোন মুসলমান কি আল্লাহ ওয়ালা হতে পারে? শহরে এসব কী হচ্ছে?

মেহদী উলবী বিশেষ ইবাদতগুজার না হলেও ইমাম শামীকে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করতেন। প্রশাসনের যে কোন ব্যাপারে তার কাছ থেকে পরামর্শ নিতেন।

সাক্ষাতপ্রার্থীরা বিদায় নিলে তিনি মেহদী উলবীর বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলেন, মেহদী উলবীর দুই স্ত্রী। ছেলে দু'জন মেয়ে তিনজন। ছেলে-মেয়েগুলো ছোট ছোট, এই ঘরে তার বেশ কদর রয়েছে। ইমাম শামীকে দেখে মেহদীর স্ত্রীরা খুব খুশি হলো।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন মেহদী উলবী কোথায়? তাদের চেহারা নিমিষেই কালো হয়ে গেলো, তাদের মুখ দিয়ে কথা বের হলো না।'কি হলো? ব্যাপার কি?'– ইমাম শামীর গলায় পেরেশানী।

মেহদীর স্ত্রীরা ইমাম শামীকে যত্ন করে বসার ঘরে বসালো।

'আমীরে শহর ঘর-দোড় ছেড়ে জঙ্গল বাস নিয়েছেন"– মেহদীর বড় স্ত্রী বললো– 'সাত দিন হয়ে গেছে। শুনেছি চল্লিশ দিন পূর্ণ করবেন।'

'এই পথে তাকে কে নিয়ে গেলো'– ইমাম শামী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন। 'শহরে একজন ইমাম এসেছে, লোকেরা দিন দিন তার শিষ্য বনে যাচ্ছে। তার সঙ্গে অসম্ভব সুন্দরী কিছু মেয়ে এসেছে। এদেরকে মনে হয় বেহেশতী হুর'– বড় স্ত্রী বললো।

'মুহতারাম খতীব! ছোট স্ত্রী বললো, আমীরে শহরও তার শিষ্য বনে গেছেন। এটা আর গোপন নেই যে, ঐ হুরের মতো এক মেয়ের জাদুতে পড়েছেন তিনি। তার কথা শুনলে বলবেন যে, আল্লাহ-খোদা তিনি ভুলে গেছেন। ঐ লোক যার নাম হাসান ইবনে সবা তাকে তিনি শুধু ইমামই নয়, নবী বলেও মেনে নিয়েছেন।'

'হাসান ইবনে সবা?'– ইমাম শামী চমকে উঠে বললেন" ঐ লোক এখানে পৌঁছে গেছে? মদীনায় শুনেছিলাম তার কথা। কিন্তু সে এত বড় বুযুর্গ বলে তো শুনিনি। শুনেছি, দুনিয়ায় আরেকবার মানুষরূপী সাক্ষাত শয়তান এসেছে। মেহদী উলবীর মতো বুদ্ধিমান এক লোককে এই শয়তানই পারে ইবাদতের নামে জঙ্গলে চিল্লা–সাধনা করতে পাঠাতে। ইসলাম ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছে, সন্ন্যাসবাদ বা বনবাসের নয়। এসব করা হয় নিজের কু-বাসনাকে চাঙ্গা করার জন্য।'

'আমীরে শহর বুদ্ধিমান বা পরহেজগার যাই হোক, হাসান ইবনে সবাই তাকে চিল্লা-সাধনার মতো বিপথে পাঠিয়েছে'– বড় স্ত্রী বললো।

'না, শুধু হাসান ইবনে সবাই নয়। তার নিজের প্রবৃত্তিই তাকে বিপথে নিয়ে গেছে। মানুষ যখন প্রবৃত্তির দাস হয়ে যায় তখন সে এধরনের মিথ্যা অবলম্বনই তালাশ করে। যা হোক, আমি ওখানে যাচ্ছি। আমীরে শহরকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবো।'

'না না, আপনি সেখানে যাবেন না'– সেখানে প্রহরা নিয়োজিত আছে। আমীরে শহরও নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন, যেখানে তিনি সাধনা করছেন সেখানে কেউ যেন না যায়। কেউ গেলে দূর থেকেই যেন তাকে তীর মারা হয়।'

'আমীরে শহর আরো দু'জন রূপসী মেয়ে আনতে চাচ্ছেন'– মেহদীর ছোট স্ত্রী বললো– 'এটা তো দোষের কিছু না। তিনি আরো দু'জন স্ত্রী আনতে পারবেন। ফুল চন্দন দিয়ে দু'জনকে বরণ করবো। কিন্তু তিনি যে ঐ নতুন ইমামের ধোঁকায় পড়েছেন। নইলে শহরে কি আমীরে শহরের জন্য সুন্দরী মেয়ের অভাব পড়েছে?'

'মুহতারাম ইমাম!'– মেহদীর বড় স্ত্রী বললো' উনাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন। আমরা ধন-সম্পদ চাই না, আমাদের স্বামীকে দেখতে চাই।'

'আমি হাসান ইবনে সবার ওখানে যাচ্ছি, প্রথম দেখবো এলোক আসলে কি এবং কাজ কি তার। তারপর দেখবো, তার বিদ্যার দৌড় কতটুক'– ইমাম শামী বললেন দৃঢ় গলায়।

মেহদী উলবীর স্ত্রীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ইমাম শামী হাসান ইবনে সবার ওখানে চলে গেলেন, হাসান ইবনে সবাকে এক লোক খবর দিলো। সে প্রায় দৌড়ে বৈঠকখানায় এসে হাজির হলো। তারপর ইমাম শামীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তার হাত-পা ছুঁয়ে নিজের মাথাটি ইমাম শামীর হাঁটুতে রাখলো,। ইমাম শামী দু'হাতে হাসান ইবনে সবার মাথাটি তুলে বললেন, সে যেন উঠে তার পাশের চেয়ারে বসে পড়ে।

'না ইমাম!'– হাসান ইবনে সবা বললো বিগলিত আওয়াজে– 'আপনার মতো এত বড় আল্লাহর ওয়ালির পাশে বসার উপযুক্ত নই আমি। আপনার পায়ের নিচে যে আমার স্থান হয়েছে এতেই তো আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। সেই কবে থেকে আপনার কথা শুনে আসছি। এখানে এসে শুনলাম, আপনি কাবার পবিত্র স্থানে কয়েক বছর ধরে ইবাদতে মশগুল। আমি তো 'ইলমে দ্বীনের' কাঙাল। এখানে আসার পর লোকেরা জানালো ইমাম শামী যদি ফিরে আসেন তাহলে মনে করবো ইলম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঝর্নাধারা ফিরে এসেছে। আপনার পায়ের নিচে আমাকে স্থান দিন। আমার জ্ঞানের অতৃপ্তি দূর করে দিন।

'আমি তো অন্য কিছু শুনেছি, শুনেছি তোমাকে বিশেষ 'ইমাম' বলা হয়। আর কিছু লোক তোমাকে নবী বলতে শুরু করেছে নাকি?'

'এটা আসলে তাদের সরলতা এবং ভুল। আমি ইমামতের দাবি করিনি। আপনি বলেছেন, কিছু লোক আমাকে নবী বলে, আমি তাদেরকে কয়েকবারই বলেছি, আমি রাত দিন ইবাদতে মগ্ন থাকি ঠিক, কিন্তু এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি কারো ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারবো না। আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর এই কথাটাই বলেছি যে, শাস্তি বা পুরস্কার তোমাদের আমলের মাধ্যমেই হবে। প্রত্যেকে এই দুনিয়া থেকেই জান্নাত বা জাহান্নাম নিয়ে যায়।'

'এটা সত্য বলেছো, কিন্তু এই জঙ্গলবাসের কথা ইসলামে তুমি কোথায় পেলে?' 'আপনি নিশ্চয় মেহদী উলবীর দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এ কাজ থেকে উনাকে আমি বাঁধা দিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি এটাকে ইবাদত মনে করছেন। তাকে অনেক বুঝিয়েছি, কিন্তু তিনি তার প্রবৃত্তির দাস হয়ে গেছেন। আমি ভাবলাম ঠিক আছে জঙ্গলবাস করুক, তবে ইবাদতের মাধ্যমে। তাকে বলেছি, চল্লিশ দিন জঙ্গলে গিয়ে থাকুন এবং এভাবে ইবাদতে ডুবে থাকুন যেন এই দুনিয়ার সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। এতে আমার উদ্দেশ্য ছিল চল্লিশ দিন এভাবে ইবাদতে ডুবে থাকলে তিনি হয়তো দুনিয়া ও কু-প্রবৃত্তির কথা ভুলে যাবেন।'

ইমাম শামীর একটি চুলও আর কালো নেই, তার ক্ষীণ হয়ে আসা চোখে তবুও এক স্বর্গীয় উজ্জ্বলতার তীব্রতা বেশ স্পষ্ট। এই চোখ দুনিয়ার তাবৎ বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। হাজার হাজার বইয়ের পৃষ্ঠা তার চোখের মণিকোঠায় সঞ্চিত হয়েছে, ভালো মন্দ এবং কত বিচিত্র ধরনের মানুষ তিনি দেখেছেন। কিন্তু এই একটি মাত্র মানুষ– হাসান ইবনে সবাকে দেখলেন যাকে কোন বইয়ের পৃষ্ঠার সঙ্গে মিলানো যাচ্ছে না। তিনি অনুভব করলেন এই লোক সাধারণ মানুষের স্তর থেকে অনেক উর্ধ্বের। তবে হাসান ইবনে সবা এই প্রথম অনুভব করলো, সে একজন কঠিন মানুষের সম্মুখীন হয়েছে।

'আমি আমীরে শহরের কাছে যাবো। তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনবো'– ইমাম শামী বললেন।

'হ্যাঁ মহামান্য ইমাম! আপনি উনাকে ফিরিয়ে আনতে পারলে বুঝবো, আপনি উনার ওপর নয় আমার ওপর অনুগ্রহ করেছেন। উনাকে আমি যা বুঝাতে পারিনি আপনি হয়তো তা বুঝাতে পারবেন।'

★★★★

সেদিন যোহরের নামাযের সময় মসজিদে এত মুসল্লী এলো যে, তিলধারণেরও জায়গা পাওয়া গেলো না। সকালেই সবাই জেনে গিয়েছিলো তাদের প্রিয় ইমাম ও খতীব ফিরে এসেছেন। সবাই ইমাম শামীর পেছনে নামায পড়লো। কিন্তু আসরের সময় আর ইমাম শামীকে মসজিদে দেখা গেলো না। মাগরিবের সময়ও না এশারের সময়ও না। মুসল্লীরা পেরেশান হয়ে তার ঘরের দিকে ছুটলো। জানা গেলো আসরের নামাযের আগে যে তিনি ঘর থেকে বেরিয়েছেন আর ফিরে আসেননি। শহরের সম্ভাব্য স্থানেও খুঁজে পাওয়া গেলো না তাকে। দুই তিনজন বললো, তারা ইমামকে শহরের বাইরে যেতে দেখেছে। অন্ধকার রাতে আর কোথায় খুঁজবে তারা। সকালের প্রতীক্ষায় রইলো সবাই।

ফজরের নামাযের পর শহরে এক চাঞ্চল্যকর খবর ছড়িয়ে পড়লো। এক লোক শহরের বাইরে থেকে আসছিলো। পরিত্যক্ত একটি এলাকা দিয়ে সে আসার সময় দেখলো একটি গাছে এক লোকের কাটা মাথা ঝুলছে। সে ভালো করে দেখার পর ভয়ে কেঁপে উঠলো। সেটা ছিলো ইমাম শামীর মাথা। সারা শহরে কান্নার রোল পড়ে গেলো। এই ভেবে হতবাক হয়ে গেল যে, ইমাম শামীর মতো নির্বিরোধী একটি লোকের সঙ্গে কে এ ধরনের শত্রুতায় অবতীর্ণ হলো?

হাসান ইবনে সবা খবর পেতেই দৌড়ে চলে এলো লোকদের জটলার মধ্যে। লোকদের মধ্যে আগ থেকেই ভীতি ও চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। হাসান একটি ঘোড়া আনিয়ে ঘোড়ায় চড়ে সেই পরিত্যক্ত এলাকার দিকে চলতে শুরু করলো। শহরের লোকেরাও তার পেছন পেছন ছুটলো।

একটি গাছের উপর ইমাম শামীর কাটা মাথা আবিষ্কার করলো সবাই। দেখা গেলো, গলা থেকে বড় নিখুঁত করে মাথার অংশটি কাটা হয়েছে।

'এই যে দেখো একটি বাহু– এক লোক চিৎকার করে বললো। লোকেরা সেদিকে দৌঁড়ে গেলো। হাসান ইবনে সবা ঘোড়া থেকে নেমে সেদিকে গিয়ে দেখলো কাধের জোড়া থেকে কাটা একটি হাত।

'সবাই এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ো;– হাসান ইবনে সবা ঘোষণা করলো– 'ইমামের দেহের আরো কিছু অংশ পাওয়া যেতে পারে। আমি বুঝে গেছি তার হত্যাকারী কে? সে মানুষ নয়। অন্য দুনিয়ার প্রাণী– জ্বিন।'

অল্পক্ষণের মধ্যেই ইমাম শামীর আরেকটি কাটা বাহু ও দুটি পা পাওয়া গেলো। আরো কিছু অংশ পাওয়া গেলো, সবগুলো একত্রিত করা হলো, লোকদের মধ্যে চরম ভীতি ছড়িয়ে পড়লো, তাদের মনে হলো, এগুলো ইমাম শামীর নয় তাদের দেহেরই অংশ। ভীত কম্পিত লোকগুলো হাসান ইবনে সবার চার পাশে জমা হতে লাগলো।

'সবাই মনোযোগ দিয়ে শোন'– হাসান ইবনে সবা ঘোড়ায় চড়ে উঁচু আওয়াজে বললো– 'তোমরা সবাই জানো আমীরে শহর মেহদী উলবী এখান থেকে একটু দূরে চিল্লা-সাধনা করছেন। পুরো শহরে ঘোষণা করা হয়েছিলো, কেউ যেন সেদিকে না যায়। এর একটি কারণ হলো, তাকে যেন বিরক্ত করা না হয়, আরেকটি কারণ হলো, তিনি এমন সাধনা করেছেন যে, সে এলাকায় জ্বিনে ভরে গেছে। আমীরে শহরের ওযীফা পাঠ জ্বিনদের ওপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই ওদিকে কেউ গেলে জ্বিনেরা তাকে বাঁধা দেয়, প্রথমে বাঁধা না মানলে তারা এই অবস্থাই করে এখন যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছো। এজন্য আমি দূর থেকেই কিছু লোক বসিয়ে দিয়েছি, যারা কাউকে ওদিকে যেতে দেয় না। এখন আমি তোমাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করছি, কেউ কি ইমামকে এদিকে আসতে দেখেছ?'

'ইয়া ইমাম!'– ভীড় থেকে একটি আওয়াজ শোনা গেলো– 'আমি কাল সন্ধ্যায় ইমাম শামীকে ওদিকে যেতে দেখি। আমি দৌড়ে গিয়ে তাকে বাঁধা দিয়ে বলি, তিনি যেন আর সামনে না যান। এর কারণও তাকে বলি আমি। কিন্তু তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বলেন, আমি অবশ্যই যাবো। আমি বুঝতে পারলাম না ইমাম হাসান ইবনে সবার কথা মানবো না ইমাম শামীর কথা। ইমাম শামীর সামনে আমি কোন ছার? আমি আর কিছু বললাম না। তিনি একটু পরই চোখের আড়ালে চলে গেলেন। হায় তখন কি ভেবেছিলাম, দুষ্ট জ্বিনরা ইমামের এই নির্দয় অবস্থা করবে?'

লোকদের মধ্যে স্তব্ধতা নেমে এলো, সবার ওপর হাসান ইবনে সবার নজর ঘুরে এলো, সে দেখলো ভয়ে নীল হয়ে গেছে প্রত্যেকেরই মুখ।

'এত ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই'– হাসান লোকদের অভয় দিয়ে বললো– 'সবার এখন সাবধান হতে হবে। কেউ যেন ঐ এলাকার দিকে না যায়। আমি ঐ হত্যাকারী জ্বিনকে ডাকিয়ে এনে অবশ্যই জীবন্ত পুরিয়ে মারবো।'

লোকেরা আস্তে আস্তে শহরের দিকে হাটা দিলো। হাসান ইবনে সবাও তার ঘোড়া নিয়ে একদিকে রওয়ানা দিলো।

আগের দিন ইমাম শামী যখন হাসান ইবনে সবার ঘর থেকে বের হলো তখন হাসান তার কয়েক জন লোককে ডেকে বললো, ইমাম শামীর ওপর নজর রেখো। তাকে জঙ্গলে যেতে দেখলে সেখানেই খতম করে দেবে। তখন তার এক উপদেষ্টা বলে–

'ইয়া ইমাম! শহরের লোকেরা তো তাকে তাদের পীর মুরশিদের চেয়েও বেশি মনে করে। এ লোক যদি আলমোতে থাকে তাহলে শহরের লোকদের ওপর আমরা যে প্রভাব বিস্তার করেছি তার সব ধূলিস্মাৎ হয়ে যাবে। যে কোন উপায়ে তাকে খতম করতে হবে।'

'তাহলে তাকে খতম করে দাও, তবে তাকে কতল করতে হবে এমনভাবে যাতে কেউ না বুঝে কোন মানুষ এর হত্যাকারী। মেহদী উলবীর কাছে এ লোক অবশ্যই যাবে। কোন পরিত্যক্ত জায়গায় তাকে তখন কতল করবে এবং হাত-পা মাথা সব বিচ্ছিন্ন করে এদিক ওদিক ছড়িয়ে রাখবে। পরে আমি লোকদের বলবো কে তার হত্যাকারী। কিছু দিনের মধ্যেই লোকেরা তাকে ভুলে যাবে এবং আমার প্রতি তাদের আস্থা আরো বেড়ে যাবে।'

★★★★

সূর্যাস্তের একটু আগে ইমাম শামীকে কবরস্থ করা হয়। তার জানাযা পড়ায় হাসান ইবনে সবা। তারপর ইমাম শামীর মৃত্যুর শোকে সে এমন এক শোক গাঁথা আবৃত্তি করে যে, লোকদের চোখ দিয়ে শুধু পানিই বের হলো না– কেউ গলা ছেড়ে কাঁদলো, কেউ কাঁদতে কাঁদতে মূর্ছা গেলো।

পরদিন সকালে হাসান ইবনে সবা মেহদী উলবীর সাথে দেখা করার জন্য জঙ্গলে গিয়ে হাজির হয়। মেহদী তখন তার বিছানায় গভীর ঘুমে। খাদেম তাকে জাগিয়ে বলে, ইমাম হাসান এসেছেন, মেহদী উলবী ধড়মড় করে উঠে বসেন। হাসান ইবনে সবা এসে তার সঙ্গে করমর্দন করে।

'আপনি কি এই সাধনা চালিয়ে যেতে পারবেন?'– হাসান জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ, অবশ্যই ইয়া ইমাম! আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না বরং এক আশ্চর্যধরনের আনন্দ অনুভব করছি। কত ধরনের সুন্দর সুন্দর মনোরম ছবি যে চোখে ভেসে উঠে তা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না।'

'আপনি তো বেশ প্রশান্তি ও আনন্দের মধ্যে আছেন, কিন্তু আপনার আশে-পাশের এলাকা অত্যন্ত ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। যে অযীফা দিয়েছি আপনাকে এর প্রতিক্রিয়া পুরো ভ্রাম্যাণ্ডের ওপর পড়ে। এটা আসলে সুলায়মান (আঃ) এর জ্বিনরা পড়তো। তাই আপনার তাবুর আশেপাশে জ্বিনে ভরে গেছে।

'এসব জ্বিনরা কি আমার কোন ক্ষতি করবে না?'

'না আমীরে শহর! এতো আপনার সৌভাগ্য। আপনার পাঠ করা ওযীফা সারা ভ্রাম্যাণ্ডের ওপর প্রভাব ফেলছে। হতে পারে কিছু জ্বিন মানুষের বেশে আপনার সামনে এসে সিজদায় পড়ে যাবে। এমন হলে আপনি কিন্তু ভয় পাবেন না।'

'আচ্ছা! স্বর্ণের ঐ টুকরো তিনটি কিভাবে এলো? আমার জায়নামাযের নিচে কি গুপ্তধন আছে?' মেহদী উলবীর গলায় পরম আগ্রহ।

'গতরাতে আমি ঘুমাইনি'– হাসান ইবনে সবা বললো– 'ঐ তিনটি টুকরো একটা ইংগিত। সারা রাত মুরাকাবা করেছি। জানতে জানতে চেয়েছি এটা কিসের ইংগিত। ভোরের দিকে গায়েব থেকে এই রহস্য জানা গেলো, একটি গুপ্তধন পাওয়া যাবে। তবে

এখনো জানা যায়নি সেই গুপ্তধন কোথায় পাওয়া যাবে। আশা করছি পনের ষোল দিন পর এটাও জানা যাবে। আর ঐ তিনটি সোনার টুকরো দ্বারা ইংগিত করা হয়েছে, আপনি আরো তিনটি শহরের মালিক হবেন। তারপর আলমোত শহর ঐ তিন শহরের সঙ্গে মিলিয়ে একটি সালতানাত প্রতিষ্ঠান করবেন। আপনি হবেন এর সুলতান। সালতানাত পেতে হলে এখন আপনাকে চল্লিশ দিনের এই ওযীফা পূর্ণ করতে হবে।

যেদিন থেকে মেহদী উলবীকে পানি ও দুধের সঙ্গে 'হাশীষ' পান করানো হচ্ছে সেদিন থেকেই মেহদী উলবীর দুনিয়া রঙিন হতে শুরু করে। বাস্তবের জগত থেকে তিনি বেরিয়ে আসেন। কল্পনার জগতই এখন তার চোখে প্রধান। এখন যখন হাসান তাকে ভবিষ্যতের সুলতান বানিয়ে দিলো তিনি আর ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় থাকতে রাজী নন, এখন থেকেই নিজেকে এক কাল্পনিক সালতানাতের সুলতান ভাবতে শুরু করে দিলেন।

'এখন একটি দুঃসংবাদ শোনাবো আপনাকে'– হাসান ইবনে সবা বললো– 'আপনাদের অত্যন্ত প্রিয় ইমাম শামী সেদিন হঠাৎ আলমোত আসেন। তিনি আপনার চিল্লা-সাধনার কথা শুনে আমার কাছে এসে বলতে লাগলেন, তিনি আপনাকে এখান থেকে নিয়ে যাবেন। ইমাম শামীকে আমি অসম্ভব শ্রদ্ধা করি। তাই তাকে বললাম, তিনি যেন আপনার কাছে না আসেন, তাহলে তার প্রাণের আশংকা তো রয়েছেই, আলমোতেরও ভয়াবহ বিপদের আশংকা রয়েছে। কিন্তু তার ও আমাদের সবার দুর্ভাগ্য তিনি শুনলেন না আমার কথা। তিনি আপনার এখানে আসার জন্য বের হয়ে গেলেন এবং এক দিনের জন্য পুরোপুরি গায়েব হয়ে গেলেন। পরে আমরা তার কাটা মাথা আবিষ্কার করি একটি গাছে। জ্বিনরা তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলে। জ্বিনরা তাদের পয়গাম্বর সুলায়মান (আ.) এর ওযীফা পাঠকারীকে বাধা প্রদানকারী কাউকে কখনো সহ্য করেনি। তাই তারা তার এ অবস্থা করে। গতকাল আমি তার জানাযার নামায পড়িয়েছি।'

হাসান ভেবেছিল এ খবর শুনে মেহদীর প্রতিক্রিয়া খুব ভয়াবহ হবে। কারণ মেহদী ইমাম শামীর ঘনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। কিন্তু এ খবর শুনে তার চোখমুখে আরো নির্লিপ্ততা ছড়িয়ে পড়লো। মনে হলো তিনি কিছুই শুনেননি। তিনি কিছুই বললেন না। মনে মনে দারুণ খুশি হলো হাসান ইবনে সবা। মেহদী উলবীর ইন্দ্রিয় অনুভূতি মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে গেছে।

'আমি এই চিল্লা অবশ্যই পূর্ণ করবো। এখন আপনি শুধু দেখবেন আমি সফল হই না ব্যর্থ হই– মেহদী বললেন কেমন জড়ানো গলায়।

'হ্যাঁ সে তো বলেছি আমি, ঐ সোনার তিন টুকরোই আপনার সফল হওয়ার বড় প্রমাণ। আর ইমাম শামী জ্বিনদের হাতে কতল হওয়াও আরেকটি প্রমাণ।'

'এখনো আমি উটনীর দুধই পান করে যাবো?'– মেহদী জিজ্ঞেস করলেন যেমন কাতর মুখে 'হ্যাঁ আরো দু'দিন আপনাকে উটনীর দুধই চালিয়ে যেতে হবে। তারপর সেই দুধের সঙ্গে দিনে রাতে আধা টুকরো রুটি খেতে পারবেন।'

হাসান ইবনে সবা চাচ্ছিলো, মেহদী উলবীকে শুধু অনুভূতি শূন্যই না সম্পূর্ণ শক্তি শূন্য করে দিতে।

মেহদী উলবীকে আরো উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে হাসান ইবনে সবা সেখান থেকে চলে এলো।

পনের ষোল দিন পর সে আরেকবার মেহদী উলবীর তাঁবুতে গেলো। সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেহদীকে দেখলো, দেখলো মেহদী উলবীর ধীরে ধীরে মাথা বিগড়ে যাচ্ছে। তবে তার কথা শুনে কেউ কিছুই বুঝতে পারছে না। বজ্রপাতে গাছের মরে যাওয়া শুকনো ডালটি যেমন নিঃষ্প্রাণ হয়ে গাছের সঙ্গে ঝুলে থাকে, মেহদী উলবীও এখন তেমনি নিষ্প্রাণ হয়ে মৃত্যু আর জীবনের মাঝখানে ঝুলে আছেন।

'আর কিছু দেখেছেন কি?'– হাসান জিজ্ঞেস করলো মেহদীকে।

'হ্যাঁ মুহতারাম ইমাম!'– মেহদী উলবী নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা গলায় বললেন– 'গত রাতে আশ্চর্য এক জিনিস দেখেছি। আমি ওযীফায় মশগুল ছিলাম। হঠাৎ অসম্ভব সুন্দরী এক মেয়ে আমার সামনে দিয়ে গেলো, মনে হলো সে শূন্যে সাতার কাটছে। ওযীফায় ছিলাম বলে বেশিক্ষণ সেদিকে তাকালাম না। তারপর সে অদৃশ্য হয়ে গেলো। আমি বলবো, এ আকাশ থেকে নেমে এসেছিলো। আমি ওযীফার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ ঢেলে দিলাম। একটু পর সেই আগেরটার চেয়ে আরো সুন্দরী এক হুর মানবী আবার আমার সামনে দিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো। একটু ভয় পেলেও নিজেকে বললাম, এটা আসমানী মাখলুক। তারপর মনে হলো, এরা মনে হয় জ্বিন, যে ব্যাপারে আপনি বলেছিলেন মানুষের রূপ ধরে আসতে পারে জ্বিনরা।

'আরো অনেক কিছুই দেখবেন, খোদার কাছে যাই চাইবেন তাই পাবেন। এটা খোদায়ী ইশারা। স্বর্ণের টুকরোর ব্যাখ্যা বলেছি আপনাকে। এখন আপনি দেখেছেন দুই হুর মানবী। নিজেই তো বুঝতে পারছেন, আপনি যা চেয়েছিলেন তাই পেতে যাচ্ছেন।

মেহদী উলবীর দেখা সেই হুর মানবী দুটিকে পাঠিয়েছিলো হাসান ইবনে সবাই। সন্ধ্যার সময় মেয়ে দুটিকে সেখানে আনা হয়। তারপর তাদেরকে অতি সূক্ষ্ম সুতার তৈরি ঝালর পরানো হয়। নারী অঙ্গগুলো এতে আরো উচিয়ে উঠে। রাত গভীর হলে তাদেরকে ইংগিত করা হয়, মেহদীর সামনে দিয়ে এমনভাবে যাও যে, তোমাদের পুরো শরীরের ভর থাকবে পায়ের পাতার ওপর। পায়ের পাতার ওপর থেকেই সামনে দিয়ে দৌড়ে যাবে। তাই করা হলো। মেহদী উলবী ভাবলেন আকাশের দুই হুর তার সম্মানে নেমে এসেছে।

চল্লিশ দিন পূর্ণ হয়ে গেলো। তাঁবু থেকে উচ্ছ্বাস-উৎফুল্লতা নিয়ে বের হওয়ার কথা ছিলো মেহেদী উলবীর। কিন্তু তিনি মাথা নিচু করে এমন কষ্টে সৃষ্টি বের হলেন যেন তার কাঁধে মণকে মণ বোঝা। বাইরে এসে তিনি অপর খাদেমের তাঁবুটি দেখতে পেলেন না। এতদিন তার তাঁবুর সাথেই ছিলো তার খাদেমের তাঁবুটি। সেই তাঁবুর অস্তিত্বও নেই কোথাও। খাদেমের নাম ধরে তিনি কয়েকবার ডাকলেন। কোন উত্তর পেলেন না। আস্তে আস্তে শহরের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তিনি এখানে এসেছিলেন না কোথাও যাচ্ছিলেন তা যেন ভুলেই গিয়েছিলেন। হঠাৎ হঠাৎ শুধু তার মনে পড়তে থাকে, তার সঙ্গে একজন খাদেম ছিলো, এজন্য তিনি হঠাৎ হঠাৎ খাদেমের নাম ধরে

ডাকতে থাকেন আর পা ঘেষটে ঘেষটে শহরের রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকেন। তাকে দেখে মনে হচ্ছিলো একটা লাশ ছোট ছোট পা ফেলে হেঁটে আসছে।

হাসান ইবনে সবাকে যখন খবর দেয়া হলো আমীরে শহর এসেছেন সূর্য তখন অনেক ওপরে উঠে গেছে। বাইরে বেরিয়ে হাসান ইবনে সবা চমকে উঠলো। দেখলো মেহদী উলবী পা টেনে টেনে তার দিকে আসছে। তাকে যদি মেহদী উলবীর কথা বলা না হতো তাহলে সে তাকে চিনতেই পারতো না। চল্লিশ দিনের না কাটা দাঁড়ি, গোঁফ ওয়ালা মেহদী উলবীকে অদ্ভুত কোন জন্তুর মতোই মনে হচ্ছিলো। মেহদী একেবারে হাসান ইবনে সবার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'এসে গেছেন আমীরে শহর?'– হাসান ইবনে সবা অলস গলায় বললেন– ভেতরে আসুন।

'পানি! পানি দাও, বড় ক্লান্ত'– ফ্যাসফেসে গলায় বললেন মেহদী।

হাসান ইবনে সবা তাকে ভেতরে নিয়ে গেলো। তার কামরায় বসিয়ে এক লোককে বললো, উনাকে সাদা পানি দাও। মেহদী পানি পান করলেন।

'আমাকে পানি পান করাও'– একটু শব্দ করে বললেন মেহদী।

'আমীরে শহর! আপনাকে তো পানি পান করানো হয়েছে।'

'এই পানি নয়।' খাদেম ওখানে আমাকে যে পানি দিতো... গলা চড়িয়ে রাগত কণ্ঠে বললেন মেহদী।

হাসান বুঝলো কোন পানি তিনি চাচ্ছেন, তবুও তাকে সাধারণ শরবত দিতে বললো। মেহদী শরবত পান করলেন।

'এই পানি নয়'– এবার গলা চড়ে গেছে মেহদীর–'আমি ঐ পানি চাচ্ছি।'

হাশীষ মিশ্রিত পানি চাচ্ছিলেন তিনি। গত চল্লিশ দিন খাদেম তাকে রাত দিন সব সময় এই পানিই পান করিয়েছে। খাদেম সব সময় তার জায়নামাযের কাছে সেই পানির বড় ভাণ্ড রেখে দিতো। গতকাল সন্ধ্যা থেকে সে পানি তিনি আর পাননি। নেশার অভাবে তার ভেতর জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিলো।

'আপনি কে?'– হাসান ইবনে সবা জিজ্ঞেস করলো।

'আমি আলমোতের আমীর। আমার নাম মেহদী উলবী'– মেহদী উন্মাদের স্বরে বললেন এবং বলেই সেখান থেকেই বের হয়ে গেলেন।

'আমি এই শহরে আমীর'– আমি মেহদী উলবী'– এসব বলে বলে কিছুক্ষণ শহরময় ঘুরলেন। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা পাগল ভেবে তাকে ঢিল ছুঁড়লো, তার জামা কাপড় ধরে, চুল দাঁড়ি ধরে টানাটানি করলো। কিন্তু মেহদী উলবী নির্বিকার। তার মুখ দিয়ে বের হতে লাগলো–

'আকাশ থেকে হুর নামবে। আকাশ থেকে ধন-ভাণ্ডার নিয়ে আসবো আমি। আমি এই শহরের আমীর। হুর পরীরা আসছে... আমি আমীর'।

তিনি তার বাড়ির দিকে গেলেন। কিন্তু তারই পোষা দারোয়ানরা তাকে ধাক্কিয়ে বাড়ির গেট থেকে বের করে দিলো। তার দুই স্ত্রী এবং সন্তানরাও তাকে চিনে না বলে

অস্বীকার করলো। কয়েকজন সিপাহী দৌড়ে এলো। ওরা সব হাসান ইবনে সবার লোক। তারা তাকে পাগল বলে পাকড়াও করে ঘোড় দৌড়ের ময়দানে নিয়ে গেলো। সারা শহর হৈ হৈ করে ময়দানে গিয়ে ভিড় করলো। ফৌজের ছোট একটা দল ওখানে এসে গেলো। তাদের সঙ্গে তাদের সিপাহ্সালারও ছিলো। এরা সবই হাসানের শিষ্য। শহরের সবার মুখে 'পাগল' আর পাগল, কেউ মানতে চাচ্ছিলো ইনি না মেহ্দী উলবী এবং এই শহরের আমীর। সিপাহ্সালার তার বাহু ধরে একটু উঁচু জায়গায় দাঁড় করালো, সবাই যাতে তাকে দেখতে পায়।

'আলমোতের লোকেরা'– সিপাহ্সালার ঘোষণা করলো– 'এই যে একটি পাগল সারা শহরে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছে। আপনারা কি তাকে আমীরে শহর বলে মানবেন?'

সমস্বরে লোকেরা তাকে আমীর মানতে অস্বীকার করলো।

'ইনি যদি বাস্তবে মেহ্দী উলবী হনও তবুও তাকে আমরা আমীরে শহর মানতে পারি না। কারণ তিনি পাগল'– সিপাহ্সালার বললো।

মেহ্দী উলবী কখনো সিপাহ্সালারের দিকে, কখনো সিপাহীদের দিকে, কখনো সমবেত লোকদের দিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকাতে লাগলো। সবাই তার এই হাবভাব দেখে আরো নিশ্চিত হলো এ নিশ্চয় পাগল।

সিপাহ্সালার লোকদের বললো, এত বড় শহরের প্রতিরক্ষার জন্য এত দিন কোন ফৌজ ছিলো না। শহরের নিরাপত্তা ও লোকদের জীবন ও সম্পদ রক্ষার জন্য বড় এক ফৌজ বানানো হয়েছে। এর ব্যয়ভার ও নেতৃত্ব দিয়েছেন ইমাম হাসান ইবনে সবা। তাই ফৌজের সিদ্ধান্ত হলো হাসান ইবনে সবা এই শহরের আমীর।

এত দিনে শহরের অসংখ্য লোক হাসান ইবনে সবার শিষ্য হয়েছে। তারা সবাই এক যোগে বললো, আমীরে শহর হবে হাসান ইবনে সবা। হাসান আমীরে শহর হয়ে মেহ্দী উলবীর পরিবারের জন্য মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করে দিলো।

★★★★

মুযাম্মিল আফেন্দী চল্লিশ দিন পর কয়েদখানা থেকে বের হলো। তার মেহ্দী উলবীর মতো পাগল হয়ে বের হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু সে বুক ফুলিয়ে কাঁধ উঁচিয়ে বের হলো। যেন এক রগচটা আমীরে শহর বের হয়েছে। রাস্তায় কাউকে দেখলেই তাকে হত্যা করবে, দূর থেকে হাসান ইবনে সবা তাকে আসতে দেখে উষ্ণ সংবর্ধনা জানালো।

'এসে গেছো মুযাম্মিল'– হাসান ইবনে সবার উষ্ণ কণ্ঠ– এখন তোমার কাজ কি?

'কাজ আমার একটাই। মরে যাবো এবং নেযামুল মুলককে হত্যা করবো'– মুযাম্মিল আফেন্দীর বিষাদপূর্ণ গলা।

'কবে যাবে?'

'যখন আপনি হুকুম করবেন, বললে আজই রওয়ানা দেবো। কয়েকদিনের মধ্যে নেযামুলমুলকের মাথা কেটে আপনার কাছে পেশ করবো।

হাসান ইবনে সবা নিজ হাতে মুযাম্মিলকে শরাব পরিবেশন করলো। তার সঙ্গে খাবারও খেলো।

পরদিন ভোরে উঁচু জাতের একটি ঘোড়ায় চড়ে মুযাম্মিল হাসান ইবনে সবা থেকে বিদায় নিলো। কারুকাজ করা তলোয়ার আর চকচকে খঞ্জর তার কোমরের দু'পাশে ঝুলছে। তার রুখ তখন সেলজুকিদের রাজধানী মারু।

সুলতান মালিক শাহ ও নেযামুলমুলক মুযাম্মিলের কথা প্রায় ভুলেই গেছেন। তাদের কাছে মুযাম্মিল নিহত। মুযাম্মিল জীবিত শুধু সুমনা ও তার মা মায়মুনার কাছে। আহমদ আওযাল খালজান থেকে ফিরে এসে প্রথমেই সংবাদ দেয়, মুযাম্মিল হাসান ইবনে সবার লোকদের হাতে কতল হয়ে গেছে। সুলতান মালিক শাহ ও নেযামুলমুলক তখনই আহমদ আওযালের কথা মেনে নেয়। তবে সুমনা মানতে পারেনি। তার দৃঢ় বিশ্বাস মুযাম্মিল জীবিত আছে। আহমদ আওযালকে বার বার বলতে থাকে, আহমদ আওযাল যেন মুযাম্মিলকে খুঁজে বের করে। আহমদ আওযাল জানতো এই রূপসী মেয়েটি আবেগরুদ্ধ হয়ে বাস্তবতা মানতে পারছে না। সে অনেক করে বুঝাতে চেষ্টা করলো, মুযাম্মিল এই দুনিয়ায় নেই। কিন্তু সুমনা চিৎকার করে বলতো, মুযাম্মিল মরতে পারে না। হাসান ইবনে সবাকে মেরে সে মরবে। তার এই জপ উঠে যায়, হাসান ইবনে সবা জীবিত থাকলে মুযাম্মিলও জীবিত আছে।

আহমদ আওযাল ও সুমনাকে কয়েকবার বলেছে, সে খালজান বা আলমোত যেতে ভয় পায় না, কিন্তু সেখানে হাসান ইবনে সবা ও তার গুপ্তবাহিনী তাকে চিনে। আর গুপ্ত বাহিনীর দু'জনকে সে কতল করে এসেছে। তাকে ওরা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

'হায় আমি যদি ওখানে যেতে পারতাম'– সুমনা বললো ভারী গলায়– 'কিন্তু হাসান ইবনে সবার সঙ্গে আমি যে থেকেছি। ওখানকার সবাই আমাকে চেনে। হাসান ইবনে সবা তো আগে আমার কতলের নির্দেশ দিয়েছে। ওখানে গেলে আমাকে শুধু কতল করা হবে না আমার ইজ্জত লুটে নেবে ওরা।

আহমদ আওযালের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে সুমনা তার মাকেও পেরেশান করে তোলে। মা বিরক্ত হয়ে একদিন তাকে বলেছেও, সে যেন নিজেকে এত অস্থির না করে, না হলে একদিন সে পাগল হয়ে যাবে।

এরপর থেকে সুমনার প্রতিদিনের কাজ হলো, সকাল হলেই ছাদে চলে যাওয়া। সুলতান মালিকশাহ সুমনা ও তার মাকে মারুতে চমৎকার একটি বাড়ি দিয়েছেন। মা মেয়ে সেখানে একলা থাকে।

বার কয়েক মায়মুনা সুমনাকে ছাদ থেকে টেনে নিচে এনেছে, তাকে ধমকিয়েছে, কিন্তু সুমনার একটাই কথা, মুযাম্মিল ফিরে আসছে। ছাদ থেকে ওকে প্রথম দেখবো আমি।

সুমনা ঘোড়সওয়ারীতে কেন অভিজ্ঞ। প্রায়ই সে সুলতানের মহলের আস্তাবল থেকে ঘোড়া চেয়ে নিয়ে শহরের বাইরে বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ ঘুরে টুরে আবার ফিরে আসে। একদিন সুমনা তার মাকে বলে, ঘোড়া আনিয়ে দাও মা! বাইরে যাবো।

'সুমনা! তোমাকে আমি এখন বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিতে পারি না। দিন দিন তোমার শরীর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তোমার মাথাও ঠিক নেই। ভয় হয় কখন জানি আবার খালজানের পথে ছুটতে শুরু করো'– মায়মুনা বলেন উদ্বেগের গলায়।

'না মা! আগেই বলেছি আমি মুযাম্মিলের খোঁজে বাতিনীদের এলাকায় যেতে পারবো না। আগে যখন যাইনি এখনো যাবো না। ঘরে দম আটকে আসে। তাই খোলা জায়গা থেকে ঘুরে আসবো একটু।

মা তাকে ঘোড়া এনে দিলে ঘোড়া নিয়ে সে বেরিয়ে গেলো। মাও বুঝতো, মেয়েকে ঘরে আটকে রাখলে উল্টো সে পাগল হয়ে যাবে। মারু শহরটা যেমন বিশাল এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভাণ্ডারও তত বৈচিত্র্যময়। নানান সাজের বাগান, টলটলে জলের ঝর্ণা, সবুজে মোড়ানো পাহাড় ও ঈষৎ বিক্ষিপ্ত টিলার সারি। শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝিরঝিরে নদীর স্নিগ্ধ আবহ মারুকে যেন দুনিয়ার অঘোষিত স্বর্গ বানিয়ে দিয়েছে।

সেদিনও সুমনা ঘোড়া নিয়ে একটি বাগানের দিকে যাচ্ছিলো। ঘোড়া হালকা চালে দৌড়াচ্ছিলো, এ ভঙ্গিটি সুমনার যেন প্রিয়। তার পাশ দিয়ে এক ঘোড় সওয়ার চলে গেলো, ঘোর-সওয়ারকে সে লক্ষ্যই করলো না। সে তার ঘোড়ার সঙ্গে নিবিড় করে কথা বলছিলো।

'সুমনা'– ঘোড়ার পদধ্বনির সঙ্গে শা শা করে শব্দটি ভেসে এলো।

সুমনা ঘোড়া থামিয়ে পেছন দিকে ঘুরলো। সম্ভবতঃ একটু আগে তার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া ঘোড়সওয়ারটিই। ঘোড়সওয়ার ঘোড়া ঘুরিয়ে তার দিকে তীব্র বেগে ছুটে আসছে। কাছে এসে ঘোড়াটি দাঁড়িয়ে পড়লো। দুই সওয়ারের চোখে অবিশ্বাস।

'মুযাম্মিল!'– সুমনার মুখ দিয়ে চিৎকার বেরিয়ে এলো।

সুমনা লাফিয়ে ঘোড়া থেকে নামলো। তার স্বপ্ন আর বাস্তব একাকার হয়ে গেছে, দু'হাত প্রসারিত করে সুমনা মুযাম্মিলের দিকে দৌড়ে গেল। তারপর দু'জনের দৃষ্টি একটি বিন্দুতে স্থির হয়ে গেলো।

'আমি প্রতিদিনই বলেছি আমার মুযাম্মিল ফিরে আসবে'– সুমনার মুখ অনবরত জপে যাচ্ছে।

অনেক্ষণ তারা এভাবে রইলো। দুই ব্যাকুল হৃদয়ের এই মিষ্টি উন্মাদনা দেখে সূর্য পৃথিবীর আড়ালে চলে গেল। তাদের ওপর চুপ করে নেমে এলো সন্ধ্যার প্রচ্ছন্ন পর্দা।

সেখান থেকে মুযাম্মিলকে সুমনা তার ঘরে নিয়ে এলো। মায়মুনাও মুযাম্মিলকে দেখে খুশিতে কেঁদে ফেললেন।

'আমি এখনই ওযীরে আজম নেযামুলমুলককে খবর দিচ্ছি, তিনি তোমার ফিরে আসার খবর শুনে খুব খুশী হবেন। এখানকার সবাই জানে তুমি কতল হয়ে গেছো'– মায়মুনা বললো।

'না, তাকে খবর দেয়ার দরকার নেই, আমি নিজেই তার কাছে যাবো'– মুযাম্মিল বললো সতর্ক হয়ে।

মায়মুনা মুযাম্মিল ও সুমনাকে একলা হওয়ার সুযোগ দিয়ে কামরা থেকে বের হয়ে গেলো। সুমনা এটাই চাচ্ছিলো। সে উঠে দরজা বন্ধ করে দিলো।

'সুলতান আর ওযীরে আজম নেযামুলমুলক বলতেন মুযাম্মিল বাতিনীদের হাতে কতল হয়েছে। আমি বলেছি মুজাম্মিল ফিরে আসবেই। তারা মানতেন না। আহমদ আওয়ালও এ কথাই বলতো।'

'নেযামুলমুলক তো চাইতেনই আমি যেন কতল হয়ে যাই'– মুযাম্মিল গম্ভীর স্বরে বললো– এখন দেখা যাবে কে কার হাতে কতল হয়।'

'কী বলছো? ও – খুব খারাপ অবস্থা গিয়েছে তোমার সেখানে। তাই হয়তো তোমার মনকে বিষিয়ে তুলেছে, কার কতলের কথা বলছো?'

'খারাপ নয় সুমনা! খুব ভালো অবস্থায় ছিলাম। আমার চোখ খুলে গেছে ওখানে গিয়ে। হাসান ইবনে সবাকে কতল করতে গিয়েছিলাম, ওখানে গিয়ে আমি জানতে পারলাম, হাসান ইবনে সবাকে নয় আমি অন্য কাউকে কতল করতে চাই। অনেক ভেবেও বের করতে পারছিলাম না কাকে খুন করবো। কিছুদিন পর সেই রহস্যের জট খুললো, আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো যাকে আমি খুন করতে চাই।'

'কে সে?' – সুমনা ভয়ে কুকড়ে গিয়ে বললো।

'নেযামুল মুলক।'

'মুযাম্মিল?– সুমনা মুযাম্মিলের বুকের কাপড় খামচে ধরে বললো– 'কী বলছো এসব? নেযামুল মুলক'...

'সুমনা!'– মুযাম্মিল সুমনাকে কাছে টেনে নিয়ে বললো– 'ভেবে দেখো, আমার কত গভীরে মিশে গেছো তুমি যে, চরম নিন্দিত মৃত্যুর মুখে পড়ার মতো এক গোপনীয়তা তোমার কাছে ফাস করে দিচ্ছি। কারণ তোমাকে ছাড়া এক কদমও আমি এগুতে পারবো না। খালজান গিয়েছিলাম এক উদ্দেশ্যে কিন্তু আলমোত থেকে ফিরেছি অন্য উদ্দেশ্যে।'

'সব খুলে বলো মুযাম্মিল! আজ আমার প্রাণটি পর্যন্ত তোমাকে দিয়ে রেখেছি। তোমার সব কথাই আমার বুকে লুকিয়ে রাখবো। আমি শুনতে চাই সেখানে তোমার ওপর দিয়ে কী বয়ে গেল?'

'যা বয়ে গেছে তার চেয়ে ভালো আর কিছু হয় না'– মুযাম্মিল কিছুটা গম্ভীর কিছুটা চতুর গলায় বললো– 'বড় অন্ধকারের মধ্যে থেকে ওখানে গিয়েছিলাম। সেখানে জানতে পারলাম এত দিন অন্ধকারের সন্ধানই করেছি। সেখানে আলোর সন্ধান পেয়েছি। জানতে পেরেছি কে বন্ধু কে শত্রু। আমার চিন্তাধারা বিশ্বাস সবকিছু বদলে গেছে। রয়ে গেছে শুধু সুমনা নামের মেয়েটির অটল বিশ্বাস অবিচল ভালোবাসা। এখন সবকিছুই সইতে পারবো, সইবো না শুধু সুমনার নামের মেয়েটির প্রত্যাখ্যান।'

সুমনা গভীর চোখে মুযাম্মিলকে লক্ষ্য করলো। মুযাম্মিলের চেহারায় যে নিঃস্পাপ সরলতার সৌন্দর্যটুকু ছিলো তা যেন কেমন রুক্ষতায় মুছে গেছে। মুযাম্মিলের এমন চেহারা সুমনা কখনো দেখেনি। কী ভেবে সুমনা গম্ভীর গলায় বললো–

'যত গোপন অগোপনীয় হোক মুযাম্মিল! সব নিরাপদে থাকবে এই বুকে। প্রাণের বিনিময়ে হলেও। কিন্তু আগে বলো নেযামুল মুলকের মতো এত বড় মহান ব্যক্তিকে হত্যা করবে কেন?'

'মহৎ আর মহান? মহান তো হাসান ইবনে সবা, আমি তাকে হত্যা করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওখানে গিয়ে অনুভব করলাম, আমি সৌভাগ্যবান যে, এই মহান ব্যক্তির কাছে যাওয়ার উপলক্ষ পেয়ে গেছিলাম।'

সুমনা ভীষণভাবে কেঁপে উঠলো। কিন্তু মুযাম্মিলের কাছে ধরা পড়া থেকে নিজেকে সামলে রাখলো। সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করলো–

'আচ্ছা মুযাম্মিল! বলতো নেযামুল মুলককে কবে মারতে চাও? এটা জিজ্ঞেস করছি যাতে তুমি তাড়াহুড়া না করো। আমার ওপর যদি তোমার আস্থা থাকে তাহলে এ কাজ আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমি তোমার জন্য এমন সুযোগ সৃষ্টি করবো যে, তুমি উনাকে কতলও করবে এবং ধরাও পড়বে না।

'হ্যাঁ সুমনা! তোমার প্রতিই আমার সবচেয়ে বেশি আস্থা। আমি জানতামও তুমি আমাকে সাহায্য করবে।'

কথা বলতে বলতে মুযাম্মিলের চোখ ছোট হয়ে এলো, সুমনা মুযাম্মিলকে শুইয়ে দিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে তার মার কামরায় চলে গেলো।

সুমনা সারা রাত তার দু'চোখ এক করতে পারলো না। সে যোগ বিয়োগ করে বুঝে গেলো, বাতিনীরা তাকে হত্যা না করে হন্তারক হিসেবে পাঠিয়েছে। সুমনা হাসান ইবনে সবার সঙ্গে থেকেছে অনেক দিন। তাই আর তার বুঝতে অসুবিধা হলো না হাসান ইবনে সবা মুযাম্মিলকে কি উপায়ে বশ করেছে। তার চোখের সামনেই তো হাসান ইবনে সবা অসংখ্য পরহেজগার আর ভালো মানুষকে শয়তানে রূপান্তরিত করেছে।

★★★★

সকালে সুমনা নিজেই মুযাম্মিলের জন্য নাস্তা নিয়ে গেলো। দু'জনে এক সাথে নাস্তা খেলো। নাস্তার পর সুমনা মুযাম্মিলকে বললো–

'শোন মুযাম্মিল! আমি আমার মাকে এসব কথা বলিনি তুমিও বলো না। নেযামুল মুলকের সঙ্গে আমরা অনেকদিন ধরেই আছি, এখন আমি তার কাছে যাচ্ছি। ঘনিষ্ঠ হয়ে কিছুক্ষণ আলাপ করে বলবো এমনিই দেখা করতে এসেছি। এভাবে কয়েকদিন উনার কাছে যাবো। একদিন সুযোগ বুঝে উনাকে বাইরে নিয়ে আসবো। আগেই তোমাকে বলে রাখবো, উল্টা পাল্টা কিছু করে বসো না আব্যর তুমি। আমার সর্বশেষ ইংগিতের অপেক্ষায় থেকো।'

মুযাম্মিল আফেন্দীর মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠলো।

'তোমার কাছে এটাই আশা করছিলাম সুমনা!'– মুযাম্মিল কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললো– 'তুমি ভাবতেও পারবে না, একাজ করতে পারলে আমি তোমাকে কেমন বেহেশতে নিয়ে যাবো, তুমি সুযোগ সৃষ্টি করো। আমি তোমার ইংগিতের অপেক্ষায় থাকবো।'

সুমনা বহুকষ্টে মুখের হাসি ধরে রেখে কামরা থেকে বের হলো।

ঘরেই পাওয়া গেলো নেযামুলমুলককে। তিনি মাত্র নাস্তা সেরে উঠেছেন। সুমনা দেখা করতে এসেছে শুনে তিনি ভাবলেন, এই মেয়ে আবারো খালজান বা আলমোত যাওয়ার কথা বলতে এসেছে। তিনি সুমনাকে ভেতরে পাঠাতে বললেন।

'এসো সুমনা!'– নেযামুল মুলক স্নেহার্দ্র গলায় বললেন– 'আজ কি আবার মুযাম্মিলের কথা মনে পড়েছে? নাও স্বপ্নে দেখেছো?'

'না মুহতারাম! স্বপ্নে নয় বাস্তবেই সে এসেছে। কাল সন্ধ্যায় অক্ষত অবস্থায় আমার কাছে এসেছে।'

'কী বলছো? তোমার মাথা কি ঠিক আছে?'– নেযামুল মুলক এমনভাবে বললেন যেন সুমনার মাথা সত্যিই বিগড়ে গেছে–'সে এলে আমার কাছে এলো না কেন?... সে কী বলেছে তার অবস্থা সেখানে কেমন ছিলো?'

'মুহতারাম! আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন যে, সে আমার কাছে আগে এসেছে, প্রথমেই আপনার কাছে এলে এতক্ষণে অন্যকিছু ঘটে যেতো।

'কী বলছো? কী হতো? মনে হচ্ছে মানসিকভাবে তুমি খুব চিন্তাগ্রস্ত?

'হ্যাঁ মুহতারাম! সারারাত ঘুমাইনি আমি, কোন ভূমিকা ছাড়া শুধু এতটুকু বলবো, যাকে আপনি হাসান ইবনে সবার হত্যার জন্য পাঠিয়েছিলেন সে এখন আপনাকে হত্যা করতে ফিরে এসেছেন'।

'এতে আমি খুব আশ্চর্যও হচ্ছি না। আমার জানা আছে, হাসান ইবনে সবার কাছে এমন জাদু আছে যা মুযাম্মিলের মতো এক দৃঢ় যুবককেও তার শিষ্য বানিয়ে নেয়-, নেযামুল মুলক বললেন শান্ত গলায়।

'মুহতারাম! আপনি তো শুধু শুনেছেন হাসান ইবনে সবার কাছে কোন জাদু আছে। আমি নিজে চোখে সেই জাদু চালাতে দেখেছি। পরে বিস্তারিত বলবো, কিন্তু তড়িৎ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে মুযাম্মিলকে এখন কি করা হবে। তাকে আমি আর কত দিন আমার আবেগের শিকলে বেঁধে রাখতে পারবো? যে কোন সময় সে আপনার ওপর হামলা চালাতে পারে... আপনি অত্যন্ত দূরদর্শী... আমি সে তুলনায় নগণ্য হয়েও পরামর্শ দেবো, তাকে আপনি কয়েদ করে রেখে দিন।'

'না সুমনা'– অসম্ভব বুদ্ধিদীপ্ত বলে প্রসিদ্ধ নেযামুল মুলক বললেন– 'আমি এতো সুদর্শন, দৃঢ়চেতা ও দুঃসাহসী এক যুবককে নষ্ট করবো না। হাসান ইবনে সবা যেভাবে নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাকে মারণাস্ত্র বানিয়েছে আমিও সেভাবে তাকে ফিরিয়ে আনবো এবং আগের মতো খাঁটি মুসলমান বানিয়ে ছাড়বো। ভেবে দেখো সুমনা! সে তার মা-বাবা ভাই-বোনের কথা মন থেকে বের করে দিয়ে একমাত্র সংকল্প নিয়েছিলো যে, হাসান ইবনে সবাকে হত্যা করবে। হাসান ইবনে সবাকে সে একজন মানুষ হিসেবে নয় মানবজাতির ধ্বংসকারী এক শয়তানের গলা কাটতে চেয়েছিলো। আমি ওকে তার আসল জীবনে ফিরিয়ে আনবো। তবে এর জন্য আমাদের একটা খেলায় নামতে হবে।'

'এই খেলায় আমি কি অংশগ্রহণ করতে পারবো না?'

'হ্যাঁ, আজ সন্ধ্যায় তুমি ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো। ওকে বলবে, আমি অমুক কামরায় একলা আছি। তাকে নিশ্চয়তা দিবে আমাকে কতল করার এটাই সুন্দর সুযোগ। বলবে, নেযামুল মুলক পেছনে ফিরলেই খঞ্জর নেযামুলমুলকের পিঠে বসিয়ে দেবে... বাকীটা আমি সামলে নেবো।'

'না মুহতারাম ওযীরে আজম! আমার ভয় হয়, খেলায় খেলায় আপনার বুকে না আবার খঞ্জর বসে যায়!'

'আহা! তুমি ওকে পাঠিয়ে দিয়ো। আমি সাবধান থাকবো।'

যে কামরার কথা নেযামুল মুলক বলেছেন সেটা তিনি সুমনাকে চিনিয়ে দিলেন। এ কামরাটি মহলের অন্যান্য কামরা থেকে আলাদা। নেযামুল মুলক এখানে বসে জটিল যে কোন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করেন।

সুমনার কথা মতো সন্ধ্যায় মুযাম্মিল তার কাপড়ের নিচে খঞ্জর নিয়ে নেযামুলমুলকের ওখানে চলে গেলো। মুযাম্মিল এর আগে যখমী হয়ে এই কামরাতেই ছিলো। তাই এই হাবেলী তার ভালোই চেনা আছে। দারোয়ান তাকে বাঁধা দিলো না। এটাও পূর্ব পরিকল্পিত। মুযাম্মিল দরজায় টোকা দিতেই নেযামুলমুলক দরজা খুললেন। মুযাম্মিলকে দেখে দারুণ খুশীর ভাব নিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। তার কামরায় নিয়ে মুযাম্মিলকে বসার ইংগিত করলেন। মুযাম্মিল তার সামনের চেয়ারে বসে গেলো।

নেযামুলমুলক এক ছুতোয় তার দিকে পিঠ দিয়ে দু'তিন কদম হেটে গেলেন। মুযাম্মিল বড় দ্রুত বসা থেকে দাঁড়িয়ে গিয়ে এক টানে তার কাপড়ের নিচ থেকে খঞ্জর বের করে ফেললো। নেযামুলমুলক জানতেন এখন কি হবে। মুযাম্মিল খঞ্জর ধরা হাতটি যেই উঠালো নেযামুল তখনই এক ঝটকায় ঘুরে গিয়ে চোখের পলকে মুযাম্মিলের খঞ্জর ধরা হাতের কনুই শক্ত করে ধরে ফেললেন। আরেক হাতে মুযাম্মিলকে জাপ্টেধরে তার দিকে টেনে আনলেন। পর মুহূর্তে নেযামুলমুলক মুযাম্মিলের পাঁজর সই করে প্রচণ্ড শক্তিতে হাঁটু চালালেন। মুযাম্মিল ব্যথায় ঘোঁত করে উঠলো। মুযাম্মিল ভেবে পেলো না নেযামুল মুলকের গায়ে এই অসুরের শক্তি কোত্থেকে এলো। মুযাম্মিল ভুলে গিয়েছিলো নেযামুলমুলক সেনাপ্রধানও ছিলেন।

সে অবস্থাতেই নেযামুল মুলক মুযাম্মিলের দুই হাত মুচড়িয়ে মুযাম্মিলের পিঠ তার সামনে নিয়ে এলেন। এবার নেযামুলমুলক তার কোমরে আরেকটি পায়ের কোপ চালালেন। মুযাাম্মিল ধপাস করে পড়ে গেলো। তার হাত থেকে খঞ্জরটিও দূরে ছিটকে গেলো। নেযামুল মুলক মুযাম্মিলের শাহরগের ওপর পা রেখে তার দেহের অর্ধেক ভার ছেড়ে দিলেন শাহরগের ওপর। মুযাম্মিল ছটফট করতে লাগলো।

নেযামুল মুলক সাংকেতিক একটি কথা বললেন। দু'জন প্রহরী দৌড়ে এসে এই দৃশ্য দেখলো এবং দু'জনে মুযাম্মিলকে বেঁধে ফেললো।

'নিয়ে যাও ওকে, কয়েদখানায় আটকে রাখো। কাল আমি ওকে দেখবো;

প্রহরীরা মুযাম্মিলকে নিয়ে গেলো।

সেদিনই নেযামুলমুলক সুলতানকে মুযাম্মিলের পুরো ঘটনা বললেন। তারপর নেযামুলমুলক বললেন–

'সুলতানে মুকাররম! এখন আমাদের আলমোত সেনা অভিযান করতে হবে। ঐ শয়তানদের ফৌজি শক্তি দিয়েই শেষ করা যাবে। হামলাকারী ফৌজের সিপাহসালার আমি নিজে হবো এবার। এখন আপনার এজাযত চাই।'

'হ্যাঁ খাজা! আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা'– পরম আস্থা নিয়ে বললেন সুলতান মালিক শাহ।

মুযাম্মিল আফেন্দীকে প্রথমে ধাক্কিয়ে তারপর মাটিতে হেঁচড়িয়ে কয়েদখানায় নিয়ে এক কুঠরীতে বন্দী করা হলো। মুযাম্মিল কয়েদখানার দেয়াল ধরে জোরে জোরে হেলিয়ে চিৎকার শুরু করে দিলো–

'তোমরা আমাকে কবরে দাফন করে দিলেও ঐ লোককে খুন করতে বেরিয়ে আসবো আমি।

পরদিন নেযামুলককে মুযাম্মিল সম্পর্কে জানানো হলো, রাতভর সে ঘুমায়নি। শুধু চিৎকার চেচামেচি করেছে। এখনো সে অবস্থায়ই আছে। নেযামুলমুলক জিজ্ঞেস করলেন, চিৎকার করে সে কি বলে? তাকে জানানো হলো, সে বলছে, আমি নেযামুলমুলকে খুন করবো।

নেযামুলমুলকে সুমনা বিস্তারিত জানিয়েছে, হাসান ইবনে সব্বার ওখানে কিভাবে মস্তিষ্ক ধোলাই করা হয়, কিভাবে সে তার শিষ্য বানিয়ে নেয় ইত্যাদি ইত্যাদি। নেযামুলমুলক তখন তার এক বিশ্বস্ত লোককে ডেকে কিছু গোপন নির্দেশ দিলেন। সে লোক চলে যাওয়ার পর তিনি এক কর্মচারীকে ডেকে বললেন, ডাক্তার নাজম মাদানীকে ডেকে আনতে।

নাজম মাদানী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চিকিৎসা সেবা দিয়ে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছেন। পরে সেলজুকি সালতানাতকে ভালো লাগায় ওখানেই রয়ে যান। এখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ায় কোথাও বের হন না, ঘরে বসে নানান গবেষণা করেন।

নেযামুল মুলকের কথা শুনেই তিনি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে নেযামুলমুলকের বাড়িতে রওয়ানা হয়ে গেলেন। নেযামুল মুলক নাজম মাদানী আসার সংবাদ পেয়ে বাইরে দৌঁড়ে গিয়ে তাকে পরম সম্মান দেখিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। ঘরে এনে বসিয়ে বললেন,

'মুহতারাম! আমার নিজেরই আপনার কাছে যাওয়া উচিত ছিলো। আপনাকে কষ্ট দেয়া...

'ওযীরে আজম!'– নাজম মাদানী তাকে বাঁধা দিয়ে বললেন–'এর চেয়ে আসল কথায় যাওয়া কি ভালো নয়?'

নেযামুলমুলক নাজম মাদানীকে মুযাম্মিলের বিস্তারিত সব বলতে লাগলেন। মুযাম্মিল এখানে কোন সূত্রে এসেছিল। সুমনা ও তার মা মায়মুনাকে নিয়ে কী কৃতিত্ব দেখিয়েছে হাসান ইবনে সবার বিরুদ্ধে কি করে মারাত্মক যখমী হয়েও প্রচণ্ড আত্মশক্তিতে বেঁচে উঠেছে। তারপর হাসান ইবনে সবাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে গিয়ে কিভাবে উল্টো নেযামুলমুলকে হন্তারক হিসেবে ফিরে এসে তার ওপর হামলা চালিয়েছে এবং নেযামুল সুমনার মাধ্যমে কি উপায়ে মুযাম্মিলকে ঠেকিয়েছেন। আরো জানালেন সুমনা ও মুযাম্মিলের সম্পর্কের কথাও।

'ঐ ছেলে কি এই মেয়ে সুমনাকে চায়?'– সম্পর্কের কথা শুনে মাদানী চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন।

'শুধু চায়ই না, যদি মানুষের সামনে সিজদা করা যেতো মুযাম্মিল এই মেয়ের পায়ে পড়ে সিজদা করতো।'

'ঐ মেয়েকে এখানে ডাকুন। আপনি কিন্তু এখনো আপনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেননি কিছু। আপনি কি এই ছেলের ভাগ্যের ফয়সালার জন্য আমার কাছ থেকে পরামর্শ নিচ্ছেন?

"তার ভাগ্যের ফয়সালা করতে চাইলে কারো পরামর্শের প্রয়োজন হতো না আমার। মুহাফিজদের হুকুম দিতাম তাকে কতল করে বাইরে ফেলে দাও। কুকুর, শূকর খেয়ে ওর লাশ পরিষ্কার করে দেবে। কিন্তু মুহতারাম ডাক্তার! মুযাম্মিলের মতো এমন মূল্যবান এক ছেলেকে আমি নষ্ট হতে দিতে পারি না। আমি হয়তো আপনাকে ভালো করে বুঝাতে পারছি না যে, এই ছেলেটি ইসলাম ও মানবজাতির জন্য কতটুকু উৎসর্গপ্রাণ ও নির্ভীক সৈনিক ছিলো। আমি চাই সে যাতে তার আসল অবস্থায় ফিরে আসে। আর হাসান ইবনে সবা তার ওপর এমন ঔষধ প্রয়োগ করেছে, তার চোখে এখন বন্ধু শত্রু আর শত্রু বন্ধু হয়ে গেছে। আমি আপনার কাছে দরখাস্ত করছি, আপনি আপনার অভিজ্ঞতায় দেখুন, বাতিনীরা কিভাবে একজন অতি ভালো মানুষকে বড় শয়তানে পরিণত করে, এর প্রতিকারই বা কি?'

'প্রিয় নেযামুল মুলক! আপনি আজ একথা বলছেন? আমি তো দীর্ঘ দিন ধরে এর ওপর কাজ করে যাচ্ছি। দীর্ঘ সময়ের পর আমি আবিষ্কার করলাম, বাতিনীরা মানুষের চিন্তা চেতনাকে কাবু করে তাকে পরিপূর্ণ শয়তান বরং মানুষ খেকোতে পরিণত করে। আমি দীর্ঘদিন আমার লোকদের মাধ্যমে যাচাই করেছি যে এটা হাশীষের (হিরোইন) অবদান। আর এরা মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা– কুপ্রবৃত্তিকেও কাজে লাগায়।,

'মুহতারাম! এখন প্রশ্ন হলো আমাদের কাছে কি এর কোন প্রতিকার আছে কি না।' 'হ্যাঁ তা আছে। তবে দু'একজনের জন্য। তাও আমি বছরের পর বছর ধরে গবেষণা আর পরিশ্রম করে তৈরী করেছি। শুধু এই মুসলিম ছেলেটির জন্যই হয়তো এর প্রতিকারিতা সাব্যস্ত হবে। হাসান ইবনে সবা যে এলাকার পর এলাকা দখল করে তার হাজার হাজার শিষ্য বানিয়েছে এর কোন প্রতিকার নেই আমার কাছে। হ্যাঁ একটা ঔষধ আপনার কাছে আছে। তা হলো এই শয়তানদের খতম করে দেয়া, ফৌজি অভিযান চালিয়ে আহমদ ইবনে গুতাশ ও হাসান ইবনে সবাকে এবং তাদের বড় বড় শিষ্যগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে আবার খাঁটি ইসলামের প্রচার শুরু করে দিন।'

'এতো আমরা করেই যাচ্ছি। সুলতান মালিক শাহ থেকে আমি হামলার এজাযত নিয়েছি।'

'কিন্তু অনেক ভেবে চিন্তে পা ফেলতে হবে। অনেক আগে আমি কেল্লা আলমোত দেখেছিলাম। এখন নাকি তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করা হয়েছে। আপনি তো জানেন ঐ কেল্লা পাহাড়ের ওপর।'

'হ্যাঁ, মুহতারাম! এসব ব্যাপার আমার ওপর ছেড়ে দিন। আপনার এখন যা করণীয় তাহলো মুযাম্মিলকে তার আসল অবস্থায় ফিরিয়ে আনা।'

★★★★

কয়েদখানার সেই কুঠুরীতে হাত পা ছুঁড়ে চিল্লাতে চিল্লাতে মুযাম্মিল আফেন্দী ক্লান্ত হয়ে গারদের পাশে বসে ঝিমুচ্ছে, এ সময় বাইরে এক লোক গারদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেলো।

'মুযাম্মিল!,– লোকটি ফিস ফিস করে বললো,

আস্তে আস্তে মুযাম্মিল মাথা উঠালো।

'মুযাম্মিল আফেন্দী! এদিকে এসো,– লোকটি এবার সামান্য শব্দ করে বললো আর ভীত চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলো কেউ দেখছে কি না।

'এ্যাই কী?'– খেকিয়ে উঠলো মুযাম্মিল– 'যাও এখান থেকে নইলে কিন্তু...

'আরে আহমক! আস্তে আস্তে'– ফিসফিস করে বললো লোকটি– 'আমি তোমার বন্ধু। এদিকে এসো।'

মুযাম্মিল হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে গারদের সামনে এসে বসলো। লোকটি বললো– 'আজ সকালেই জেনেছি তোমাকে কয়েদ করা হয়েছে। আমি তোমাকে এখান থেকে ভাগিয়ে নিয়ে যাবো, আমি জানি তুমি আলমোত থেকে কেন এসেছো। হাসান ইবনে সবার চর আমি। এই কয়েদখানায় আমার প্রভাব আছে। নেযামুল মুলককে আমিই কতল করতে পারতাম। কিন্তু ইমামের পয়গাম পেয়েছি, এ কাজ মুযাম্মিল আফেন্দী করবে। আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তোমার সাহায্য করার জন্য। এখানে তুমি কোন হাঙ্গামা করো না এখন। তোমাকে এখান থেকে বের করা ও আলমোতে পাঠানো আমার কাজ।

'আমি কি নেযামুল মুলককে কতল করতে পারবো?'– মুযাম্মিলের গলায় আশা।
'প্রথম তোমাকে এখান থেকে বের করতে হবে, তারপর দেখা যাবে কোন সুযোগ পাওয়া যায় কিনা। দুই তিন দিনের মধ্যে কোন সুযোগ না পাওয়া গেলে তোমাকে আলমোত ফেরত পাঠানো হবে এবং সুযোগ সৃষ্টি হলে আবার ফিরিয়ে আনা হবে।'
'একটা কাজ করতে পারবে? সুমনা নামের একটা মেয়ে...

'হ্যাঁ হ্যাঁ চিনি ওকে, সুমনাকে না চিনলে কিসের গোয়েন্দাগিরি করি আমি। এটাও জানি সে এখন নেযামুলমুলকের ওখানে।'

'আমি শুধু জানতে চাই সে ঠিক আছে তো? নাকি ওকেও পেরেশান করা হচ্ছে?'

'না সে ঠিক আছে। ওকে সন্দেহ করা হলে তোমার সঙ্গেই ওকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করা হতো।'

মুযাম্মিল শান্ত হয়ে গেলো। যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর কেউ ঠাণ্ডা পানি ছিটিয়ে দিয়েছে।

'এখন তোমার খাবার দাবারের ব্যবস্থা আমার হাতে হবে'– লোকটি বললো– 'আমি চেষ্টা করবো আমার নিজ হাতে খাবার নিয়ে আসতে। আমি না আসতে পারলে যে খাবারই আনা হবে খুব আরাম করে খাবে। এমনভাব করবে যে, তুমি ভেতর

ভেতর মরে গেছো। এখন আর কোন ভয় নেই তোমাকে নিয়ে এবং এখন আর তুমি আশংকামূলক কিছু করবে না। আমার চলে যাওয়ার সময় হয়েছে।'

'হ্যাঁ ভাই! আমি এখন তোমার ওপর ভরসা করছি। তুমি যাও, তবে আমার বের হওয়ার ব্যবস্থা করো শিগগির। আমি চেষ্টা করবো নেযামুল মুলকে কতল করে আলমোত ফিরে যেতে।'

★★★★

সুমনা নেযামুল মুলকের খাস কামরায় বসা। ডাক্তার নাজম মাদানীকে শুনাচ্ছে হাসান ইবনে সবা কিভাবে মানুষকে ধ্বংস করে।

'মহামান্য ডাক্তার!'– সুমনা বললো– 'হাসান ইবনে সবা আহমদ ইবনে গুতাশ থেকে যে জাদু শিখেছে সেটা সে খুব কমই ব্যবহার করে। সে অন্য আরেকটা জাদু ব্যবহার তা থেকে কেউ বাঁচতে পারে না। সে জাদু হলো আমার মতো রূপসী নারী।... আমি এই জাদু আমার হাত ও মুখ দিয়ে প্রয়োগ করেছি। আর চালাতেও দেখেছি। 'সুমনা'!– নাজম মাদানী বললেন– 'সেই জাদুই এখন তোমার মুযাম্মিল আফেন্দীর ওপর চালাতে হবে। আমার মনে হয় তোমার সেই জাদু ভালোই কাজ করবে। কারণ আমাকে বলা হয়েছে তোমাদের সম্পর্ক আত্মার, লোক দেখানো নয়।'

'হ্যাঁ মুহতারাম! মুযাম্মিলকে সুস্থ করতে যা যা লাগে সবই করবো আমি।'

'এজন্য তোমাকে আমি অনেকটা শিখিয়ে দেবো।'

নাজম মাদানী এবার মনোযোগ দিলেন নেযামুলমুলকের দিকে। তাকে তিনি বললেন–

'প্রিয় নেযামুলমূলক! আপনিতো জানেন আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি প্রাণীর জোড় সৃষ্টি করেছেন। এও জানেন যে, নর জন্তু জানোয়াররা মাদীদের ভোগের জন্যে পরস্পরের রক্ত পর্যন্ত পান করে। মানুষকে আল্লাহ বুদ্ধি, আবেগ এবং অনুভূতি দিয়েছেন। এজন্য সে নারী বা পুরুষকে পাওয়ার জন্য এমন এমন অবস্থার তৈরি করে যে, মানুষ নিজেও হয়রান হয়ে যায়। নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণ সবসময়ই তীব্র হয়। এজন্য পুরুষ নারী দ্বারা প্রতারিতই হয় বেশি। আর সুমনার মতো মেয়েরা তো পুরুষের কাছ থেকে যা ইচ্ছা তাই আদায় করতে পারে। এ ধরনের অসম্ভব সুন্দরী মেয়েরা তাদের রূপ নিয়ে পুরুষকে নাচাতেও পারে। এরা ইংগিত করলে পুরুষরা তাদের সাথে লুটোপুটি খায়। হাসান ইবনে সবাও এই নুসখাটাই ব্যবহার করছে। কুচক্রী হলেও তার বুদ্ধির প্রশংসা করি আমি। 'হাশীষ' (হিরোইন) আর নারীকে সে যেভাবে ব্যবহার করছে পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্যন্ত তা কারো মাথায় আসেনি।... মুযাম্মিল আফেন্দীর মধ্যে 'হাশীষের যে প্রতিক্রিয়া আছে সেটা দূর করতে চেষ্টা করবো আমি।'

'আপনি কি হাশীষের বিপরীতে কোন ঔষধ ব্যবহার করবেন না অন্য কোন পদ্ধতি?'

'হ্যাঁ ঔষধই দেবো। কিন্তু সে নাকি কয়েদখানায় খুব হাঙ্গামা করছে। তাকে ঔষধ পান করাবেন কিভাবে? এ ব্যবস্থা আপনাকেই করতে হবে'– ডাক্তার বললেন।

'ব্যবস্থা করছি, ওকে আগে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে... দাঁড়ান দেখি... সে লোক ফিরে এসেছে কিনা।'

নেযামুলমুলক দারোয়ানকে ডেকে জিজ্ঞেস করতেই সে জানালো, কয়েদখানা থেকে সে লোক এইমাত্র এসেছে। এইবার লোকটি ভেতরে এলো।

'হ্যাঁ বলো কি করে এসেছো?'– নেযামুলমুলক লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন। 'সব ঠিক করে এসেছি, সে এখন বেশ শান্ত হয়ে গেছে। ওকে বলেছি, কাল থেকে আমি ওর খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করবো। খুব খুশী হয়েছে সে এবং আমাকে বিশ্বাসও করেছে'– লোকটি জবাব দিলো।

'চমৎকার'– নেযামুল মুলক বললেন, তারপর ডাক্তারকে বললেন– 'এখন ওকে সহজেই ঔষধ দেয়া যাবে।'

নেযামুলমুলকের ইশারায় লোকটি বাইরে চলে গেলো।

'আপনাকে আমি সতর্ক করে দেয়া জরুরী মনে করছি'– ডাক্তার মাদানী বললেন– 'যে ঔষধ তৈরি করেছি আমি এই প্রথম সেটা প্রয়োগ করতে যাচ্ছি। এর প্রতিক্রিয়ায় মুযাম্মিল অচেতন হয়ে সাবে। কিন্তু পরিমাণের চেয়ে দু'এক ফোটা বেশি যদি তাকে দেয়া হয় তাহলে এই ছেলে মারা যাবে।'

'না না'– সুমনা আঁতকে উঠে বললো– 'এমন কথা মুখেও আনবেন না। আমাকে কোন পদ্ধতির কথা বলুন যদি বলেন তাহলে তার সঙ্গে আমাকেও বন্দী করুন। রাতদিন ওকে আমি দেখে রাখবো। আমার বিশ্বাস ওকে আমি সুস্থ করে তোলতে পারবো।'

'সুমনা বেটি!– নেযামুলমুলক বললেন– 'আমরাও চাই মুযাম্মিলের মতো এমন মূল্যবান একটি ছেলে খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক। তুমি ভেঙ্গে পড়ো না।

'ঘাবড়িয়োনা মেয়ে!'– ডাক্তার সুমনার মাথায় হাত রেখে বললেন– 'আমি তো বলিনি সে অবশ্যই মরে যাবে। আমি তো শুধু আশংকা করেছি। সব কাজ তো তুমিই করবে। আর কি করতে হবে তাও বলে দেবো তোমাকে।'

'আপনি ঔষধটি দিয়ে দিন'– নেযামুলমুলক বললেন– 'তবে পরিমাণে সব সময় কম করে দেবেন। আমি বুঝি না গাছ-গাছালির ঔষধে এমন কি আছে যে প্রাণও ছিনিয়ে নিতে পারে।

'কিন্তু এর মধ্যে যা দেয়া হয়েছে তা তো আগে শুনবেন, অতি দুর্লভ কিছু জিনিস দেয়া হয়েছে এতে। এর মধ্যে একটা হলো মরু অঞ্চলের সাপের বিষ, আরেকটা হলো, অতি দুর্লভ একটা পোকার চর্বি। বুঝতেই পারছেন, মরুর কোথায় কোথায় ঘুরে ফিরে আর সাপ বের করা যায়? আর কেই বা এর জন্য বসে থাকে। তবুও আমি তা যোগাড় করেছি।'

ডাক্তার সুমনা ও নেযামুল মুলককে আরো কিছু উপদেশ দিলেন।

★★★★

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, কয়েদখানার মশালগুলো জ্বালানো হচ্ছে। একটু পর রাতের খাবার দেয়া হলো কয়েদীদেরকে।

সকালের সেই লোকটি মুযাম্মিলের জন্য খাবার নিয়ে এলো। পাতলা রুটির সঙ্গে কয়েক পদের তরকারি এবং এক জগ দুধ দেখে মুযাম্মিল হয়রান হয়ে গেলো। 'তোমার চেহারায় পেরেশানী কেন'– লোকটি মুযাম্মিলকে বললো– 'বলেছিলাম না এখন থেকে তোমার খাবার আমিই ব্যবস্থা করবো, আর এই খাবারই তুমি পাবে প্রতি বেলা। তোমার পালানেরও ব্যবস্থা করেছি, আরো দুই তিন দিন অপেক্ষা করতে হবে। আরাম করে খাও। তারপর দুধটুকু খেয়ে নিয়ো, আমি যাচ্ছি।

কয়েদখানার দেয়ালে হেলান দিয়ে মুযাম্মিল আস্তে আস্তে সুবোধ বালকের মতো খাবার খেলো। তারপর দুধ পান করলো, বাইরে থেকে প্রহরী তীক্ষ্ণচোখে মুযাম্মিলের দিকে তাকিয়ে রইলো, সে দেখলো মুযাম্মিলের হাত থেকে পেয়ালিটি পড়ে গেলো। মুযাম্মিলের মাথা ঢোলতে লাগলো। তারপরই সে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো। নাক ডাকার আওয়াজ শুনতেই প্রহরী দৌড়ে সেখান থেকে চলে গেলো।

প্রহরী মুযাম্মিলের খাবার নিয়ে আসা লোকটিকে নিয়ে এসে কুঠরীর দরজা খুলে দিলো, লোকটি চলে গেলো কুঠরীর ভেতরে। সে মুযাম্মিলের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে প্রথমে আস্তে তারপর জোরে জোরে মুযাম্মিলের মাথা ধরে ঝাঁকি দিলো। মুযাম্মিল চোখ খুললো না। একটু নড়লোও না। লোকটি এক দৌড়ে বাইরে চলে গেলো। ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ছুটতে লাগলো। কয়েদখানা শহর থেকে বেশ দূরে পরিত্যক্ত এলাকায়।

লোকটি নেযামুল মুলকের মহলে এসে থামলো। মহলের যে কামরায় সুমনা, নেযামুল মুলক ও ডাক্তার নাজম মাদানী রয়েছেন সে কামরায় হাজির হলো।

'কী খবর?'– নেযামুল মূলক জিজ্ঞেস করলেন।

'খবর খুবই ভালো, ডাক্তার সাহেব ঔষধের যে প্রতিক্রিয়ার কথা বলেছিলেন তাই হয়েছে, গভীর ঘুমে এখন সে। ওর শরীর ধরে মাথা ধরে কয়েকবার আমি ঝাঁকিয়েছি, কিন্তু সামান্যতম নাড়াচাড়াও নেই ওর মধ্যে।'

'বেঁচে আছে তো?'– সুমনা চঞ্চল হয়ে বললো।

'অবশ্যই বেঁচে আছে' লোকটি বললো– 'আমাকে কি এতই বেকুব মনে হয় যে জীবিত আর মৃতের পার্থক্য বুঝবো না?'

'ওযীরে আজম! ওকে এখানে আনার ব্যবস্থা করুন।' ডাক্তার বললেন।

কিছুক্ষণ পর কয়েদখানায় মুযাম্মিলের কুঠরীর দরজা খুলে গেলো। চারজন লোক একটি চারপায়া নিয়ে ভেতরে ঢুকলো। অচেতন প্রায় মুযাম্মিলকে চারপায়ার ওপর রেখে ওরা মুযাম্মিল সমেত চারপায়াটি নিয়ে কয়েদখানা থেকে বের হয়ে গেলো।

নেযামুল মুলক, ডাক্তার ও সুমনা অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলো। সুমনা স্থির থাকতে পারছিলো না। সে বিড় বিড় করে কোন দু'আ পড়ছিলো।

একটু পর মুযাম্মিলের জন্য নির্ধারিত কামরায় চারপায়া প্রবেশ করলো। সুসজ্জিত একটি পালঙ্কের ওপর মুযাম্মিলকে রেখে ঐ চারজন লোক কামরা থেকে বের হয়ে গেলো। সুমনা দ্রুত মুযাম্মিলের নাড়ী পরীক্ষা করলো, তার ফ্যাকাশে চেহারায় রক্ত ফিরে এলো।

'সুমনা'- ডাক্তার মুযাম্মিলের নাড়ীর ওপর হাত রেখে বললেন- 'বিপদ কেটে গেছে। নাড়ী ঠিক মতোই চলছে, যে আশংকা করছিলাম তা যদি হতো এতক্ষণে মুযাম্মিলের নাড়ী চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে যেতো। আমরা চলে যাচ্ছি কামরা থেকে। তুমি সারা রাত এখানে থাকবে। সবকিছু তোমাকে আমি ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছি। জেগে উঠলে প্রথমেই তাকে এই দুধটুকু পান করাবে। আরো কি কি করতে হবে সব জানা আছে তোমার। তারপর সে আবার ঘুমিয়ে পড়বে। তখন তুমিও শুয়ে পড়বে। সে আগামীকাল দিনের আগে আর উঠবে না। আর জোর করে কিছু করো না যেনো।'

'আর সুমনা!'- নেযামুলমুলক বললেন- 'দরকার হলে বাইরে সবসময় চারজন প্রহরী থাকবে। সে কোন হাঙ্গামা করলে এরাই ওকে সামলাবে।'

'মনে রেখো সুমনা!'- ডাক্তার বললেন- 'সে কি ঠিক হয়ে যাবে না আরো বিগড়ে যাবে সব নির্ভর করছে তোমার ওপর। তোমার বুদ্ধি আর রূপ দিয়ে ওর মনের সব কুৎসিৎ জিনিসগুলো বের করে দেবে। আর সে তো আগ থেকেই তোমার প্রেমে পাগল।'

উভয়ে কামরা থেকে বের হয়ে গেলেন।

মুজাম্মিলের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে একটি শাহী কামরা। তবে তা নেযামুল মুলকের মহলে নয়, সুলতান মালিক শাহর মহলে। ডাক্তারের পরামর্শ মতে মুযাম্মিল ঠিক হওয়ার আগে তার সঙ্গে নেযামুল মুলকের দেখা না হওয়াই নিরাপদ। ডাক্তারের কথামতোই এই কামরার সাজসজ্জা হয়েছে। পুরো কামরার মেঝে থেকে জানালার পর্দা, খাটের তুলতুলে বিছানা, ঘরময় গোলাপরঙা গালিচা ইত্যাদি যে কারো চোখ জুড়িয়ে দেয়ার মতো।

মুযাম্মিলের সামনে সুমনা কি পোষাক পড়বে তাও পছন্দ করে দিয়েছেন ডাক্তার। ডাক্তার সুমনাকে বলে দিয়েছেন, চুল সবসময় খোলা রাখবে, আর প্রেম ভালোবাসার যত বুলি আছে সম্মোহনী ভাষায় তা বলে যাবে। তবে যথাসম্ভব নিজের দেহকে বাঁচিয়ে রাখবে।

সুমনা ঘুমন্ত মুযাম্মিলের দিকে তাকিয়ে রইলো, তার জেগে উঠার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। কিছুক্ষণ সে চঞ্চল পায়ে কামরায় পায়চারী করলো। একটু পর এসে মুযাম্মিলের চুলের ভেতর হাত বুলিয়ে হাত ফেরাতে লাগলো। যেন এক মা তার ঘুমন্ত শিশুর মাথায় বিলি কেটে দিচ্ছে।

রাতের দুই প্রহর চলে গেলো। সুমনার চোখে তন্দ্রা এসে ভীড় করলো। হঠাৎ মুযাম্মিলের দেহ নড়ে উঠলো। সুমনা সজাগ হয়ে গেলো। সে জানে এখন কি করতে হবে। চেয়ার থেকে উঠে মুযাম্মিলের খাটে গিয়ে বসলো সে। এ সময় মুযাম্মিল সুমনার দিকে মুখ করে পাশ ফিরলো, তার একটি হাত গিয়ে পড়লো সুমনার কোলের ওপর। সুমনা মুযাম্মিলের হাতটি উঠিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে ম্যাসেজ করতে লাগলো।

মুযাম্মিলের চোখও আস্তে আস্তে খুলে গেলো।

'মুযাম্মিল!'– সুমনা ঝুকে তার ঠোঁট মুযাম্মিলের কানের কাছে নিয়ে গিয়ে বললো– 'তুমি আমার কাছে এসে গেছো। এখন আর কেউ আমাদের পৃথক করতে পারবে না।

মুযাম্মিলের চোখ পুরোপুরি খুলে গেলো। সুমনা তার আরো কাছে চলে এলো।

'আমি কোথায়?'– মুযাম্মিল স্বপ্ন জড়ানো কণ্ঠে বলল–' তুমি কে?'

'তুমি আমার কাছে গো'– সুমনা বড় প্রেমসিক্ত গলায় বললো– 'তুমি সেই প্রেমের স্বর্গে এখন যেখানে কেউ কারো রক্তপাত ঘটায় না। আর আমি তোমার আত্মা।'

'এটা কি কয়েদখানা না?'– যেন ঘুম থেকে কেউ কথা বলছে।'

'হ্যা তুমি আমার মনের কয়েদখানায় বন্দী। তুমি আমার ভালোবাসার শিকলে বন্দী।'

তার এক হাত আপনিই সুমনার চুলের ভেতর চলে গেলো। সুমনার ঠোঁটে রহস্যময় হাসি, ডাক্তার যেভাবে বলেছে সেভাবে সুমনা গলায় পরম মমতা ঢেলে এটা ওটা বলে গেলো। এবার মুযাম্মিলের চোখ পুরোপুরি সজাগ হয়ে গেলো। সে এক ঝটকায় উঠে বসলো। তার অবিশ্বাস্য চোখ সারা কামরার ওপর দিয়ে ঘুরে গেলো।

'সুমনা!'– মুযাম্মিল কেমন ধরা গলায় বললো– 'তুমি কবে এলে?... মিথ্যা বলছো নাতো... আমি কোথায় ছিলাম...? আমি... আমি সুমনা?... আমি কি স্বপ্নে ছিলাম?' – তার মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগলো। কি যেন সে খুঁজতে লাগলো। কিন্তু কিছুই তার মনে পড়লো না।

'মুযাম্মিল'– সুমনা মুযাম্মিলের গালে হাত ছুঁয়ে বললো– 'তুমি যে বড় লম্বা সফর থেকে এসেছো। একটু দুধ খেয়ে শুয়ে পড়ো। ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে। তারপর আবার আমরা প্রেমের কথায় হারিয়ে যাবো।'

দুধে ঔষধ মেশানো ছিলো। তবে ঔষধের কোন জাজ বা গন্ধ নেই এতে। মুযাম্মিল 'দুই তিন শ্বাসে গ্লাস খালি করে দিলো। আস্তে আস্তে আবার ঘোরের মধ্যে হারিয়ে যেতে লাগলো।

সুমনা এবার এমন হৃদয় ছোঁয়া ভাষায় প্রেম ভালোবাসার পংক্তি আবৃত্তি করতে শুরু করলো যে, মুযাম্মিলের দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর ধারা নামলো। ডাক্তার সুমনাকে বলেছিলেন, মুযাম্মিলের মনে হাসান ইবনে সবা ধ্বংস ও নষ্টের যে বীজ বুনে দিয়েছে তা বের করে সেখানে প্রেম-ভালোবাসার পবিত্র আবেগ ভরিয়ে দিতে হবে।

★★★★

সকাল বেলা ডাক্তার ও নেযামুল মুলক দেখতে এলেন তাদের রাত কেমন কেটেছে। নেযামুল ভেজানো দরজায় টোকা দিলেন। ভেতর থেকে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেলো না। আরো কয়েকবার টোকা দিলেন। না, দরজা খুললো না। নেযামুল মূলক দরজা ঠেলে ডাক্তারকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। দেখলেন, সুমনা মুযাম্মিলের বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে আর তার পা খাটের নিচে ঝুলছে। মুযাম্মিলের হালকা নাক ডাকার আওয়াজ আসছে।

'আসুন ওযীরে আজম!'– ডাক্তার বললেন– 'ঐ দেখুন সুমনা রাতে ওকে দুধ পান করিয়েছে, পেয়ালা খালি পড়ে আছে। দুপুরের আগে সে জাগবে না, সুমনা অবশ্য একটু পর জেগে উঠবে। ওর ঘুম বলছে সারা রাত সে ঘুমায়নি।'

একাধারে কয়েক দিন এই ঔষধ মিশ্রিত দুধ পান করানো হলো। মুযাম্মিল জাগলেই দুধ পান করিয়ে সুমনা তার সেই প্রেম ভালোবাসার নানা কবিতা গল্প বলতো, মুযাম্মিলের এতে দারুণ প্রতিক্রিয়া হতো।

ডাক্তারের তত্ত্বাবধানেই সব চলতে লাগলো। চতুর্থ দিন তাকে আর ঔষধ দেয়া হলো না। সে সজাগ হওয়ার পর ডাক্তার তার দু'কান নিজের হাতের অঞ্জলীতে নিয়ে ম্যাসেজ শুরু করে দিলেন এবং মুযাম্মিলের চোখে চোখ রেখে ফিস ফিস করে কি যেন বলতে লাগলেন। এ ছিলো হিপ্টোনেজমের প্রক্রিয়া। সাত আট দিনের মধ্যে এই প্রক্রিয়া সফল হলো। খুব দ্রুত মুযাম্মিল স্বাভাবিকত্বের দিকে ফিরে আসতে লাগলো। এত জলদি ফল দিবে ডাক্তার নিজেও আশা করেননি। ডাক্তার বলেই ফেললেন, ঔষধের পর এর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব সুমনার এবং সুমনার প্রেমসিক্ত অবিরাম যত্ন।

একদিন নেযামুল মুলক মুযাম্মিলের সামনে এলেন। কি হবে কেউ জানে না, ডাক্তার ও সুমনা টান টান হয়ে দাঁড়ানো, বাইরে নেযামুল মুলকের মুহাফিজরা প্রস্তুত।

নেযামুল মুলকের দিকে চোখ পড়তেই মুযাম্মিল প্রথমে সবিস্ময়ে সবার দিকে একবার করে তাকালো। তারপর তার চোখ দুটো ছল ছল করে উঠলো। নেযামুল মুলকের ঠোঁটে হাসি। তার দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত। মুযাম্মিলও দু' হাত প্রসারিত করে প্রায়... উড়ে নেযামুল মুলকের বুকে গিয়ে পড়লো। নেযামুল মুলক তাকে জড়িয়ে ধরলেন।

'কেন মুযাম্মিল? কোথায় চলে গিয়েছিলে? আমি তো... ভেবেছিলাম তুমি আর ফিরেই আসবে না'– নেযামুল মুলকের গলা ধরে এলো।

'কিছুই মনে পড়ছে না। শুধু আপনাকে দেখে মনে পড়ছে... আপনি আমাকে... যেতে বাঁধা দিয়েছিলেন। তারপরও আমি চলে গিয়েছি'– আবেগ রুদ্ধ গলায় বললো মুযাম্মিল!

'আর এখন?'

'না আর যাবো না। কোথাও যাবো না আর।'

আস্তে আস্তে মুযাম্মিলের কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেলো। এবার তার ভেতর ছাই চাপা আগুন যেন দাউ দাউ জ্বলে উঠলো। হাসান ইবনে সবার প্রতি এত দিন শুধু ক্রোধ ছিলো। কিন্তু এখন সেটা তীব্র প্রতিশোধ স্পৃহার রূপ নিলো।

'মুযাম্মিল আফেন্দী!'– একদিন নেযামুল মুলক তাকে বললেন– 'যা হওয়ার হয়ে গেছে। আচ্ছা এখন বলো তো সেখানে তোমার সঙ্গে কেমন আচরণ করা হয়েছে? এটা জিজ্ঞেস করছি এ কথা জানার জন্য যে তোমার মতো দৃঢ়চেতা এক যুবকের ওপর বাতিনীরা কি করে প্রাধান্য বিস্তার করলো!'

'হ্যাঁ, এখন আমার সেখানকার প্রতিটি মুহূর্তের কথা মনে পড়ছে। আমি নিজেই আপনাকে তা শুনাতাম। আপনি হয়তো অন্য কোন কারণে শুনতে চাচ্ছেন। কিন্তু আমি শোনাতাম এজন্য যে, আপনারা যাতে বুঝতে পারেন আমি কতটুকু অক্ষম ছিলাম। আমার চিন্তা শক্তি অনুভূতি শক্তি আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিলো।'

'সে সব ভুলে যাও। তোমার কোন দোষ ছিলো না। এখন বলো, তোমাকে কাবু করা হলো কিভাবে?'

'আমাকে ওরা কয়েদখানার কালো কুঠরিতে বন্দী করলো'— মুযাম্মিল বলতে শুরু করলো— ভেতরে এমন উৎকট গন্ধ যেন কোথাও অনেক দিনের পঁচা লাশ পড়ে আছে। তিন দিন আমাকে কিছুই খেতে দেয়া হয়নি। এক ঢোক পানিও না। ভেতরে আমার সব জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিলো। হাসান ইবনে সবাকে যদি কতল করতে পারতাম তাহলে হাজার কষ্টও আমি বরদাস্ত করতে পারতাম। মৃত্যু হলে হাসি মুখে তা বরণ করে নিতাম। আমার দেহের কোষগুলো যেন আস্তে আস্তে মরে যাচ্ছিলো। সাত আট দিন না খেয়ে থাকতে পারি আমি। কিন্তু পানি ছাড়া একদিনও থাকতে পারি না...

'দুর্গন্ধ, ক্ষুধা, আর মরণ পিপাসা আমার চিন্তা ভাবনার ক্ষমতাও কেড়ে নিলো। তিন চার দিন পর মনে হলো আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। তারপর একদিন আমার কুঠরীর দরজা খুলে এক লোক আধা টুকরো শুকনো রুটি ছুঁড়ে মারলো। যেন আমি একটি কুকুর। অতি নোংরা একটি পেয়ালায় সামান্য পানি ভরে দরজার পাশে রেখে দরজা বন্ধ করে দিলো লোকটি। আমি কে আমার মর্যাদা কী সব তখন ভুলে গেলাম। কুকুরের মতো সেই আধা টুকরো রুটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। রুটি নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে তরকারির বাটির দিকে গেলাম। সেটা কি তরকারির ঝোল ছিলো না কোন নোংরা পানি ছিলো সেটা দেখার কথা মনেই এলো না। ওর মধ্যে রুটি চুবিয়ে নিমিষেই আধা টুকরো রুটি শেষ করে ফেললাম। ক্ষুধা আরো তীব্রতর হলো। কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করে গারদের শিকে ধরে চিৎকার করে বললাম, আরেকটু রুটি দাও আমাকে, খোদার দিকে চেয়ে আরেকটু রুটি দাও...

'আমি দরজার শিক ধরে চিৎকার করছিলাম। এক সান্ত্রী এসে শিকের বড় একটি ফাঁক দিয়ে আমার মুখে এত জোরে ঘুষি মারলো উল্টো দিকের দেয়ালে আমার মাথা ঠুকে গেলো। আমার চোখে অন্ধকার নেমে এলো...

'জ্ঞান ফেরার পর দেখলাম মোটামুটি পরিষ্কার একটি কামরায় আমি। একটি বিছানায় চিত হয়ে শোয়া। এক লোক বর্শা হাতে আমার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার পা দিয়ে আমার পায়ে খোঁচা দিয়ে বললো, কি হুঁশ ফিরেছে? আমি কিছুই বলতে পারলাম না। উঠে বসলাম আমি। বর্শাধারী বাইরে বের হয়ে গেলো, আবার তখনই ফিরে এলো সঙ্গে আরেকটি লোক নিয়ে। তার হাবভাব দেখে মনে হলো এ কোন ফৌজি অফিসার।'

মুযাম্মিল আফেন্দী এরপর যা শোনালো তা ছিলো এরকম :

'মুযাম্মিল আফেন্দী!'— অফিসারটি বললো— 'তুমি এখানে কেন এসেছিলে?'

'পানি... পানি... পানি...!' অস্ফুট শব্দে মুযাম্মিলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো। 'তুমি এখানে এসেছিলে কেন? জবাব দাও পানি পাবে... কেন এসেছো?'

'কতল হওয়ার জন্য'— বড় কষ্টে মুযাম্মিলের গলা দিয়ে বের হলো।

'এটা আমার প্রশ্নের জবাব হলো না।'

তীব্র পিপাসায় মুযাম্মিলের মুখ হা হয়ে গেলো। তার মুখ দিয়ে সে আর কোন শব্দ বের করতে পারলো না। সে ইশারা করে জানালো, আর বলতে পারছে না সে। তার ঠোঁট আবার বিনা শব্দে নড়ে উঠলো। অর্থাৎ পানি।

'না, পানি পাবে না।

আস্তে মুযাম্মিলের দু' চোখ বন্ধ হয়ে এলো, একদিকে সে গড়িয়ে পড়লো। তীব্র পিপাসা ওকে বেহুঁশ করে দিয়েছে।

হুশ ফেরার পর মুযাম্মিল অনুভব করলো তুলতুলে নরম একটি বিছানায় শোয়া। তার সামনে অসম্ভব সুন্দরী একটি মেয়ে। ঠোঁটে তার ভুবন ভুলানো হাসি।

'উঠো মুযাম্মিল!' খাবার খেয়ে নাও'– বড় আদুরে সুরে বললো মেয়েটি।

'পানি... পানি... মুযাম্মিলের গলায় যেন হাজার হাজার কাঁটা বিধে আছে।

'খালি পেটে পানি নয়। কিছু খেয়ে নাও, তারপর পানি দেবো।'

মেয়েটি মুযাম্মিলকে ধরে উঠালো। মুযাম্মিল দেখলো, এই কামরাটি অত্যন্ত সুন্দর করে সাজানো, কামরার মাঝখানে চেয়ার বেষ্টিত একটি টেবিল। টেবিল থেকে রুটি গোশতের গন্ধ আসছে। মুযাম্মিলের পায়ে জোর ফিরে এলো। নিজেই মেয়েটির কাঁধে ভর দিয়ে একটি চেয়ারে বসলো।

টেবিলে খাবারের পরিমাণ দেখে মুযাম্মিল হয়রান হয়ে গেলো। মনে হচ্ছিলো এ কোন শাহজাদা বা বড় কোন হাকিমের খাবার। সে বিশ্বাস করতে পারছিলো না এ খাবার তার জন্য আনা হয়েছে। কিন্তু সে ফলাফলের দিকে গেলো না। খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, সে লক্ষ্যও করলো না কয়েক টুকরো ভুনা গোশত গড়িয়ে গড়িয়ে মাটিতে পড়েছে।

বড় দ্রুত কয়েক লোকমা মুখে দিয়ে পানির জগের দিকে মুযাম্মিল হাত বাড়ালো। মেয়েটি এসে মুযাম্মিলের হাত থেকে পানির জগটি নিয়ে গিয়ে বললো– 'পানি আমি পান করাবো। এক ঢোক এক ঢোক করে, এক বারে নয়।'

মেয়েটি সুন্দর একটি গ্লাসে পানি ঢেলে মুযাম্মিলকে দিলো। মুযাম্মিল এক ঢোকে পানি শেষ করে আবার খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। একটু খেয়ে আবার মেয়েটির দিকে তাকালো। মেয়েটি তাকে আরেকটু পানি দিলো, এক নিঃশ্বাসে পানি শেষ করে আবার মনোযোগ দিলো খাবারের দিকে।

দেখতে দেখতে ডজন খানেক বড় বড় রুটি কয়েক ডিশ তরকারি খেয়ে দেয়ে পরিষ্কার করে ফেললো মুযাম্মিল। এবার তৃপ্ত হয়ে পানি চাইলো।

'এখন পানি নয়, শরবত খাবে এখন'– মেয়েটি মন ভুলানো হাসি দিয়ে বললো।

মেয়েটি আরেকটি জগ থেকে এক গ্লাস শরবত দিলো মুযাম্মিলকে। গ্লাস এক নিঃশ্বাসেই শেষ করে ফেললো মুযাম্মিল।

মুযাম্মিল মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলো, এমন নেংরা জঘন্য কামরা থেকে বের করে তাকে এখানে এনেছে কেন? তার এমন রাজকীয় আপ্যায়ন দেয়া হচ্ছে কেন? কিন্তু সে কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারলো না। তার দু'চোখে গাঢ় নিদ্রা চেপে এলো। সে কোনমতে বিছানায় গিয়ে শুতে পারলো মাত্র। পরমুহূর্তেই অনেক জিজ্ঞাসাকে চাপা দিয়ে তার চোখ বন্ধ হয়ে গেলো।

★★★★

সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই সে দারুণ আরাম বোধ করলো। হেঁটে হেঁটে কামরার বাইরে গেলো। সামনের ফুলে ফুলে ভরা বাগানের দৃশ্য দেখে তার মন মুগ্ধতায় ভরে গেলো। মুযাম্মিল বাগানের দিকে এগিয়ে গেলো, মুযাম্মিলের পায়ের আওয়াজ পেয়ে মেয়েটিও আরেক কামরা থেকে বেরিয়ে এলো। সেও মুযাম্মিলের পাশে পাশে হাঁটতে লাগলো।

'তুমি আমাকে কিছু বলতে পারবে'– মুযাম্মিল মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো– 'ঐ জঘন্য কামরা থেকে বের করে এনে আমার জন্য এমন রাজকীয় আপ্যায়ন কেন?'

'ইমামের হুকুমে তোমাকে কয়েদখানা থেকে বের করা হয়েছে– মেয়েটি বললো– আর ইমামের হুকুমেই এসব ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'ইমাম কে?'– হয়রান হয়ে জিজ্ঞেস করলো মুযাম্মিল।

'ইমাম হাসান ইবনে সবা।'

'আমি স্বপ্ন দেখছি না তো!'– মুযাম্মিল সবিস্ময়ে নিজেকেই যেন জিজ্ঞেস করলো। 'আমি জানি তুমি কি ভাবছো। গতকাল ইমামকে বলা হয় তুমি তাকে কতল করতে এসেছো, এও বলা হয় তোমাকে কয়েদখানার অতি নোংরা একটি কামরায় রাখা হয়েছে। তার নির্দেশ ছাড়া এক মেহমানকে কয়েদ করা হয়েছে বলে তিনি তাদের ওপর প্রচণ্ড রাগ করেছেন। তিনি ওদেরকে তিনটি করে দুররা মারতে বলেছেন। তারপর হুকুম করেছেন তোমাকে মুক্ত করে এখানে নিয়ে আসতে... তুমি কি সত্যিই হাসান ইবনে সবাকে হত্যা করতে এসেছিলে?'

'হ্যাঁ'– এমনভাবে বললো যেন সে এজন্য খুব লজ্জিত।

'ইমাম যে কোন সময় এখানে আসবেন, তোমার সঙ্গে সাক্ষাত করবেন।'

'এমন কি হয় না যে তিনি এখানে আসবেন না বা আমার সাথে তার দেখা হবে না?'

'একথা বলছো কেন?'

'উনাকে যদি বলি যে, আমি তাকে হত্যা করতে এসেছিলাম তাহলে তো আবার আমাকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করবে, তার সামনে আমি মিথ্যা বলতে পারবো না।' 'তুমি জানো মুযাম্মিল! ইমাম হাসান ইবনে সবা আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় বান্দা। তিনি সত্য শুনতেই পছন্দ করেন। সত্য কথাই নির্ভয়ে তাকে বলবে।'

কথায় কথায় মেয়েটি মুযাম্মিলের সামনে হাসান ইবনে সবার এমন একটা ছবি দাঁড় করালো যে, হাসান ইবনে সবা কোন ফেরেশতা বা আল্লাহর কোন নবী। মেয়েটি মুযাম্মিলকে কামরায় নিয়ে এলো। কামরায় পৌঁছেই মুযাম্মিল মেয়েটির কাছে গতরাতের সেই শরবত চাইলো। এই শরবত খাওয়ার পর থেকেই মুযাম্মিলের কাছে তার দুনিয়া ক্রমেই রঙ্গিন হয়ে যাচ্ছে এবং সে তার অতীত ভুলে যাচ্ছে। মেয়েটি তাকে পেয়ালা ভরে শরবত দিলো।

হাসান ইবনে সবার প্রতি মুযাম্মিলের এখন আর কোন ক্ষোভ নেই। তার কাছে মনে হলো এখন বাতিনীদের একজন সে। হাসান ইবনে সবার শিষ্য।

দরজার ওপর টোকা পড়লো। মুযাম্মিল চমকে উঠে তাকালো দরজার দিকে মেয়েটি গিয়ে দরজা খুলে দিলো।

'ইমাম আসছেন'– বাইরে থেকে আওয়াজ এলো।

মেয়েটি দুই কপাট পুরোপুরি খুলে দিলো। কামরায় প্রবেশ করলো হাসান ইবনে সবা। মেয়েটি দরজা ভেড়িয়ে বাইরেই রয়ে গেলো। হাসান ইবনে সবার চেহারা কিছুটা গম্ভীর। মুযাম্মিল তার দিকে তাকিয়ে আছে হয়রান চোখে। হাসান ইবনে সবা ধীরে ধীরে কামরায় পায়চারী করতে লাগলো। একেই যে মুযাম্মিল কতল করতে এসেছে এ অনুভূতি তার একবারও এলো না। 'হাশীষের' প্রতিক্রিয়া তার ভেতর এতই মারাত্মক হয়েছে। বরং সে ভেবে পাচ্ছিলো না এই মহান ব্যক্তির সামনে এখন কি করবে।

জ্বলন্ত অঙ্গার যেন বরফের টুকরো হয়ে গেছে।

'মুযাম্মিল আফেন্দী!'– হাসান মুযাম্মিলের সামনে দাঁড়িয়ে বললো– 'আমার বড় আফসোস হচ্ছে, এই কেল্লায় তুমি আমার মেহমান হয়ে এসেছো, আর ঐ বদবখতরা তোমাকে বন্দী করেছে।'

হাসান মুযাম্মিলের চোখে চোখ রেখে কথা বলছে, আর মুযাম্মিল অনুভব করছে যেন এই লোক তার আত্মায় ঢুকে গেছে।

হঠাৎ হাসান ইবনে সবা তার আলখেল্লার ভেতর থেকে একটি তলোয়ার বের করলো। মুযাম্মিল আঁতকে উঠলো, মৃত্যু এখন তার চোখের সামনে ঝুলছে, অথচ সে নীরব।

'এই নাও। তুমি আমাকে কতল করতে এসেছিলে। এই তলোয়ার দিয়ে আমাকে কতল করো'– হাসান মুযাম্মিলের হাতে তলোয়ার দিয়ে বললো।

মুযাম্মিল তলোয়ার নিলো বটে, কিন্তু তাকিয়ে রইলো হাসান ইবনে সবার মুখের দিকে। তলোয়ার দিয়ে কি করতে হয় তাও যেন সে ভুলে গেছে। হাসান ইবনে সবা মুযাম্মিলের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো, মুযাম্মিলের দিক থেকে কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে আস্তে আস্তে আবার মুযাম্মিলের দিকে ঘুরলো।

'যদি আমি মিথ্যা হতাম এতক্ষণে তোমার হাতে দু'টুকরো হয়ে যেতাম'– গম্ভীর মুখে বললো হাসান ইবনে সবা'– তুমি এমন লোকদের কথা শুনে আমার কাছে এসেছো যারা আমার সত্যতা সম্পর্কে জানে না। সেলজুকি সুলতান চায় না এমন কোন শক্তি জেগে উঠুক যারা মানুষকে সেলজুকিদের কবল থেকে মুক্ত করবে। আরে বাদশাহী তো শুধু আল্লাহর জন্যই। আমি যা কিছু করছি আল্লাহর হুকুমে করছি। বিশ্বাস না হলে তলোয়ার চালিয়ে দেখো... তলোয়ার আমার দেহের কাছে এসে থেমে যাবে। কারণ আল্লাহ এখনো আমার বিরুদ্ধে ফয়সালা করেননি।

মুযাম্মিলের মগজ ধোলাই আগেই হয়ে গেছে। যতটুকু বাকী ছিলো হাসান ইবনে সবা তা পুরো করে দিলো, মুযাম্মিল তলোয়ার বড় অনুতপ্ত হাতে হাসান ইবনে সবার সামনে রাখলো।

'মুযাম্মিল আফেন্দী!'– তলোয়ার আলখেল্লার ভেতর ঢুকিয়ে মুযাম্মিলের কাঁধে হাত রেখে বড় মধুর গলায় বললো– 'তুমি আমার মেহমান... আমার সঙ্গে এসো।'

নেযামুল মুলককে মুযাম্মিল তার এতটুকু ঘটনা শুনিয়ে বললো– 'মুহতারাম ওযীরে আযম!' হাসান ইবনে আমাকে এমন এক দুনিয়ায় নিয়ে গেলো যা আজ আমার মনে হচ্ছে অতি রূপময় স্বপ্ন। যদি দুনিয়ায় বেহেশত থেকে থাকে তাহলে হাসান ইবনে সবার দুনিয়ায় দেখেছি আমি। এখনো আমার কাছে এ সব স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। হাসান ইবনে সবা আমাকে অসম্ভব স্নেহ করতো। তাকে আমি এমন মহান ও পবিত্র হাস্তী ভাবতে লাগলাম যে, আকাশে যদি আল্লাহ থাকে দুনিয়াতে আছে হাসান ইবনে সবা। কয়েকদিনের মধ্যে সে আপনাদের বিরুদ্ধে আমার মনে প্রচণ্ড ঘৃণা ভরে দিলো। আমিও খুব দ্রুত আপনাকে হত্যার জন্য তৈরী হয়ে গেলাম। আমার প্রতিও হাসান ইবনে সবার এত বিশ্বাস জন্মালো যে, তার কিছু গোপন তথ্যও আমার কাছে ফাস করে দিলো। 'এখন অন্য কথা রেখে গোপন কি জেনেছো তাই শোনাও'– নেযামুল মুলক বললেন।

মুযাম্মিল আফেন্দী শোনালো যে, হাসান ইবনে সবার শিষ্যরা তিন ভাগে ভাগ করা। প্রথম দলটি বিভিন্ন এলাকায় তাবলীগ বা প্রচারের কাজ করে। তবে এরা সাধারণ লোকদের সঙ্গে মিশে না, বড় বড় হাকিম ও সরদার গোছের লোকদেরকে এরা হাত করে। নারী ও হাশীষের ব্যবহারে এরা ওদেরকে হাসান ইবনে সবার পাক্কা শিষ্য বানিয়ে নেয়। দ্বিতীয় দলটিকে বলা হয় 'রফীক।' হাসান ইবনে সবার একান্ত ব্যক্তিগত দল ওটা। তিন নাম্বার দলের নাম 'ফেদায়েন।' এ দলের সবাই জানবায। হাসান ইবনে সবা এদের কাউকে আত্মহত্যা করতে বললে সঙ্গে সঙ্গে সে তার বুকে তলোয়ার বসিয়ে দেয়। দেখতেই শুধু এরা মানুষ; কিন্তু এদের স্বভাব মানুষ খেকো হিংস্র প্রাণীর মতো, এদেরকে বিড়ালের গোশত খাওয়ানো হয়। কারণ বিড়াল কাউকে আক্রমণের সময় অত্যন্ত হিংস্র হয়ে উঠে এবং তার শিকারকে না মেরে সে সুস্থির হয় না।

'আর রফীক'দেরকে এমন এমন খাবার দেওয়া হয় যা সবসময় তাদের শরীর উত্তপ্ত রাখে, ওদেরকে যে কোন হুকুম দেয়া হোক ওরা তা পূর্ণ করবেই। 'রফীক' দলের বাতিনীরা শত্রুর বিরুদ্ধে সামনাসামনি লড়াইয়ে যেন পারঙ্গম, আর 'ফেদায়েনরা' গুপ্তঘাতক বা আত্মঘাতী হামলায় বেশ উস্তাদ।

'আচ্ছা মুযাম্মিল! বলোতো, এখনো তুমি হাসান ইবনে সবাকে একলা গিয়ে খতম করতে চাও?'

'না ওযীরে আযম, আলমোত যেতে যারা আমাকে বাঁধা দিয়েছে তারা সত্যিই বলেছে, হাসান ইবনে সবার হাতে কতল হওয়া যায় তাকে কতল করা যায় না। এর অর্থ এই নয় যে, আমরা হাসান ইবনে সবাকে জীবিত থাকার অধিকার দিয়ে রেখেছি। আমি বলবো, ফৌজি হামলা ছাড়া বাতিনীদের এই সর্বগ্রাসী তুফান কখনো রুখতে পারবেন না। আমি পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে বলছি, হাসান ইবনে সবার রাস্তা যদি আপনি না রুখেন তাহলে সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন সেলজুকি সালতানাতের সুলতান হবে হাসান ইবনে সবা।'

★★★★

নেযামুল মুলক আলমোত হামলার জন্য সম্ভাব্য ফৌজ প্রস্তুত করে ফেললেন। যথাসম্ভব তিনি রক্তপাত এরিয়ে চলতে চাচ্ছিলেন। তাই তিনি সুলতানকে বললেন, হাসান ইবনে সবার কাছে আগে পয়গাম দিয়ে দূত পাঠানো হোক। সুলতান এজাযত

দিয়ে দিলেন। নেযামুল মুলক এই পয়গাম দিয়ে আলমোত এক দূত পাঠিয়ে দিলেন যে, হাসান ইবনে সবা যেন ইসলাম বিরোধী এসব কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দেয় এবং সুলতান মালিক শাহর অনুগত হয়ে যায়।

দূত আলমোত গিয়ে হাসান ইবনে সবার হাতে নেযামুলমুলকের পয়গাম দিলো, 'সুলতান ও নেযামুল মুলককে আমার পয়গাম শুনিয়ে দিয়ো'– হাসান ইবনে সবা বললো– 'আমি কখনো কারো আনুগত্য মানিনি। আর নেযামুল মুলক! আমরা দু'জনে এক সঙ্গে পড়েছি। আমাকে তুমি তখন থেকেই চেনো। একজন খাঁটি বন্ধু হিসেবে তোমাকে আমি পরামর্শ দিচ্ছি– আলমোতের দিকে কখনো পা বাড়াবে না, হে সালতানাতে সেলজুকের সুলতান মালিক শাহ! নিজের সালতানাতের বাইরে এসো না, এটাই তোমার জন্য ভালো, আমাকে আমার জগতে স্বাধীন থাকতে দাও। এই পরামর্শ তোমাদের যদি ভালো না লাগে আমি তোমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি, তোমাদের ও তোমাদের ফৌজের পরিণতি অনেক মন্দ হবে।

দূত বিদায় নিয়ে ফিরে আসছিলো হাসান ইবনে সবা তাকে বললো– দাঁড়াও! তুমি হয়তো বুঝোনি আমি কি বলেছি, হয়তো ভাবছো আমি এমনিই গুল মারছি। আমার এসব কথা এখন বাস্তবে দেখে যাও।'

হাসান ইবনে সবার হুকুমে ফেদায়েন বাহিনীর শ'দেড় শ লোকের একটা দল সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো।

'বন্ধুরা আমার!'– হাসান তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললো– 'তোমাদের মধ্যে একজনকে আমি আল্লাহর কাছে পাঠাতে চাই। যে আল্লাহর কাছে যেতে চাও এগিয়ে এসো।'

পুরো দলটাই এক সঙ্গে এগিয়ে এলো। হাসান এক যুবককে ইশারা করতেই সে দৌড়ে এলো হাসান ইবনে সবার কাছে।

'নিজেকে কতল করে দাও'– হাসান ইবনে সবা বললো,

যুবক তার কোমরবন্ধ থেকে ধারালো একটি খঞ্জর বের করলো এবং পরমুহূর্তেই নিজের বুকে খঞ্জরটি বিদ্ধ করে দিলো। তারপর বড় আওয়াজে একটা শ্লোগান দিলো– 'ইমাম হাসান ইবনে সবা জিন্দাবাদ– এবং পড়ে গেলো।

হাসান ইবনে সবা আরেক যুবককে ডেকে বললো–

'কেল্লার ঐ উঁচু ছাদে গিয়ে উঠো এবং সেখান থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ো।'

যুবক দৌড় লাগালো, একটু পর তাকে পাঁচ ছয় তলা সমান উঁচু কেল্লার দেয়ালে দেখা গেলো। একটু পর সে তীরের মতো নিচে নেমে এলো। তার গুড়ো হয়ে যাওয়া মাথাটি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

হাসান ইবনে সবা আরেকজন ফেদায়েনকে ডেকে পানিতে ডুবে মরে যেতে বললো। সেও আলমোতের নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো, অনেক্ষণ পর ভেসে উঠলো তার মরা লাশ।

'সুলতান মালিক শাহকে তো তুমি এসব বলবেই'– হাসান দূতকে বললো– 'তাকে বলবে আমার কাছে এ ধরনের আত্মঘাতী ফেদায়েন বিশ হাজার আছে। তোমাদের এত

বড় লশকরে কি এমন একজন আত্মঘাতী সৈনিকও আছে?... আর আমার বন্ধু নেযামুল মুলককে বলবে, তাকে আমি আজও শ্রদ্ধা করি। শৈশবের বন্ধুত্ব যেন সে নষ্ট না করে এবং আমার বিরুদ্ধে ফৌজি অভিযান না করে। আমার কথা না বুঝতে পারলে যত বড় লশকর আছে নিয়ে এসো।'

ভয়ে পত্রদূতের চেহারা নীল হয়ে গেলো। কম্পিত পায়ে সে কোন মতে সেখান থেকে বেরিয়ে এলো।

★★★★

পত্রদূত মারু পৌঁছতেই সুলতান মালিক শাহ ও নেযামুল ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইলেন হাসান ইবনে সবা কি জবাব দিয়েছে। হাসান ইবনে সবা যা বলেছে এবং যা করে দেখিয়েছে পত্রদূত হুবহু তাদেরকে জানালো।

সুলতান মালিক শাহ স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু নেযামুল মুলক ক্রোধে ফেটে পড়তে চাচ্ছিলেন। তিনি উঠে দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ করে কামরায় জোরে জোরে পায়চারী করতে লাগলেন।

'কি ভাবছেন খাজা?– মালিক শাহ শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

'শিগগিরই রওয়ানা দেয়া ছাড়া আমি আর কিছুই ভাবতে পারছি না'– নেযামুলমুলক বললেন চরম উত্তেজিত হয়ে– 'ঐ ইবলিস কি ভাবছে তার এই শিয়ালের ধূর্তামি দেখে আমরা ভয় পেয়ে যাবো?... আমি কাল ফজরের পর কোচ করতে চাই। আশা করি আপনি আমাকে বাঁধা দিবেন না!'

'হ্যাঁ খাঁজা! কালই আপনার লশকর নিয়ে রওয়ানা হয়ে যান। আপনার সঙ্গে আমার দু'আ যাবে।'

পরদিন ফজরের পর নেযামুল মুলক অতি সংক্ষেপে তার লশকরকে বললেন, আমরা কোন দেশ জয় করতে যাচ্ছি না, বরং এক ইবলিসি শক্তিকে চির দিনের জন্য খতম করতে যাচ্ছি। আমরা যদি সময় নষ্ট করি বা সেখানে গিয়ে প্রাণের আশংকায় মুখ ফিরিয়ে নেই তাহলে মনে রেখো, ইসলাম অতীত অতিথি হয়ে যাবে। তারপর না কেউ আল্লাহর নাম নেবে, না তার রাসূল (স) এর নাম নেবে।

লশকর আলমোতের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলো। মারুর হাজার হাজার জনগণ বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে বা গলিমুখে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে লশকরের জন্য দু'আ করলো। শেষ মুহূর্তে সুলতান মালিকশাহও লশকরের সঙ্গে যোগ দিলেন।

লশকর অর্ধেক পথে থাকতেই হাসান ইবনে সবার গুপ্তচররা হাসান ইবনে সবাকে লশকরের রওয়ানার কথা জানিয়ে দিলো। হাসান ইবনে সবার ঠোঁটে হাসি খেলে গেলো। সে মোটেও উত্তেজিত হলো না। নিজের ফৌজ প্রস্তুতের হুকুমও দিলো না। তার তিন চার জন বিশেষ উপদেষ্টা তার সামনে বসা ছিলো। হাসান ইবনে সবা তাদেরকে বললো–

'যা শোনার তোমরা তো শুনেছো। নেযামুল মুলককে পথেই শেষ করে দেবে।'

হাসান ইবনে সবার মুখ থেকে এতটুকুই বের হলো। তার সামনে বসা এক পেদায়েন উঠে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলো।

'নাহাওয়ান্দ' সেলজুকি সালতানাতের বড় একটি শহর। এর ভৌগোলিক গুরুত্বও অনেক। হযরত উমর (রা.) এর যুগে ২০ হিঃ সনে এটি মুসলমানরা জয় করে। এই লড়াইতে অনেক সাহাবায়ে কেরাম শহীদ হন। রোযার মাস ছিল বলে সুলতান মালিক শাহ্ এই নাহাওয়ান্দে ছাউনি ফেলার প্রস্তাব করেন। এখানেই ছাউনি ফেলা হলো, সৈনিকরা সবাই ইফতার করলো। রাতে তারাবীর নামাযও পড়লো, নেযামুলমূলক ও সুলতান মালিক শাহের বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয় সুন্দর একটি দালানে। নেযামুল মুলক নামাযের পর তার রুমের দিকে রওয়ানা হলেন।

দালানের কাছে পৌঁছে দেখলেন সেখানে অনেক মানুষের জটলা। এরা সবাই নেযামুল মুলকের সাক্ষাত প্রার্থী, যেই এলো তার সঙ্গেই নেযামুল মুলক হাত মেলালেন। কাউকে কুশলও জিজ্ঞেস করলেন।

'সেলজুক ওযীরে আজম কি এক মাজলুমের ফরিয়াদ শুনছেন?'– ভীড় থেকে একটি আওয়াজ শোনা গেলো– 'আমি একটি দরখাস্ত লিখে এনেছি।'

ন্যায়পরায়ণ হিসেবে নেযামুল মুলকের অত্যন্ত সুখ্যাতি আছে। তিনি এই আওয়াজ শুনে লোকটিকে সামনে আসতে বললেন।

এক যুবক এগিয়ে এলো। তাকে খুব ক্ষিপ্ত দেখালো, নেযামুল মুলকের পায়ে সে এক টুকরা কাগজ ছুঁড়ে মেরে বললো, এই নিন, দেখুন আমার ফরিয়াদ। আমি এর ন্যায় বিচার চাই।

নেযামুল মুলক কাগজটি নেয়ার জন্য কুঁজো হয়ে ঝুঁকলেন। এসময়, কাগজ ছুঁড়ে মারা যুবক চোখের পলকে তার কাপড়ের ভেতর থেকে খঞ্জর বের করলো এবং কুঁজো হয়ে থাকা নেযামুল মুলকের পাজরে শরীরের সমস্ত জোর দিয়ে গেঁথে দিলো, খঞ্জর তার পিঠ দিয়ে ঢুকে বুক চিড়ে বের হয়ে গেলো।

লোকেরা তাকে সেখানেই পাকড়াও করলো। নেযামুলমুলক পিঠে খঞ্জর নিয়েই সোজা হলেন। তার শেষ শব্দ ছিলো এই ঃ 'আমার হত্যার বিনিময়ে ওকে হত্যা করো না। তারপর সজোরে কালেমা পাঠ করে একজনের বুকে মাথা রেখে চোখ মুঁদলেন। কিন্তু কেউ তার শেষ কথাটি শোনার প্রয়োজন বোধ করলো না। কিছু লোক নেযামুলমুলকে উঁচিয়ে নিয়ে গেলো। আর বাকীরা হত্যাকারী সেই যুবকের শরীর 'কিমা' বানানোর প্রতিযোগিতায় লেগে গেলো।

নেযামুল মুলকের হত্যাকারীর নাম আবু তাহের। হাসান ইবনে সবার ফেদায়েন বাহিনীর অন্যতম সদস্য ছিলো আবু তাহের।

১০৯২ ইং সনে নেযামুল মুলককে শহীদ করা হয়।

সুলতান মালিক শাহ খবর শুনে প্রথমে তিনি হতভম্ব হয়ে যান। তারপর ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেন। দুনিয়ার সব কিছুই তখন তার নিরর্থক মনে হলো। তবে এটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে এক কঠিন পরীক্ষা ভেবে অনেক্ষণ পর নিজেকে তিনি শান্ত

করলেন। সুলতান মালিকশাহ নেযামুল মুলকের লাশটি দেখলেন। তার চেহারায় যন্ত্রণার কোন ছাপ নেই। যেন আল্লাহর পথে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পেরেছেন বলে তিনি পরিতৃপ্ত। সেই তৃপ্তির দ্যুতি তার মুখকে আলো করে রেখেছে। কিন্তু সুলতান মালিক শাহ তার হত্যাকারীর লাশ খুঁজে পেলেন না। বিক্ষিপ্ত কয়েকটি হাড়গোড় পরে থাকতে দেখলেন।

পুরো লশকর শোকে স্তব্ধ হয়ে গেলো। এ অবস্থায় কোন অভিযান সফল করা বেশ কঠিন। তাই সুলতান এই অভিযান মুলতুবী করে লশকর নিয়ে ফিরে আসেন।

খাজা হাসান তুসী নেযামুলমুলক শুধু দরবারী প্রথাসিদ্ধ ওযীরে আজম ছিলেন না। তিনি তার সমকালে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাবিদও ছিলেন। 'মাদরাসায়ে নেযামিয়া' নামে তিনি এক ঐতিহাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইমাম গাজ্জালী (র.), কিংবদন্তী বীর সালাহউদ্দিন আইয়ুবী এবং বিখ্যাত মনীষী বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই ইতিহাসখচিত ছাত্র ছিলেন। সেই খাজা হাসান তুসী নেযামুলমুলক আজ গুপ্তঘাতকের হাতে শহীদ হয়েছেন।

সুলতান মালিক শাহ তার ফৌজ নিয়ে মারু অভিমুখে আসছেন। দূর থেকে ঝড়ের মতো ধুলো উড়তে দেখে লোকেরা বুঝলো সেনাদল ফিরে আসছে। খবর পেয়ে লোকেরা রাস্তায় জড়ো হতে লাগলো। শহরের দালানগুলোর ছাদ মহিলাদের দখলে চলে যেতে লাগলো। সবার মধ্যে আনন্দের ঢেউ। সৈন্যদল যখন এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসছে, তাহলে নিশ্চয় বিজয়ী হয়েই আসছে।

কয়েক দল লোক এগিয়ে গেলো শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত করে সৈন্যদলকে শুভেচ্ছা বার্তা জানাতে। কিন্তু একটু গিয়ে তারা থমকে দাঁড়ালো। সবাই চোখ কুচকে দেখলো সম্মুখ সারির মুজাহিদরা কারো লাশ বহন করছে। কেউ একজন এগিয়ে জানতে চাইলো কার লাশ? বলা হলো ওযীরে আজম নেযামুল মুলক বাতিনী ফেদায়েনদের হাতে কতল হয়ে গেছেন। সেখানে থেকেই কেউ চিৎকার করে উঠলো, অধিকাংশই হাহা করে শহরের দিকে দৌড়ে গেলো। এ খবর সারা শহরে ছড়িয়ে পড়তে আর সময় লাগলো না।

নেযামুল মুলক মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিলেন। এমন কেউ নেই যে তার দরদী হাতের স্পর্শ পায়নি। তাই সারা শহরময় মাতম করে উঠলো, হাজার হাজার শোকার্ত আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠলো আকাশ বাতাস।

একটু পরই সেই শোকে মুহ্যমানদের স্তব্ধ কণ্ঠ গর্জন করে উঠলো– 'এক বাতিনীকেও ছাড়া হবে না।'

'কেটে কুচি কুচি করে ফেলা হবে হাসান ইবনে সবাকে।

'প্রতিশোধ... খুনের বদলে খুন... প্রতিশোধ চাই...'ফৌজ আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাও।'

এমন অসংখ্য গগনবিদারী আওয়াজে কেঁপে উঠতে লাগলো পুরো শহর। মা-বোনদের বুক চিড়ে বেরিয়ে আসতে লাগলো একটি আর্তিই– আমরা আমাদের নৌজোয়ান বেটাদের উৎসর্গ করে দিলাম। যুবকরা ফেটে পড়তে চাচ্ছিলো এই বলে–

আমরা নিজেরা ফৌজ বানিয়ে আলমোত হামলা করবো। তাদের কণ্ঠে সহসাই যেন শোক রূপ নিলো শক্তির।

লোকজন তাদের প্রিয় নেযামুল মুলককে শেষ বারের মতো দেখার জন্য তার মহলের সামনে ভেঙ্গে পড়লো, প্রতিটি চোখ জমাট অশ্রু বিন্দুতে ঝাপসা হয়ে আসছিলো। প্রতিটি কণ্ঠ প্রতিশোধের অদম্যতায় ফেটে পড়ছিলো।

সুলতান মালিক শাহর অবস্থাও সাধারণ মানুষের মতোই। কাঁদতে কাঁদতে মাঝে মধ্যে তার হেচকি উঠে যাচ্ছে। তিনি যখন দেখলেন প্রতিশোধের আগুন জ্বলতে থাকা জনগণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে তিনি তখন নিজেকে খুব কষ্টে সামলে নিলেন। তারপর নেযামুল মুলকের মহলের বুরুজে চড়ে বিক্ষুব্ধ জনতার উদ্দেশ্যে উঁচু আওয়াজে বললেন– 'মারুর প্রিয় অধিবাসীরা! আপনারা ধৈর্য ধারণ করুন। শান্ত হোন।'

এসময় কয়েকটি আওয়াজ উঠলো– 'খামোশ... খামোশ... চুপ চুপ... সবাই সুলতানের কথা শোনো।

'নিজেদের উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ করুন'– সুলতান যথাসম্ভব নিরাবেগ– গম্ভীর গলায় বললেন– 'আপনারা ভাববেন না যে, আমি নেযামুল মুলকের খুনের কথা ভুলে যাবো। বাতিনীরা নেযামুল মুলকের পিঠে শুধু খঞ্জর মারেনি সালতানাতে সেলজুকির আত্মায় খঞ্জর মেরেছে। কিন্তু এই সালতানাতের ভাগ্যে আল্লাহ তা রাখেননি হাসান ইবনে সবা ও তার বাতিনীরা যেমনটি চাইছে আমি ওয়াদা করছি, নেযামুলমুলকের এক এক ফোটা রক্তের বিনিময়ে বিশজন করে বাতিনীর রক্ত ঝরবে। বাতিনীরা ইসলাম ও মানবতাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। সেনাদল দ্বারা কোন দেশ জয় করা আমাদের কাজ নয়। ঐ বর্বরদের মাটিতে মিশিয়ে দেয়াই আমাদের কর্তব্য। আমি নাহাওয়ান্দে থেকে ফৌজ ফিরিয়ে এনেছি সমস্ত ফৌজ শোকে মুহ্যমান হয়ে গেছে বলে। প্রতিশোধ স্পৃহায় মুজাহিদরা চরম উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলো। এমন উন্মত্ত অবস্থায় লড়াই করা যায়; কিন্তু জেতা যায় না। সৈন্যসংখ্যা আমরা আরো বাড়াবো, তারপর আলমোত হামলা করে বাতিনীদের নাম ঠিকানা মুছে দেবো। আলমোত তখন হবে একটি ধ্বংস স্তূপ।

'লশকরে আমরাও যোগ দেবো। আমরা সবাই প্রস্তুত। কোন বাতিনীকে জীবিত ছাড়বো না'– অজস্র কণ্ঠে আওয়াজ উঠলো।

'আমাদের বেটাদেরও নিয়ে যাও। ইসলামের নামে ওদের কুরবান করে দিলাম। নেযামুল মুলকের খুনের বদলা না নিয়ে ওরা থামবে না'– এ ছিলো নারীদের আবেগ উদ্বেলিত কণ্ঠের মাতম।

★★★★

'আবু তাহের শুধু একজন মানুষকেই হত্যা করেনি'– নেযামুল মুলকের হত্যার খবর পেয়ে হাসান ইবনে সবার উচ্ছ্বসিত প্রতিক্রিয়া– 'সে তো পুরো একটি ফৌজকেই হত্যা করেছে... কোথায় আলমোতে হামলাকারী সেলজুকি ফৌজ?... তোমাদেরকে আমি কিছুদিন আগেও বলেছি বড় ফৌজের বিরুদ্ধে সম্মুখ লড়াইয়ে নামতে গেলে প্রচণ্ড মার খেতে হয়। এর চমৎকার ঔষধ হলো, হামলাকারী ফৌজের সামনে না পড়ে ওদের

প্রধান সেনাফৌজকে মেরে ফেলো। এখন বাস্তবেই তোমরা এর চমৎকার ফলাফল দেখতে পাচ্ছো। শত্রু সম্রাটের সেনাদলকে তোমরা কেন পরাজিত করতে যাবে? স্বয়ং সেই সম্রাটকেই মেরে ফেলো। দেখবে সেই সেনাদল এমনিই পিঠটান দেবে– মারু কি কেউ গেছে?'

'হ্যাঁ ইমাম! অনেক আগেই একজনকে পাঠানো হয়েছে'– একজন বললো।

'মারুর লোকদের প্রতিক্রিয়া কি সেটা আমার খুব দ্রুত জানা দরকার'– হাসান ইবনে সবা বললো– 'সবার আগে জানা দরকার, সুলতান মালিক শাহ এর জবাবে কি বলেন? তিনি যে কোনভাবেই এর প্রতিশোধ নিবেনই।'

'হ্যাঁ ইমাম! আমরা এর ব্যবস্থাও করেছি।'

'মুহূর্তের মধ্যে আমার জানা দরকার মারুতে কি হচ্ছে। সুলতান মালিক শাহ যদি আবার আলমোত আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকেন তাহলে তাকেও আমরা নেযামুল মুলকের মতো খোদার কাছে পাঠিয়ে দেবো।'

সুলতান মালিক শাহের তিন ছেলে– বরকিয়ারক, মুহাম্মদ ও সানজার। ছোট দু'জন সদ্যযুবক। আর বরকিয়ারক পূর্ণ যুবক। সালতানাতের ব্যাপারে মোটামুটি উপযুক্ত, সুলতান তার বড় ছেলের কাছ থেকে মাঝে মধ্যে প্রশাসনের ব্যাপারে পরামর্শও নেন। নেযামুলমূলকের হত্যার কারণে এই তিন ভাইও কম বিচলিত হননি। তিন ভাইয়ের সঙ্গেই মুযাম্মিল আফেন্দীর ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। মুযাম্মিল আফেন্দী তো প্রায় উম্মাদ বনে গিয়েছিলো, কারণ, তার ওপর হাসান ইবনে সবার এটা উপর্যুপরি চতুর্থ আঘাতের ক্ষত তার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত করে দিয়েছে। আর এই শেষ ক্ষতটি এমন যা আর কখনো শুকাবে না। নেযামুল মূলক ফিরে এসে তার ক্ষত কখনো সারিয়ে তুলবেন না।

নেযামুলের দাফন করা হয়েছে অনেক দিন হলো। সুলতান মালিক শাহের হুকুমে সৈন্য বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে পুরোদমে প্রশিক্ষণ আর প্রস্তুতিও চলছে। একদিন মুযাম্মিল সুলতান মালিক শাহের তিন ছেলের কাছে গেলো।

'বন্ধুরা আমার!' মুযাম্মিল তাদেরকে বললো– 'অনেক বড় ফৌজ তৈরি হচ্ছে। কিন্তু বড় বড় ফৌজও আলমোতে গিয়ে ব্যর্থ হতে পারে। কারণ, আলমোত এমন এক শহর যেটাকে সব দিক দিয়ে অবরোধ করা যাবে না। তাছাড়া হাসান ইবনে সবার কাছে আত্মঘাতী কিছু জানবাজ আছে যা আমাদের ফৌজে নেই।

'তাহলে কি করতে হবে আমাদের? আমরা তো আর খামোশ হয়ে বসে থাকতে পারবো না! সুলতানের বড় ছেলে বরকিয়ারকে বললো চিন্তিত হয়ে।

'সে কথাই তোমাদের তিনজনকে বলতে এসেছি। বাতিনীদের খতম করার একমাত্র উপায় হলো হাসান ইবনে সবা ও তার গুরু আহমদ ইবনে গুতাশকে কতল করা। তবে একাজ সহজ নয়। তোমরা তো জানই হাসান ইবনে সবাকে কতল করতে গিয়ে আমার কি অবস্থা হয়েছিল। আমি বলবো হাসান ইবনে সবার মতো আমাদেরও এমন কিছু জানবায তৈরি করতে হবে। এ ব্যাপারে আমি সবরকম সাহায্য করবো।'

'সালারদের সঙ্গে আজই আমি কথা বলবো, আশা করি প্রাণ বাজি রাখা নির্ভীক কিছু সিপাহী অবশ্যই পাওয়া যাবে'–বরকিয়ারক বেশ আশাপ্রদ গলায় বললো।

'কিন্তু বরকিয়ারক!– মুযাম্মিল বললো– তুমি যদি ভেবে থাকো সোনা রুপার লোভ দেখিয়ে ফৌজকে প্রাণ বাজি রাখার পথে নিয়ে আসবে তাহলে ভয়ংকর আত্মতুষ্টি নিজেকে ভুগাবে। হাসান ইবনে সবা তার জানবাযদের নিজের ফেরকার সঙ্গে উন্মাদ করে রেখেছে। তাছাড়া 'হাশীষ' পান করিয়ে ওদের মাথাটাও তার কব্জায় নিয়ে নিয়েছে। হাসান ইবনে সবা সেখানে পরিকল্পনা করে আর তার ফেদায়েনরা তা বাস্তবায়ন করে। আমরা কি এভাবে জানবায তৈরি করতে পারবো?'

'পারবো, তবে সালারদের সঙ্গে আগে কথা বলতে হবে'– বরকিয়ারক বললো।

হাসান ইবনে সবা জানবায তৈরির জন্য শুধু 'হাশীষই ব্যবহার করতো না, তার হিপ্টোনিজম বিদ্যা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সুন্দরী মেয়েদেরও সে ব্যবহার করতো। যে কারণে বাতিনী জানবাযদের তুলনা চলে কেবল বনের মানুষ খেকো হিংস্র প্রাণীর সঙ্গেই। কিন্তু সেলজুকি মুসলমানদের জন্য তো এতটুকু নিচে নামা কখনোই সম্ভব না। এজন্য তাদের জানবায তৈরির পরিকল্পনা সংশয়ে রয়ে যায়।

★★★★

সুমনার কাছে নেযামুল মুলক ছিলেন প্রগাঢ় মমতাময়ী এক পিতার মতো। সুমনার বাবাকে তো হাসান ইবনে সবার লোকেরাই হত্যা করে। তারপর এই নেযামুল মুলকেও তারই এক ফেদায়েন হত্যা করেছে। একাধারে হপ্তা দুয়েক দিন রাত, আধো ঘুম আধো জাগরণ অবস্থায় সুমনা অনবরত কেঁদে যায়। মায়মুনা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো– এই মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে হয় মরে যাবে না হয় বদ্ধ পাগল হয়ে যাবে।

আচমকা একদিন সুমনা কান্না বন্ধ হয়ে গেলো। স্থানুর মতো তার মার পাশে গিয়ে বসলো। কেমন জটধরা সুরে বললো–

'মা! রাতে স্বপ্নে নেযামুল মুলকের সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছে। তিনি এই বলে অভিযোগ করছেন যে, তোমরা এখনো আমার হত্যার প্রতিশোধ নিলে না।!'

এবার মা মায়মুনা ভয়ে কেঁপে উঠলো। এই মেয়ের মাথা তো আসলেই বিগড়ে গেছে। তবুও স্বভাবিকভাবে বলতে চেষ্টা করলেন–

'তোমাকে যে উনি খুব ভালবাসতেন এজন্যই তুমি তাকে স্বপ্নে দেখেছো।'

'না মা! তিনি আমাকে বলতে এসেছিলেন, আমার খুনের বদলা শুধু তুমিই নিতে পারবে। এখন তো আমারই প্রতিশোধ নিতে হবে। নেযামুলমুলক তো আমার আত্মার পিতা ছিলেন।'

'আচ্ছা বেটি! তুমি কি আলমোত গিয়ে হাসান ইবনে সবাকে হত্যা করতে পারবে? তোমাকে তো সেখানে হাসান ইবনে সবাসহ আরো অনেকেই চিনে, তুমি আলমোত যাওয়ার আগেই তো কতল হয়ে যাবে।'

'শোন মা! হাসান ইবনে সবার কাছ থেকে যে কূট চালিয়াতি শিখেছি আমি তাই তার ওপর প্রয়োগ করবো। আমার কাছে খঞ্জর থাকবে। সোজা আমি হাসান ইবনে সবার কাছে গিয়ে বলবো, আমি তোমার তীব্র টানে চলে এসেছি। সে আমাকে জল্লাদের হাতে দেয়ার আগে তার বুকে আমি খঞ্জর বসিয়ে দেবো।

মা মায়মুনা তাকে অনেক বুঝাতে চেষ্টা করলেন। অবশেষে বললেন, তুমি চলে গেলে আমি আত্মহত্যা করবো। এসব কথায় সুমনার মন একটুও গললো না।

মায়মুনা শেষ পর্যন্ত মুযাম্মিলের কাছে গেলেন। মুযাম্মিলও তাকে অনেক যুক্তি দিয়ে বুঝালো তার এসব পাগলামী চিন্তা ভাবনা। তাদের প্রণয়-ভালোবাসার কথাও ইনিয়ে বিনিয়ে বললো মুযাম্মিল। কিন্তু সুমনাকে কারো কথাই প্রভাবান্বিত করলো না। 'আমাকে বলো না কিছু মুযাম্মিল?– সুমনা বললো– 'প্রেম-ভালোবাসার কথা বলার সময় না এটা। আমার ওপর এখন নেযামুলমুলকের খুন সওয়ার হয়ে আছে। যে পর্যন্ত আমি এই খুনের ঋণ পরিশোধ করতে না পারবো সে পর্যন্ত আমি আর অন্য কিছু শুনতে চাই না।'

'তাহলে এটাও শুনে নাও সুমনা! যে পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকবো সে পর্যন্ত ঘরের বাইরে তুমি এক কদমও রাখতে পারবে না। তুমি কি মনে করছো আমরা পুরুষরা মুরদা বনে গেছি? নাকি আমরা এতই বোধহীন হয়ে পড়েছি যে, নেযামুলমুলকের মতো এমন মহান ব্যক্তির হত্যার প্রতেশোধের কথা মাথা থেকে নামিয়ে দিয়েছি? আমিই যাবো। আমরা জানবাযদের একটা বাহিনী তৈরি করছি। সেদিন বেশি দূরে নয়, যে দিন আহমদ ইবনে গুতাশ ও হাসান ইবনে সবার লাশ তোমার পায়ে এনে ফেলবো'– মুযাম্মিল দৃঢ় গলায় বললো।

'তুমি তো আগেও ওখানে গিয়েছিলে?'– সুমনার গলায় সংশয়।

'সেই অভিজ্ঞতা এখন আমার কাজে আসবে। আর আমি তো এবার একা যাবো না। জানবাযদের বাহিনী নিয়ে যাবো। কেন দেখছো না আলমোতের ওপর হামলার জন্য কত বড় ফৌজ তৈরি হচ্ছে?'

'ঠিক আছে আমি অপেক্ষা করবো কিছুদিন। তোমরা যদি ব্যর্থ হও আমি তা সফল করে দেখাবো'– সুমনা বললো ক্লান্ত গলায়।

সেখানে সবচেয়ে বেশি কষ্ট ও সংকটে ছিলেন সুলতান মালিক শাহ। নেযামুলমুলক তার শুধু ডান হাত ছিলেন না। তিনি ছিলেন তার প্রশাসনের আত্মার মতো। স্বীয় তিন পুত্রের ওপর আস্থা ছিল না তার। ওদের মধ্যে দেশের প্রতি যথেষ্ট আবেগ প্রেম থাকলেও সে বিচক্ষণতা তো ছিলো না যা এই সংকটে কাজে লাগবে।

আলমোত ও বাতিনীদের এলাকায় সুলতান যেসব গুপ্তচর ছড়িয়ে রেখেছিলেন তাদের পক্ষ থেকে যে তথ্য আসছিলো সুলতানকে তা আরো বিপর্যস্ত করে তুললো। সবচেয়ে ভয়ংকর তথ্য হলো, বাতিনীরা তাদের প্রচার কার্য আরো তীব্র করে তুলেছে এবং আশে পাশের কেল্লা শহরগুলো বিনা লড়াইয়ে কব্জা করার চেষ্টা করছে। আরো ভয়াবহ খবর হলো, ঐসব এলাকায় বাতিনীরা এত প্রভাব বিস্তার করেছে যে, সেখানকার লোকেরা হাসান ইবনে সবাকে শুধু ইমামই নয় নবী মানতে শুরু করেছে। সাধারণ লোকেরাও হাসান ইবনে সবার নির্দেশে প্রাণ বিসর্জনের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে।

সুলতান মালিক শাহ একদিন তার তিন ছেলেকে ডেকে পাঠালেন। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন–

'বেটারা আমার! এ দেশ ও মুসলমানদের ওপর এত ভয়াবহ অবস্থা কখনো আসেনি। এখন আমাদের দায়িত্ব শুধু দেশ রক্ষাই নয়; ইসলামকেও রক্ষা করতে হবে ধ্বংসের হাত থেকে। যে দিন সেলজুকি সালতানাত ধ্বংস হয়ে যাবে সেদিন ইসলামের উড়ন্ত ঝাণ্ডাটিও পড়ে যাবে মুখ থুবড়ে। একজন সম্রাটের যদিও কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না কিন্তু আল্লাহর কাছে তাকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। এই সালতানাত আমার, তোমাদের বা তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরও নয়। এটা আল্লাহর সালতানাত। একে বাঁচানো আমাদের জন্য ফরজ। তোমাদেরকে আমি বলিনি, বেশ ক' রাত ধরে আমি ঘুমুতে পারছি না। মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা। আজ আমার বড় একা লাগছে।

'মুহতারাম আব্বাজান!'– বড় ছেলে বরকিয়ারক বললো– 'আমাদের তিন ভাইয়ের উপস্থিতিতে আপনার একা একথা বলা উচিত নয়। শহীদ নেযামুলমুলককে আমরা 'রুহানী' পিতা বলে জানতাম। আল্লাহ তাআলা তাকে যে দূরদর্শীতা দিয়েছিলেন এদেশের আর কাউকে তা দেননি। তাকে ছাড়া আমরা এখন দুর্বল হয়ে পড়েছি। কিন্তু এই দুর্বলতা তিনি থাকতেই আমরা আমাদের মধ্যে তৈরি করেছি। আপনার কোন সমস্যা আসলে আপনি নিজে তা সমাধান না করে নেযামুলমুলকের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। তাকে ছাড়া এজন্যই আপনাকে আজ দুর্বল ও একা লাগছে। অনেক বড় ফৌজ প্রস্তুত হচ্ছে। এই ফৌজ এখন উত্তপ্ত আগুনের মতো ফুসছে। যখন হামলা করবে এই ফৌজ বাতিনীরা তখন ধুলোর মত উড়ে যাবে।

'না বেটা! আমি যা বলতে চাচ্ছি তুমি বুঝতে পারছো না। আলমোত ফৌজের জোরে জয় করা যাবে না। এ নিয়ে ভাবতে ভাবতে তো আমি পেরেশান হয়ে গেছি। আমার ভাবনায় তোমরা সাহায্য করো। অন্য কোন উপায় আমাদের বের করতে হবে।'

'আমাদের সময় দিন মুহতারাম আব্বাজান!'– আরেক ছেলে মুহম্মদ বললো– 'আপনি এত পেরেশান হবেন না। আমরা তো একটা উপায় বের করেছি। জানবাযদের একটি বাহিনী তৈরি করছি আমরা।'

সুলতানের মাথায় যন্ত্রণা উঠলে তিনি শুয়ে পড়লেন। তিন ছেলে চলে গেলো।

★★★★

মুযাম্মিল একদিন ঘোড়া দৌড়ের ময়দানে সেনা প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করতে গেলো। এখানে এসেই মুযাম্মিল ঘুরে ঘুরে লোকদেরকে ফৌজে ভর্তি হতে উৎসাহ দেয়। তার কথায় অনেকেই এ পর্যন্ত ফৌজে ভর্তি হয়েছে।

আজো মুযাম্মিলের মন সেদিকেই। লোকজনের ভীড়ের মধ্যে এক যুবকের ওপর তার চোখ পড়লো। চেহারাটা কিছু পরিমিত মনে হচ্ছে, মুযাম্মিলের মনে হচ্ছে একে সে বিশেষ কোন জায়গায় দেখেছে। কিন্তু কোথায় দেখেছে মনে করতে পারছে না। লোকটির চোখ মুযাম্মিলের দিকে পড়তেই চেহারার ভাব পাল্টে গেলো এবং ত্রস্ত পায়ে সেখান থেকে সরে পড়তে লাগলো। মুযাম্মিলের সন্দেহ হলো।

'একটু দাঁড়ান ভাই!'– মুযাম্মিল তাকে পেছন থেকে ডাকলো।

লোকটি যেন মুযাম্মিলের কথা শুনতেই পায়নি। দ্রুত হাঁটতে লাগলো। মুযাম্মিল দৌড়ে লোকটির কাছে চলে গেলো।

'এই যে ভাই! কোথায় যেন দেখেছি আপনাকে। এই শহরে নয়। অন্য কোথাও আমাদের সাক্ষাত হয়েছিলো'–মুযাম্মিল বলে তীক্ষ্ণচোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

'হ্যাঁ ভাই! তা তো হতেই পারে'– লোকটি বললো– 'আপনার স্মরণশক্তি ও উদার মনের প্রশংসা না করে পারছি না যে, আপনি আমাকে মনে রেখেছেন, কিন্তু আমি মোটেও মনে করতে পারছি না। হয়তো কোন কাফেলা বা সরাইখানায় আমাদের দেখা হয়েছিলো। আমার পেশা ব্যবসা। দেশে দেশে শহরে শহরে ঘুরতে হয় আমাকে।'

'আপনার মুখের এই তিলটার কথাও মনে আছে আমার।'

লোকটি হা হা করে হেসে উঠলো এবং মুযাম্মিলের হাতে হাত রেখে খুশি খুশি গলায় বললো–

'এই তিলের কারণেই যে আমাকে একবার দেখে সে সবসময় মনে রাখে আমাকে। আপনি এখানেই থাকেন?

'হ্যাঁ ভাই আমি এখানেই থাকি।'

'আচ্ছা দোস্ত! তোমার কথা আমার মনে থাকবে'–লোকটি একথা বলে চলে গেলো।

মুযাম্মিল সেখানে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো। লোকটির মুখের ঐ তিলটি তাকে কেমন যেন অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। ঐ তিলওয়ালা মুখরা যেন তার জীবনের কোন ভয়াবহ ঘটনার সঙ্গে জড়িত।

কয়েকদিন পর মুযাম্মিল লোকটির কথা ভুলে গেলো। মুযাম্মিল প্রায়ই সুলতানের তিন ছেলের ওখানে গিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ আলোচনা করে। সেদিন সকালে মুযাম্মিল বরকিয়ারকের ঘরে গেলো। বরকিয়ারককে কিছুটা পেরেশান দেখতে পেলো সে। মুযাম্মিল তাকে বিজ্ঞেস করলো, কি কারণে তাকে এত পেরেশান দেখাচ্ছে?'

'সুলতান যে বিছানায় পড়ে গেছেন'– বরকিয়ারক বড় হতাশ মুখে বললো।

তিনি কি খুব অসুস্থ?'– মুযাম্মিল বললো বেশ চিন্তিত গলায়।

'অসুখটা ধরা যাচ্ছে না। সবসময় মাথা ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করেন। আবার কখনো সারা শরীরে এমন অস্থিরতা অনুভব করেন যে, তার সহ্যের বাইরে চলে যায়। ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছেন। দেহের ভার পায়ে নিতে পারেন না।'

'ডাক্তার তো দেখেছেন?'

'তিন চার দিন ধরে ডাক্তাররা নিয়মিত আসছেন। ডাক্তাররা বলেছেন, মানসিকভাবে তিনি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। প্রয়োজনীয় ঔষধ দিয়েছেন। কিন্তু তার অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকেই যাচ্ছে।'

'নেযামুলমুলকের শোক তিনি ভুলতে পারছেন না। তাছাড়া তার মনে বোঝা চেপে বসেছে যে, বাতিনীদের তিনি আর হারাতে পারবেন না। এখন আমাদের কাজ হলো, তাকে এই নিশ্চয়তা দেয়া যে, বাতিনীদের আমরা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলবো। আমাকে সুলতানের কাছে নিয়ে চলো। আশা করি সুলতানকে আমি কিছুটা সুস্থ করে তুলতে পারবো। তিনি আমাকে বেশ স্নেহ করেন।

'দুঃখিত মুযাম্মিল ভাই!'– বরকিয়ারক বললো– 'ডাক্তার শক্ত করে বলে দিয়েছেন বাইরের কেউ যেন সুলতানের কাছে না যায়। সুলতান ডাকলে ভিন্ন কথা, ঘরের কাউকেও তার কাছে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।'

মুযাম্মিল কিছুটা বিব্রত হলেও হাসিমুখে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলো। তারপর সে জানবায তৈরির ব্যাপারে পুরোপুরি ডুবে গেলো। যদিও এ ব্যাপারে তার কোন অভিজ্ঞতা নেই। তবুও সে হাল ছাড়ার পাত্র নয়। দশ বার জনের একটা দলকে সে জুটিয়ে ফেললো।

একদিন বরকিয়ারক তার ঘর থেকে বের হয়ে ফটকের সামনে এক দরবেশকে দেখতে পেলো। দারোয়ান তাকে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। দরবেশের এক হাতে তসবীহ। আরেক হাতে লাঠি। মাথায় পাগড়ি। পরনে সবুজ জুব্বা। দরবেশ তাকে দেখে দূর থেকে সালাম জানালো। বরকিয়ারক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সেদিকে এগিয়ে যেতেই দারোয়ান অভিযোগ করলো, এই দরবেশ সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাত করতে চাচ্ছে। বরকিয়ারক দরবেশকে বললো–

'আপনি কি জানেন না সুলতান অসুস্থ? ডাক্তার উনার সঙ্গে সাক্ষাত বন্ধ করে দিয়েছেন। আপনি আমাকে বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি। এখানে কেউ এসে নিরাশ হয়ে যায় না।'

'আমি জানি সুলতান অসুস্থ'–দরবেশ বললো– 'আমি এও জানি সুলতান কি অসুখে ভুগছেন। ডাক্তারের ঔষধও সুলতানের কাজে আসছে না। আমি অবশ্য ডাক্তারের চিকিৎসা বন্ধ করে দিতে বলছি না। আমি মনো চিকিৎসক। আমার মনে হয় বাতিনীরা তার ওপর কোন জাদুটোনা করেছে। তাকে আমি একবার দেখলেই বুঝতে পারবো।'

'সুলতানকে আগে জিজ্ঞেস করে নিই। এখন তো তিনি ঘুমুচ্ছেন।'

'না তাকে জাগানো ঠিক হবে না। আমি একটা কথা বলতে চাই। আমাকে এখনই বিশ্বাস করা ঠিক হবে না আপনার। আমি তো আপনার জন্য অপরিচিত। আমার গন্তব্য এখানে নয়। আমি কিছুদিনের জন্য এখানে থেমেছি। শহরের এক সরাইখানায় উঠেছি। আপনি ইচ্ছা করলে ঐ সরাইখানায় আসতে পারেন। তাহলে হয়তো আমার প্রতি বিশ্বাস আসবে আপনার। বিনিময়ে কিন্তু আমি কিছু চাই না।'

'তাহলে এখনই চলুন যাই'–বরকিয়ারক বললো।

'তাহলে তো খুবই ভালো হয়।'

রাস্তায় দরবেশ কথা বলতে বলতে গেলো। বরকিয়ারক কিছুই বললো না। তবে দরবেশের কথায় প্রভাবান্বিত হলো।

দরবেশের কামরা সরাইখানার ওপর তলায়। দরবেশ বরকিয়ারককে তার কামরায় নিয়ে গেলো। দরজায় কমবয়সী একটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

'ইনি মহামান্য সুলতানের বয়োজ্যেষ্ঠ পুত্র মান্যবর বরকিয়ারক'–দরবেশ বিনয়ে গলে গিয়ে মেয়েটিকে বললো– 'সুলতান ঘুমুচ্ছেন। উনার সঙ্গে দেখা হয়েছে। উনি মেহেরবানী করে এখানে এসেছেন।

'খোশ আমদেদ!'–মেয়েটি ঝুঁকে পড়ে বললো– 'সুলতানের অসুস্থতা আমাদেরকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। তার জন্য আমি দুআ করে যাচ্ছি। সম্ভব হলে আমার প্রাণটাই সুলতানকে দিয়ে দিতাম। তিনি তো ইসলামের অনেক বড় এক স্তম্ভ। আল্লাহ তাকে সুস্থতা দান করুন।

'এ আমার ছোট বোন রুজিনা'–দরবেশ বললো– 'আমার কাঁধের ওপর সে এখন বড় দায়িত্ব হয়ে চেপে আছে। এ পর্যন্ত কোন উপযুক্ত ছেলে পেলাম না। পেলেও বংশ খান্দান ভালো মেলে না। ওকে তো আর আমি ফেলে দিতে পারি না।'

বরকিয়ারক সুলতান পুত্র হলেও ইসলামের কঠোর শাসনে থাকায় কখনো বিলাসবহুল জীবনের স্বাদ পায়নি। কিন্তু তাই বলে এত রূপবতী যৌবনবতী এক মেয়েকে দেখে চোখ ফিরিয়ে রাখতে পারবে এমন তো নয়। কোন পুরুষের পক্ষেই তা সম্ভব নয়। বরকিয়ারক যেন ভুলেই গেলো মেয়ের বড় ভাই কামরায় রয়েছে। মেয়েটির চুম্বকীয় মুখের ওপর বরকিয়ারকের নজর আটকে গেলো। শাহী মহলের কত সুন্দরী মেয়েই তো বরকিয়ারক দূর থেকে দেখেছে। দুদিন পরই তো আবার সেই সুন্দর মুখের কথা ভুলে গেছে। বরকিয়ারকের মনে এই প্রচলিত প্রথার কথাও কখনো আসেনি যে, সে একজন শাহজাদা বলে আরেক শাহজাদীকে বিয়ে করবে। মেয়েদের ব্যাপারে তাদের কোন ভাইয়েরই কোন দুর্বলতা ছিলো না কখনো। কিন্তু সে তো এক যুবক। এই মেয়ের প্রতি বরকিয়ারক আকৃষ্ট না হয়ে পড়লো না। মেয়েটির রূপ-সৌন্দর্যই নয়, কী এক রহস্য, অচেনা এক চুম্বকীয় শক্তি যেন তীব্রভাবে তাকে টানছে। মেয়েটির ভেজা দুই ঠোঁটের সলজ্জ হাসি বরকিয়ারকের ভেতর যৌবনের ঝড় বইয়ে দিলো যেন। দরবেশের কথায় হঠাৎ সে চমকে উঠে।

'আমি চাচ্ছিলাম হজ্জে যাবো'–দরবেশ বললো– 'কিন্তু মনে হচ্ছে এ বছরও হজ্জে যেতে পারবো না। রুজিনাকে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির হাতে সোপর্দ না করে তো আর হজ্জে যেতে পারি না আমি। এ আমার মরহুম বাবার আমানত।'

বরকিয়ারক চিন্তায় ডুবে গেলো, এই মেয়েকে যদি সে বিয়ে করতে চায় সুলতান কি তাহলে তাকে এজাযত দিবেন। কিন্তু মুশকিল হলো, সুলতানের এ অবস্থায় এ কথা তো উঠানো যাবে না।

'সুলতান মালিক শাহের আমি খুব ভক্তও'–দরবেশ বললো–'এখানে এসে তার অসুস্থতার কথা শুনে খোঁজখবর নিলাম তিনি কি অসুখে ভুগছেন। আমার বাবা আধ্যাত্মিক বিদ্যায় অতি দক্ষ ছিলেন। তিনি আমাকে কয়েকটা অলৌকিক চিকিৎসা শিখিয়েছিলেন। সুলতানের অসুখের ধরণ জানার পর আমার বুঝতে বাকী রইলো না এ কাজ হাসান ইবনে সবার। আপনার বাবা তো হাসান ইবনে সবার এই ফেতনাকে ধ্বংস করতে চান। হাসান ইবনে সবা ও তার গুরু জাদুটোনার ব্যাপারে উস্তাদ। নেযামুল মুলককে কতল করার পর এখন তারা সুলতানকে শেষ করে দিতে চাচ্ছে ওরা। গতকাল রাতে নফল পড়ে কিছুক্ষণ মুরাকাবা করি আমি। এতে যে অবস্থা আমার সামনে এসেছে তাতে আমার পশম দাঁড়িয়ে গেছে। কোন ঔষধ সুলতানকে ভালো করবে না। তবে ঔষধ বন্ধও করা যাবে না। ঔষধ তাকে কিছুটা হলেও সান্ত্বনা দেয়। আমি তার মানসিক চিকিৎসা করতে চাই।'

তারপর রহস্যভরে দরবেশ এমন এমন কথা বললো যে, বরকিয়ারক অনুভব করলো এখনই দরবেশকে সুলতানের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত।

'আচ্ছা! এসব জাদু-মন্ত্র দিয়ে কি আমাদের পুরো সালতানাত ধ্বংস করা যাবে?'–বরকিয়ারক দরবেশকে জিজ্ঞেস করলো।

'না'–দরবেশ বললো– 'তবে এতটুকু ভেবে দেখুন যে, কোন ঘরের কর্তাকে যদি মানসিক রোগীতে পরিণত করা হয় এর পরিণতি কি হবে? সেই পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবে। এই সালতানাতেরও সে অবস্থা। সুলতান মালিক শাহকে মানসিক ও শারীরিকভাবে পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে। আপনি তার স্থলাভিষিক্ত হলে আপনারও একই অবস্থা হবে। তারপর সালতানাত ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'আপনি কোন্ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করবেন? আপনি কি শুধু তার জন্য দুআ করবেন না অন্য কিছুও করবেন?'

'দুআ তো করতে হবেই। কিছু তাবীজও দেবো। তবে সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে আমার চিকিৎসা ফলদায়ক হবে না। তার কাছে আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যান। আমি আমার পীর মুরশিদকে এত কষ্টে থাকতে দিতে পারি না।'

'আমি নিজেও তো তার এ অবস্থা সহ্য করতে পারছি না। তিনি আপনার পীর মুরশিদ আর আমার বাবা। ঠিক আছে আমি যাচ্ছি। তিনি জাগলে আপনাকে খবর দেবো। আপনি এখানেই তো আছেন?'

'হ্যাঁ, সুলতানকে না দেখে আমি এখান থেকে যাবো না।'

'ভাইজান! আপনি না কি জরুরী কাজে যাবেন। তাড়াতাড়ি আসবেন কিন্তু'–রুজিনা দরবেশকে বললো।

'ওহ্! তুমি মনে করিয়ে দিয়ে ভালো করেছো। আমি তাড়াতাড়িই আসবো। শাহজাদা এতক্ষণ তোমার সঙ্গে থাকবেন'–দরবেশ বরকিয়ারককে বললো– 'শাহজাদা! ও একা ভয় পায়। আমার ছোট একটি কাজ আছে। দয়া করে আপনি যদি একটু বসতেন...

বরকিয়ারক সায় দিতেই দরবেশ বেরিয়ে গেলো।

'আপনি তো নিশ্চয় বিয়ে করেছেন?'–রুজিনা আমতা আমতা করে বরকিয়ারককে জিজ্ঞেস করলো।

'না রুজিনা! আমাদের খান্দানের রীতি হলো, ছেলেদেরকে তখনই বিয়ের উপযুক্ত মনে করা হয় যখন তাদের জ্ঞান বুদ্ধিও প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যায়। এখনো আমি ঠিক করিনি কাকে বিয়ে করবো!'

'আপনি কেমন মেয়ে চান?'–রুজিনা লজ্জা পেয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'কত মেয়েই তো দেখেছি। কিন্তু পছন্দ তো এ পর্যন্ত কাউকেই হলো না।'

'আপনি কি মেয়েদের মধ্যে কোন গুণ-রহস্য খুঁজছেন?'

'হ্যাঁ!'

'একটি মেয়ের মধ্যেও কি তা পাননি?'–মুচকি হেসে রুজিনা জিজ্ঞেস করলো।

'আজ পেয়েছি। কার মধ্যে জানো? তোমার মধ্যে'–বরকিয়ারক মুখ লাল করে বললো।

'কিন্তু আমি তো শাহী খান্দানের উপযুক্ত নই।'

'দেখো রুজিনা! ভুলে যাও আমি শাহজাদা। আমাকে তোমার মতোই একজন মনে করো। আচ্ছা সত্যি করে বলো তো আমাকে তোমার ভালো লেগেছে কিনা?'

'বড় কঠিন প্রশ্ন করেছেন। যদি বলি আপনাকে খুব ভালো লাগছে তাহলে আপনি বলবেন, আপনি শাহজাদা বলে আপনাকে ভালো লাগছে আমার। যদি বলি ভালো লাগার মতো কোন কিছু নেই আপনার মধ্যে, আপনি নারাজ হয়ে যাবেন। জ্ঞানীরা বলে থাকেন, বাদশাহদের কাছ থেকে দূরে থাকো। যদি খুশী থাকেন স্বর্ণরুপায় ঝুলি ভরে দেবেন। বেজার হলে শূলিতে চড়িয়ে দেন।'

'আমি তোমার মধ্যে আরেকটা গুণ দেখতে চাই। সেটা হলো সাহস। এমন মেয়ে আমি চাই যে আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় পায় না।'

'আল্লাহকে ছাড়া আমিও কাউকে ভয় পাই না'–রুজিনা বললো– 'আমি আবার বলবো, আমি যদি বলি আপনাকে খুব ভালো লাগছে আপনার ভেতরের সুলতানী জেগে উঠবে। আপনি ভাববেন, আমি আপনাকে নয় আপনার পদমর্যাদাকে ভালোবেসেছি। আপনি অনেক মেয়ে দেখেছেন কাউকেই আপনার উপযুক্ত মনে হয়নি। আমিও অনেক সুদর্শন যুবক দেখেছি, আপনার মতো কাউকে আমি পাইনি।'

'কোন্ জিনিসটা আমার ভালো লেগেছে সেটা কি সাহস করে তুমি বলতে পারবে?'

'এক সুলতানের ছেলে হয়েও আপনার মধ্যে কোন গর্ব অহংকার নেই। আপনি ভাইজানকে বলেছেন, কোন মেয়ের প্রতি আপনার দুর্বলতা ছিলো না। আপনি যদি সত্য বলে থাকেন তাহলে আপনার মতো পুরুষকেই আমি আমার স্বামী হিসেবে কল্পনা করেছি এত দিন। কিন্তু আমি কখনো আপনার উপযুক্ত হতে পারবো না।'

এই প্রথম এক মেয়ে বরকিয়ারকের মন মস্তিষ্ক উভয়টাকেই কাবু করে ফেললো। বরকিয়ারক রুজিনাকে তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলো।

'না না'–রুজিনা আঁতকে উঠে বললো–'এই বিয়ে কখনো হবে না। সুলতান আপনাকে কখনো এই অনুমতি দেবেন না যে, ঘর নেই বাড়ি নেই এমন এক মেয়েকে আপনি বিয়ে করুন।'

'রুজিনা! তুমি জানো? তোমার জন্য আমি সালতানাতের উত্তরাধিকারও বিসর্জন দিতে পারবো? আল্লাহ সাক্ষী, বিশ্বাস করো, তুমিই প্রথম যাকে আমি এভাবে বললাম'–বরকিয়ারক বললো ঘোরলাগা কণ্ঠে।

'কিন্তু আপনি সুলতানের বড় পুত্র। তারপর আপনিই সুলতান হবেন। আপনাকে আমি সুলতান হিসেবে দেখতে চাই। আপনি আমাকে আর বাধ্য করবেন না।'

'তোমার ভাইজান এসে পড়ছেন। তোমার সঙ্গে আমার একা কোথায় দেখা হতে পারে?'

'দেখা হওয়া তো কোন সমস্যা না। কিন্তু আপনাকে বলছি আমি; আপনি যদি এক শাহজাদার ভাব নিয়ে আমার কাছে আসেন তাহলে তা হবে আমাদের শেষ সাক্ষাত। আমার ভাই একজন দরবেশ। তার কাছে এতটুকু পুঁজিই আছে যা দিয়ে সসম্মানে আমরা বেঁচে থাকতে পারবো। কিন্তু আমার সম্পদ হলো আমার আবরু আমার ইজ্জত। আমি প্রাণ দিয়ে দেবো কিন্তু এই সম্পদ কাউকে ছুঁড়ে দেবো না।

আমার পায়ে আপনি স্বর্ণমুদ্রার স্তূপ রেখে দিতে পারেন। কিন্তু আমাকে কিনতে পারবেন না।'

'তুমি কি এখনো আমাকে মানতে পারোনি? তুমি কি বুঝোনি আমার ভালোবাসার সম্পর্ক তোমার হৃদয়ের সঙ্গে, তোমার দেহের সঙ্গে নয়?'–বরকিয়ারক আকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'আমি তো সেই ভালোবাসাই খুঁজে মরছি। কিন্তু শুনেছি শাহী খান্দানের লোকেরা ভালোবাসা করে দেহের সঙ্গে। অন্তরের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই।'

'সেটা অন্য কোথাও। মুসলমান শাহী খান্দানে নয়। আচ্ছা কোথায় আবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে?'

'রাতে আমার ভাইজান কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমান। তার কানে ঢোল বাজালেও তিনি চোখ খুলবেন না। সরাইখানার পেছনে চমৎকার একটি বাগান আছে। মাঝরাতে সেখানে দেখা হবে।'

বরকিয়ারক যেন ভুলেই গেছে সে এত বড় সালতানাতের এক শাহজাদা। সে রুজিনার কাছে প্রেমের জন্য শুধু হাত পাততে বাকী রেখেছে।

অনেকক্ষণ পর দরবেশ এলো। কিন্তু বরকিয়ারকের মনে হলো, দরবেশ মুহূর্ত মাত্র দেরী করেছে। দরবেশ বরকিয়ারককে কৃতজ্ঞতা জানালো।

বরকিয়ারক তো সেখান থেকে উঠতেই চাচ্ছিলো না। তবুও তাকে উঠতে হলো।

★★★★

সেদিনের সব কাজকর্ম ভুলে গেলো বরকিয়ারক। সরাইখানা থেকে সোজা সুলতানের কামরায় গিয়ে হাজির হলো। সুলতান তখন জেগে উঠেছেন।

'বেটা বরকিয়ারক!'–তাকে সুলতান মালিক শাহ ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন– 'এখন আর আমার জীবনের ভরসা নেই। এই বাস্তবতা মেনে নাও। আমি আর দুই চার দিনের মেহমান মাত্র। সালতানাতের সবকিছু তোমার কাঁধে এসে পড়বে। তোমার এত বড় ইসলামী সালতানাতকেই সামলানো হবে না, ইসলামকেও সমুন্নত করতে হবে।'

মুহতারাম আব্বাজান! এত ভেঙ্গে পড়বেন না'–বরকিয়ারক বললো–আপনার কাছ থেকে আল্লাহ আরো অনেক কাজ নেবেন। আল্লাহর ওয়াস্তে এমন কথা আর বলবেন না। ডাক্তার বলেছেন, আপনার শরীরে কোন অসুখ নেই। আপনি নিজেই আপনার মনে বোঝা চেপে রেখেছেন। আপনাকে আমি আত্মিক চিকিৎসা করতে চাই।'

'আমি নিজেও আত্মিক চিকিৎসার পক্ষে। কিন্তু এমন আত্মিক চিকিৎসক তো দেখছি না আমি'।

'আমি একজন আত্মিক ও মানসিক চিকিৎসক পেয়েছি। তিনি বলেছেন আপনার শারীরিক কোন অসুখ নেই। আপনার প্রতি জাদুটোনা করে হয়েছে। আপনি তো জানেন, হাসান ইবনে সবা ছাড়া এ কাজ আর কারো হতে পারে না। ঐ হাকিম আমাকে বলেছেন, আপনি দীর্ঘায়ু পেয়েছেন।'

দরবেশ তাকে যা যা বলেছে বরকিয়ারক সুলতানকে তার সবই বললো। সুলতান বরকিয়ারককে বললেন দরবেশকে নিয়ে আসতে।

শাহী পাল্কিতে করে দরবেশকে আনা হলো। বরকিয়ারকের অনুরোধে দরবেশ রুজিনাকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছে। বরকিয়ারক রুজিনাকে তার মা বোনদের কাছে পাঠিয়ে দিলো আর দরবেশকে নিয়ে সুলতানের কাছে গেলো।

দরবেশ সুলতানের সামনে বসে একটু ঝুঁকে কিছুক্ষণ বিড় বিড় করলো। তারপর চোখ বন্ধ করে মোরাকাবায় চলে গেলো। আর হাতের আঙ্গুলে তসবীহের দানা গুনতে লাগলো। একটু পর চোখ খুলে তসবীটি রেখে দিয়ে সুলতানের মুখের দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে রইলো।

'মহামান্য সুলতান! আগে যা দেখেছি এখনো তাই দেখতে পাচ্ছি'–দরবেশ বললো– দুশমন ঘরে বসেই আঘাত করেছে। এই মহল এলাকার কোথাও না কোথাও কালো বিড়ালের মাথা দাফন করা আছে। কোথায় আছে তা আমি বলতে পারবো না এখন। পরে আপনাকে তা বের করে দেখাবো। এখন কাজ হলো, এর প্রতিক্রিয়া দ্রুত দূর করা। যাতে আগের মতো আপনার মাথা আবার কাজ শুরু করে।'

'এ চিকিৎসা আপনি কিভাবে করবেন? আমারও কিছু করতে হবে?'–সুলতান জিজ্ঞেস করলেন।

'কিছু নফল নামাযের ওযীফা ও নামাযের পর পাঠ করার কিছু দুআ দেবো আপনাকে, আর বাকী কাজ আমি করবো। সাত দিন পর আপনি আবার তাজা হয়ে উঠবেন।'

'আচ্ছা! আপনার কাছে এমন কোন ওযীফা বা আমল আছে যা করার পর শক্তিশালী দুশমনও দূর হয়ে যাবে'–সুলতান জিজ্ঞেস করলেন।

'অনেক কিছুই হতে পারে। কিন্তু সব তো আর একবারে হবে না। আগে আপনাকে সুস্থ সবল করতে হবে। তারপর অন্য কাজও করা যাবে।'

সুলতান নিজেকে সম্পূর্ণরূপে এই দরবেশের কাছে সঁপে দিলো।

'মহামান্য সুলতান!'–দরবেশ বললো– 'আমি দেখতে পাচ্ছি, হাসান ইবনে সবা আপনার ওপর যে জাদু চালিয়েছে তা উল্টো তার ওপর গিয়ে পড়বে। নিশ্চিতভাবে বলতে না পারলেও অনুমানে বলছি, এতে হাসান ইবনে সবা এর উল্টো প্রতিক্রিয়া সহ্য করতে পারবে না। মরে যাবে। আর সে মরে গেলে তো বাতিনীরাই খতম হয়ে যাবে। আপনাকে আমি বাদামের সাতটি দানা ও সাতটি খেজুর দেবো। প্রতিদিন ফজরের পর আপনি খালি পেটে একটি করে বাদামের দানা খাবেন এবং রাতে শোয়ার আগে একটি করে খেজুর খাবেন। মনে রাখবেন। বাদামের দানা ও খেজুর অনেকক্ষণ চাবিয়ে মুখের লালার সঙ্গে মিশিয়ে তারপর গিলতে হবে। এই সাত দিনে আপনার কষ্ট কিছুটা বেড়ে যেতে পারে। এতে পেরেশান হবেন না। অষ্টম দিনে খাট থেকে লাফিয়ে উঠবেন এবং সদ্য যুবকের মতো শরীরে চাঙ্গাভাব অনুভব করবেন।'

দরবেশ তার থলে থেকে সাতটি বাদামের দানা ও খেজুর বের করে সুলতানের হাতে দিলো।

'এটা আলাদা করে রাখবেন'–দরবেশ বললো–'আমি পড়ে দিয়েছি এগুলো। গত রাতে এজন্য ঘুমাইনি পর্যন্ত।'

দরবেশ তার মতো আরো অনেক কথা বললো। তার কথা শুনে সুলতানের চোখে মুখে মাঝে মধ্যে আশার ঝলক চমকে উঠতে দেখা গেলো। তার মলিন চেহারাও উজ্জল হয়ে উঠলো। কথায় কথায় সুলতান মালিক শাহ্ দরবেশের ব্যক্তিগত পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। এর উত্তরে দরবেশ বরকিয়ারককে যা বলেছিলো সুলতানকেও তা বললো।

'মহামান্য সুলতান!' দরবেশ বললো– 'আমার মাথার ওপর এখন একটা বোঝাই আছে। এটা নামাতে পারলে বাকী জীবন কাবার চত্বরে কাটিয়ে দেবো। আমার ছোট একটি বোন আছে। সত্যিকারের একজন মর্দে মুমিনের হাতে তাকে সোপর্দ করতে চাই।'

'আপনার বোন কোথায়?'–সুলতান জিজ্ঞেস করলেন।

'ওকে আমার সাথেই নিয়ে এসেছি। একলা ছাড়ার সাহস হয় না'।

'মুহতারাম আব্বাজান!'– বর্‌কিয়াক সলজ্জ মুখে বললো– 'আমি উনার বোনকে দেখেছি। ঘটনাক্রমে তার সঙ্গে কথাও হয়েছে। আমার এতে মনে হয়েছে উনার বোন শুধু সুন্দরীই নয়, বেশ বুদ্ধিমতী ও দূরদর্শীও। আপনি অনুমতি দিলে উনার বোনকে বিয়ে....'

'নিয়ে আসুন ঐ মেয়েকে'–সুলতান দরবেশকে বললেন।

মেয়েকে নিয়ে আসলো বরকিয়ারকের মা। দরবেশ সুলতানের মনে এতই প্রভাব বিস্তার করেছে যে, তিনি আর এর চেয়ে বেশি ভাবনার প্রয়োজন বোধ করলেন না। মেয়েকে প্রথামতে দু' একটি কথা জিজ্ঞেস করলেন। মেয়েটিও জবাব দিলো বিচক্ষণতা নিয়ে।

'বরকিয়ারক!'–সুলতান এমনভাবে বললেন যেন কোন শাহী ফরমান জারী করছেন–এই মেয়ের সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে।'

বরকিয়ারকের মাও মেয়ের রূপ দেখে তার প্রতি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তিনিও স্বামীর মতকে সাদরে সমর্থন করলেন।

'না সুলতানে মুহতারাম!' –দরবেশ হাতজোড় করে বললো– 'আমি এত উপরে উঠার যোগ্য না। আরেকটু ভেবে চিন্তে ফয়সালা করুন। এমন যেন না হয় যে, শাহী মহলে আমার বোনকে এই বলে খোটা দেয়া হবে–সে ঘর ও ঠিকানাবিহীন এক দরবেশের বোন।'

'আমি আমার ফয়সালা শুনিয়ে দিয়েছি। এটা ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ (স) এর প্রতি আত্মপ্রেমীদের খান্দান। মেয়েদেরকে এখানে চোখের পাপড়িতে বসিয়ে রাখা হয়। আপনি যে আশংকা প্রকাশ করেছেন এই চারদেয়ালের ভেতর তা পাপ মনে করা হয়।'

'মুহতারাম সুলতান'–বরকিয়ারকের মা বললেন– 'আগে আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন। তারপর এই মেয়ের সাথে বরকিয়ারকের শাদীর ইন্তেজাম করা যাবে।'

বরকিয়ারকের মার চেহারায় আজ অনেক দিন পর হাসি দেখা দিলো। কারণ সুলতানের চেহারায় আজ সতেজতার আভা দেখা দিয়েছে। এজন্য তিনি দরবেশের

প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাকে উপঢৌকন দেয়ারও আশ্বাস দিলেন। কিন্তু দরবেশ তাকে এই বলে থামিয়ে দিলো যে, সে কারো পুরস্কারের আশায় এখানে আসেনি। একজন সাচ্চা মুসলমানের খেদমত করতে এসেছে।

একটু পর দরবেশ রুজিনাকে নিয়ে বের হয়ে গেলো।

★★★★

সুলতান মালিক শাহর প্রতিদিনের এই রুটিন দাঁড়িয়ে গেছে, তিনি ভোরে উঠে প্রথমে একটা বাদামের দানা মুখে দিয়ে চাবাতে থাকেন। এরপর নামায ওযীফা আদায় করেন। এশার নামাযের পরও কিছু ওযীফা আদায় করে একটা খেজুর মুখে দিয়ে চাবাতে থাকেন। তারপর ঘুমুতে যান।

আর বরকিয়ারক এখন প্রতিদিন দু' তিনবার রুজিনার কাছে যায়। এখন আর তাদের সরাইখানার পেছনের বাগানে যেতে হয় না। বরকিয়ারককে দেখলেই দরবেশ কামরা থেকে বের হয়ে যায়। রুজিনা তখন তার রূপের মায়ায় বরকিয়ারককে মাতিয়ে তোলে আর বরকিয়ারক ভিখারীর মতো রুজিনার মধ্যে হারিয়ে যায়।

দরবেশ প্রতিদিনই সুলতানের কাছে গিয়ে বসে বিড় বিড় করে দুআ দরূদ পড়ে। সুলতানের চোখে ফুঁক মারে। তারপর গম্ভীর সুরে এটা ওটা বলে চলে আসে।

ছয় দিনের দিন সুলতান হঠাৎ তার বুকে কেমন অসহ্য অস্থিরতা অনুভব করলেন। সুলতান দরবেশকে ডেকে আনতে নির্দেশ দিলেন। দরবেশ আসতে তার এই অস্থিরতা বেড়ে মাথায় গিয়ে পৌঁছে।

'এমন হওয়ারই কথা ছিলো'–দরবেশ এসে সুলতানকে বললো– 'মুখ বুজে এ কষ্টটা সহ্য করে যান। কাল এ সময় কষ্ট কমতে থাকবে। তারপর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবেন।'

সেদিন দিনে রাতে সুলতান ঘুমুতে পারলেন না। পরদিন সকালে তিনি অনুভব করলেন তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, দরবেশকে আবার ডাকা হলো। দরবেশ এসে গতকালের মতোই সান্ত্বনা দিলো এবং আনন্দ প্রকাশ করলো যে, তার চিকিৎসা সফল হওয়ার প্রমাণ এটা।

পরদিন ভোরে উঠে সুলতান বাদামের শেষ দানাটি মুখে পুড়লেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি ছট্ ফট্ করে কাটালেন। সুলতান দরবেশকে নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়ে বললেন, আজ রাতে যেন দরবেশ তার এখানে কাটায়। তিনি আর এ কষ্ট সহ্য করতে পারছেন না।

মুযাম্মিল আফেন্দী সুলতানকে দেখছে না অনেক দিন ধরে। তাকে বলা হচ্ছে, ডাক্তার ও এক দরবেশ চিকিৎসক কঠিন নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে সুলতানের কাছে কোন সাক্ষাতপ্রার্থী আসতে পারবে না। বরকিয়ারকের সাথে তার প্রায়ই দেখা হয়। বরকিয়ারক প্রায়ই সুলতানের অবস্থা কি দরবেশ কি বলেছে তা তাকে বলেছে।

সেদিন সুলতানের অবস্থা বেশি নাজুক শুনে মুযাম্মিল আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলো না। সন্ধ্যার দিকে অস্থির হয়ে মুযাম্মিল সুলতানের মহলের দিকে ছুটে গেলো।

বরকিয়ারককে বললো, সে সুলতানকে দেখতে চায়। তার ব্যাকুলতা দেখে বরকিয়ারক আর না করতে পারলো না। মুযাম্মিলকে সুলতানের কামরায় নিয়ে গেলো।

মুযাম্মিল সুলতানের কামরায় ঢুকে দেখলো, সুলতান খাটের ওপর হাত পা ছেড়ে পড়ে আছেন। মরা লাশের মতো তার চেহারা রক্তশূন্য। মুযাম্মিলের ভেতর কে যেন অশনি সংকেত বাজিয়ে দিলো। সুলতানের পাশে বসে থাকতে দেখলো দরবেশকে। দরবেশের চেহারার ওপর মুযাম্মিলের চোখ পড়লো এবং মুযাম্মিল একটা চরম ধাক্কা খেলো। তার পা কেঁপে উঠলো। দরবেশের চোখের নিচে মটর দানার মতো কালো তিলটা যেন মুযাম্মিলকে ভেংচি কাটছে।

মুযাম্মিলের সঙ্গে এর ঘোড়দৌড়ের ময়দানে দেখা হয়েছিলো। এটা মনে হতেই মুযাম্মিলের মাথায় বিদ্যুৎ চমকে উঠলো এবং নিমিষের মধ্যেই তার সব মনে পড়লো। এই তিলওয়ালা লোকটা তো যুবক ছিলো। তার দাঁড়ি ছিলো কুচকুচে কালো, ছোট ছোট করে ছাটা। চুলও ছিলো কদম ছাট। এখন তার চুল ও দাড়ি এত লম্বা ও কাঁচা পাকা কেন? আচমকা মুযাম্মিলের মনে পড়লো এই তিলওয়ালার সঙ্গেই সে খালজান থেকে আলমোত গিয়েছিলো। আরে এ তো হাসান ইবনে সবার লোক।

মুযাম্মিলের খুপড়ির ভেতর হাতুড়ি পেটা শুরু হলো। সে কোন কিছু না ভেবেই দরবেশের কাঁচা পাকা লম্বা দাড়ি ধরে টান দিলো। পুরো দাড়ি মুযাম্মিলের হাতে চলে এলো। দরবেশের মুখে কালো ও ছোট করে ছাটা দাঁড়ি রয়ে গেলো। কামরার সবাই মুযাম্মিল আর দরবেশকে হতভম্ব হয়ে দেখছে। মুযাম্মিল এবার দরবেশের পাগড়িটি মাথা থেকে খুলে তার ঘাড় অবধি লম্বা চুল ধরে টান দিলো। এই চুলও উঠে এলো। সুলতান আঁতকে উঠলেন। বরকিয়ারক এক ঝটকায় দাঁড়িয়ে গেলো।

'সুলতানে মুহতারাম!'–মুযাম্মিল হাহা করে বলে উঠলো–'এই লোক তো আপনার বাদামে ও খেজুরের মধ্যে বিষ ভরে বিষ পান করিয়েছে। এখনই ডাক্তারকে ডাকুন।'

এক পাশের দেয়ালে কারুকাজ খচিত সুলতানের তলোয়ারটি ঝুলছিলো। মুযাম্মিল তলোয়ারটি নিয়ে কোষমুক্ত করে তলোয়ারের অগ্রভাগ দরবেশের শাহরগে রেখে বললো– 'সত্য বল্ তুই কে? তোর সঙ্গের মেয়েটি কে? সে তো তোর বোন নয় তোরা হাসান ইবনে সবার পাঠানো লোক।'

'দোস্ত'!–দরবেশ হাসিমুখে এবং নির্ভয়ে বললো– 'আমি আমার কাজ করে ফেলেছি। এখন তুমি আমাকে কতল করতে পারো। তবে আমার সঙ্গের মেয়েটিকে অপরাধী ভেবো না। সে আমার গোপন জীবন সম্পর্কে কিছুই জানে না। আমি সুলতানের হত্যাকারী। এজন্য সুলতানের কাছে এ অনুরোধ করতে পারবো না যে, আমার অপরাধে আমার বোনকে শাস্তি দেবেন না।'

'হায় যালিম মানুষ!'–সুলতান বড় করুণ মুখে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন– 'তুমি যদি এই বিষের ক্রিয়া আমার দেহ থেকে নামিয়ে দিতে পারো তোমাকে ক্ষমা করে সসম্মানে এখান থেকে বিদায় করবো। তোমার বোনের বিয়ে দেবো আমার ছেলের সঙ্গে আর তুমি যে পুরস্কারই চাইবে তাই তোমাকে দেবো।'

'হায় দুর্ভাগা সুলতান!'–ছদ্মবেশী লোকটি বললো– 'এই বিষের কোন প্রতিষেধক নেই। আমার মৃত্যুর জন্য আমি মোটেও চিন্তিত নই। পুরস্কার দিয়ে কি করবো আমি। আমি হাসান ইবনে সবার ফেদায়েন। আমার জন্য এই পুরস্কারই যথেষ্ট যে, আমি ইমামের সন্তুষ্টি অর্জন করেছি। আমি সোজা জান্নাতে যাচ্ছি। ইমাম যে কাজের জন্য আমাকে পাঠিয়েছিলেন তা তো আমি করে ফেলেছি।'

ডাক্তার এসেই সুলতানের নাড়ী পরীক্ষা করে সুলতানকে ঔষধ খাওয়ালেন। কিন্তু ডাক্তারের মুখে যে হতাশা ফুটে উঠলো সেটা তিনি লুকোতে পারলেন না।

বরকিয়ারকের মা এসব জানতে পেরে চিৎকার করতে করতে সুলতানের কামরায় এলেন। পেছন পেছন রুজিনা, মুহম্মদ ও সাঞ্জারও এলো। মুহাম্মদ ও সাঞ্জার কি বলবে কি করবে বুঝতে পারছিলো না। দিশাহারা চোখে একবার সুলতানের দিকে আরেকবার দরবেশের দিকে তাকাতে লাগলো।

'সুলতানে মুহতারাম!'–মুযাম্মিল আফেন্দী বললো– 'ওকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। নিজ হাতে ওকে আমি হত্যা করবো।'

'ওকে নিয়ে যাও'–সুলতান কম্পিত কণ্ঠে বললেন– 'ওকে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে ওর ওপর রক্তচোষা কুকুর ছেড়ে দাও আর আরেকটি কবর খুড়ে ওর বোনকে জীবন্ত দাফন করে দাও।'

রুজিনা চরম আতংকিত চোখে বরকিয়ারকের দিকে তাকালো। বরকিয়ারক রুজিনাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বললো–

'না, নিরপরাধীর কোন শাস্তি নেই।'

'বেওকুফ হয়ো না বরকিয়ারক! যাকে তুমি বাঁচাতে চাচ্ছো সে এক নাগিনা' –মুযাম্মিল ধমকে উঠলো।

'খবরদার!'–বরকিয়ারক গর্জে উঠলো–'এই মেয়ের কাছে আসবে না কেউ। আর সবাই শুনে নাও, সুলতান জীবিত না থাকলে আমিই সুলতান হবো। এখন আমার হুকুম চলবে'–সে হাসান ইবনে সবার ফেদায়েনের দিকে ইংগিত করে বললো– 'সুলতানে মুআজ্জম যেভাবে হুকুম দিয়েছেন ওকে সেভাবে শেষ করে দাও।'

এই হাঙ্গামার মধ্যেই সুলতানের সমস্ত দেহ একবার কেঁপে উঠলো এবং তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

৪

বরকিয়ারক সুলতান হয়ে হুকুম জারী করলো, সুলতান মালিক শাহ মরহুম ঐ বাতিনীকে যেভাবে হত্যা করতে বলেছেন সেভাবে হত্যা করা হোক। আর কেউ ঐ বাতিনীর বোন রুজিনার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারবে না। তার সঙ্গে সুলতান বরকিয়ারকের বিয়ে হবে এবং কেউ যেন না জানে, সুলতানকে এক বাতিনী বিষ দিয়ে মেরেছে। সবাইকে বলা হবে দীর্ঘ অসুস্থতার পর সুলতান মারা গেছেন।'

প্রত্যেকটা হুকুম পালন করা তো সহজই ছিলো। কিন্তু মৃত্যুর আসল কারণ গোপন রাখা তো অসম্ভব ব্যাপার। কারণ সুলতান মালিক শাহ্ গতানুগতিক ধারার সুলতান হলে তার মৃত্যুর খবর শুনে লোকেরা এই বলে চিন্তামুক্ত হয়ে যেতো যে, আজ এক সুলতান মরেছে কাল আরেক সুলতান এসে যাবে। সুলতান মালিক শাহ্ তো নেযামুল মুলকের মতো জনগণের সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিলেন। প্রজাদের সঙ্গে তিনি সুলতান নয় একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে মিশতেন। তাছাড়া তিনি ইসলাম ও মুসলমানকে ঐ বাতিনীদের অশুভ ঝড়ের কবল থেকে রক্ষার জন্য যে অক্লান্ত সাধনা করেছেন তা তো এই দেশের জনসাধারণের কাছে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো ইতিহাস। সাধারণ মানুষরা তো বটেই দেশের ছোট ছোট বাচ্চারাও তার নাম নিতো পরম ভালোবাসা নিয়ে।

সুলতান মালিক শাহ্ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পর তার ঘরে যে বিলাপ উঠলো তা জঙ্গলের আগুনের মতো দেখতে দেখতে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়লো। তুফানের মতো খণ্ড খণ্ড মিছিলের আকারে লোকেরা শাহী মহলে ভেঙ্গে পড়লো। মহলের ফটকের প্রহরীরা লোকেদেরকে বাঁধা দেবে কি নিজেরাই কাঁদছিলো বুক চাপড়িয়ে। মহিলারা এই বলে চিৎকার করছিলো– ঐ বাতিনী কাফের সুলতানকে বিষ দিয়েছে। এ অবস্থায় তার মৃত্যুর কারণ গোপন রাখা দুরূহ হয়ে পড়লো।

তারপর বরকিয়ারকের হুকুমে সালতানাতের প্রতিটি প্রাদেশিক শহরে এই ঘোষণা দিয়ে পয়গাম পাঠিয়ে দেয়া হলো, সুলতান ইন্তিকাল করেছেন, কাল দুপুরে মারুতে ঘোড়দৌড়ের ময়দানে তার জানাযার নামায পড়ানো হবে। আর জানাযার পর এক বাতিনীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।

এতে অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগলো এক বাতিনীকে কেন এমন প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে?

সুলতান মালিক শাহর সরকারী আমলা, কর্মকর্তা, কর্মচারী, শাহী খান্দানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা আমীর উমারার সংখ্যা কম ছিলো না। তারা প্রত্যেকেই সুলতানের মৃত্যুর কারণ জেনে যায় অল্প সময়ের মধ্যেই।

পরদিন যোহরের নামাযের পর সুলতানের জানাযা অনুষ্ঠিত হলো। লক্ষাধিক মানুষ তার জানাযায় এলো। আরো লক্ষ লক্ষ মানুষ সারা দেশে তার গায়েবানা জানাযা আদায় করলো। তাকে দাফন করার পর সুলতানের হত্যাকারী ঐ বাতিনীকে ঘোড়দৌড়ের ময়দানে আনা হলো।

সুলতানের কথামতো একটি গর্তে বাতিনীর কোমর পর্যন্ত পুঁতে ফেলা হলো। চার সিপাহী এক দিক থেকে নিয়ে এলো চারটি বিশাল হিংস্র কুকুর। কুকুরগুলোর বাঁধ খুলতেই চারটি কুকুরই এক সঙ্গে সেই বাতিনীর ওপর হামলে পড়লো। আকাশ কাঁপানো বাতিনীর একটি চিৎকার কেবল শোনা গেলো–'হাসান ইবনে সবা জিন্দাবাদ'। এরপর লক্ষাধিক দর্শক দেখলো, যেখানে ঐ বাতিনীকে পুঁতা হয়েছিলো সেখানে শত শত গোশতের টুকরো নিয়ে কুকুর চারটি কামড়াকামড়ি করছে।

এই বাতিনীকে কেন এত নির্মম শাস্তি দেয় হলো লোকদেরকে তা বলা হলো না। কিন্তু সবার মধ্যে এটা ছড়িয়ে পড়লো যে, এই বাতিনীই সুলতান মালিক শাহকে বিষ দিয়ে মেরেছে। দর্শকদের মধ্য থেকে মাঝে মধ্যে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে শ্লোগান উঠলো, এই পাষণ্ডের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দাও। এর বংশের সবগুলোকে কুকুরের খাবারে পরিণত করো।

কিন্তু তার ঘর কোথায় বা সে কোথায় থাকতো তা কেউ জানতো না। তার বোন রুজিনারই শুধু এর উত্তর জানার কথা। রুজিনা তখন সুলতানের মহলের একটি কামরায়। শাহী খান্দানের কেউ রুজিনাকে মেনে নিতে পারছিলো না। কারণ সে সুলতানের হত্যাকারীর বোন। এতে তার হাত আছে একথা ভাবাও স্বাভাবিক। তবে বরকিয়ারকের কারণে কেউ কিছু বলতে পারছিলো না। বরকিয়ারক সেদিনই ঘোষণা করে দিয়েছিলো, রুজিনাকে সে যে কোন মূল্যে বিয়ে করবে।

বরকিয়ারকের মা সেদিনই সন্ধ্যায় শোক-দগ্ধ মুখে একলা রুজিনার কামরায় চলে এলেন। রুজিনা তাকে দেখে মাথা নিচু করে দাঁড়ালো।

'বসো বসো'–বরকিয়ারকের মা খাটের এক পাশে বসতে বসতে বললেন– 'তোমার সাথে আমি কিছু কথা বলতে এসেছি। দেখো, তোমাকে আমার ছেলেই পছন্দ করেনি, বরং সুলতানে মরহুম ও আমিও তোমাকে পছন্দ করেছিলাম এবং ঠিক করা হয়েছিলো বরকিয়ারকের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে। কিন্তু যা হয়েছে তা তোমার সামনেই হয়েছে। আমি কি করে এমন লোকের বোনকে আমার ছেলের বৌ করবো, যে শুধু আমাকেই নয় সুলতানের আরো দু'জন স্ত্রীকে বিধবা করেছে! লোকদেরকে জিজ্ঞেস করো, তারা বলবে, সালতানাতে সেলজুকিরা বিধবা হয়ে গেছে। তোমাকে আমি কোন শাস্তির কথা শোনাতে আসিনি। তোমার সাথে আমি একটি ভালো কাজ করতে চাই। তুমি কোথায় যাবে বলো। কয়েকজন মুহাফিজ দিয়ে তোমাকে সেখানে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবো।'

'আম্মীজান'–রুজিনা বেদনায় ভেঙ্গে যাওয়া কণ্ঠে বললো– 'আপনারা আমাকে ঘাড় ধাক্কা দেয়ার আগে আমি একটা কথা শুনতে চাই। শাহজাদা বরকিয়ারক যখন আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলো আমি তা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলাম, আমি শাহী খান্দানের উপযুক্ত নই। কিন্তু তিনি আমাকে এখানে আসার জন্য বাধ্য করলেন। তবুও আমি আসতে রাজী ছিলাম না। কিন্তু আমার ভাই এখানে আসলে আমাকেও নিয়ে আসেন। কারণ তিনি আমাকে একা সরাইখানায় রেখে আসতে ভয় পাচ্ছিলেন....।

'পরে সুলতানে মারহুম ও আপনি আমাকে মেনে নিলে আমি খামোশ হয়ে যাই। এরপর যে ভয়াবহ ও বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটলো এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি নিজেকে এত সম্মানের পাত্রী মনে করি না যা আপনি আমাকে দিতে চাচ্ছেন। আমার অনুরোধ আমাকে আমার ভাইয়ের মতোই মৃত্যুদণ্ড দেন। আমি সুলতানের হত্যাকারীর বোন, করুণা প্রার্থনা করার যোগ্য নই আমি।'

'তোমার ভাইয়ের সুলতানকে বিষ দেয়ার কথা কি তুমি জানতে না?'

'না না'–রুজিনা প্রায় কেঁদে ফেললো– 'আমি জানলে বরকিয়ারককে কখনো ইয়াতীম হতে দিতাম না। বরকিয়ারকই প্রথম যুবক যাকে আমি অন্তর থেকে চেয়েছি।

বরকিয়ারক এর চেয়েও বেশি ভালোবাসে আমাকে। যা হোক আমি বরকিয়ারকের স্ত্রী হতে চাই না। আমার ভাইয়ের অপরাধ সম্পর্কে আমি জানতাম কি না সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু এই সত্য তো আর পাল্টানো যাবে না যে, আমি সুলতানের হন্তারকের বোন। আমার মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত।'

'আচ্ছা, তোমরা এসেছো কোত্থেকে? তোমার ভাই বাতিনী ছিলো এটা কি তুমি জানতে না?'

'আম্মীজান! আমাদের কোন ঠিকানা থাকলে তো বলতামই আমরা কোত্থেকে এসেছি। ভাইজান বলতো, আমরা ইস্পাহানের লোক। শৈশবে বাপ মারা যাওয়ার পর ভাইজানই মানুষ করেছে আমাকে। তাকে আমি যাযাবরই দেখেছি। ছোট একটা কারবার ছিলো তার। এতে আমাদের দু'বেলার রুটি ও সফরের খরচ হয়ে যেতো। এক এক শহর বা গ্রামে আমরা এক দেড়বছর করে থাকতাম। ঐ সময় ভাইজান আমাকে চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি করে রাখতো। তাই কাদের সঙ্গে তার উঠাবসা ছিলো কখনো জানতে পারিনি আমি। প্রত্যেক বছরই ভাইজান হজ্জে যাওয়ার নিয়ত করতো। আমার জন্য যেতে পারতো না।'

কথা বলার সময় রুজিনার চোখ পানিতে ভরে যাচ্ছিলো আর সে চোখ মুছছিলো।

'আমার ছেলে ফয়সালা শুনিয়ে দিয়েছে সে তোমাকে বিয়ে করবে'–সুলতানের বিধবা স্ত্রী বললেন– 'সে এখন আমার তো নয়ই কারো কথাই মানবে না। তুমি কি ওকে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে?'

'আমি তো প্রত্যাখ্যানই করছি'–রুজিনা চোখ মুছতে মুছতে বললো– 'আমি যে মৃত্যুদণ্ড চাচ্ছি এর একটা কারণ হলো আমি হত্যাকারীর বোন। তারপর এখন আর আমার আর কোন আশ্রয় নেই। আমার একমাত্র আশ্রয় হলো কবর। আপনার কাছে মিনতি করছি, আমাকে আপনি কবরে নামিয়ে দিন'।

বরকিয়ারকের মা রুজিনার এই কান্নাসিক্ত মুখে বারবার নিজ থেকে মৃত্যুদন্ড চাওয়ায় এতই প্রভাবান্বিত হলেন যে, তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন, এই মেয়ে যাতে কোন ভুল লোকের হাতে না পরে তাই তাকে একা ছাড়া যাবে না।

'রুজিনা! তোমাকে আমি আমার ঘর থেকে বের করে দিতে চাই না। তোমাকে যদি অন্য কারো কাছে বিয়ে দিয়ে দেই তুমি মেনে নেবে তা?'–বরকিয়ারকের মা জিজ্ঞেস করলেন।

'এখন আমি কিছুই বলতে পারবো না। আমার মনমস্তিষ্কে একটা কথাই ঘুরছে, আমার বেঁচে থাকার অধিকার নেই।'

'আমি তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। তুমি আগে ভেবে দেখো। তারপর আমাকে বলো। আমি তোমার জন্য ভালো কিছুর ব্যবস্থাই করবো।'

'আম্মীজান! আপনি এক কাজ করুন' বরকিয়ারকের মন থেকে আমাকে বের করে দিন। ওকে আপনি রাজী করুন আমাকে যেন ছেড়ে দেয়। তিনি সুলতান হিসেবে হুকুম দিয়েছেন, তার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। এই হুকুম আমার ভালো লাগেনি। মাকে সন্তানের হুকুম দেয়া পাপ। এই পাপে আমি শরীক হতে চাই না।'

বরকিয়ারকের মা চিন্তায় ডুবে গেলেন। এ সময় কামরার দরজায় এসে দাঁড়ালো বরকিয়ারক। তার মুখের ভাব বলে দিচ্ছে, তার মার এই কামরায় আসাটা তার ভালো লাগছে না। 'মা!'-সুলতান বরকিয়ারক তার মাকে বললেন- 'আপনাকে সম্মান করা আমার ওপর ফরজ। কিন্তু এটা জিজ্ঞেস করার অধিকার আমার আছে যে আপনি কেন এখানে এসেছেন? আমার মনে হয় আপনি বলতে এসেছেন সে এক খুনীর বোন। এজন্য তাকে বিশ্বাস করা যাবে না।'

'বরকিয়ারক!'-রুজিনা বললো এবং একটু থেমে আবার বললো- 'মাফ করবেন। আপনাকে বরকিয়ারক নয় সুলতানে মুহতারাম বলা উচিত আম্মীজান যা বলেছেন এবং আমি তাকে যা বলেছি হুবহু সব আমি আপনাকে শুনাচ্ছি।'

বরকিয়ারকের মা ও তার মধ্যে এতক্ষণ যে কথা হয়েছে তার সব সে বলে গেলো।

'আমি যে ফয়সালা করেছি তা তোমাকে মানতে হবে'-বরকিয়ারক বললো- 'অবশ্য তোমাকে জোর করে আমার স্ত্রী বানাবো না। এটা আমার অন্তরের আওয়াজ।'

'এক অন্তরের আওয়াজ আরেক অন্তরই শুনতে পারে সুলতানে মুহতারাম!' -রুজিনা বললো- 'আমার অন্তর তো মরে গেছে। আমার ভাই সুলতানকেই বিষ দেয়নি আমার অন্তরকেও বিষ দিয়ে মেরে ফেলেছে। আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই। আপনার কাছে হাতজোড় করছি আমাকে চলে যেতে দিন।'

'প্রিয় বেটা আমার!'-বরকিয়ারকের মা বলে উঠলেন- 'তুমি তো মাত্র নওজোয়ান। আমার বয়স দেখো। আমি দুনিয়ার অনেক কিছুই দেখেছি। অসংখ্য মানুষকে পড়েছি। তোমাকে আমি এই বিয়ের অনুমতি দিতে পারতাম। কিন্তু যা হয়েছে সব তো তোমার সামনেই হয়েছে।'

'আচ্ছা রুজিনা!'-বরকিয়ারক বললো-'আম্মীজানকে তুমি বলেছো, তোমার ভাই বাতিনী কি করে হয়েছে তা তুমি জানো না। সে মরার আগে হাসান ইবনে সবার নামে শ্লোগান দিয়েছিলো। এতে বুঝা যায় সে হাসান ইবনে সবার ফেদায়েন ছিলো। কি করে সে ফেদায়েন হলো তা কি জানো তুমি?'

'আমি কিছুই জানি না। সে আমাকে আলমোত নিয়ে গিয়ে সাত আট মাস রাখে। আমাকে একটি ঘরের চার দেয়ালের ভেতর বন্ধ করে রেখে সে বাইরে চলে যেতো, আপনাদের কাছেই শুনছি সে বাতিনী ও ফেদায়েন ছিলো। প্রায়ই সে বলতো, রুজিনা! আল্লাহ যেন তোমাকে কোন ভালো মানুষের হাতে সোপর্দ করেন তাহলেই আমি হজ্জ করতে পারবো।'

'মা!'-বরকিয়ারক বললো- 'আজই তো আমরা আমাদের প্রিয় আব্বাজানকে দাফন করে এলাম। সবাই এখন শোকতপ্ত। আরো কিছু দিন যাক। এই মেয়েকে এখানে থাকতে দিন। আপনার অনুমতি ছাড়া কিছু করবো না আমি।'

'সুলতানে মুহতারাম!'-রুজিনা বললো- 'আপনি বলেছিলেন, আমার এই গুণটা আপনার খুব পছন্দ হয়েছে যে, আমার মনে যা আসে তা আমি বলে ফেলি। ... আমি সত্য বলি সত্য শুনি তা যতই তিক্ত হোক। আমি তো আপনার আব্বাজানকে ফিরিয়ে

দিতে পারবো না। তাই আমি আমার প্রাণ দিয়ে যেতে চাই। এতে হয়তো আপনার, আপনার আম্মীজানের এবং শাহী খান্দানের অন্যরাও কিছুটা সান্ত্বনা পাবেন। আম্মীজানকে বলেছি আমি, আমি বেঁচে থাকলেও কার জন্য বেঁচে থাকবো?'

'আমার জন্য। আমি যে ফয়সালা করেছি তার ওপরই আমি বহাল থাকবো। তবে আম্মীজানের অনুমতির জন্য কিছু দিন অপেক্ষা করবো।'

★★★★

মারুসহ পুরো সেলজুকি সালতানাতে যখন শোকের কালো ছায়ায় সবকিছু স্তব্ধ। আলমোতে তখন চলছে উৎসব-আনন্দের ঢেউ। সুলতান মালিক শাহের খুনীকে যখন চারটি হিংস্র কুকুর দ্বারা নির্মমভাবে হত্যা করা হলো তখন এক গুপ্তচর মারু থেকে আলমোতের দিকে রওয়ানা দিলো।

'ইয়া ইমাম!'—সেই গুপ্তচর আলমোতে পৌঁছে হাসান ইবনে সবাকে বললো—'সবচেয়ে বড় দুশমন মরে গেছে। দাফনও হয়ে গেছে। তার গদিতে বসেছে তার বড় ছেলে বরকিয়ারক।'

'তার খুনীর কি হয়েছে?'—হাসান ইবনে সবা জিজ্ঞেস করলো।

'তার দেহের অর্ধেক মাটিতে পুঁতে কুকুর দিয়ে তাকে হত্যা করেছে।'

'তার সাথে একটি মেয়ে ছিলো। তার খবর জানো?'

'সুলতানের ঘরে। নতুন সুলতানকে সে আগেই তার জালে ফাসিয়েছিলো।'

'ঐ মেয়ে একা কিছু করতে পারবে?'

'এই প্রশ্নের উত্তর দুই তিনদিন পর আসবে। সুলতানের দাফনের পর তার খুনীর শাস্তি দেখেই আমি রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলাম।'

হাসান ইবনে সবা তার সঙ্গী-সহকারীদের ডেকে সব বললো, সুলতানের মৃত্যুর খবরে সবাই বিজয়ীর শ্লোগান দিয়ে উঠলো।

'দেখেছো তোমরা?'—লোকদেরকে বললো হাসান ইবনে সবা—'কিছুদিন আগে তোমাদেরকে বলেছিলাম, কোন গোত্রকে ধ্বংস করতে হলে প্রত্যেকেই হত্যা করার দরকার নেই। বরং গোত্র প্রধানের মাথা খারাপ করে দাও। তাকে চরম ভোগবিলাসে মজিয়ে দাও। আর এই নিশ্চয়তা দাও যে, তুমি অর্ধেক দুনিয়ার বাদশাহ। তোমার সমান দুনিয়ায় আর কেউ নেই। কোন চতুর সুন্দরী মেয়ের নেশায় তাকে পাগল করে তোলো। যত বড় ঋষি-বুযুর্গ হোক তোমার কথায় উঠবে নাচবে।' এমন কত খান্দানই দেখেছো তোমরা— যারা নারী ও সম্পদের পেছনে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। আর কোন সালতানাতকে ধ্বংস করতে চাইলে তার শাসককে ভালো পথ থেকে সরিয়ে দাও এবং তার অন্তর থেকে প্রজাদের ভালোবাসা বের করে দাও। তারপরও কাজ না হলে তাকে হত্যা করো।'

'ইয়া ইমাম!'—এক সহকারী বললো— 'এ কাজ তো হয়ে গেলো। এখন বলুন সামনের কাজ কি?'

'এ কাজ সেই মেয়ে করবে'–হাসান ইবনে সবা বললো– 'এই মেয়ে বড় ক্ষিপ্র। কাজ উদ্ধারের জন্য সবই করতে পারে সে। এই মেয়ের নির্বাচন আমি নিজে করেছি। এখন বিচক্ষণ একজন মারুতে গিয়ে রুজিনার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে আমাকে কে বলতে পারবে এই মেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং সে তার কাজে নিশ্চিত সফল হবে?'

'আমি ইমাম!'–এক লোক বললো– 'আমার তত্ত্বাবধানে ওর প্রশিক্ষণ হয়েছে। মারুতে ওর সাথে এক অভিজ্ঞ লোক ও দু'জন বৃদ্ধা মহিলা গিয়েছিলো।'

'তোমরা জানো মারুতে আমাদের কি করতে হবে। আমাদের ঐ ফেদায়েন সেখানকার জমি সমতল করে দিয়েছে। সে সেলজুকি সালতানাতের মাথা কেটে দিয়েছে। এখন তার অবশিষ্ট দেহ দু'ভাগে ভাগ করতে হবে।'

'হ্যাঁ ইমাম!'–আরেক লোক বললো– 'সালতানাতের রাজধানী মারুতে গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে দিতে হবে। এ কাজ রুজিনাই করতে পারবে।'

'মালিক শাহর বড় ছেলে বরকিয়ারক একজন যুবক। তার বিয়ে হয়নি এখনো। তার স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে জেনেছি আমি। একটি মোমের মতো মনে করতে পারো তাকে। রুজিনা ঠিক থাকলে এই মোম গলিয়ে সে নিজের মতো করে গড়ে নিতে পারবে'–হাসান ইবনে সবা বললো।

'ইয়া ইমাম!'–তার এক ·ঙ্গী বললো– 'একথা তো আগেও বলেছেন একবার যে, মালিক শাহের কতলের পর আমাদের কি করতে হবে। এটা আমাদের ওপর ছেড়ে দিন। দেখুন আপনার হুকুম পালিত হয় কি না!'

'তোমরা তো ভালো করেই জানো আমার হুকুম যারা পালন করতে পারে না তাদের কি পরিণতি হয়?'

★★★★

আলমোত থেকে কিছু দূরে যেসব কেল্লা আছে সেগুলো এখনো হাসান ইবনে সবার দখলে আসেনি। এত দিন সে ঐসব কেল্লার দিকে এগোয়নি সুলতান মালিক শাহের ফৌজ যে কোন সময় এসে পড়তে পারে এই ভয়ে।

ঐ সব কেল্লার মধ্যে কেল্লা মুলাযখান খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেল্লা। আগে এ কেল্লাটি লুটেরা ও ডাকাতদের দখলে ছিলো, কাফেলা লুট করে ডাকাতরা মালপত্র এখানে এনে জমা করতো ও ভাগবাটোয়ারা করতো। কাফেলায় যুবতী মেয়ে ও কমবয়সী ছেলেমেয়ে পেলে অপহরণ করে এখানে এনে বন্দি করতো।

ডাকাতদের ভয়ে এসব এলাকায় ব্যবসায়ী কাফেলার আসা যাওয়া কমে যায়। এর মন্দ প্রভাব পড়ে ব্যবসা বাণিজ্যের ওপর। সুলতান মালিক শাহ তখন যুবক বয়সের। ব্যবসায়ী ও সাধারণ কাফেলার ওপর ডাকাতদের এমন উৎপাতের কথা জানতে পেরে আফদুদ্দৌলা বিন বুয়া নামে এক জাদরেল সালারকে ফৌজ দিয়ে কেল্লা মুলায খান পাঠান। একদিন আফদুদ্দৌলা তার ফৌজ নিয়ে ঝড়ের বেগে এসে কেল্লা অবরোধ করেন।

কেল্লার প্রাচীরে সিঁড়িযুক্ত মই নিক্ষেপ করে ফৌজ ভেতরে ঢুকে পড়ে। একটি ডাকাতও জীবিত বের হতে পারেনি। যুবতী ও কমবয়সী ছেলেমেয়েদেরকে উদ্ধার করে রাজধানী মারুতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তারপর ওদেরকে যার যার পরিবারে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

সুলতান মালিক শাহ এই কেল্লা জায়গীর হিসেবে দান করেন মীর আনায নামক এক রঈসকে। আর কেল্লার আমীর রয়ে যান সালার আফদুদ্দৌলা বিন বুয়া। হাসান ইবনে সবা আলমোত দখলের কিছুদিন পর তার এক প্রতিনিধি দল এসে আমীরে কেল্লার কাছে এই কেল্লা কেনার প্রস্তাব দেয়। আমীরে কেল্লা তা প্রত্যাখ্যান করে জানিয়েদেন ভবিষ্যতে যেন এই কেল্লায় কোন বাতিনী ঢোকার দুঃসাহস না দেখায়।

কিছুদিনের মধ্যেই এই কেল্লা জমজমাট শহরে পরিণত হয়। হাসান ইবনে সবার দৃষ্টি সবসময় এই কেল্লার দিকে নিবদ্ধ থাকে। তবে হাবভাবে বুঝায় এই কেল্লার প্রতি তার কোন আগ্রহ নেই।

সুলতান মালিক শাহকে হত্যার পর হাসান ইবনে সবা তার বিশেষ শিষ্যদের বলে, কেল্লা মুলাযখান এখন আমাদের দখলে আসা উচিত।

আমীরে কেল্লা আফদুদ্দৌলা সেদিন তার বন্ধুদের নিয়ে বৈঠক করছেন। এমন সময় তাকে জানানো হলো এক শুভ্রকেশী বৃদ্ধ তার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছে। অত্যন্ত সজ্জন ও উদারপ্রাণ হিসেবে আফদুদ্দৌলার সুপরিচিতি রয়েছে সবার মধ্যে। বৃদ্ধকে না ডেকে তিনি নিজেই তাকে শুভেচ্ছা জানাতে চলে এলেন বাইরের ঘরে।

'আমীরে কেল্লা!'–বৃদ্ধ নিচু গলায় আফদুদ্দৌলাকে বললো– 'একা আপনাকে আমি কিছু বলতে চাই।'

তাকে অন্য কামরায় নিয়ে যাওয়া হলো।

'আমীরে কেল্লা!'–বৃদ্ধ বললো– 'আপনাকে আগেই আমি বলে রাখছি, আমি বাতিনী। এই কেল্লায় বাতিনীদের আসা তো নিষেধ।'

'তাহলে আপনি কি করে ঢুকলেন'–আফদুদ্দৌলা চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন– 'ফটকের সামনে কেউ জিজ্ঞেস করেনি যে আপনি কে?'

'জিজ্ঞেস করেছিলো। আমি মিথ্যা বলেছি যে আমি আহলে সুন্নত... আপনি জিজ্ঞেস করবেন আমি কেন মিথ্যা বললাম? আমার আকীদা যাই হোক আমি দুনিয়া বিমুখ একজন মানুষ। মানুষের প্রতি আমার সীমাহীন ভালোবাসা। খোদা আমাকে 'কাশফ'–গোপন বিষয় জানার শক্তি দিয়েছেন। এই কেল্লার প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই। কেল্লার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। 'কাশফ' থেকে এক ইশারা পেয়ে ঘোড়া দাঁড় করালাম। আমি পরিষ্কার ইংগিত পেলাম যে, কেল্লার ভেতর গুপ্তধন আছে। আমি তখনই বিশ্বাস করলাম এখানে গুপ্তধন থাকবেই। কারণ এই কেল্লা অনেক বছর ডাকাতদের কব্জায় ছিলো। যেখানে ডাকাত সেখানে গুপ্তধন থাকবেই।'

'আপনি আমাকে গুপ্তধনের সুসংবাদ দিতে এসেছেন?'–আফদুদ্দৌলা জিজ্ঞেস করলেন ব্যঙ্গ করে–'তারপর আপনি শর্ত দেবেন, আমি অর্ধেক সম্পদ আপনাকে দিলে আপনি গুপ্তধন বের করে দেবেন।'

'আগেই বলেছি আমি দুনিয়াবিমুখ লোক। অর্থ সম্পদ দিয়ে কি করবো আমি? গুপ্তধন কোথায় আছে বের করে দেবো আমি, তবে এই শর্তে নয় যে, অর্ধেক আমাকে দিতে হবে। কত হাজার হাজার মানুষের রক্ত ঝরিয়ে ডাকাতরা এই গুপ্তধন গড়ে তুলেছে। তাই এই গুপ্তধন না আমার না আপনার। আমি শর্ত দেবো, এই গুপ্তধনের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ আপনি নেবেন আর সব গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দেবেন'।

'ঠিক আছে মুহতারাম!'–আফদুদ্দৌলা বৃদ্ধের কথায় বেশ প্রভাবান্বিত হয়ে বললেন– 'আমি এই গুপ্তধন গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেবো। আচ্ছা বলতে পারেন কতখানি গুপ্তধন আছে?'

'এটা বলা মুশকিল। তবে বলা যায় অনেকখানিই হবে এই গুপ্তধন আরেকটা কথা, আপনারা আমাদের বাতিনীদের কাফের বলেন। আমি নিজেও অবশ্য আগে সন্দিহান ছিলাম। কিন্তু যখন আমার 'কাশফ' হতে শুরু করলো আমি বুঝে গেলাম যে, কাফের হলে খোদা আমাকে 'কাশফ' এর শক্তি দিতেন না। আজ যখন গুপ্তধনের ইংগিত পেলাম তখন একবার ভাবলাম গুপ্তধন দিয়ে আমার কী কাজ! পরে খেয়াল হলো, না, এই গুপ্তধন আল্লাহর বান্দাদের কাজে লাগা উচিত। আমি যেটা বলতে চাই তা হলো, একবার আমাদেরকে বাতিনীদের ব্যাপারে আপনার সাথে কথা বলতে দিন। এর অর্থ এই নয় যে, আপনি আমাদের আকীদা গ্রহণ করুন। আমি চাই আমাদেরকে আপনি শত্রু ভাবা ছেড়ে দিন।'

'আপনি কি আমাদের সাথে লোকজন নিয়ে বিতর্ক সভায় বসতে চান?'

'তর্ক-বিতর্ক নয়। বিতর্ক মানে তো পরস্পরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা না আমীরে কেল্লা এমন কোন ইচ্ছা আমার নেই। আমি চাই আমাদের ব্যাপারে আপনাদের ধারণা স্বচ্ছ হয়ে উঠুক'।

'গুপ্তধনের কথা কি এরপর বলবেন? না কি আমাকে বাতিনী বানানোর চেষ্টা করবেন?'

'না না। গুপ্তধনের কথা ভিন্ন। সেটা তো বলবোই আমি। আকীদার কথা যেটা বললাম তা তো আপনার কাছে অনুমতি চেয়েছি। আপনি অনুমতি না দিলে তো করার কিছু নেই। আল্লাহর বান্দাদের আমি ভালোবাসতে চাই।

'আচ্ছা বলুন তো আপনি কতজনকে আপনার সঙ্গে আনবেন'–আফদুদ্দৌলা জিজ্ঞেস করলেন।

'আমীরে কেল্লা! আমার সাথে সাধারণ কেউ আসবে না। কয়েকজন আলেম ও তাদের কিছু ছাত্র আসবে। ধর্মকর্ম ছাড়া তারা কিছুই বুঝে না। আপনি অনুমতি দিলে প্রায় চল্লিশজনের মতো আলেম ও তাদের ছাত্রদের নিয়ে আসবো আমি চাই উনারা এসে কেল্লাবাসীর সঙ্গে সালাম বিনিময় ও কুশল বিনিময় করে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হোক।'

'ঠিক আছে। কিন্তু এখানে এসে যেন বাতিনীদের তবলিগ শুরু না করে।'

'না, তা করবে না। কাউকে যদি তবলিগ করা অবস্থায় পাকড়াও করা হয় তাহলে আপনি যেমন শাস্তি দিতে চান দেবেন।'

'গুপ্তধনের কথা কি সেদিনই হবে?'–আফদুদ্দৌলা জিজ্ঞেস করলেন।

'না। আমি উলামায়ে কেরামের সাথে ফিরে যাবো। দু' চারদিন পর ফিরে আসবো। তখন আপনাকে নিয়ে গুপ্তধনের সন্ধান করবো এবং আপনার সামনে মাটি খুঁড়ে গুপ্তধন উদ্ধার করবো।'

আফদুদ্দৌলার মাথায় গুপ্তধন সওয়ার হয়ে গেলো। তাই তিনি বৃদ্ধকে একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিলেন। বৃদ্ধ সেদিন রাতে আফদুদ্দৌলার অতিথি হয়ে রইলো। পরদিন সকালে চলে গেলো।

সকালে বৃদ্ধকে বিদায় করে দিয়ে আফদুদ্দৌলা শহরের বড় মসজিদের খতীবকে ডেকে এনে বললেন, অমুকদিন বাতিনী উলামারা আসবেন। ওদের সঙ্গে 'বহছের' জন্য আপনি প্রস্তুতি নিন।

নির্দিষ্ট দিনে দুপুর বেলায় প্রায় চল্লিশ জন আলেমবেশী লোক এলো। সবার পরনে আলখেল্লা, মাথায় পাগড়ি ও রুমাল, হাতে তসবি। তাদের পোষাক ও চলাফেরা দেখে মনে হচ্ছিলো দ্বীন-ধর্ম ছাড়া তাদের আর কোন কিছুর প্রতি কৌতূহল নেই। আমীরে শহর আফদুদ্দৌলা তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করলেন।

বৃদ্ধ দুই চারজন আলেমকে নিয়ে আমীরে শহরের একটি কামরায় গিয়ে বসলো। আমীরে শহরকে বললো, আমরা এখানেই একলা কথা বলতে চাই।

'আমীরে কেল্লা!'–বৃদ্ধ বললো– 'আমরা আপনার সাথে কথা বলবো এবং আপনার কথা শুনবো। খতীব সাহেবকেও এখানে ডেকে আপনি ভালো করেছেন। আমাদের কথাবার্তা চলাকালে যারা আমাদের সঙ্গে এসেছেন তারা শহর ঘুরেফিরে দেখুক। আপনি একেবারে নিশ্চিন্ত থাকুন। এরা সরল লোক।'

আফদুদ্দৌলা একটু হেসে সায় দিলেন। কিছু বললেন না। তিনি জানেন এই কেল্লা বাতিনীদের থেকে নিরাপদ। আর এদেরকে ঢুকতে দিয়েছেন গুপ্তধনের কথা চিন্তা করে। এতটুকু ঝুঁকি নিতেই হবে। তারা কথাবার্তায় ডুবে গেলো। অন্য বাতিনীরা শহরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। পথচারী যারাই সামনে পড়লো তাদেরকে মাথা ঝুঁকিয়ে সালাম করলো। করমর্দন করলো। কারো কারো সাথে কোলাকুলিও করলো। লোকেরা তাদের নিছক আলেম বা মাদরাসার শিক্ষক ভেবে বেশ সম্মান করতে শুরু করলো।

একটু পর ওরা তিন চারটি দলে ভাগ হয়ে গেলো। আট নয়জনের একটা দল গেলো বড় ফটকের দিকে। ফটকের পাশে মুহাফিজদের একটা কামরা আছে। পাঁচ ছয় জন মুহাফিজ সেখানে বসে গল্প করছে। ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুই মুহাফিজ। তারা গিয়ে দুই মুহাফিজের সঙ্গে বেশ আগ্রহ নিয়ে করমর্দন করে কোলাকুলি করলো এবং কথায় কথায় দু'জনকে তাদের মুহাফিজ কামরায় নিয়ে গেলো।

কামরায় বসে থাকা পাঁচ ছয়জন মুহাফিজ ওদেরকে বড় আলেম মনে করে খুব শ্রদ্ধা নিয়ে করমর্দন করলো। এক বাতিনী হঠাৎ দরজা বন্ধ করে দিলো। আর অন্যান্য বাতিনীরা তাদের আলখেল্লার ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিলো। আলখেল্লার ভেতর থেকে যখন ওরা হাত বের করলো তখন দেখা গেলো প্রত্যেকের হাতে ছোট ছোট ধারালো তলোয়ার। মুহাফিজরা নিরস্ত্র ছিলো, তারা তাদের হাতিয়ার পর্যন্ত পৌঁছবে তো দূরের কথা অবাক হওয়ারও সুযোগ পেলো না। মিনিটের আগে খুন হয়ে গেলো সাত আটজন মুহাফিজ।

শহরে আগ থেকেই গোপনে কিছু বাতিনী থাকতো। আগ থেকেই তারা জানতো আজ হাসান ইবনে সবার ফিদায়েনরা আসবে। বাতিনীদের ভাগ হয়ে যাওয়া অন্যান্য দলের সঙ্গে এখানকার বাতিনীরা শরীক হয়ে গেলো। কেল্লার ভেতরের দিকে কিছু ফৌজ ছিলো। তাদের জানার কথা নয় শহরে কি হচ্ছে। বাতিনীরা কখনো এখানে আসবে এবং হামলা করবে তা তো তারা কল্পনাও করেনি। একটুপর যখন তারা কতল হলো, জানতেও পারলো না কাদের হাতে ওরা কতল হচ্ছে।

যে কামরায় আফদুদ্দৌলা বৃদ্ধ ও আলেম বাতিনীদের সাথে কথা বলছিলো সে কামরায় এক বাতিনী ঢুকে সালাম দিলো। সালামের অর্থ ছিলো বাইরের কাজ শেষ হয়ে গেছে। সালাম শেষ হতে হতে আফদুদ্দৌলা ও খতীবের কাজও শেষ করে দিলো বাতিনীরা।

সেদিনই হাসান ইবনে সবা তার এক শিষ্যকে এই কেল্লার আমীর বানিয়ে পাঠিয়ে দিলো।

★★★★

কেল্লা মুলাযখান থেকে একটু দূরেই আছে কেল্লা কহস্তান। এই কেল্লার আমীর যেমন লোভী তেমনি দুশ্চরিত্রের। এই কেল্লাকে ঘিরেও বড় একটি শহর গড়ে উঠেছে। শহরের হাকিম মুনাওয়ারুদ্দৌলা। মুনাওয়ারুদ্দৌলা অত্যন্ত দৃঢ়চেতা মুসলমান। ঐ কেল্লার ওপর বাতিনীদের নজর ছিলো সবসময় এবং আমীরে কেল্লার কুকীর্তির সুযোগে কেল্লায় বাতিনীরা নিয়মিত যাতায়াত করেছে ইদানিং।

মুনাওয়ারুদ্দৌলাকে কয়েকজন লোক জানালো, এখানে একটি বাড়িতে পাঁচ ছয়জন বাতিনী থাকে। এরা খুবই ভয়ংকর লোক। আমীরে কেল্লাকে জানানো উচিত। যাতে তিনি ওদের পেছনে চর লাগান। হাকিম মুনাওয়ার একদিন আমীরে কেল্লার কাছে গিয়ে বাতিনীদের কথা জানালেন।

'সন্দেহজনক লোক তো সবখানেই আছে'–আমীরে কেল্লা কোন গুরুত্ব না দিয়ে মুখ বাঁকিয়ে বললো– 'তা তোমার বোনের খবর কি? বিয়ে টিয়ে হয়েছে?'

মুনাওয়ার খুবই বিরক্ত হলেন। তিনি কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলতে এসেছেন আর এই বুড়ো কিনা তার বোনের কথা জিজ্ঞেস করছে। মুনাওয়ারের সদ্য যুবতী ছোট একটি বোন আছে। তার রূপের খ্যাতি রয়েছে সারা শহর জুড়ে। আমীরে কেল্লার কথার উত্তরে মুনাওয়ার গম্ভীর হয়ে বললেন, যে বিষয় নিয়ে এসেছি সে বিষয়ে কথা বলা অনেক জরুরী।

'ঠিক আছে দেখবো আমি ওদের পেছনে গুপ্তচরও লাগিয়ে দেবো'–আমীরে কেল্লা বললেন।

বাতিনীদের চিন্তা হাকিম মুনাওয়ারকে ভীষণ অস্থির করে তুললো। তিন চারদিন পর আবার তিনি আমীরে কেল্লার কাছে গিয়ে বললেন, এখনো যে ওদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলেন না!

'আমার কেল্লা নিয়ে তোমার এত চিন্তা কেন? এই পাঁচ সাতজন বাতিনী আমার কি করবে?'–আমীরে কেল্লা খোশ কণ্ঠে বললেন।

'মুহতারাম আমীর!'–মুনাওয়ার বললেন– 'আপনি দেখছেন না এই বাতিনীরা কিভাবে সবখানে পৌঁছে যাচ্ছে? সুলতান মালিক শাহ ও ওযীরে আজম খাজা হাসান তুসী নেযামুল মুলককে ঐ বাতিনীরা হত্যা করেছে। কেল্লার ব্যাপারে আপনি সচেতন না হলে কেল্লা তো লুটে নেবে ওরা। শুনেননি কেল্লা মুলাযখানও নিয়ে নিয়েছে ওরা।'

'আরে কি বলছো মুনাওয়ার! বাতিনীরা আমার কেল্লা দখলের চিন্তাও করতে পারবে না। ওরা এখানে এলেও মনে রেখো মৃত্যুকে সঙ্গে করে আসবে।'

এর দু'দিন পর আমীরে কেল্লার দুই লোক খুব দামী কিছু উপহার নিয়ে মুনাওয়ারুদ্দৌলার কাছে এসে পয়গাম দিলো, আমীরে কেল্লা তার বোনকে স্ত্রী বানাতে চায়।

'আমীরে কেল্লার মাথা কি ঠিক আছে?'–মুনাওয়ার ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন– 'এই উপহার নিয়ে যাও। আর তাকে গিয়ে বলো, আমার সদ্যযুবতী বোনকে এমন হাবড়া বুড়োকে দেবো না যে একটা নিকৃষ্ট শরাবী আর বদকার। তার আগের ক'টা বউ আছে তাই তো সে জানে না।'

'কী তার এত বড় সাহস!'–আমীরে কেল্লা তার উপহার ফিরে আসতে দেখে এবং মুনাওয়ারের কথা শুনে বললেন– 'আমি ইটের জবাব পাটকেল দিয়ে দেবো না। ওর সঙ্গে দোস্তী বজায় রাখবো আমি। দেখো ওর বোন খুব দ্রুতই আমার কাছে চলে আসবে।'

একদিকে বাতিনী আরেকদিকে তার বোনের ব্যাপারে আমীরে কেল্লার চরিত্রহীন প্রস্তাব মুনাওয়ারুদ্দৌলাকে তোষের আগুনে নিয়ে ফেললো। সবকিছু এমন জট পাকিয়ে গেলো যে তিনি অসহ্য হয়ে উঠলেন। তার ঘরে আছে তার স্ত্রী, দুটি বাচ্চা ও তার বোন। মুনাওয়ারুদ্দৌলা একদিন প্রচণ্ড ক্ষোভে তার স্ত্রী ও বোনের কাছে সবকিছু খুলে বললেন।

'আমি ঐ বাতিনীদের ধরতে চাই। যদি ওদের ধরতে পারি আর প্রমাণিত হয় ওরা বাতিনী গুপ্তচর ও সন্ত্রাসী তাহলে নিজ হাতে ওদেরকে হত্যা করবো'–মুনাওয়ার বললেন।

'ভাই জান!'–মুনাওয়ারের বোন তাকে বললো– 'আমি আপনার সাথে আছি। আমাকে বলুন আমি কি করতে পারি। ইসলাম ও সত্যের প্রতি আপনার তীব্র দায়িত্ববোধ ও ভালোবাসা দেখে আমি নিজের একটি গোপন কথা বলে দিতে বাধ্য হচ্ছি। যে পাঁচ ছয় জন যুবক সম্পর্কে সন্দিহান ওদের একজনের সাথে আমার সম্পর্ক আছে। এখন আমি কোন দ্বিধা ছাড়াই বলছি, ওর সাথে একান্তেও কয়েকবার আলাপ করেছি আমি। না, আমাকে সে কখনো মন্দ ইংগিত করেনি। আপনি বললে ওকে আমি প্রেম ভালোবাসার কথায় ভুলিয়ে এটা বের করতে পারবো ওরা কে ও কোত্থেকে এসেছে?'

'চমৎকার'!–মুনাওয়ার খুশী হয়ে বললেন– 'কোন ভাই তার বোনকে এভাবে ব্যবহার করে না। কিন্তু তোমার সাথে ওদের যে সম্পর্ক আছে তা ব্যবহার করা এখন জরুরী হয়ে পড়েছে। ওদের কাছে গিয়ে হাসান ইবনে সবার কথা উঠাবে আর এমন ভাবে কথা বলবে যেন তুমি হাসান ইবনে সবার ভক্ত এবং তার কাছে যেতে চাও।'

মুনাওয়ারের বোন তাকে আশ্বস্ত করলো, কয়েকদিনের মধ্যেই ওদের আসল পরিচয় বের করে ফেলবে।

তিন চারদিন পর মুনাওয়ারের বোন মুনাওয়ারকে জানালো, হ্যাঁ ওরা বাতিনী। এখানে চরবৃত্তি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য এসেছে। তবে এখন ওরা গোপনে তাবলিগ করছে।

'তুমি কিভাবে জানলে?'–মুনাওয়ারুদ্দৌলা বোনকে জিজ্ঞেস করলেন।

'এটা জানতে কোন অসুবিধাই হয়নি। আপনি যা করতে বলেছিলেন আমি তাই করেছি। আমি এমন ভঙ্গিতে হাসান ইবনে সবার কথা বলেছি যেন তাকে আমি নবী মনে করি এবং তাকে দেখার জন্য অস্থির। সে অবশ্য প্রথমে এমন ভাব করে যেন হাসান ইবনে সবাকে সে কাফের মনে করে। কিন্তু আমি যখন আবেগ নিয়ে কথা বলি সেও খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে। পরের দিন এসে বলে আমাকে সে একদিন হাসান ইবনে সবার কাছে নিয়ে যাবে। ইমাম আমাকে দেখে নাকি খুব খুশী হবে।'

এর দুদিন পর মুনাওয়ারের বোন মুনাওয়াররের কাছে বলে তার ঘনিষ্ঠ বাতিনীর সঙ্গে দেখা করতে গেলো কিন্তু আর ফিরে আসলো না। সন্ধ্যা মিলিয়ে আস্তে আস্তে রাত গভীর হলো। ফেরার নাম নেই তার। মুনাওয়ার তখন নিজেকে ধিক্কার দিলেন, কেন তিনি এমন এক ভয়ংকর লোকের সাথে তার বোনকে সম্পর্ক রাখতে উৎসাহিত করতে গেলেন। তিনি জানেন, হাসান ইবনে সবা এ ধরনের সুন্দরী মেয়েদেরকে কী কাজে ব্যবহার করে। এটা ভেবে তার ক্রোধ আরো বেড়ে গেলো। রাগে দুঃখে তিনি দিশাহারা হয়ে গেলেন। একবার ভাবলেন আমীরে কেল্লার কাছে যাবেন। পরমুহূর্তেই এটা বাদ করে দিলেন। আমীরে কেল্লা তাকে দুশমনের অধিক মনে করেন না।

'আমার মাথায় একটা কথা এসেছে'–মুনাওয়ারের স্ত্রী তাকে পরামর্শ দিলো–'আপনি আমীরে কেল্লার কাছে গিয়ে বলুন, আপনার বোনকে ওই বাতিনীদের একজন প্রতারণার জালে ফেলে নিয়ে পালিয়েছে। আপনি যদি ওকে উদ্ধার করে দিতে পারেন আমার বোনকে আপনার সাথে বিয়ে করাবো।'

'কোন মূল্যেই একাজ করবো না আমি'–মুনাওয়ার বললেন– 'আমার বোনকে হাতে পেলেই কতল করে ফেলবো। তবুও আমীরে কেল্লার কবলে পড়তে দেবো না।'

'আরে আপনাকে বলছি না আপনার বোনকে তার কাছে দিতেই হবে। আগে তো ওকে পাওয়ার রাস্তা বের করুন। ওকে পেয়ে গেলে আমীরে কেল্লাকে পরিষ্কার বলে দেবেন, তার কাছে আপনার বোনকে দেবেন না। ভয় নেই। এখানে আমার তিন ভাই থাকেন। ওরা আমীরে কেল্লাকে ছেড়ে দেবেন না।'

মুনাওয়ারুদ্দৌলা তখনই আমীরে কেল্লার ওখানে গিয়ে হাজির হলেন। 'বলো রঈস!'–আমীরে কেল্লা বললেন– 'কী মনে করে এলে?'

'আপনার সাহায্য দরকার। আমার বোনকে পাওয়া যাচ্ছে না। ঐ পাঁচ ছয়জন বাতিনীর ওপর আমার সন্দেহ হচ্ছে। ওদের একজন ওকে না কি ভালোও বাসে। সেই মনে হয় নিয়ে পালিয়েছে আমার বোনকে। সবচেয়ে পেরেশানীর কথা হলো, ওকে তো হাসান ইবনে সবার অন্দর মহলে নিয়ে যাবে।'

'সে কোথাও যায়নি'–আমীরে কেল্লা মাতাল গলায় বললেন। এতক্ষণ তিনি মদ খাচ্ছিলেন–'সে আমার কাছেই আছে। পেরেশান হয়ো না আমীর! তুমি অনুমতি দিলে এ বিয়ে খুব ধুমধাম করে হবে। আর অনুমতি না দিলেও এ বিয়ে হবে। তখন তুমি চেয়ে চেয়ে দেখবে শুধু। কী বলো? আমার শক্তির কথা কি তুমি ভুলে গেছো?'

'শরাবের শক্তি কোন শক্তি নয়। আমি আর একবার তোমাকে ভদ্রভাবে বলবো, আমার বোনকে দিয়ে দাও, দ্বিতীয়বার আর বলবো না।'

আমীরে কেল্লা তখন মদ আর শক্তির নেশায় বদ্ধ মাতাল।

'রঈস মুনাওয়ার!'–আমীরে কেল্লা বললেন– 'এখন যাও। চিন্তা ভাবনা করে কাল জানিয়ো। তখনো যদি এমন ধমকের সুরে কথা বলো নওকর দিয়ে তোমাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবো এবং আমার দু'টি শিকারী কুকুর তোমার ওপর ছেড়ে দেবো।

মুনাওয়ার সেখান থেকে বের হয়ে এলেন।

ঘরে যখন পৌঁছলেন মুনাওয়ারুদ্দৌলা তখন এক জ্বলন্ত অঙ্গার। তার ভেতর থেকে যেন আগুনের হলকা বেরোচ্ছে। স্ত্রী আঁচ করতে পেরে আমীরে কেল্লার ওখানে কী হয়েছে তা জানতে চাইলো। চুপ করে রইলেন তিনি এবং স্ত্রীকে এক দিকে সরিয়ে দিয়ে তলোয়ার নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। স্ত্রী পেছন পেছন দৌড়ে এলো।

'তুমি ফিরে যাও'–মুনাওয়ার তার স্ত্রীকে বাঁধা দিয়ে বললেন– 'কাউকে আমি হত্যা করতে যাচ্ছি না, জীবিতই ফিরে আসবো ইনশাআল্লাহ।'

মুনাওয়ার সোজা গিয়ে সেই বাতিনীদের হাবেলির দরজায় ধাক্কা দিলেন। মুনাওয়ার দেখলেন, তার বোনের সাথে যে ছেলেটির সম্পর্ক সে ছেলেটি দরজা খুলেছে। তারা পরস্পরকে ভালো করেই চিনতো। ছেলেটি মুনাওয়ারকে ভেতরে নিয়ে বসালো। বাকীরা সবাই মুনাওয়ারের কাছে বসে গেলো।

'বন্ধুরা!'–মুনাওয়ার বললেন– 'আমি কাউকে কতল করতেও আসিনি কতল হতেও আসিনি। আমার বোনকে আমীরে কেল্লা ছিনিয়ে নিয়েছে। ওই বদকার অনেক দিন ধরে আমার বোনের পেছনে লেগে ছিলো, আমি পরিষ্কার ভাষায় তাকে বলে দিয়েছি, আমার বোনের চিন্তা বাদ দিতে।'

'আপনি আমাদের কাছে সাহায্য চান এই তো! কী সাহায্য করবো বলুন'–ঐ ছেলেটি বললো।

'বন্ধুরা! আমি জানি তোমরা সবাই বাতিনী। আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে যে কোন সময় কতল করাতে পারতাম। কিন্তু করাইনি আমি তোমাদেই একজন সঙ্গী বলে। তোমরা আমার ওপর বিশ্বাস রাখো। সকাল হলেই তোমাদের একজন হাসান ইবনে সবার কাছে চলে যাও। তাকে বলো, তার কিছু ফেদায়েন পাঠিয়ে যেন এই কেল্লাটি নিয়ে নেয়। যেভাবে তোমরা কেল্লা মুলাযখান দখল করেছো।

দুই তিন দিন পর শহরে পঞ্চাশজনের একটা ব্যবসায়ী কাফেলা এলো। কয়েকটি উটে করে তারা তরকারি ও সবজির স্তূপ নিয়ে আসে। শহরের সরাইখানায় গিয়ে থামে তারা।

রাতের প্রথম প্রহর তখন। আমীরে কেল্লা শরাব পান করছে। আর মুনাওয়ারের বোনকে তার পাশে বসিয়ে শরাব পান করার জন্য জোরজবরদস্তি করছে। মেয়েটি কেঁদে কেঁদে শরাব খেতে অস্বীকার করছে আর আমীরে কেল্লা হা হা করে হাসছে। এ সময় দারোয়ান এসে জানালো, বাইরে রইসে শহর মুনাওয়ারুদ্দৌলা দাঁড়িয়ে আছেন। আমীরে কেল্লা আরো জোরে হাহা করে হেসে বললো, ওকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।

মুনাওয়ারুদ্দৌলা ভেতরে ঢুকলেন। তার পেছন পেছন আরো নয় জন লোক ঢুকলো। আমীরে কেল্লা হয়রান হয়ে ওদের সবার দিকে তাকালো। কিন্তু ওদেরকে এ প্রশ্ন করার সুযোগ পেলো না তারা কে এবং কেন এসেছে, এর আগেই ওদের একজনের খঞ্জর তার বুকে বিদ্ধ হয়ে গেলো।

ব্যবসায়ী বেশে এসেছিলো হাসান ইবনে সবার ফেদায়েনরা। আমীরে কেল্লাকে কতল করে এরা কেল্লার ভেতরে যে ক'জন ফৌজ ঘুমন্ত ছিলো –তাদেরকেও পাইকারী দরে হত্যা করলো। কেল্লাটি তারপর চূড়ান্তভাবে হাসান ইবনে সবার হয়ে গেলো।

মুনাওয়ারুদ্দৌলার আশা ছিলো বাতিনীরা তাকে সম্মান দেবে। কিন্তু এক রাতে তার বোন ছাড়া তাকে সহ তার স্ত্রী ও বাচ্চাদেরও বাতিনীরা হত্যা করলো নির্মমভাবে।

৫

মুনাওয়ারুদ্দৌলার বোনের নাম হামীরা। হামীরা ভাইয়ের মতোই ইসলামের প্রতি দৃঢ়চেতা। এজন্য দুই ভাই বোন একে অপরের জন্য প্রাণ ছিলো। বোনের মধ্যে সব সময় জিহাদী জযবা চাঙ্গা রাখার জন্য ভাই তাকে শাহসওয়ারী, তীর, তলোয়ার ও খঞ্জর চালনাসহ অনেক কিছুই শিখিয়েছেন। হামীরা প্রায়ই ঘোড়ায় করে শহরের বাইরে থেকে ঘুরে আসতো।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। অস্তগামী সূর্যের সুবর্ণ রেখা হামীরার কুসুম রাঙা মুখটা আরো রাঙিয়ে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে স্বর্গচ্যুত কোন অপ্সরী। সেই অপ্সরীর মুখে আজ বেদনার চিকন আভা। এমন এক সন্ধ্যার কথাই তার মনে পড়ছে।

সেদিন সন্ধ্যা প্রায় হয়ে আসছিলো। হামীরা শহর থেকে একটু দূর থেকে ঘোড়া দৌড়ে শহরের দিকে আসছে। এ সময় এক সুদর্শন ঘোড়সওয়ার তার পেছন পেছন এলো। হামীরা তার দিকে বিষ চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তার পিছু নেয়ার উদ্দেশ্য কি?

'আপনার ঘোড়ায় জিন বাঁধা নেই। জিন লাগিয়ে নিন। পড়ে যেতে পারেন'–ঐ ঘোড়সওয়ার বললো।

ঘোড়া থেকে নেমে হামীরা দেখলো ঘটনা সত্যিই। তার মুখ নরম হয়ে এলো। ভালো করে জিন বেঁধে নিলো।

'আপনি যেতে পারেন। শুধু এ কারণেই আপনার কাছে থেমেছিলাম'–সওয়ার বললো।

যুবকটিকে হামীরার ভালো লাগলো।

'আপনি কে? এখানেই কি থাকেন?'–হামীরা জিজ্ঞেস করলো।

'আমি জাবের ইবনে হাজিব। বাগদাদ থেকে এখানে পড়ালেখার জন্য এসেছি। আমার মতো আরো চার পাঁচজনকে এখানে পেয়ে গেছি। ওদের সঙ্গে থাকি।'

'কিন্তু আপনাকে বেশ দক্ষ শাহসওয়ার মনে হচ্ছে। আপনি এতই অভিজ্ঞ যে, দূর থেকে দেখেই বুঝতে পেরেছেন আমার ঘোড়ার জিন ভালো করে বাঁধা নেই!'–হামীরা বললো।

'জ্ঞান-বিদ্যার সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে তো শাহসওয়ারই হয়ে যায় মানুষ।'

'হ্যাঁ এমনই তো হওয়া উচিত। কিন্তু বিদ্যাপ্রার্থীরা সাধারণত দুনিয়াবিমুখ হয়।'

'আমি ওদের দলের নই। দুনিয়ার সাথে সম্পর্কহীন জ্ঞান বিদ্যা কোন কাজে আসে না। আমি মুসলমান যে শাহসওয়ার নয় সে কিসের মুসলমান। যার হাতে তীর বর্শা খেলেনা সে কোন্ ইসলামের পূজারী। যে আলেমের মধ্যে ইলমের বাস্তবায়ন নেই তাকে আমি অপূর্ণাঙ্গ মানুষ মনে করি।'

দুই ঘোড়সওয়ার ধীরে ধীরে চলতে লাগলো। হামীরা যেন তার ঘরে ফেরার কথা ভুলে গেছে। দুই ঘোড়সওয়ার নদীর তীরে এসে থামলো। দু'জনে নানান কথায় ডুবে গেলো। জাবেরের কথার শব্দ-ভঙ্গি হামীরাকে বেশ মুগ্ধ করলো। কথা বলতে বলতে সন্ধ্যা গভীর হয়ে এলো। জাবের তখন হামীরাকে ঘরে ফেরার কথা মনে করিয়ে দিলো। হামীরা ঘরের দিকে রওয়ানা দিলো ঠিক, কিন্তু তার মন পড়ে রইলো নদী তীরে।

এটা ছিলো জাবের আর হামীরার প্রথম সাক্ষাত। এরপর থেকে হামীরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঘোড়া নিয়ে বের হতো। তার দৃষ্টি জাবেরকে খুঁজতো। কিন্তু জাবের প্রতিদিন বের হতো না। সপ্তায় মাত্র তিন চার দিন ওদের সাক্ষাত হতো। ক্রমেই ওরা পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে। ওরা একসময় বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে হামীরা জানায়, আমার ভাই এই শহর প্রধান। তাই তিনি সাধারণ কারো সঙ্গে আমার বিয়ে মেনে নেবে না। তারপরও তার কাছে আমি অনুমতি চাইবো। তিনি অনুমতি না দিলে তুমি যেখানে আমাকে নিয়ে যেতে চাইবে আমি যাবো। কোন আমীরজাদা আমার পছন্দ নয়। এরা ভোগবিলাস ছাড়া কিছুই বুঝে না। তাই আমি তাদের কয়েদখানায় বন্দী হতে চাই না।

তাদের সম্পর্ক এতটুকু পৌছার পর হামীরা জানতে পারে, জাবের ও তার সঙ্গীরা সব বাতিনী, লেখাপড়ার সাথে তাদের কোনই সম্পর্ক নেই। তার দুঃখ হয়, জাবের বাতিনী হয়েও তাকে মিথ্যা কথা বলেছে যে, সে বাগদাদ থেকে জ্ঞান-বিদ্যার সন্ধানে এসেছে। তবে জাবেরের প্রতি এজন্য হামীরার প্রেমের মোহ কমেনি। জাবেরই তার একমাত্র ভালোবাসার পুরুষ রয়ে যায়।

যে রাতে মুনাওয়ারুদ্দৌলা বাতিনীদের নিয়ে আমীরে কেল্লার ওপর হামলা চালাতে যান সে রাতেই জাবের হামীরার ঘরে পৌছে এবং হামীরাকে নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে যায়।

শহর থেকে বের হয়ে জাবের তার ঘোড়ার গতি কমিয়ে দেয়। হামীরাও তার ঘোড়ার গতি কমিয়ে দিয়ে জাবেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করে। জাবের তাকে জানায়, সে তার সঙ্গীদের অপেক্ষায় আছে। একটু পর তার পাঁচ সঙ্গী এসে পৌছে। জাবের ও তার সঙ্গীদের কাজ আসলে শেষ হয়ে গিয়েছিলো। তাদের কাজ ছিলো সেই কেল্লা দখল করা। সে কাজ হয়ে গেছে বলে তারা তাদের আসল জায়গায় ফিরে যাচ্ছে। আর জাবের হাসান ইবনে সবার জন্য নিয়ে যাচ্ছে হামীরা নামক এক জীবন্ত ফুল, যে ফুল তার বেহেশতে জায়গা পাবে।

হামীরা এতক্ষণ ভেবেছে জাবের তাকে বাগদাদ নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু জাবেরের সঙ্গে তার পাঁচ সঙ্গী যোগ দেয়ার পর তার সন্দেহ হলো জাবের হয়তো তাকে অন্য কোথাও অন্য কোন কাজে নিয়ে যাচ্ছে।

রাত গভীর হয়ে যাওয়াতে তারা এক জায়গায় থামলো। থেমে খাবার দাবার খেলো। তারপর শোয়ার আয়োজন চললো। হামীরা একটু দূরে গিয়ে বিছানা করে শুয়ে পড়লো। কিন্তু তার ঘুম এলো না। চোখ জ্বালা করতে লাগলো। তাকে নানান চিন্তা ক্ষতবিক্ষত করতে শুরু করলো। জাবের বাতিনী জেনেও জাবেরের প্রতি তার ভালোবাসা অটুট ছিলো। সে বলতো, আমাদের ভালোবাসা পবিত্র। এই পবিত্র ভালোবাসার শক্তিতে একদিন আমি তাকে বাতিনী থেকে বের করে নিয়ে আসবো। আর আজ সেই জাবেরই তাকে আলমোত নিয়ে যাচ্ছে। সে এটা ভেবে আরো কষ্ট পেলো যে, ইসলামের একজন খাঁটি অনুরাগী হওয়ার পরও সে কিভাবে একটি মুসলিম কেল্লা ও মুসলিম শহর বাতিনীদের দখলের ব্যাপারে সাহায্য করলো।

সে মনে মনে আল্লাহর কাছে বার বার মাফ চাইলো। একবার নিজকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য কল্পনা করলো, সে জাবেরের স্ত্রী হয়ে গেছে। তাদের এখন বড় সুখ শান্তির জীবন। জাবের আসলে বাতিনীদের ব্যাপারে সব ধরনের তথ্য জানার জন্য এই বাতিনীদের সঙ্গে থাকে। সব জানা হয়ে গেলে জাবের নেমে পড়বে ইবনে সবার বিরুদ্ধে প্রচারণায়।

শুয়ে থাকা হামীরার ভেতর এসব ভাবনা ঝড় তুলছে। হঠাৎ হামীরা সচকিত হয়ে উঠলো। জাবের এদিকে আসছে। হামীরা চোখ বন্ধ করে ফেললো। জাবের হামীরার ওপর ঝুঁকে দেখলো। হামীরাকে ঘুমন্ত মানুষের মতো ভারী নিঃশ্বাস ফেলতে দেখে জাবের নিশ্চিত হয়ে চলে গেলো তার সঙ্গীদের কাছে।

'ও ঘুমিয়ে পড়েছে'–হামীরার কানে ভেসে এলো জাবেরের কণ্ঠ।

হামীরা তো সজাগই ছিলো। এবার তার পুরো বোধ জেগে উঠলো। তার কান সতর্ক হয়ে উঠলো।

'আমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছি সে সন্দেহ তো করেনি ও?'–জাবেরের এক সঙ্গীর গলা।

'না, ওকে আমি সন্দিহান হতে দেইনি'–জাবের বললো।

'ওহ! ইমাম ওকে দেখে দারুণ খুশী হবেন'–আরেক সঙ্গী বললো।

'আমি তোমাদেরকে একটা কথা বলে রাখছি'–জাবের বললো– 'তোমরা তো জানো ওকে আমি কি কাজের জন্য নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু ওকে যে আমি ভালোবেসেছি এতে কোন প্রতারণা নেই। আমার মনের গভীরেই ওর জায়গা। আমি জানি কেমন জটিল অবস্থা নিজের জন্য সৃষ্টি করেছি।

'ব্যাপার যদি এমনই হয় শায়খুল জাবাল (হাসান ইবনে সবা) কে জানতে দিয়ো না। শায়খুল জাবাল যদি তোমাদের হৃদয়-ঘটিত ব্যাপার জানতে পারেন তাহলে তোমার কি শাস্তি হবে তা তো তুমি জানোই' –আরেকজন বললো।

'হ্যাঁ জানি আমি। ইমাম আমাকে খঞ্জর দিয় বলবেন এটা তোমার বুকে বসিয়ে দাও। এটা গোপন রাখবো আমি। ইমামকে এ বিষয়ে জানতে দেবো না।'

হামীরার আর সন্দেহ রইলো না তাকে ধোঁকা দিয়ে আলমোত নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাকে সেই হাসান ইবনে সবার বেহেশতের কমনীয় ফুল বানানো হবে যার নাম শুনলে

তার মন ঘৃণায় ভরে উঠে। হামীরা এতক্ষণ নিজের ভবিষ্যত নিয়ে অস্থির ছিলো। এবার সে অনুভব করলো তার ভেতর থেকে আগুনের হলকা বের হচ্ছে। একবার ভাবলো এই ছয়জনের ওপর হামলা করে বসবে কি না। কিন্তু তার ভেতর থেকে কেউ একজন বলে উঠলো, ওদের বিরুদ্ধে কিছু করতে যাওয়া মানে আত্মহত্যা করা। এরা ঘুমাক তারপর এখান থেকে সরে পড়ো।

মাঝরাত পর্যন্ত ওরা হামীরাকে নিয়ে কথা বলে গেলো। তারপর সবাই শুয়ে পড়লো। জাবের শোয়ার আগে আরেকবার এসে হামীরাকে দেখে গেলো।

একটু পর ছয়টি নাকের ঘড় ঘড় আওয়াজ ভেসে এলো। হামীরা অপেক্ষা করলো আরো কিছুক্ষণ। পনের বিশ কদম দূরে ঘোড়াগুলো বাঁধা রয়েছে। তবে জিন রয়েছে ঐ বাতিনীদের পাশেই। হামীরা পা টিপে টিপে জিনগুলোর কাছে গিয়ে একটা জিন উঠালো। জিনগুলো বেশ ভারী। তাই তার হাত থেকে জিনটা হঠাৎ পড়ে গেলো। শক্ত জিন মাটিতে পড়ে এই নিঝুম রাতে সেটা কয়েকগুণ আওয়াজ তুললো। হামীরাও পড়ে গেলো। আর চোখ খুলে গেলো জাবেরের। অন্য কারো ঘুম ভাঙ্গলো না। এদিকে হামীরা উঠে দাঁড়ালো। ওদিকে জাবের উঠে হামীরার কাছে চলে এলো।

'কি করছো?'–জাবের ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো যাতে কেউ জেগে না উঠে–'পড়ে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, আমার সঙ্গে এসো।'

বলে হামীরা জাবেরের বাহু ধরে তার সঙ্গীদের থেকে অনেকটা দূরে নিয়ে গিয়ে দু'জনে সেখানে বসলো।

'আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?'–হামীরা জিজ্ঞেস করলো।

'কেল্লা আলমোত!'–জাবের গম্ভীর গলায় জবাব দিলো।

'আলমোত? আমরা বাগদাদ যাচ্ছি না?'

'শোন হামীরা! আমি একজন বাতিনী'

'আর এজন্য তুমি আমাকে ইবলিস হাসান ইবনে সবার দরবারে পেশ করবে আর সে আমাকে তার বেহেশতের 'হুর' বানাবে।... জাবের! আমি তোমাদের সব কথা শুনেছি। আর আমি জানি, আমার মতো সুন্দরী মেয়েদেরকে বাতিনীদের জন্য খুব জরুরী।'

'আমি জানি তুমি সব জানো। কিন্তু তুমি আমাকে পুরোপুরি জানতে পারোনি। আমি হাসান ইবনে সবার সেই স্তরের লোক যারা কোন মেয়ে বা যুবককে জালে জড়ানোর জন্য মুখের এমন জাদু চালায় যে সেই শিকার তাদের পায়ে এসে লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু এতে কোন আবেগ থাকে না। অন্যের প্রাণ নেয়া এবং নিজের প্রাণ দিয়ে দেয়া আমাদের বাতিনীদের কাছে স্রেফ একটা খেলা। নিজেদের মা বোনের ব্যাপারেও আমাদের মধ্যে কোন আবেগ কাজ করে না। কিন্তু হামীরা! তুমিই আমার জীবনে প্রথম ও সম্ভবত শেষ মেয়ে, যে আমার হৃদয়কে তার মুঠোতে পুরে নিয়েছে। তবে এখন আর এর কোন প্রয়োজন নেই যে, তোমাকে ধোঁকা দিয়ে কোথাও নিয়ে যাবো। তুমি সম্পূর্ণ আমাদের কব্জায় এখন। পালিয়ে যাবে কোথায়? কতদূর যাবে?... আমাদের হাতে ধরা

পড়তেই হবে। তখন আমরা তোমার এই সুন্দর দেহটার পূর্ণ স্বাদ নিয়ে তোমাকে মেরে ফেলে রাখবো।'

'তখন তো আমি তোমাদের হাতে ধরা দেয়ার আগে আত্মহত্যা করবো। আমি মুসলমানের মেয়ে। কাউকে আমার দেহ স্পর্শ করতে দেবো না।'

'আরে সব কথা তুমি শুনবে না?'–জাবের হামীরাকে বাঁধা দিয়ে বললো– 'আমি এখন যে কথা বলবো সেটা প্রতারণা মনে করো না। ভালোবাসা আমার জন্য সবসময় এক মরীচিকা হয়ে এসেছে। সেই মরীচিকার পেছনে আমি অনেক দৌড়িয়েছি। হোচট খেয়েছি। আবার উঠে দৌড়িয়েছি। তারপর সেই দৌড়ে পৌঁছেছি আলমোত। না, সেখানেও মরীচিকা। তোমাকে আমি কোন দীর্ঘ-তিক্ত কাহিনী শোনাবো না। শুধু বলবো, তোমাকে পেয়ে আমার ঘুমন্ত ও প্রতারিত হৃদয়ে ভালোবাসার অতল দরিয়া জেগে উঠেছে। তুমি এখন নির্বিঘ্নে আমার সাথে চলো....

'তোমার মতো সুন্দরী মেয়েদেরকে মাত্র দুই তিন দিনে মস্তিষ্ক ধোলাই করে আলমোতের বেহেশতের 'হুর' বানানোর জন্য ওখানে অনেক লোক আছে। এসব মেয়েদের মস্তিষ্ক ধোলাইয়ের পর তারা সেখান থেকে কখনো পালানোর চিন্তা করে না। কিন্তু হামীরা! তোমাকে কখনো ওদের হাতে দেবো না। তোমার প্রতি আমার ভালোবাসায় যে কোন খাঁদ নেই এর প্রমাণ আমি দেবো... দেখো হামীরা! জন্ম থেকেই মানুষ কোন এক ধর্ম বিশ্বাস বুকে আগলে রাখে। সেটা ভুলও হতে পারে সঠিকও হতে পারে। তাই তোমাকে আমি ইসলামের পথ থেকে কখনো সরাবো না। আমাদের ইমাম হাসান ইবনে সবাও ইসলামের অনুরাগী। তুমি সেখানে গিয়ে দেখো। যদি সেখানে তোমার মন টিকে থেকে যাবে। আর না হয় তোমাকে নিয়ে আমি বাগদাদ চলে যাবো। আমার ভালোবাসার শপথ নিয়ে অঙ্গীকার করছি। আলমোতের কারো হাতে তোমাকে দেবো না। আমার নিজের কাছে রাখবো।'

নৈঃশব্দের রাত বয়ে চলছে আর জাবের তার মুখের জাদু চালিয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে হামীরার চেতনাকে গ্রাস করে চলেছে জাবের। হামীরা এটা মানতো যে, জাবেরের সঙ্গে একা একা নির্জনে কত সাক্ষাত করেছে। কিন্তু জাবের কখনো তার প্রতি আপত্তিজনক কোন ইংগিত করেনি। জনমানুষ থেকে কত দূরের এই গহীন জঙ্গলেও জাবের তার প্রতি কোন লোভ করেনি। তার সঙ্গীরাও বোধহয় জাবেরের কারণেই তার প্রতি হাত বাড়ানোর সাহস করেনি। জাবেরের প্রতি এজন্য সে কৃতজ্ঞতা বোধ করলো। এই গভীর বনে জাবেরকেই তার নিরাপদ সফরসঙ্গী মনে হলো। তাই জাবেরের সঙ্গে হামীরা শর্ত করলো, সে আলমোত যেতে রাজি আছে। তবে ভালো না লাগলে সে ফিরে আসবে।

★★★★

মুযাম্মিল আফেন্দী দিনে তার ব্যবসা বাণিজ্যে কিছু সময় দেয় আর বাকী সময় তার কাটে সেনা ছাউনীতে জানবায তৈরীর কাজে। আর সন্ধ্যার পর থেকে ঘন্টার পর ঘন্টা সুমনা আর সে দু'জনে এক সঙ্গে বাতিনী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নানান প্ল্যান প্রোগ্রামে– আলোচনায় কাটিয়ে দেয়। মুযাম্মিলের চেয়ে সুমনার তাড়নাই বেশি হৃদয় স্পর্শকারী।

একদিন মুযাম্মিল সুমনার ঘরে ঢুকতেই সুমনার মা মায়মুনা তাকে বললেন, 'সুমনাকে তুমি এখন বিয়ে করে ফেলো। দুই যুবক যুবতী এক সঙ্গে উঠা বসা করো। লোকে একে অন্য কিছু মনে করে সুলতান বরকিয়ারকের কান ভারী করতে পারে। তখন এর পরিণতি ভালো নাও হতে পারে। তাছাড়া তোমাদের মন তোমাদের পরস্পরকে গভীরভাবে চায়। তোমাদের এই ঘনিষ্ঠতা তোমাদেরকে আপত্তিজনক অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে। তখন তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষমা করতে পারবে না।'

মুযাম্মিল কিছু বললো না। সুমনার দিকে চোখ তুলে তাকালো। এর অর্থ সুমনাই তার মাকে জবাব দিক।

'নিশ্চিতভাবে আমার একটা কথা শুনে রাখো'–সুমনা বললো– 'মুযাম্মিল আর আমার ভালোবাসা যদি দেহগত হতো তাহলে এত দিনে আমরা স্বামী স্ত্রী হয়ে যেতাম। আর না হয় আপনার আশংকাই সত্য হতো... আমাদের ভালোবাসা আত্মার প্রেমে সিক্ত। আমাদের পথ ও গন্তব্য এক। আমাদের মাথার ওপর রয়েছে আল্লাহর গায়েবী হাত। যেদিন আমি ইংগিত পাবো আমার দেহের সঙ্গে মুযাম্মিলের ভালোবাসার সম্পর্ক সেদিন থেকে ওর আর আমার পথ ভিন্ন হয়ে যাবে।'

'সুমনা বেটি! আমি দুনিয়া দেখেছি... যৌবন আর রূপে সেই শক্তি'

'আহ মা! আমার রূপ আর যৌবনের প্রতিই সবচেয়ে বেশি ঘৃণা'–সুমনা ঝাঁঝালো গলায় বললো–'এই রূপ যৌবন আমাকে এক নিকৃষ্ট মানুষের পায়ে নিয়ে ফেলেছিলো। যে শরীরকে মানুষ এত পছন্দ করে সে শরীরের প্রতি দিন দিন আমার ঘৃণা বাড়ছে... আমার কাছে আছে শুধু রূহ–আত্মা বা অন্তর। এর মালিক মুযাম্মিল। আমি পবিত্র অপবিত্র যাই হই আমি মুযাম্মিলেরই। শুধু বিয়েই আমাদের শেষ গন্তব্য নয়। মানুষের জন্য আমি এক সুন্দর ধোঁকা হয়েছিলাম। আল্লাহকে আমি অনেক অসন্তুষ্ট করেছি। কিন্তু মহান আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়ে ঈমানের আলো দিয়েছেন। এর শুকরিয়া স্বরূপ আমার জন্য ফরজ কাজ হলো আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা এবং আমার অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা। এরপর আমি নিজেকে মুযাম্মিলের কাছে স্ত্রী হিসেবে পেশ করবো। মুযাম্মিল! তোমার কি এতে দ্বিমত আছে?'

'না সুমনা! তুমি যা বলেছো আমার বক্তব্যও সেটাই। আমাদের সবার আগে আসল উদ্দেশ্য পূরণ করতে হবে। এ কথা বলে তুমি আমার ঈমান, বিশ্বাস ও সংকল্পকে নতুন জীবন দিয়েছো।

'আমাদের গন্তব্য হাসান ইবনে সবাকে কতল করা'–মুযাম্মিল জবাব দিলো।

'এটা বলার কোন প্রয়োজন নেই তবুও বলছি, আমি আমার নিজের সত্তা ও অস্তিত্বকে মুযাম্মিল ছাড়া অপূর্ণাঙ্গ মনে করি। আচ্ছা এসব কথা থাক... মুযাম্মিল! তুমি কি বরকিয়ারককে বলোনি এ মেয়ে সন্দেহজনক?'

'একবার বলেই তো বুঝেছি। সে আমাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছে। আমি তো ওকে বন্ধু মনে করি এখনো। কিন্তু সে এমনভাবে বলেছে যে, তখন আর সে কারো বন্ধু নয় সুলতান বনে গেছে।'

'তাহলে রায় গিয়ে আবু মুসলিম রাজীর সাথে কথা বলে দেখো। তিনি এত বড় শহর ও বিশাল এলাকার হাকিম। সুলতান মালিক শাহের খুব নির্ভরযোগ্য উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি হয়তো বরকিয়ারককে বুঝিয়ে টুঝিয়ে বিয়ে থেকে বিরত রাখতে পারবে।'

'বরকিয়ারক তার কথাও মানবে না। বরকিয়ারক তো রুজিনার জন্য পাগল হয়ে গেছে... আবু মুসলিম রাজী বরকিয়ারকের বিয়ে উপলক্ষে আসছেন এখানে। এর আগে উনার সঙ্গে দেখা করাটা অর্থহীন। বিয়ে হবেই। আমি আবু মুসলিম রাজীকে জিজ্ঞেস করবো রুজিনাকে কি করে গায়েব করা যায়। এখনো তো বলা যাচ্ছে না রুজিনা কি করে বসবে। কিন্তু সে কিছু একটা করবেই। বরকিয়ারক যদি তখন জীবিত থাকে তাহলে সারা জীবন পস্তাবে।'

বরকিয়ারক ও রুজিনার বিয়ে হবে আজ। বিয়ে উপলক্ষে সারা শহর আলোকসজ্জা করা হয়েছে। সারা শহরের মানুষকে দাওয়াত করা হয়েছে। মন্ত্রী, আমীর উমারা ও সরকারী আমলা এবং অন্যান্য বিত্তবানদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর সারা শহরবাসীর জন্য খোলা ময়দানে ব্যবস্থা করা হয়েছে। খাওয়ার পর রাখা হয়েছে নাচ গানের আসর। এভাবে এই বিয়ের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা। এমন ব্যয়বহুল বিয়ে শাহী খান্দানে আর কখনো হয়নি।

সুলতান মালিক শাহর সময় এ ধরনের বিয়ে এই দেশে তো দূরের কথা শাহী খান্দানেও কখনো হয়নি। সুলতান মালিক শাহ শহীদ হয়েছেন দুই মাসের কিছু বেশি সময় হয়ে গেছে। তবুও লোকজন তার শোক ভুলতে পারেনি। কিন্তু বরকিয়ারকের বিয়ের দিন সবাই যেন তাকে ভুলে গেলো। বরকিয়ারক চাচ্ছিলোও এটা।

বাইরে যখন বরকিয়ারকের বিয়ে উপলক্ষে সারা দুনিয়া জুড়ে উৎসব চলছিলো তখন শাহী মহলের ভেতরে এক কামরায় আবু মুসলিম রাজী বসে আছেন। তার কাছে বসা মুযাম্মিল ও বরকিয়ারকের ছোট দুই ভাই মুহম্মদ ও সাঞ্জার। এর দু'জন ভাইয়ের এ বিয়ে কোনভাবেই মেনে নিতে পারছিলো না।

'আমীরে মুহতারাম!'-মুযাম্মিল আবু মুসলিম রাজীকে বললো- 'সুলতানে মরহুমের মৃত্যুর সময় আপনি যখন এখানে আসেন তখন বলার সুযোগ হয়নি। আপনাকে কি কেউ বলেছে, আমাদের নয়া সুলতানের কনে এক বাতিনী। আর সে নিজেকে সুলতানের খুনীর বোন বলে পরিচয় দেয়?'

'হ্যাঁ আফেন্দী! আমার গোয়েন্দা ব্যবস্থা এমন যে, মাটির নিচের কথাও আমার কানে পৌঁছে যায়। এসব আমি জানি।' আবু মুসলিম রাজী বললেন।

'এই মেয়ে আলমোত থেকে এসেছে। ওর ব্যাপারে আপনি ভেবেছেন কিছু?'

'আমি তো ভাবছিই। তুমি কি ভেবেছো তাই বলো।'

'আমীরে মুহতারাম! আমার চিন্তা হলো এই মেয়ে না জানি কি খেলা দেখায়! আমার কথা হলো আমাকে যখনই আপনার প্রয়োজন হবে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে নিয়ে যাবেন। সুমনাকে তো আপনি জানেন। সেও আগুনের মতো জ্বলছে। ওকেও আপনি ব্যবহার করতে পারেন।'

'তুমি এক দিন রায় চলে এসো। নির্বিঘ্নে বসে আলাপ করা যাবে।'

'এই মেয়ে কি ভাইকে মেরে ফেলতে পারে?'–মুহাম্মদ জিজ্ঞেস করলো।

'সম্ভবতঃ না' –আবু মুসলিম রাজী বললেন– 'সে সুলতান বরকিয়ারককে তার কাবুতে রেখে তার মনোযোগ হাসান ইবসে সবা থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। সুলতানের ইন্তিকালের পর বাতিনীদের তাবলিগ আরো তীব্র আকার ধারণ করেছে। আমি শুধু দেখবো সুলতান বরকিয়ারক কি করে!'

'বরকিয়ারক ভাইজান কিছুই করবে না। আমরা তার সঙ্গে থাকি। আমরা দুই ভাই দেখছি, তার আচার ব্যবহার একদমই পাল্টে গেছে। আমরা যেন এ বাড়ির মেহমান। দুই চার দিন পর চলে যাবো'–মুহাম্মদ বললো।

'এটা খেয়াল রেখো মুহাম্মদ! সাঞ্জার তুমিও'–আবু মুসলিম রাজী বললেন– 'যদি বরকিয়ারক বা তার বৌ তোমাদের সাথে খারাপ আচরণ করে তোমরা চুপ থেকো। এখনই এটা আমি বলতে চাইনি। তোমাদেরকে শুধু ইংগিত দিচ্ছি। আমি খবর পেয়েছি, এই মেয়ের মাধ্যমে হাসান ইবনে সবা সারা সালতানাতে গৃহযুদ্ধ বাঁধাতে চায়। কিভাবে গৃহযুদ্ধ বাঁধাবে সেটা ভেবে এখন নিজেদের ওপর চাপ তৈরী করো না। আমি তো আছি। তোমরা দুই ভাই সজাগ থেকো... আর মুযাম্মিল! চারদিক নজর রেখো। যখনই কিছু জানতে পারবে আমার কাছে চলে আসবে।

★★★★

আগের দিন বরকিয়ারক সেই মহা উৎসবের আয়োজন করেছিলো কনের পক্ষ থেকে। পরের দিন তার নিজের পক্ষ থেকে ওয়ালীমা–বিবাহোত্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করলো। আমীর উমারা, উযীর, নাযীর ও দেশের বড় বড় লোক বরকিয়ারককে মোবারকবাদ জানাতে এলো। বরকিয়ারক আগত অতিথিদেরকে কয়েকদিন শাহী অতিথিশালায় থেকে যেতে বললো। কারণ শেষের দিন সে সবার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবে।

পঞ্চমদিন সুলতান বরকিয়ারক সবাইকে একত্রিত করে যে ভাষণ দিলো তাতে প্রশাসনের বেশ কিছু অদল বদল করলো।

আবদুর রহমান সামিরীকে বানালো নয়া প্রধানমন্ত্রী। নিয়ম করলো, হাসান ইবনে সবার মোকাবেলা করা হবে ইসলামী তাবলিগ দ্বারা। কারণ সেটা এক ধর্মীয় ফেরকা। যা ফৌজি শক্তি দিয়ে দাবানো যাবে না। এজন্য অনেকগুলো প্রাণের ক্ষতি হয়েছে। সেই ধারা এখন থেকে বন্ধ। আর জনসাধারণের করের পরিমাণও আরো বাড়ানো হবে।

উপস্থিত সবাই একে অপরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো। সবাই চরম অস্বস্তি নিয়ে অনুভব করলো, সুলতান নেশাকাতর হয়ে এসব বলেছেন।

'সুলতানে মুহতারাম!'–আবু মুসলিম রাজী নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বলে উঠলেন– 'হাসান ইবনে সবা এক ভয়ংকর ফেতনা এবং ইসলামের নিকৃষ্ট দুশমন নেযামুল মুলক ও সুলতান মালিক শাহর খুনী।'

'এখন আর কেউ কতল হবে না'–বরকিয়ারক আবু মুসলিম রাজীকে বাঁধা দিয়ে বললো– 'আর এটা ভাববার কাজ আমার   আপনার নয়   আপনি রায়তে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখুন।'

সবাই স্তব্ধ হয়ে গেলো। আবু মুসলিম রাজীকে সুলতান মালিক শাহও কখনো এভাবে ধমক দিয়ে কথা বলেননি। মালিক শাহ তাকে সর্বোচ্চ সম্মান দিতেন। সবাই বুঝলো একে কিছু বলা অর্থহীন। এখানে যত ছোট বড় আমীর উমারা হাকীম কাযীরা আছেন সবাই বরকিয়ারকের বাবার আমলের লোক। এদের সবার স্নেহ পেয়েই বরকিয়ারক বেড়ে উঠেছে। কিন্তু বরকিয়ারক কাউকে ব্যক্তিগতভাবে তো নয়ই সরকারী পদমর্যাদা অনুযায়ী প্রত্যেকের প্রাপ্য সম্মানটুকুও দিলো না।

দরবার কক্ষ থেকে বাইরে এসে অনেকেই কানাঘুষা শুরু করলো। কারো কারো মুখ দিয়ে তো কথা সরছিলো না। আবু মুসলিম রাজী চলে গেলেন বরকিয়ারকের মার কাছে। এই ঘরে তাকে বড়ই আপন মনে করা হয়। বরকিয়ারকের মা তাকে দেখেই কাঁদতে লাগলেন।

'আমার এক শোক ছিলো আমি বিধবা হয়েছি বলে'–বরকিয়ারকের মা বললেন– 'এখন আমার ছেলে বরকিয়ারকের শোক আমাকে শেষ করে দিচ্ছে। রুজিনা ওর ওপর চড়াও হয়েছে নেশা হয়ে। ওয়ালীমার পর সেই যে দু'জন কামরার দরজা বন্ধ করেছে আর খোলার নাম নেই। কাল সন্ধ্যায় দু'জনকে পাল্কিতে চড়ে বাইরে বের হতে দেখে আমি ওদের শয়ন কক্ষে চলে গেলাম। খাদেমা ঘর গোছগাছ করছিলো। দুটি রুপার পেয়ালা ও একটি সুরাহী পড়েছিলো। আমি পেয়ালা শুঁকে আশ্চর্য ধরনের এক গন্ধ পেলাম। আমি নিশ্চিত এতে শরাব ছিলো না, অন্য কোন দুর্লভ নেশা জাতীয় জিনিস ছিলো।'

'বোন! আপনি এত পেরেশান হবেন না'–আবু মুসলিম রাজী বরকিয়ারকের মাকে মিথ্যা সান্ত্বনা দিলেন–'এ আপনার ছেলের যৌবনের অপরাধ। কিছু দিন পর নেশা কেটে যাবে। আশা করি ছেলে তার পূর্বপুরুষদের সঠিক পথে চলে আসবে।'

'এই বয়সে দুনিয়া তো আমি কম দেখিনি'–বরকিয়ারকের মা বললেন– 'আমি কি করে নিজেকে এই ধোঁকা দেবো যে, এই ছেলে তার শহীদ পিতার পথে ফিরে আসবে! যৌবন তো আমরাও দেখেছি। সুলতানে মুহতারাম আমাকে যখন বিয়ে করেন আমার রূপ যৌবন এই মেয়ের চেয়ে তো কম ছিলো না। তিনি তো আমাকে নিয়ে এত পাগল হয়ে উঠেননি। শরীয়তের হুকুমের বাইরে তিনি যাননি কখনো। আল্লাহ তাআলা পুরুষের মধ্যে এই দুর্বলতা রেখেছেন যে, সে সুন্দরী মেয়ের জন্য নেশা বনে যায়। সে মেয়ে যদি চতুর আর কুচক্রী হয় তাহলে তার স্বার্থসিদ্ধির জন্য সেই পুরুষকে তার রূপের উগ্র নেশায় ফেলে তাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। সে ধ্বংস হওয়ার আগ মুহূর্তেও বুঝতে পারে না যে রূপের সে পূজারী ছিলো সেই রূপই তাকে শেষ করে দিচ্ছে... হায় নারীর হাতে কত রাজত্ব উল্টে গেছে।'

আবু মুসলিম রাজী বরকিয়ারকের মাকে আরো কিছু সান্ত্বনা দিয়ে উঠে পড়লেন।

★★★★

এর কয়েকদিন আগে জাবের হামীরাকে নিয়ে আলমোত পৌঁছেছে। কোন মেয়েকে এখানে অপহরণ করে আনার পর মেয়ে দলের প্রশিক্ষকের কাছে তাকে সোপর্দ করা হয়। কোন মেয়ে এদের পথে না আসলে এর চিকিৎসাও এদের কাছে আছে। হয় তার প্রতি জবরদস্তি করা হয়, না হয় আদর সোহাগ, হিপ্টোনেজম ও হাশীষের মাধ্যমে পথে আনা হয়। তবে জবরদস্তির চিকিৎসা খুবই কম করা হয়। কিন্তু জাবের এসবের ধারে কাছে না গিয়ে হামীরাকে তার এক বন্ধুর ঘরে নিয়ে যায়।

জাবেরের এই বন্ধু বাতিনী হলেও ফেদায়েন ছিলো না। তার কাছে সে তার ও হামীরার সমস্যা খুলে বললো।

'নারে ভাই! ওকে আমি ইমামের কাছে নিয়ে যাবো না'–জাবের তার বন্ধুকে বললো– 'ওর সঙ্গে আমার হৃদয় ঘটিত কিছু ব্যাপার আছে। শেষ পর্যন্ত তাকে সেখানেই পাঠাতে হবে যার জন্য ওকে আমি নিয়ে এসেছি। কিন্তু আমি ওকে এত ভালোবাসি যে, আমি চাই না ওকে অন্য কারো কাছে দেয়া হোক। আমি নিজেই ওকে তৈরী করবো।'

জাবেরের মধ্যে হামীরার তীব্র ভালোবাসা ছিলো সত্যি। কিন্তু ওর মধ্যে আরো প্রবল ছিলো হাসান ইবনে সবা। তাই সে চাচ্ছিলো ওকে বেহেশতের হুরও বানাতে এবং এই মেয়ে যাতে তাকে ঘৃণাও না করে।

তার বন্ধু তাকে পরামর্শ দিলো, হামীরাকে নিয়ে তুমি একবার হাসান ইবনে সবার কাছে যাও, আর তাকে বলো, এই মেয়েকে তুমি নিজে তৈরী করতে চাও। আর না হয় কখনো যদি ইমাম জানতে পারেন, এক মেয়েকে তুমি তোমার কব্জায় রেখেছো তাহলে তোমাকে মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে কম শাস্তি দেবেন না।

পরামর্শটি জাবেরের ভালো লাগলো। একদিন সে হামীরাকে হাসান ইবনে সবার কাছে নিয়ে গেলো। হামীরা প্রথমে যেতে চায়নি। পরে তার কৌতূহল হলো, যার ইশারায় তার লোকেরা বুকে খঞ্জর বসিয়ে দেয়। ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে, পানিতে ঝাপ দেয় সে না জানি দেখতে কেমন?

জাবের হামীরাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে নিজে একা হাসান ইবনে সবার কাছে গিয়ে জানালো, যার ভাই কেল্লা কহস্তান আমাদের দখলে দিয়েছে তার বোনকে নিয়ে এসেছি। হাসান ইবনে সবা আগেই জেনেছে কি করে ঐ কেল্লা বাতিনীদের দখলে এসেছে। জাবের তাকে আরো বিস্তারিত শোনালো।

'তুমি এখন কি চাও? '–হাসান ইবনে সবা জিজ্ঞেস করলো।

'ইয়া শায়খুল জাবাল!' 'এই মেয়েকে আমি কিছু পুরস্কার দেয়ার আবেদন করছি। আমি নিজে ওকে তৈরী করতে চাই। ওর ওপর জোরজবরদস্তি না করে, হাশীষ পান না করিয়ে পূর্ণ সুস্থ সচেতন অবস্থায় যদি ওকে তৈরী করতে পারি তাহলে এই মেয়ে আপনার পায়ে পাহাড় এনে আছড়ে ফেলতে পারবে।'

'আমার মনে হয় তুমি নিজেই পুরস্কার নিতে চাও'–হাসান ইবনে সবা বললো তীর্যক সুরে–এক সুন্দরী যুবতী মেয়ের চেয়ে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে তুমি কি ওকে পুরস্কার হিসেবে নিজের কাছে রাখতে চাও?'

'ইয়া শায়খুল জাবাল!'–জাবের জোর দিয়ে বললো– 'যেদিন আমার মনে আমার ইমামকে ধোঁকা দেয়ার কথা আসবে সেদিন নিজের খঞ্জর দিয়ে নিজেকে আমি শেষ করে দেবো... ঐ মেয়েকে আমি নিয়ে এসেছি। আশা করি, সে আপনার কাছে একটু বসলেই তার একগুয়েমি ভাব দূর হয়ে যাবে। আপনাকে বলেছি, এই মেয়ের মনে আপনার এবং আমাদের সবার প্রতি চরম ঘৃণা। আবার আমার প্রতিও তার অগাধ ভালোবাসা। ওকে আপনি এক নজর দেখে নিন।'

হাসান ইবনে সবার ইংগিতে জাবের বাইরে থেকে হামীরাকে ভেতরে নিয়ে এলো।

হামীরাকে হাসান ইবনে সবার কাছে বসানো হলো। তখন হাসান ইবনে সবার চোখে হাসি মুখে হাসি। সে চোখে যখন সে হামীরার দিকে তাকালো হামীরার চোখের পলক ফেলারও সুযোগ হলো না। হামীরা অনুভব করলো, হাসান ইবনে সবার চোখ থেকে অদৃশ্য এক আলো তার দেহে ঢুকছে। সে নিজের মধ্যে অন্যরকম পরিবর্তন অনুভব করলো। তার মনে হলো হাসান ইবনে সবা তো এতো ঘৃণার উপযুক্ত নয়।

'একটা কথা বলবে মেয়ে!'–হাসান মুচকি হেসে তাকে জিজ্ঞেস করলো– 'তোমার মনে নিশ্চয় কারো ভালোবাসা আছে?'

'হ্যাঁ, আল্লাহর ভালোবাসা'–হামীরা জবাব দিলো।

'তারপর কার?'

'আল্লাহর সর্বশেষ রাসূল (স) এর।'

'তারপর কার?'

'আমার ভাই মুনাওয়ারুদ্দৌলার।'

'তারপর?'

হামীরা এবার কিছু বললো না। শুধু জাবেরের দিকে তাকালো।

'আচ্ছা মেয়ে বলো তো'–হাসান ইবনে সবা বললো– 'যার মনে ভালোবাসার সমুদ্র তরঙ্গায়িত হয় তার মনে ঘৃণা আসে কোত্থেকে?'

হামীরা চমকে উঠে জাবেরের দিকে তাকালো। কিন্তু বললো না কিছু।

'যাও মেয়ে! তুমি প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতীক। তুমি সৌরভ ছড়ানো ফুল। এই সুন্দর ফুলে ঘৃণার দুর্গন্ধ লাগিয়ো না... জাবেরের সঙ্গে যাও। তোমার মন থেকে যখন ঘৃণা দূর হয়ে যাবে এবং তা অবশ্যই দূর হবে– তখন তোমার মনই তোমাকে বলবে, চলো ঐ লোকের কাছে... তারপর তুমি নিজেই আমার কাছে চলে আসবে।'

হামীরা উঠলো সেখান থেকে। কিন্তু হাসান ইবনে সবার চোখ থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলো না। সে উপলব্ধি করলো তার ভেতর কে জানি ঝাঁকুনি দিয়ে গেছে। জাবের তাকে বাহু ধরে না উঠালে সে সেখানেই বসে থাকতো। হামীরাকে নিয়ে জাবের সেখান থেকে বের হয়ে গেলো।

জাবেরের বন্ধুর ঘরে পৌছা পর্যন্ত হামীরা কোন কথা বললো না। তার ভেতর এক অবোধ পরিবর্তন অনুভব করলো। হাসান ইবনে সবা তো তার দুনিয়ার একক সম্রাট। সে ইচ্ছা করলে জাবেরকে বলতে পারতো, এই মেয়ে আমার কাছে থাক তুমি যাও। কিন্তু হাসান ইবনে সবা হামীরার রূপ যৌবনের প্রতি মোটেও তাকালো না। এজন্য সে হাসান ইবনে সবার প্রতি কিছুটা হলেও আকৃষ্ট হলো। জাবেরও এরকম। জাবেরের সাথে এত দিন তার উঠাবসা কিন্তু কখনো প্রেম ভালোবাসার কথা ছাড়া অর্থহীন কোন আচরণ করেনি।

হঠাৎ হঠাৎ হামীরার মনে পড়লো তার ভাই-ভাবী ও নিজের ভাইবোন মা-বাবার কথা। কিন্তু সে তাদের সবাইকে ভুলে যেতে চাচ্ছিলো।

দু' একদিন পর জাবের তাকে বললো, চলো তোমাকে এখানকার প্রাকৃতিক রূপ দেখিয়ে আনি। তুমি নিশ্চিত বলে উঠবে, পর জনমের বেহেশত কি এর চেয়েও সুদৃশ্য হবে?...

দু'জনে শহর থেকে বের হলো। এই কেল্লা ও শহর একেবারে পাহাড়ের ওপর থেকে ঢাল পর্যন্ত বিশাল এলাকা নিয়ে বিস্তৃত। অনেক দূর গিয়ে ওরা পাহাড় থেকে নামলো। সামনে পড়লো নদী। কিন্তু পাহাড় ও নদীর মাঝখানে প্রশান্ত একটি মেঠো যমিন ওদেরকে কাছে টেনে নিলো। যেখানে নানা জাতের ফুলের বৃক্ষ রূপের নৈসর্গিক রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। হামীরার মনে হলো নিসর্গের এই নিটোল যৌবনের কাছে সে নিজেকে আত্মসমর্পণ করেছে। এখান থেকে আর কোন কালে সে নড়তে পারবে না। জাবের তাকে নদীর তীরে নিয়ে এলো। নদী এখান থেকে অনেক নিচে খাদের মতো নেমে গেছে। একটু সামনে নদীর পাট তীক্ষ্ণভাবে বেঁকে যাওয়াতে নদীর প্রবাহ প্রচন্ড বিক্ষুব্ধ আকার ধারণ করে থাকে সব সময়।

জাবের আর হামীরা খাদের ওপর দাঁড়িয়ে শত শত ফুট নিচের নদীর গর্জন শুনতে লাগলো।

'এখান থেকে নদীতে কেউ পড়লে বাঁচতে পারবে?'–হামীরা অন্যমনস্ক হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'অসম্ভব!'–জাবের জবাব দিলো– 'কোন বিখ্যাত সাতারুও পারবে না। দেখছো না, এখানে নদীর দুই পাট সংকীর্ণ হয়ে তীক্ষ্ণ বাঁক নেয়াতে পানির তরঙ্গ কেমন ফুলে ফেঁপে উঠছে... এখানে দাঁড়িয়ে দেখতেই বুক কাঁপছে।'

'ইমামের কাছে আবার কবে নিয়ে যাবে?'

'তার কাছে আবার যেতে চাইবে?'–জাবের মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলো।

'আমি অনুভব করছি উনার কাছে আমার আরেকবার যাওয়া উচিত'–হামীরা একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো– 'আমার মা, ভাই, ভাইয়ের বাচ্চাদের কথা মন থেকে তাড়াতে চাই, কিন্তু ওদের কথা বড্ড মনে পড়ে।'

'আমার একটা কথা শোন'–জাবের একটু চিন্তা করে বললো– 'ওদেরকে ভুলে যাওয়াই তোমার জন্য উত্তম... তোমার ভাই যেহেতু এই দুনিয়ায় নেই...।

‘কি বললে?’–হামীরা তড়পে উঠে জিজ্ঞেস করলো– ‘এই দুনিয়ায় নেই মানে? কোথায় তিনি?’

‘তাকে কতল করা হয়েছে। তার স্ত্রী, দুই বাচ্চা ও তোমার মা বোনের একই পরিণতি হয়েছে।’

‘আরে কে করেছে এমন’–হামীরার চোখ মুখ ফেটে যেতে চাইলো।

‘আমার সঙ্গী-সাথীরা’–জাবের নির্বিকার গলায় বললো।

‘তোমার...তোমার...তোমার সঙ্গী...’ হামীরা চিৎকার করে উঠলো।

জাবের নদীর খাদের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। হামীরা চিৎকার করতে করতে প্রথমে জাবেরের বুকে হাত রাখলো–যেন তাকে বুকে জড়িয়ে নেবে–পরমুহূর্তেই তার সমস্ত শক্তি দিয়ে জাবেরকে ধাক্কা মারলো। জাবের এক পলক শূন্যে চিত হয়ে রইলো। তারপর বিচিত্র ভঙ্গিতে খাড়া হয়ে নিচের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলো। তার আর্ত চিৎকার ভেসে এলো। তারপরই তার পড়ার ‘ছলাৎ’ ‘ছলাৎ’ শব্দ শোনা গেলো। হামীরা ওপর থেকে দেখলো, নদী তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নদীর সেই বাঁকে এসে তীব্র স্রোতের ঘূর্ণির মধ্যে জাবেরের দেহ ঘুরতে লাগলো। হামীরা ডানে বামে তাকালো। ভারী একটা পাথর পড়ে ছিলো। সেটি উঠালো খুব কষ্টে। জাবের তার নিচে ফেঁসে গিয়েছিলো। হামীরা সোজা বরাবর পাথরটি ছেড়ে দিলো। পাথর গিয়ে পড়লো জাবেরের মাথার চাঁদিতে। এরপর আর জাবেরকে দেখা গেলো না।

অল্প সময়ের মধ্যেই হামীরা নিজের মধ্যে ফিরে এলো। সে এখন একা এই বাস্তবতা মেনে নিলো। তার এখন এখান থেকে পালানো দরকার। তার ভাগ্য ভালো সূর্য অস্তগামী। সে দ্রুত পা চালিয়ে হাঁটতে লাগলো। অশ্রু বন্যায় ভেসে যাচ্ছে তার দু’ চোখ। এর মধ্যেই সে আল্লাহকে স্মরণ করে এগিয়ে যাচ্ছে। সূর্য যখন ডুবে গেলো সে তখন ঘন জঙ্গলে পৌঁছে গেছে।

এবার সে ঘন জঙ্গল ভেঙ্গে দৌড়াতে শুরু করলো। যাতে কারো পিছু ধাওয়ার আগে সে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছাতে পারে। রাতের অন্ধকার ও ঘন জঙ্গল তাকে বেশ আড়াল দিচ্ছিলো। আলমোত থেকে সে বেশ দূরে চলে এসেছে। হঠাৎ তার কানে ঘোড়ার খুর ধ্বনি ভেসে এলো। সে এক লাফে একটি গাছের পাতাময় ডালে উঠে বসলো। অন্ধকারেও আবছা আবছা জঙ্গলের পটভূমি দেখা যাচ্ছে।

ঘোড়সওয়ার কাছে চলে এলো। হামীরার মাথা দ্রুত কাজ করছে। সে হঠাৎ গাছ থেকে লাফিয়ে পড়লো এবং কলজে কাঁপিয়ে দেয়া আওয়াজে চিৎকার করলো এবং হাহা করে বললো, ‘মুসাফির! ঘোড়া ছেড়ে পায়দল চল্ তোর কলিজা খাবো’...।

ভূত বা প্রেতাত্মার অস্তিত্বের কথা কে না বিশ্বাস করে। সেই সওয়ার তাকে নিশ্চিত প্রেতাত্মা ছাড়া আর কিছু মনে করলো না। অন্ধকার রাতে এমন জনহীন বনে এমন রূপসী মেয়ে কেন আসবে। হামীরার চিৎকার এতই ভয়ানক হয়েছে যে, ঘোড়াও লাফিয়ে উঠলো। সওয়ার ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে হামীরার সামনে হাঁটু মুড়ে বসে হাতজোড় করে থর থর করে কাঁপতে লাগলো। অর্থাৎ প্রেতাত্মার কাছে সে প্রাণভিক্ষা চাচ্ছে।

হামীরা সেই সওয়ারের দিকে মোটেও তাকালো না। ধীরে ধীরে পা ফেলে ঘোড়ার সামনে গেলো। রেকাবিতে পা রেখে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে খুব জোরে ঘোড়া ছুটালো। সেই কম্পমান সওয়ার যেন দেখলো, প্রেতাত্মা উড়ে উড়ে ঘোড়ার কাছে গেলো এবং ঘোড়া নিয়ে আকাশের দিকে উড়ে চলে গেলো।

একটু দূরে গিয়ে হামীরার মনে প্রশ্ন জাগলো, সে এখন কোথায় যাবে? তার ভাই কতল হয়ে গেছে। তার পরিবারের কারো খোঁজ নেই। সে এখন কোথায় যাবে?

৬

হামীরার ছুঁড়ে মারা পাথরের আঘাতে জাবের শুধু নদীর নিচের দিকেই গেলো না তার মৃত্যুও নিশ্চিত হয়ে গেলো। স্রোতস্বিনী নদী তাকে সেই ঘূর্ণি থেকে অনেক দূরে নিয়ে নিক্ষেপ করলো। সেখান থেকে মাইল খানেক দূরে নদীর পাট বেশ চওড়া হয়ে গেছে। সেখানে একটা পাকা বাধানো চমৎকার ঘাটলা আছে। অনেক সৌখিন সাতারুরা সেখানে এসে সাতার কাটে। সূর্য প্রায় ডুবু ডুবু। হাসান ইবনে সবার চার পাঁচজন ফেদায়েন সাতার কাটছে এখানে। হঠাৎ একজন চিৎকার করে উঠলো– 'লাশ... আহা ডুবে মরেছে... ধরো...উপরে উঠাও।'

'আরে এতো জাবের ইবনে হাজিব'–এক ফেদায়েন জাবেরকে চিনতে পেরে বললো– এ কি করে নদীতে ডুবলো?'

ওদের মধ্যে দুই ফেদায়েন জাবেরকে ভালো করে চিনতো। এরা এও জানতো, জাবের এক মেয়ে নিয়ে এসেছে এবং ইমামের কাছে অনুমতি নিয়েছে যে, সে-ই ঐ মেয়েকে তৈরী করবে।

এই ফেদায়েনরা সাতার টাতারের কথা ভুলে গিয়ে জাবেরের লাশ উঠিয়ে কেল্লার ভেতর নিয়ে গেলো।

'শায়খুল জাবালকে জানানো উচিত'–একজন বললো।

'লাশ ওখানেই নিয়ে চলো'–আরেকজন বললো।

লাশ তারা হাসান ইবনে সবার ঘরের আঙিনায় রেখে হাসান ইবনে সবাকে খবর দিলো। হাসান ইবনে সবা এসে জাবেরের লাশ দেখলো।

'এতো এক মেয়েকে নিয়ে এসেছিলো সঙ্গে করে। ও যেখানে থাকতো সেখানে গিয়ে ঐ মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো'–হাসান ইবনে সবা হুকুম করলো।

এক ফেদায়েন দৌড়ে গেলো এবং একটু পর দৌড়ে এসে জানালো ঐ মেয়ে সেখানে নেই।

'সেও তাহলে এর সঙ্গে ডুবে গেছে। মনে হয় তার লাশ নদীর তীব্র স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গেছে'–হাসান ইবনে সবা বললো।

হামীরাকে যে নদী ভাসিয়ে নিয়ে যায়নি। সে নিজেই যে রাতের অন্ধকারে গহীন জঙ্গলে ভেসে যাচ্ছে মহা শক্তিধর হাসান ইবনে সবা তাও জানতে পারলো না।

'এই লাশ নিয়ে যাও। কাফন দাফনের ব্যবস্থা করো। ঘোষণা করিয়ে দাও, ওর জানাযা কাল দুপুরে হবে এবং জানাযা পড়াবো আমি... আর ঐ মেয়েটিকেও খুঁজে বের করার চেষ্টা করো। নদীর কোথাও ভেসে উঠতে পারে।

★★★★

সকালে কেল্লা আলমোতে জাবেরের মৃত্যুসংবাদ ঘোষিত হলো। তার পরিচিত অপরিচিতরা তার লাশ দেখতে এলো। সবার মনে এই প্রশ্ন গুঞ্জরিত হতে লাগলো– জাবের ডুবলো কি করে? এ সময় এক ফেদায়ের লোকদেরকে জানালো,

'কাল বিকেলে ওকে এক মেয়ের সাথে নদীর দিকে যেতে দেখেছি। আমি তখন কেল্লার প্রাচীরে এমনিই ঘুরছিলাম। তারপর দু'জনকে পাহাড়সংলগ্ন অনেক উঁচু তীরের কাছে দেখলাম। সেখানে একটা টিলা থাকায় দু'জনে আমার চোখের আড়াল হয়ে গেলো। তবুও সেদিকেই তাকিয়ে রইলাম আমি। একটু পর মেয়েটি একা ফিরে এলো। একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে একদিকে দৌড় শুরু করলো। মেয়েটিকে আর দেখলাম না। জাবেরকেও ফিরে আসতে দেখলাম না আর। তারপর সূর্য ডুবে গেলো।'

একটু পর লোকদের মধ্যে আরেকটি খবর ছড়িয়ে পড়লো যে, আজ সকালে সরাইখানায় এক লোক এসেছে। রাতে পথে এক প্রেতাত্মা তার পথ আটকে দাঁড়িয়েছিলো। তারপর তাকে তার ঘোড়া থেকে নামিয়ে সেই প্রেতাত্মা ঘোড়া নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। হাসান ইবনে সবার গুপ্তচররা এটা শুনে লোকটিকে সরাইখানা থেকে নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো সেই প্রেতাত্মাটি কোন রূপ ধরে এসেছিলো।

'চাঁদের উজ্জ্বল রূপালী আলোর মতো এক যৌবনবতী রূপসীর রূপ ধরে এসেছিলো'–লোকটি বললো– 'হঠাৎ আমার সামনে উদয় হয়ে এমন বিকট স্বরে চিৎকার করে উঠলো যে, আমার ঘোড়াটি লাফিয়ে উঠলো। আমি টের পেলাম আমার প্রাণ তার মুঠোতে। সে গম গম করে বললো, মুসাফির ঘোড়া থেকে নেমে হেঁটে যা, তোর কলিজা খাবো... আমি কাঁপতে কাঁপতে তার পায়ে পড়ে প্রাণভিক্ষা চাইলাম। সে আমাকে কিছুই বললো না। উড়তে উড়তে ঘোড়ার কাছে গেলো এবং ঘোড়া নিয়ে আকাশের দিকে উড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো'

তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, সেই প্রেতাত্মার পোশাক ও চেহারার আকৃতি কেমন ছিলো। মুসাফির হামীরার পোশাক ও চেহারার হুবহু বর্ণনা দিলো।

হাসান ইবনে সবা যখন জানাযার নামায পড়াতে এলো তখন তার গুপ্তচররা সেই ঘোড়সওয়ার মুসাফির ও জাবের-হামীরাকে প্রাচীর থেকে দেখা সেই বাতিনীকে তার সামনে উপস্থিত করে এদের কাছ থেকে কি কি শুনেছে তা তাকে জানালো। হাসান ইবনে সবা আবার এদের কাছ থেকে আলাদা করে তাদের বর্ণনা শুনে এতে নিশ্চিত হয়ে গেলো যে, ঐ মেয়ে জাবেরকে নদীতে ডুবিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে। জাবের যদি এমনিই নদীতে পড়ে যেতো তাহলে হামীরা পালাতো না। চিৎকার চেচামেচি করে লোকজনের সাহায্য চাইতো।

'দু'জন লোক এখনই কহস্তান চলে যাও'–হাসান ইবনে সবা হুকুম করলো– 'সে ওখানেই গেছে... ওকে পাওয়া গেলে কোন শাস্তি দেয়া হবে না। এমন মেয়েই আমাদের দরকার... এছাড়া ওকে সবখানেই তালাশ করা হবে। মারু বা রায়ও সে যেতে পারে।'

হাসান ইবনে সবার হুকুম মতো তখনই দু'জন লোক রওয়ানা হয়ে গেলো।

★★★★

সরাইখানার ঐ ঘোড়সওয়ার মুসাফির যখন প্রেতাত্মার গল্প করছিলো হামীরা তখন জঙ্গলের এক পাশে কয়েকটি ঘর মিলিয়ে ছোট একটি বসতি দেখতে পেলো। ভোরের আলো ফুটতে আর বাকী নেই। রাতের অন্ধকার তাকে এমন করে আড়াল করে রেখেছিলো যেমন মা তার কোলের শিশু বাচ্চাকে আগলে রাখে। ভোরের আলো ফুটতেই হামীরা ভয় পেয়ে গেলো। তার এই বয়স ও এই রূপই তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ অবস্থায় যেই তাকে দেখবে তার দিকে হাত বাড়াতে চেষ্টা করবে। ঘরগুলোর দিকে যাবে কিনা একবার ভাবলো। অনাকাঙ্ক্ষিত কোন ঘটনা না ঘটলে দিনের বেলা লুকানোর জন্য এ জায়গাটা তার জন্য উপযুক্ত হতে পারে। এ ছাড়া আর কোথায় বা গিয়ে লুকানো যাবে? আর আশ্রয়ই বা পাওয়া যাবে কোথায়? কহস্তান তো এখন বাতিনীদের দখলে। সেখানে তার কেউ নেইও। তার ভাই ভাবী ও ভাতিজারা সবাই মারা পড়েছে বাতিনীদের হাতে।

দ্বিধান্বিত হয়ে ঘোড়াটি আস্তে আস্তে হাঁটিয়ে বসতির কাছে নিয়ে দাঁড় করালো। বাড়িগুলো মামুলি ধরনের। একটা বাড়ি অবশ্য একদমই ভিন্ন। আমীরানা সাজসজ্জা এবং খুব বড়। দরজাটিও খুব উঁচু ও কারুকাজ করা। হামীরার ঘোড়া দরজা থেকে পনের বিশ কদম দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

এ সময় দরজা খুলে ধবধবে সাদা চুলের এক বৃদ্ধ বের হয়ে এলেন। পরনে তার লম্বা সাদা আচকান মাথায় কাপড়ের টুপি। হাতে একটা নকশাদার পাত্র। পাত্র থেকে কুন্ডলি পাকিয়ে ধোয়া উঠছে। বৃদ্ধ আস্তে আস্তে হামীরার ঘোড়ার সামনে এসে হামীরার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। হামীরা আগেই তার চেহারা যাতে দেখা না যায় এবং তার বয়স যাতে বুঝা না যায় এজন্য চেহারায় নেকাব চড়িয়ে দেয়। শুধু তার চোখ দেখা যাচ্ছিলো।

'এসো বোন! মুসাফির হলে ভেতরে এসে বিশ্রাম করে নাও। রাস্তা ভুলে গেলে মনযিল কোথায় বলো। আর কোন বিপদে পড়লে মুখ খুলো... এটা আমাদের গির্জা। আমরা এখানে তার উপাসনা করি যিনি আমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন'–বৃদ্ধ বললেন।

'আপনি নিশ্চয় পাদ্রী। কিন্তু আমি কি করে নিশ্চিত হবো আপনার গির্জায় আমি নিরাপদে থাকবো?'–হামীরা বললো।

বৃদ্ধ তার হাতের ধুনি দান একটু ঘুরালেন। ধোয়া ওপরে উঠে হামীরার নাকে পৌছাতেই হামীরা ধোয়ার মধ্যে কেমন এক পবিত্র সুগন্ধি অনুভব করলো।

'তুমি সম্ভবতঃ মুসলমান। এসো... আমাদের গির্জায় তুমি তেমনি প্রশান্তি অনুভব করবে যেমন তোমরা তোমাদের খোদার দরবারে সিজদা দিয়ে করে থাকো। ঘোড়া থেকে নেমে এসো আমাকে পরীক্ষায় ফেলো না।'

হামীরা ঘোড়া থেকে নেমে এলো।

'আমার ঘোড়াটি এমন জায়গায় বাঁধা দরকার যেখানে কারো নজর না পড়বে। ওরা আমাকে পিছু ধাওয়া করে আসছে'–হামীরা বললো।

'কারা?'

'বাতিনীরা। পিছু ধাওয়া করছে মানে এই নয় যে, আমি কোন অপরাধ করে পালিয়েছি। আমি আমার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ ঐ জালিমদের জাল থেকে ছিনিয়ে এখানে পৌঁছেছি। সেটা হলো, আমার ইজ্জত ও আমার দ্বীনী আকীদা।'

কথার ফাকে গির্জা থেকে এক লোক বেরিয়ে এলো। পাদ্রী তাকে নির্দেশ দিলেন, ঘোড়াটি এমন জায়গায় বেঁধে রাখো যাতে কেউ না দেখে। পাদ্রী হামীরাকে গির্জার ভেতর দিয়ে একটি কামরায় নিয়ে গেলো। এটি মনে হয় পাদ্রীর থাকার ঘর। পাদ্রী হামীরাকে খাটে বসিয়ে কিছু খেয়ে নিতে বললেন।

'আমি ক্ষুধার্ত বা পিপাসার্ত নই'–হামীরা বললো– 'ঘোড়ার সঙ্গে খাবার ও পানি ছিলো। একটু আগে পেট ভরে খেয়ে নিয়েছি।'

হামীরা তার চেহারার নেকাব সরালো। রাহেব ভীষণভাবে চমকে উঠলেন। যেন হামীরা তাকে কতল করার জন্য খঞ্জর বের করেছে।

'তুমি নিশ্চিত হতে চেয়েছিলে এখানে নিরাপদ থাকবে কিনা'–পাদ্রী বললেন– 'কিন্তু আমি এখন ভয় পাচ্ছি আমার অস্তিত্ব ও আমার এই গীর্জা তোমার থেকে নিরাপদ থাকবে কিনা।'

'কেন আমার চেহারার মধ্যে অশুভ কিছু আছে?'

'বাতিনীদের ইমাম হাসান ইবনে সবার কাছে তোমার মতো অসংখ্য মেয়ে আছে। এদের মধ্যে আমি এই প্রথম একটি মেয়ে দেখলাম। ঐ বাতিনীদের ইমাম কাউকে তার জালে জড়াতে চাইলে তোমার মতো মেয়েকে পাঠায়। আর সেই মেয়ে তোমার মতো মাজলুম বনে নানান কাহিনী শোনায়।'

'মহামান্য পাদ্রী!'–হামীরা তাকে বাধা দিয়ে অতি শান্ত গলায় বললো– 'এমন একটি মেয়ে বানানোর জন্যই আমাকে ধোঁকা দিয়ে আলমোত নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। সে কাহিনী শোনাবো আপনাকে। এর আগে আমি আমার পরিচয় দিচ্ছি। আমি কহস্তানের রঈস মুনাওয়ারুদ্দৌলার বোন। কহস্তানের আমীর ও আমার ভাইকে বাতিনীরা হত্যা করে... ।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ শুনেছি আমি'–পাদ্রী দুঃখিত হয়ে বললেন– 'কহস্তান বাতিনীরা নিয়ে নিয়েছে ও মুনাওয়ারুদ্দৌলাকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করেছে। এতে আমি বেশ আঘাত পেয়েছি। খুব ভালো মানুষ ছিলেন তিনি। তবে কেল্লার আমীর ছিলেন অতি বদ লোক...আচ্ছা তোমার কথা বলো।'

হামীরা পাদ্রীকে পুরো ঘটনা শোনালো। জাবেরের সঙ্গে পরিচয় থেকে নিয়ে কেল্লা আলমোত পৌঁছা ও এরপর এখানে আসা পর্যন্ত সব ঘটনা শোনালো।

এর মধ্যে গির্জার এক পরিচারিকা এসে তাদের সামনে নাস্তা রেখে গেলো। 'এখন তুমি নিশ্চয় কহস্তান যাওয়ার কথা আর ভাববে না। এখন মন থেকে কহস্তান দূর করে দাও'–পাদ্রী বললেন।

'তাহলে আমি কোথায় যাবো?'

'সেলজুকি সুলতানের কাছে! ঠিকানা তো সেই একটাই যেখানে তুমি যেতে পারো। যেখানে আশ্রয় পেতে পারো...মারু বা রায়। সেলজুকিদের নয়া সুলতান কেমন তা অবশ্য বলতে পারবো না। তবে সুলতান মালিক শাহ তো ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ শাসক। বাতিনীদের সন্ত্রাস বন্ধের জন্য তিনি এক পবিত্র সংকল্প করেছিলেন। তাই রায় যাওয়াই তোমার জন্য ভালো। সেখানকার হাকিম আবু মুসলিম রাজী যেমন সুপণ্ডিত তেমনি ভালো মানুষ। তার কাছে গেলে তুমি শুধু নিরাপদই থাকবে না, তিনি তোমাকে এমন যত্ন করে রাখবেন যেমন কহস্তানে ছিলে।'

'ওখানে কি একাই যাবো? তাহলে তো রাতে সফর করাই আমার জন্য ভালো।'

'আমার দৃষ্টিতে তুমি এখন এই গির্জার মতো পবিত্র স্থানে থেকো। আমি তোমাকে একা ছেড়ে আমার খোদাকে নারাজ করার হিম্মত দেখাতে চাই না আমার দু'জন লোক তোমার সাথে যাবে। আর তোমাকে ছদ্মবেশে এখান থেকে বের করা হবে।'

হামীরা নিজেকে এমন হালকা বোধ করলো যেন এক নিমিষে একটি পাহাড় নেমে গেছে। 'মান্যবর!'–হামীরা জিজ্ঞেস করলো– 'আমার ভবিষ্যত কি হবে? অপরিচিত দুই লোক আমাকে ধোঁকায় ফেলবে না তো?'

'তুমি কে?... কেউ না... আমি কে?... কেউ না...তুমি জিজ্ঞেস করো ইসলামের ভবিষ্যত কি হবে? তোমাকে আমাকে তো খোদাই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আমাদের দেখতে হবে তিনি যার জন্য আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তা পূর্ণ হচ্ছে কিনা সে উদ্দেশ্য কি? মানুষের প্রতি ভালবাসা...।'

'আপনার দৃষ্টিতে ইসলামের ভবিষ্যত কি?'

'ভালো নজরে পড়ছে না'–পাদ্রী বললেন– 'পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধর্ম হলো ইসলাম কিন্তু এর যে মাহাত্ম্য ছিলো তা ছোট করা হচ্ছে। বাতিনীরা ইসলামের জন্য বড় বিপদ এখন। তাদের এই মিথ্যা আকীদা বড় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। হাসান ইবনে সবা সব ধরনের শয়তানীকে বড় শোভন করে দেখাচ্ছে। মানুষ এখন সেদিকেই ঝুঁকছে। নারী ও মদে যে স্বাদ আছে তা তো খোদার উপাসনায় নেই... তুমি ভবিষ্যতের কথা বলছো? একটা সময় আসবে হাসান ইবনে সবা দুনিয়ায় থাকবে না। তার এই আকীদাও আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু মানুষের রিপুর পূজা ও ভোগের লালসা কখনো মিটবে না। শয়তানের প্রতীক হয়ে হাসান ইবনে সবা যে কোন রূপে বেঁচে থাকবে। ভোগ বিলাসের দিকে যে ঝোঁক তা মুসলমানদেরকে ঘুণ পোকার মতো খেয়ে যাবে। তখন মুসলমান হবে শুধু নামকে ওয়াস্তে মুসলমান। তাদের সেই প্রাণশক্তি পবিত্রতা বোধ কোথায় হারিয়ে যাবে!'

★★★★

সুলতান বরকিয়ারকের ওযীরে আজম আবদুর রহমান সামিরী বরকিয়ারকের মার কাছে বসা। মার চোখ দিয়ে পানি ঝরছে।

'আপনার কোন প্রভাবই কি আপনার ছেলে বরকিয়ারকের মধ্যে নেই?' আবদুর রহমান সামিরী জিজ্ঞেস করলেন।

'তুমি প্রভাবের কথা বলছো?'–বরকিয়ারকের মা বললেন– 'আমি তার মা এও তো সে ভুলে গেছে। ক'দিন ধরে তো তার ছায়াও দেখছি না। তবে তার রানী রুজিনা দু' এক পলকের জন্য দেখা দেয় তবে আমার সঙ্গে কথা বলে না। বললেও হুকুমের সুরে। তার ভাইদের সাথে বরকিয়ারকের ব্যবহার দিন দিন খারাপ হচ্ছে। না জানি কখন ভাইয়ে ভাইয়ে লেগে যায়।'

'আপনাকে একথাই আমি বলতে এসেছি'–সামিরী বললেন– 'সালতানাতের ব্যাপারে সুলতান বরকিয়ারকের কোন আগ্রহ নেই ফৌজ এখনো এ মাসের বেতন পায়নি। সুলতান মরহুম মালিক শাহের আমলে কখনো এমন হয়নি। ফৌজ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছে। এদিকে বাতিনীরা যারা সালতানাত গ্রাস করে নিচ্ছে। আমরা যদি ফৌজে এত অসন্তোষ ও হতাশা ছড়িয়ে দেই তাহলে সেলজুকি সালতানাত আল্লাহ রক্ষাকারী...।'

'তাকে তুমি এসব কথা বলেছো?'

'না, কথা বলবো কি করে। তিনি তো বাইরেই বের হন না।'

'তুমি এখানে বসো। আমি বাইরে বের করছি ওকে। আমি তো এক মা।'

'না না। ওর কাছে আপনি যাবেন না। ওর কাছে আপনি যাবেন না। অসৌজন্য কিছু করে বসতে পারেন উনি। তখন হয়তো আমি অন্য কিছু করে বসবো!'

বরকিয়ারকের মা সামিরীকে হাতে বাঁধা দিয়ে বের হয়ে গেলেন। বরকিয়ারকের শয়ন কক্ষের দরজায় টোকা দিলেন। দরজা খুলে রুজিনা বাইরে এলো।

'কী হয়েছে?'–রুজিনা জিজ্ঞেস করলো।

কোন জবাব না দিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন। বরকিয়ারক আধো ঘুম আধো জাগরণে।

'কী হলো মা?'–বরকিয়ারক মাদক কণ্ঠে বললো।

'কী হয়েছে বাইরে বের হয়ে দেখা কি তোমার কাজ নয়?'–মা চরম ক্ষোভ নিয়ে বললেন–'তোমার বাপকে কি কখনো এ সময় শয়ন কক্ষে দেখেছো? কুঁড়ে কুকুরের মতো এখনো বিছানায় পড়ে আছো!'

'উনার শরীর ভালো নয়। আপনি যান। ওযীরে আজমকে বলুন উনার কাজ করতে'–রুজিনা বললো।

'আমি তোমাকে বলছি বরকিয়ারক!'–মা হাত নাড়াতে নাড়াতে তার দিকে এগিয়ে বললেন– 'সুলতান তুমি। তোমার এই চামচিকা বেগম নয় তোমার বাবা এই ফৌজ তৈরী করেছিলেন বাতিনীদের খতম করার জন্য। আর আজ তুমি এও জানো না ফৌজকে এ মাসের বেতন দেয়া হয়নি?'

'এতে কোন কেয়ামতটা এসে পড়লো'–বরকিয়ারক অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললো– 'এত ফৌজ আমি রাখবোও না। সালারদের ডেকে বলে দেবো অর্ধেক ফৌজ ছুটি দিয়ে দিতে।'

'তাহলে তোমার রানীকে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে যাও। তুমি যেমন ফৌজকে ছুটি দিয়ে দেবে বাতিনীরাও কিছু দিন পর তোমাকে তোমার জীবন থেকে ছুটি দিয়ে দেবে। হুশে ফিরে আয় বেটা! হুশে ফিরে আয়। তোর বাপের কবরকে অপমান করিসনে। ভেবে

দেখ এই সালতানাত কত রক্ত আর প্রাণের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। তোর পূর্বপুরুষদের আত্মাকে কষ্ট দিস না। এই যৌবন কয়েকদিনের ময়লা মাত্র। চিরঞ্জীব একমাত্র আল্লাহ তাআলা।'

'ওকে এত পেরেশান কেন করছেন মা!'-রুজিনা বেজার মুখে বললো।

'তুমি চুপ থাকো মেয়ে! আমাকে মা বলবে না। আমি ওর মা এবং এই সালতানাতের মা যেখানে আমাদের মহান পূর্বসুরীরা ইসলামের ঝাণ্ডা উচ্চকিত করার জন্য এসেছিলেন। ওর সঙ্গে যদি তোমার মনের সম্পর্ক পবিত্র থাকতো তাহলে তুমি ওকে এই কামরায় বন্দি করে রাখতে না।'

'আচ্ছা মা আচ্ছা! তুমি যাও আমি তৈরী হয়ে বের হচ্ছি'-বরকিয়ারক ক্লান্ত সুরে বললো।

'আমি তোমাকে এখনই বাইরে দেখতে চাই। এখনই উঠো!'-মা বললেন।

বরকিয়ারক আস্তে আস্তে উঠতে লাগলো আর মা কামরা থেকে বের হয়ে গেলেন। রুজিনা খটাশ করে দরজা বন্ধ করে বরকিয়ারকের কাছে গেলো।

'আরো কিছুক্ষণ শুয়ে থাকুন'-রুজিনা বরকিয়ারককে শুইয়ে দিতে দিতে বললো- 'মা শ্রদ্ধার পাত্রী ঠিক, কিন্তু মার তো এও দেখা উচিত ছেলে কি অবস্থায় রয়েছে। আপনার ব্যাপারে ওদের কোন আগ্রহ নেই। আপনার মা ও ভাইয়েরা শুধু সালতানাত নিয়েই আছে। কেন যে তাদের মনে এই ভয় ঢুকলো যে, এই সালতানাত কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। এরা আসলে সিংহাসন চায়।'

রুজিনার পরনে তখনো রাতের বাসি পোশাক। সুরাহীতে হাশীষ মিশ্রিত কিছু শরাব ফেলে বরকিয়ারককে সে পান করালো। তারপর বরকিয়ারকের জন্য আবার নিজের যৌবন উন্মুক্ত করে দিলো এবং বরকিয়ারকের মা ও তার ভাইদের বিরুদ্ধে যা মুখে এলো তাই বলে গেলো। বরকিয়ারক আবার রুজিনার মধ্যে হারিয়ে গেলো। সে বেমালুম ভুলেই গেলো, একটু আগে তার মা এসে তাকে কিছু বলে গেছে।

বিকেলের দিকে বরকিয়ারক মন্ত্রী পরিষদের দরবার কক্ষে গিয়ে বসলো। সেখানে তার ওযীরে আজম আবদুর রহমান সামিরীকে ডেকে আনলো।

'আপনি আমার বড় এবং আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি'-বরকিয়ারক ওযীরে আজম সামিরীকে বললো- 'আপনার খেয়াল রাখা উচিত এমন কোন ব্যাপার যেন না হয় যাতে আমার মনে আপনার শ্রদ্ধাবোধ কমে যায়। ফৌজের বেতন আমার মা দেয় না আমি দিই। আপনি কেন অযথা আমার মাকে পেরেশান করলেন। তিনি রেগে গিয়ে আমাকে আমার স্ত্রীর সামনে অপমান করেছেন আশা করি ভবিষ্যতে আপনি এ ধরনের কাজ করবেন না।'

'আমি মাফির দরখাস্ত করছি সুলতানে মুহতারাম!' সামিরী বললেন- 'আমি দু'বার আপনার কাছে অনুরোধ করেছি যে, ফৌজকে সময় মতো বেতন দেয়া হয়নি এবং এমন এর আগে কখনো হয়নি। এই বিলম্বের কারণে ফৌজে অসন্তোষ দানা বাঁধতে পারে। আপনি তো জানেন, সুলতান মালিক শাহ মরহুম এই ফৌজ কি উদ্দেশ্যে বানিয়েছেন। তিনি জীবিত থাকলে আলমোতে হামলা করে হাসান ইবনে সবার

শয়তানীকে চিরদিনের জন্য খতম করে দিতেন। গুপ্তচররা প্রায় প্রতিদিনই আমাকে সংবাদ দিচ্ছে, বাতিনীরা বড় দ্রুত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদের শহরসহ বড় বড় শহরে তারা আবাদী গড়ে তুলছে।'

'আমি যে হুকুম জারী করেছিলাম সেটা হয়তো আপনি ভুলে গেছেন। মরহুম ফৌজ তৈরী করেছেন ঠিক, কিন্তু ভাবেননি এই ফৌজ আমরা কত দিন পুষতে পারবো। রাজস্বের অধিকাংশ অর্থ তো ফৌজ খাচ্ছে। আমি বলেছিলাম, হাসান ইবনে সবার কাছে শান্তি চুক্তির জন্য এক প্রতিনিধি দল পাঠাবো যে, সে যেন তার এলাকায় থাকে এবং আমাদেরকে আমাদের এলাকায় থাকতে দেয়... যা হোক, এবার ফৌজের বেতন দিয়ে দিন। তবে অর্ধেক ফৌজকে ছুটি দিয়ে দিন। এদের ঘোড়াগুলো বিক্রি করে এর অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা করে রাখুন। আমি সিপাহসালার ও অন্যান্য সালারদের হুকুম দিয়ে দিচ্ছি, ফৌজ ছাটাই করে বর্তমান সংখ্যা অর্ধেকে নিয়ে আসুন।'

'সুলতানে মুহতারাম! আপনার আব্বাজানও তার কাছে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন। হাসান ইবনে সবা বিদ্রুপ করে তাকে বলেছিলো, আমার কাছে যে শক্তি আছে তোমাদের কাছে তা নেই। তিনজন শিষ্যকে আত্মহত্যা করতে বললে তারা সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরকে খঞ্জর দিয়ে শেষ করে দেয়। এরপর সে বলেছে, তোমাদের ফৌজে তো একজনও এমন জানবায নেই।'

'ওসব কথা আমাকে মনে করাবেন না। সেটা ছিলো আমার মরহুম আব্বাজানের আমলের কথা। আমার কাজ আমি নিজেই তৈরী করে নিচ্ছি। আমি হুকুম দিচ্ছি ফৌজের অর্ধেক অংশ করে পাঠিয়ে দিন।'

সুলতান বরকিয়ারক যখন তার ওযীরে আজমকে হুকুম দিচ্ছে তখন রুজিনার কাছে এক অর্ধবয়স্কা মহিলা বসা। এটা রুজিনার বিশেষ পরিচারিকা।

'আর ঐ গুপ্তচরকে বলবে'—রুজিনা বলছিলো ঐ পরিচারিকাকে—'সে যেন খুব দ্রুত ইমাম পর্যন্ত এ খবর পৌঁছে দেয় যে, অনেক সফলতা পেয়েছি আমি। ফৌজ অর্ধেক কমিয়ে নেয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি করিয়ে নিয়েছি। সুলতান বরকিয়ারক ফৌজ ছাটাই করার এই হুকুম তার ওযীরে আজম ও সালারদের ডেকে দিয়ে দিয়েছে... সুলতান সম্পূর্ণ আমার মুঠোতে এসে গেছে। তার মা, ওযীরে আজম ও তার ভাই মুহাম্মদ আমার কাছ থেকে তাকে দূরে রাখতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ওদের বিরুদ্ধে আমি ঘৃণা উস্কিয়ে দেবো। বেতন দেয়ায় বিলম্ব হওয়ায় ফৌজের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে। বেতন দেয়ার ব্যাপারে এই বিলম্বের পেছনেও আমার হাত আছে। ইমামকে যেন বলে কিছু লোক পাঠিয়ে দিতে। ওরা ছাটাইকৃত ফৌজের মধ্যে সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছড়িয়ে দেবে... পয়গামে এও বলবে, রায়ের হাকিম আবু মুসলিম রাজি সম্পর্কে এতটুকু শুধু এখন বলতে পারি, তিনি সুলতানের সব ফয়সালার বিরুদ্ধে। তবে তার প্রতিক্রিয়া কি হবে তা বলা যাচ্ছে না।'

সুলতান বরকিয়ারক ওযীরে আজম সামিরীকে আরো কিছু নির্দেশ দিয়ে বিদায় করে দিলো। তারপর সিপাহসালার আবু জাফর হেজাযী ও নায়েবে সিপাহসালার আওরিজীকে ডেকে আনলো।

'কাল রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ফৌজের বেতন দিয়ে দেবেন'–সুলতান বরকিয়ারক বললো– 'এবং ফৌজ অর্ধেক কমিয়ে আনার ব্যাপারে আমার ফয়সালাটি কার্যকর করবেন। এত ফৌজের প্রয়োজন নেই এখন আমাদের। আপনারা দু'জন ফয়সালা করবেন কাকে ফৌজে রাখবেন আর কাকে ছাটাই করবেন।'

'হ্যাঁ সুলতানে মুহতারাম!'–সিপাহসালার আবু জাফর হিজাযী বললেন– 'ফৌজ অর্ধেকই করা উচিত। খুব দ্রুত আপনার হুকুম কার্যকর করা হবে।'

'সুলতানে মুহতারাম'–সালার আওরিজী বললেন– 'আপনার কাছে আবেদন করছি ফৌজের সংখ্যা কমানো উচিত হবে না। আপনি জানেন মরহুম সুলতান এই ফৌজ কেন তৈরী করেছিলেন...।

'আরো অনেক কিছু জানা আছে আমার'–বরকিয়ারক আওরিজীকে বাঁধা দিয়ে বললো– 'এ শুধু আমি জানি এত বড় ফৌজকে কোথেকে বেতন দেয়া হয়। ভেবেচিন্তেই যা বলার বলছি আমি। এটাই কার্যকর হওয়া উচিত।'

'সুলতান ঠিকই বলছেন আওরিজী'–সিপাহসালার হিজাযী বললেন– 'এত বড় বাজেট পূরণ করা মুশকিলের ব্যাপার। রাষ্ট্রীয় কোষাগারের ওপর এটা অর্থহীন এক বোঝা। সুলতানে মুহতারামের হুকুম এখনই আমাদের পালন করা উচিত।'

'হুকুম পালন আমাদের কর্তব্য। কিন্তু আমি এটা ভুলতে পারবো না, এই দেশ আমাদের দেশ। এটা মুসলমানের দেশ। এই ফৌজ বাতিনী অপশক্তি থেকে ইসলামকে বাঁচানোর জন্য তৈরী করা হয়েছে। এর দ্বারা বাতিল অপশক্তিকে এমনভাবে খতম করা হবে যেভাবে অগ্নিপূজারী ও রোমীয় পরাশক্তিকে খতম করা হয়েছিলো। আমরা যদি হাসান ইবনে সবাকে খতম না করি'...

এই নাম শুনতে শুনতে আমি অতিষ্ঠ হয়ে গেছি। প্রথম দিনই বলে দিয়েছি আমি। বাতিনীদের বিরুদ্ধে আমরা ফৌজ ব্যবহার করবো না–বরকিয়ারক বললো।

'এটাও ভেবে দেখুন মহামান্য সুলতান!'–আওরিজী বললেন– 'ফৌজের ব্যাপারে আপনার এই ফয়সালা যদি বহাল রাখেন তাহলে পুরো ফৌজে এবং দেশবাসীর মধ্যে আপনার বিরুদ্ধে অনাস্থা ভাব জন্মাবে। এর পরিণতি ভয়াবহ হবে। এছাড়া এখন আর আমি কিছু ভাবতে চাই না।'

'আপনাকে বের করা হচ্ছে না সালার আওরিজী! আপনি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন'–সিপাহসালার বললেন।

'সবার আগে তো আমিই ফৌজ থেকে বের হবো'–আওরিজী বললেন– 'আমি মুজাহিদ। ইসলামের দুশমনের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য ফৌজে শামিল হয়েছিলাম। আপনার মতো সুলতানের তোষামোদের জন্য নয়।'

'আপনি আমাকে অপমান করছেন আওরিজী! আমিও মুজাহিদ। তোষামুদে নয়।'

'চুপ করুন দুজনেই! আপনাদের দু'জনকে ঝগড়ার জন্য আমি ডাকিনি' –বরকিয়ারক বললো।

'সুলতানে মুহতারাম!'-সালার আওরিজী বললেন- 'আপনি আমার সত্য কথা পছন্দ করুন আর না করুন তার কোন পরওয়া নেই আমার। আমি যা বলছি আপনার ব্যক্তির জন্য বলছি না আপনার সালতানাতের নিরাপত্তার জন্য বলছি। এই সালতানাত শুধু আপনারই নয়...আমারও...এবং একমাত্র আল্লাহর। ফৌজের ব্যাপারে আপনি ভুল সিদ্ধান্ত নিলে সালারদের মধ্যে যারা এই ফয়সালাকে ভুল মনে করবে তারা রুখে দাঁড়াবে এবং সিপাহসালার হিজাযীর হুকুম মানবে না। হিজাযী আপনাকে খুশী করতে চান আর আমি চাই আল্লাহকে খুশী করতে।'

★★★★

একদিন রায় এর আমীর আবু মুসলিম রাজী তার দফতরে প্রশাসনিক কাজে মগ্ন ছিলেন। দারোয়ান এসে তাকে জানালো, দু'জন লোক এসেছে। তাদের সঙ্গে একটি মেয়ে আছে। আবু মুসলিম তখন এদেরকে ভেতরে ডাকালেন।

'এই মেয়েকে আমরা আপনার কাছে সোপর্দ করতে এসেছি। আমরা মুসলমান নই। এই মেয়ে মুসলমান'-দু'জনের একজন বললো।

'কে এই মেয়ে? কোত্থেকে এনেছো একে? আর আমাকেই বা ওর সঙ্গে জড়াচ্ছো কেন?'

'আমার নাম হামীরা'-মেয়েটি বললো-আমি কহস্তানের রঈস মুনাওয়ারুদ্দৌলার বোন।'

'কহস্তান তো বাতিনীদের দখলে এখন। তুমি কি করে পালালে?' আবু মুসলিম রাজী জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনি অনুমতি দিলে আমি সব খুলে বলতে পারি'-হামীরা বললো- 'সবার আগে আমি আল্লাহর পরে এই লোকগুলোর প্রশংসা করছি যারা মুসলমান না হয়ে আমাকে পরম নিরাপদে এখানে নিয়ে এসেছে।'

আবু মুসলিম রাজীর অনুমতি পেয়ে হামীরা পুরা ঘটনা তাকে শোনালো।

'আমি কি করে বিশ্বাস করবো তুমি যা বলেছো সব সত্য?'-আবু মুসলিম জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ আপনি সন্দেহ করতে পারেন। ঐ বৃদ্ধ পাদ্রীও সন্দেহ করেছিলেন।... আর আমার কাছেও এমন কোন কিছু নেই যা দিয়ে আমার কথা সত্য বলে প্রমাণ করবো।'

'আপনি যদি আমাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে সন্দেহ করেন'-দু'জনের একজন বললো- 'এবং এই মেয়েকেও অবিশ্বাস করেন তাহলে আমাদের দু'জন কয়েদখানায় বন্দি করুন। যখন আপনার বিশ্বাস হবে তখন ছেড়ে দেবেন আমাদের।'

রাজী ওদের জন্য খাবার দাবারের ব্যবস্থা করলেন। তারপর আরো অনেক কথা বললেন ওদের সাথে।

'তুমি তাহলে আমার এখানেই থাকো হামীরা।'-রাজী বললেন হামীরাকে- 'তোমার আর কোন আশ্রয় থাকলে সেখানে পাঠিয়ে দিতাম।'

'তাহলে আমার একটি কথা শুনুন'-হামীরা বললো- 'আমি এখানে আপনার আশ্রয়ে অসহায়ের মতো বসে থাকবো না। আমার পরিবারের প্রত্যেকের খুনের বদলা

নেবো এই বাতিনীদের কাছ থেকে। বাতিনীদের বিরুদ্ধে আমাকে যেভাবে ইচ্ছা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। এজন্য আমার প্রাণ উৎসর্গ করলাম।'

হামীরাকে নিয়ে আসা সেই দুই লোককে আবু মুসলিম রাজী অতি দামী কিছু উপঢৌকন দিয়ে বিদায় করে দিলেন।

রায় অনেক বড় শহর। এই শহরে অনেক বড় একটি বাণিজ্যিক এলাকা আছে। গ্রাম থেকে আসা এই দুইজন বাজার দিয়ে যাওয়ার সময় এত বড় বাজার দেখে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো। সাজানো গুছানো দোকানগুলো ওদের কাছে ভালো লাগলো। 'এই যে ভাইয়েরা!' ওদের কানে ভেসে এলো। চেয়ে দেখলো এক লোক হাসিমুখে ওদের কাছে আছে-'তোমরা মনে হয় বড় লম্বা সফর করে এসেছো!'

'হ্যাঁ ভাই! আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি। এখন ফিরে যাচ্ছি'-তাদের একজন বললো।

'কিছু কিনতে চাও এই দোকান থেকে?'-সে লোক ওদেরকে জিজ্ঞেস করলো।

'না। দেখতে ভালো লাগছে তাই দেখছি। আমরা বন জঙ্গলের মানুষ এগুলো কিনে করবো কি?'

'কোন কিছু তোমাদের ভালো লাগলে বলো। তোমরা পরদেশী। তোমাদেরকে আমি উপহার দিতে চাই।'

'কেন কেন? আমদেরকে উপহার দিতে চাও কেন?'-এক মুসাফির সন্দিগ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'তোমাদের কাছ থেকে আমি আর কি দাম নেবো!'-সে লোক বললো- 'আমার স্বভাব এটা। কোন সরলমনা মুসাফিরকে দেখলেই আমি তার কুশল জিজ্ঞেস করি। জিজ্ঞেস করি, যাতে তার কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমি তাকে সাহায্য করতে পারি।'

'আমাদের কোন কিছুর প্রয়োজন নেই বন্ধু!'-একজন বললো- 'তুমি আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করেছো এই যথেষ্ট।'

'তাহলে আমাকে একটু খুশী করার জন্য হলেও আমার সঙ্গে এসো। আমি তোমাদেরকে এই শহরের এক বিশেষ শরবত পান করিয়ে বিদায় দিতে চাই'-লোকটি বললো।

লোকটির চাপাচাপিতে এরা দু'জন তার সঙ্গে গেলো। চমৎকার করে সাজানো একটি শরবতের দোকানে সে এদেরকে নিয়ে গিয়ে বসালো। লোকটি এদের কাছে নিজেকে এমনভাবে তুলে ধরলো যেন মানুষের সেবা করা ছাড়া দুনিয়ায় আর কোন কাজ নেই তার। 'তোমাদের সঙ্গে একটি মেয়ে ছিলো। তোমরা গিয়েছিলে আমীরে শহরের কাছে। মেয়েটি মনে হয় শাহী খান্দানের না?-লোকটি একথা জিজ্ঞেস করে মেয়েটির পরিচয়ও জিজ্ঞেস করলো।

জঙ্গলের সেই বৃদ্ধ পাদ্রী এ দু'জনকে শুধু বলে দিয়েছে একে আমীরে শহর আবু মুসলিম রাজীর কাছে দিয়ে আসবে। তিনি একথা বলে দেননি, যদি কেউ এই মেয়ের পরিচয় জানতে চায় তাহলে সাবধানে এড়িয়ে যাবে। কিছু বলবে না।

তাই এই পরোপকারী দোকানি যখন এদের কাছে মেয়ের পরিচয় জানতে চাইলো, এরা তখন হামীরার বিস্তারিত তথ্য কথায় কথায় ফাঁস করে দিলো। হামীরার প্রয়োজনীয় তথ্য জানার পর লোকটি এদের দু'জনকে এমন একটি মেয়েকে শয়তানের হাত থেকে বাঁচানোর ব্যাপারে অবদান রাখার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় করে দিলো।

লোক দু'জন চলে যাওয়ার পর ঐ লোকটি দৌড়ে বাজারের পাশের একটি বাড়িতে গিয়ে ঢুকলো। সেখানে তার মতো আরো তিনজন বসে আছে।

'পেয়ে গেছি ভাই মাল! পেয়েছি ওকে।'–লোকটি বললো।

'কাকে?'

'হামীরাকে! আমীরে শহর আবু মুসলিম রাজীর মহলে এখন সে। এই মাত্র দু'জন লোক ওকে ওখানে পৌঁছে দিয়ে গেলো।'

'আলমোত তাহলে কে যাবে? আজই কেউ রওয়ানা হয়ে গেলে ভালো হয়। ইমাম খুশী হয়ে যাবেন।'

'তিনি শুধু হামীরার খোঁজ পেয়েই খুশী হবেন না। এখন হুকুম আসবে এই মেয়েকে অপহরণ করে আলমোত পৌঁছে দাও।'

এক বাতিনী সফরের জন্য প্রস্তুতি নেয়া শুরু করলো।

★★★★

কিছু দিন পর সুলতান বরকিয়ারকের ছোট ভাই মুহাম্মদ রায়-এ আবু মুসলিম রাজীর কাছে এলো। আবু মুসলিম মুহাম্মদকে দেখে এমনভাবে জড়িয়ে ধরলেন যেমন বাবা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে। মুহাম্মদ দারুণ সুদর্শন হয়ে উঠছে। বাবা মালিক শাহর মতোই এই ছেলে দৃঢ়চেতা–জযবাদীপ্ত।

''বলো মুহাম্মদ! মারুর অবস্থা কি?'–রাজী জিজ্ঞেস করলেন।

'খুব খারাপ'–মুহাম্মদ বললো– 'আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন মা ও ওযীরে আজম সামিরী। সুলতান বরকিয়ারককে না জানিয়ে এসেছি। বরকিয়ারক এখন তার স্ত্রীর হাতের মুঠোয়। সে তার মাথায় যা ঢোকার তাই সালতানাতের জন্য হুকুম বনে যায়। আমাকে ও সানজারকে তিনি ভাই মনে করা ছেড়ে দিয়েছেন। আমাকে বলেছেন, তোমাকে কোন পদ দিয়ে দেবো কিন্তু আমার পথে দাঁড়াবে না। এতো পারিবারিক ব্যাপার। তিনি ভয়ংকর এক হুকুম জারী করেছেন। ফৌজের অর্ধেকাংশ ছাটাই করে দিতে বলেছেন।'

'কি বললে?'–রাজী চমকে উঠে বললেন– 'সে এত বড় ভয়াবহ বেকুফিতে নেমে এসেছে?...

তোমার মা ও ওযীরে আজম তাকে বাঁধা দেয়নি?'

'সবাই বাধা দিয়েছে। কারোটাই শোনেন না তিনি। যে ভয়াবহ বিপদ এগিয়ে আসছে সে ব্যাপারে তো তিনি বেখবর। তাই আপনাকে আমি সতর্ক করতে এসেছি। আর আমার আসার কারণ হলো আপনার কাছ থেকে পরামর্শ নেয়াও।'

'হ্যাঁ মুহাম্মদ! তুমি যে বড় ভয়াবহ খবর শুনিয়েছো!'

'সেখানে তো এখন গৃহযুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। ফৌজ থেকে যাদেরকে ছাটাই করা হবে তাদেরকে তো আলাদা করা হচ্ছে। এসব ফৌজদের কথা হলো, আমরা জীবিকা না পাই কোন অসুবিধা নেই। সালতানাতের নিরাপত্তার জন্য বাতিনীদের খতম করবোই আমরা। কারণ বাতিনীদের চিরতরে খতম করার জন্য আমাদেরকে ফৌজে নেয়া হয়েছিলো।... আরেকটি সমস্যা হলো নায়েবে সালার আওরিজী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন। তিনি ওযীরে আজমকে বলেছেন, সিপাহসালার হিজাযীর বিরুদ্ধে রীতিমতো তিনি লড়বেন এবং ফৌজের কমাণ্ড তার হাতেই রাখবেন।'

'সিপাহসালার হিজাযী তোষামুদে লোক। মরহুম সুলতান মালিক শাহ কিভাবে তাকে সিপাহসালার বানিয়েছেন জানি না আমি। সে তো তোষামুদি ছাড়া কিছুই জানে না।'

'তিনি সুলতান বরকিয়ারকের সব ভুল ফয়সলা মাথা পেতে মেনে নেন এবং অন্যকেও মানতে বাধ্য করেন। আওরিজী ও তার মধ্যে তো এখন শত্রুতা তৈরী হয়ে গেছে।'

'আওরিজী দৃঢ়চেতা এক মুজাহিদ। সে যা বলেছে তা করে দেখাবে। কিন্তু এটা তো ভয়ংকর অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে।'

'ওযীরে আজমের গুপ্তচররা তাকে জানিয়েছে বাতিনী সন্ত্রাসীরা উভয় দিকের ফৌজকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উস্কানি দিচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, ছাটাইকৃত ফৌজের সঙ্গে অন্যান্য ফৌজের লড়াই বাঁধাবে এরা। শহরবাসীও এ নিয়ে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। যে কোন দিন এর বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

'আমাকে ভাবতে দাও অবস্থা এখন এমন নয় যে, তড়িৎ কোন পরামর্শ দিতে পারবো আমি। এ মুহূর্তে তোমাকে শুধু এ নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, সর্বাবস্থায় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। প্রয়োজন হলে ছাটাইকৃত ফৌজকে এখানে ডেকে এনে নতুন করে প্রস্তুত করবো এবং সুলতান বরকিয়ারকের গদি উল্টে দেবো। যা হোক তুমি এখানে কয়েকদিন থাকো। চিন্তা করে কিছু না কিছু একটা বের করবো আমি।'

এ বিষয়ে আরো কিছু কথা হলে হাসান ইবনে সবার কথাও আসলো। তখন কথা প্রসঙ্গে আবু মুসলিম রাজী মুহাম্মদকে শোনালেন, হামীরা কি করে হাসান ইবনে সবার কবল থেকে ছুটে এসেছে এবং এখন হাসান ইবনে সবা থেকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য কেমন ব্যাকুল! এরপর রাজী হামীরাকে ডাকিয়ে এনে মুহাম্মদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

'হামীরা!'–আবু মুসলিম রাজী বললেন– 'মুহাম্মদ কিছু দিন এখানে থাকবে। তোমার বুকে যে যন্ত্রণা তার বুকেও একই যন্ত্রণা। তাকে ভালো করে আপ্যায়ন করো। আর নির্দিষ্ট কামরায় নিয়ে যাও।'

হামীরা ও মুহাম্মদ কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো।

তারা চলে যাওয়ার পর আবু মুসলিম রাজী হারিয়ে গেলেন গভীর চিন্তার রাজ্যে। মুহাম্মদ এটা উপলব্ধিও করতে পারবে না যে, মারুর ঐ খবর শুনিয়ে বিশ্বদর্শী আমীর আবু মুসলিম রাজীর ভেতর কেমন ঝড় বইয়ে দিয়েছে। দুশ্চিন্তায়-অস্থিরতায় তিনি

একবার বসছেন দাঁড়াচ্ছেন আবার ঘরময় পায়চারী করছেন। অনেকক্ষণ পর ক্লান্ত হয়ে তিনি দারোয়ানকে ডেকে বললেন, মজিদ ফাদেলকে ডেকে আনো।

মজিদ ফাদেল একজন অসাধারণ বিজ্ঞদর্শী রাজনীতিবিদ ও দেশের শ্রেষ্ঠ আলেমদের একজন। আবু মুসলিম রাজী তাকে তার প্রশাসনের কার্যকরী উপদেষ্টার মর্যাদা দেন।

একটু পর একটি পাল্কি আবু মুসলিম রাজীর হাবেলিতে নামলো। আবু মুসলিম রাজী বাইরে বের হয়ে মজিদ ফাদেলকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

'খুব পেরেশান দেখাচ্ছে। কোন জটিল সমস্যা...' মজিদ ফাদেল বসতে বসতে বললেন।

'হ্যাঁ জটিল না হলে আপনাকে তো কষ্ট দিতাম না। যে আশংকা নিয়ে আমরা কয়েকবারই আলাপ করেছি তাই মেঘের কালো পাহাড় হয়ে সেলজুকি সালতানাতকে গ্রাস করে ফেলেছে। যার মধ্যে হাজারো বজ্র পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। সে তো আপনি নিজেও জানেন এখন তা থেকে কত রক্ত-মেঘ বর্ষিত হবে'–আবু মুসলিম রাজী বললেন।

'আর কোন খবর এসেছে?'

একটু আগে মুহাম্মদ তাকে যা শুনিয়েছে আবু মুসলিম তা ফাদেলকে শোনালেন।

'বরকিয়ারক কি কিছুই বুঝতে পারছে না?'–মজিদ ফাদেল জিজ্ঞেস করলেন।

'না। আমি নিজে ওর সঙ্গে কথা বলেছি। যে তার শ্রদ্ধেয়া মার কথা শোনে না, নিজের স্ত্রীকে মাথায় উঠিয়ে রাখে, আমার কথায় তার কি ক্রিয়া হবে...যে আশংকা আমরা করেছিলাম এখন তাই হচ্ছে। বরকিয়ারক এখন অর্ধেক ফৌজ ছাটাই করছে। কিছু দিন পর বাকী ফৌজ থেকেও আরো অর্ধেক তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিবে। আর ছাটাই করা ফৌজের মধ্যে তো বটেই শহরবাসীর মধ্যেও প্রচণ্ড ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছে। গৃহযুদ্ধ যেন অত্যাসন্ন।

'এ নিয়ে আপনি ভেবেছেন কিছু?'

'আমি যাই ভেবেছি, আমার ভাবনা ভুল হলে আপনি আমাকে সঠিক পথে নিয়ে যাবেন। আর সঠিক হলে আমাকে আরো সুচিন্তিত পরামর্শ দেবেন। আপনাকে এখানে এনে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্য এটাই।'

'ঠিক আছে আপনার চিন্তা ভাবনার কথা বলুন।'

'আমি পরিষ্কার গৃহযুদ্ধের আশংকা করছি। মুহাম্মদকে বলেছি, ছাটাই করা ফৌজ যদি বিদ্রোহ করে বসে এবং তাদের ওপর জুলুম নির্যাতন শুরু হয়ে যায় তাহলে ওদেরকে আমি এখানে নিয়ে এসে নতুন করে গড়ে তুলবো। তারপর বরকিয়ারকের ফৌজকে শায়েস্তা করবো।'

'আমি আপনার মতের সাথে একমত'–মজিদ ফাদেল বললেন– 'তবে আগ বাড়িয়ে আপনাকে কিছু করতে আমি নিষেধ করবো। এরা কি করে তা আগে দেখতে হবে আপনাকে। এরা যদি জুলুম নির্যাতনের পথে যায় তাহলে আমাদের কর্তব্য হবে সরকারী ফৌজ যাতে ধ্বংস না হয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। আপনার উদ্দেশ্য হবে বরকিয়ারককে অপসারণ করে মুহম্মদকে তার পিতার আসনে বসিয়ে দেয়া।'

'আমার উদ্দেশ্য এটাই মুহতারাম! এতো কখনো হতে পারে না যে, একজনকে গদি থেকে নামিয়ে আমি নিজে তার গদির ওপর বসে যাবো এবং আরেক ভাইকে বঞ্চিত করবো। মুহম্মদ ও সানজার এক মহান পিতার সন্তান। তাদের বাবা সুলতান মালিক শাহ ও আমি একই মঞ্জিলের মুসাফির'–আবু মুসলিম রাজীর গলা ভারী হয়ে এলো এবং তার চোখ ফেটে অশ্রু বেরোতে লাগলো।

'আমি যে খবর পাচ্ছি তাতে আমি নিশ্চিত গৃহযুদ্ধ হবেই'–ফাদেল বললেন– 'আমার এক ছাত্র গুপ্তচর। মারু থেকে তাই নিয়মিতই খবর পাই আমি। বাতিনী সন্ত্রাসীতে সারা শহর ভরে যাচ্ছে। এতো নিশ্চিত যে, হাসান ইবনে সবাই রুজিনাকে পাঠিয়েছে। জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা বলছে আমাকে, নারীরা পৃথিবীতে যে ধ্বংস ডেকে এনেছে সাম্রাজ্যবাদী সম্রাটরাও সেই ধ্বংস সাধন করতে পারেনি। তবে ঘনিষ্ঠ পুণ্যময় স্ত্রী ও স্নেহবতী মায়ের কোমল পরশে এই নারীই কিন্তু পৃথিবীকে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরে তুলেছে। কিন্তু হাসান ইবনে সবা এই শুদ্ধতার প্রতীক নারীকেই দুনিয়ার সবচেয়ে বিষধর সাপে পরিণত করেছে। বরকিয়ারকের ঐ নববধূও তেমনি এক বিষধর নাগিনী।'

'আচ্ছা ঐ মেয়েকে খুন করালে কেমন হয়?'–আবু মুসলিম রাজী ফাদেলকে জিজ্ঞেস করলেন।

'বরকিয়ারক তখন হিংস্র জন্তু বনে যাবে। তার মাকে খুন করবে। ছোট দুই ভাইকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করবে। সে জানে আপনি এই মেয়েকে কি চোখে দেখেন। আপনাকেও খুন করবে সে। আমার মতে বরকিয়ারকের এই ভুলের পরিণাম ওকে দেখতে দিন। রক্ত যে ঝরবে এতে কোন সন্দেহ নেই। সে নিজ চোখে দেখুক, তার খান্দান ও পুরো সালতানাতের ধ্বংসের কারণ সে-ই। তার স্ত্রী নয়।'

'এই মেয়ে শুধু এখন সালতানাতের সম্রাজ্ঞীই নয় সে রাষ্ট্রীয় কোষাগারও শূন্য করে দিচ্ছে। সালতানাতের অর্থভাণ্ডার চলে যাচ্ছে আলমোত। খুব দ্রুত আমাদের কিছু করা উচিত।'

'এ বোঝা আপনার মাথায় চাপাবেন না'–মজিদ ফাদেল বললেন– 'হাসান ইবনে সবা তাড়াহুড়া করছে। এক নারীর মাধ্যমে সে চাল দিচ্ছে। সে সফলও হবে। তাকে সফল হতে দিন। কারণ গৃহযুদ্ধ হবেই। গৃহযুদ্ধের সব আয়োজন শেষ করে ফেলেছে ওরা। আর নায়েবে সিপাহসালার আওরিজীও সঠিক চিন্তা ভাবনাই করছে। তাই এই গৃহযুদ্ধকে আপনি বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করবেন না। করলে আপনার শক্তির অপচয় তো ঘটবেই এবং দুশমনদের কালো তালিকাতেও আপনার নাম উঠে যাবে। তারপর খবর বের হবে, রায়ের আমীর আবু মুসলিম রাজী কতল হয়ে গেছেন। আপনি মুহম্মদকে মারু পাঠিয়ে দিন। তাকে বলে দিন তার এখানে আসার কথা যাতে কেউ জানতে না পারে।'

'আমরা তো আসলে ইসলামকে পৃথিবীতে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সমৃদ্ধি দানের কাজে ডুবে ছিলাম। কিন্তু এখন এই সালতানাতকে ধ্বংসের কবল থেকে বাঁচাতে হিমশিম খাচ্ছি।'

'আসলে এসব ফেতনা সৃষ্টি করা হয়েছে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য'–মজিদ ফাদেল বললেন–'ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিপ্লব। আল্লাহ তাআলা কেয়ামত পর্যন্ত এ ধর্মকে চিরস্থায়ী করেছেন। তবে বাতিল-অপশক্তিও তার ভিত দুর্বল করতে থাকবে।

ভাববেন না যে, হাসান ইবনে সবার কাছে যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেয়েরা আছে তারা শুধু অপহৃতই, বরং ইহুদী খ্রিষ্টানরাও নিজেদের সেরা সুন্দরী মেয়েদেরকে হাসান ইবনে সবার কাছে পাঠাচ্ছে। খ্রিষ্টানরা তো বটেই বিশেষ করে ইহুদীরা সব যুগেই ইসলামের প্রাণপাতের জন্য তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে...।

'কিন্তু ভয়াবহ ব্যাপার হলো, স্বয়ং মুসলমানরাই এখন ইসলামের বিকৃতি সাধনে উঠে পড়ে লেগেছে। ক্ষমতা আর ব্যক্তি প্রতিষ্ঠার ভূত এমনভাবে তাদের ওপর সওয়ার হয়েছে যে, ইসলামের চরম শত্রুর সঙ্গেও তারা হাত মেলাতে কুণ্ঠিত হচ্ছে না। খেলাফত ছিলো ইসলামী সৌন্দর্য ও সততাবোধের কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু সেই খলীফা এখন কোথায়?... খেলাফত এখন পরিবারতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। এ ব্যাপারে শরীয়তের কঠোর ন্যায়ভিত্তিক নীতিমালা ছিলো সবচেয়ে বড় বাধা। হাসান ইবনে সবা সেই বাধাটাই দূরে সরিয়ে বলছে এটাই আসল ইসলাম। আর মানুষের স্বভাব হলো, সে কোন অনুশাসনকে পছন্দ করে না। কারণ এতে তার কুপ্রবৃত্তির খোরাক নেই। যা হোক, মারুর প্রতি আপনার দৃষ্টি সজাগ রাখুন। আর সব সময় নিজেকে প্রস্তুত রাখুন। আমি সবসময় আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবো।'

আবু মুসলিম রাজী ও মজিদ ফাদেল ইস্পাহানী যখন গভীর আলোচনায় মগ্ন তখন আরেক কামরায় সুলতান বরকিয়ারকের ছোট ভাই মুহাম্মদ ও হামীরা মুখোমুখি বসে।

'মুহতারাম রাজীর কাছে তোমার কথা খুব অল্পই শুনেছি। তোমার সব কথা আমি জানতে চাই'–মুহাম্মদ হামীরাকে বললো।

হামীরা ধীরে ধীরে তার সব কথা মুহাম্মদকে শোনালো। কথা বলার সময় কখনো তার চোখ অশ্রুতে ভরে গেলো। কখনো সে ডুকরে উঠলো। কখনো আবার প্রতিশোধ স্পৃহায় তার চোখ মুখ আগুন লাল হয়ে উঠলো।

'ইসলামে তোমার মতো নারীই প্রয়োজন'–মুহাম্মদ গভীর কণ্ঠে বললো–তবে প্রতিশোধ নিতে চাইলে তোমার মনোবল দৃঢ় করতে হবে পুরুষদের মতো। মেয়েদের মতো কান্নাকাটি করে নয়।'

'আমি একা কি করতে পারবো?'

'অনেক কিছু। এক বীর পুরুষের মতোই তুমি সাহসী–নির্ভীক। কিন্তু যতদিন আমরা পুরুষরা বেঁচে থাকবো মেয়েদেরকে কোন বিপদে জড়াবো না। মুহতারাম রাজীকে আমি যা জানিয়েছি তুমি তো তা শুনেছো। তুমি হয়তো অনুভব করতে পেরেছো, আমার ও তোমার জযবা এক–অভিন্ন। আমার বড় ভাই এখন মুসলমানদের এই সালতানাতের জন্য বড় ক্ষতিকর বস্তু হয়ে উঠেছে। এই সালতানাতকে আমরা ইসলামের এক সুরক্ষিত দুর্গ বানিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের মহান পিতার মৃত্যুর পর সেই দুর্গের ইটগুলো খসিয়ে নিচ্ছে বাতিলরা।... এখনো আমি কাঁচা বয়সের। বিজ্ঞদের মতো কথা বলা আমার সাজে না। তবুও তোমাকে বলছি, যেভাবে তুমি ভয়কে জয় করেছো আজীবন সেভাবে নিজেকে নির্ভীক রাখবে। ভয়কে যদি প্রশ্রয় দিতে তাহলে একজন পুরুষকে নদীতে ফেলে দিয়ে আলমোত থেকে এ পর্যন্ত পৌছতে পারতে না।'

'এই দেশ কি বাতিনীদের খতম করতে পারবে?'–হামীরা জিজ্ঞেস করলো।

'করতে পারতো। আমার মহান পিতার জীবনের লক্ষ্যই ছিলো... বাতিনীদের বিনাশ... কিন্তু আমার বড় ভাই বাবার গদিতে বসে বাতিনীদের খতম না করে নিজ পিতার মহান উদ্দেশ্যকে খতম করে দিচ্ছেন।'

'সেটা কিভাবে?'

'এভাবে যে, তিনি বাতিনীদের কোলের পুতুল হয়ে গেছেন এখন। সবার প্রচন্ড বিরোধিতা উপেক্ষা করে এক বাতিনী মেয়েকে বিয়ে করেছেন। ঐ বাতিনীর নাম রুজিনা। রুজিনা তোমার চেয়ে সুন্দরী নয়। কিন্তু তাকে এমন জাদু শেখানো হয়েছে যে, এই সালতানাত এখন তার মুঠোয়।'

'এই মেয়েকে কি শেষ করে দেয়া যায় না? কেউ না করলে আমাকে দিন এই কাজ। যে পর্যন্ত এক বাতিনীর খুনে আমার হাত রঞ্জিত না হবে এক দন্ডের জন্যও শান্তি আসবে না আমার। আমার বড় ভাই, মা ও ছোট ভাই বোনদের খুনের প্রতিশোধ নেবোই আমি।'

'আর আমি আমার বাবার খুনের বদলা নেবো। বাতিনীরা তাকে বিষ দিয়ে মেরেছে। কিন্তু কথা হলো দু'একজনকে কতল করে কিছুই হবে না। কাউকে কতল করা তো মুশকিলের কিছু নয়। রুজিনাকে আমি নিজেই কতল করতে পারি। কিন্তু এর পরিণামে আমার ভাই বরকিয়ারক আমাদের সবাইকে খুন করাবেন। তিনি তো এখন অন্যের হাতের ক্রীড়নক।'

'আমি ভেবেছিলাম, এক গরিব মেয়ে সেজে রুজিনার বাঁদি হয়ে যাবো, তারপর তাকে সহজেই বিষ দিয়ে মারতে পারবো। কিন্তু আপনি যা বললেন তা বুঝতে পেরেছি।'

'তুমি এখানেই থাকো। নিজেকে উত্তেজিত করো না। যেখানে প্রয়োজন অনুভব করবো তোমাকে ডেকে নেবো।'

'আমি আর কত দিন এখানে পড়ে থাকবো? আমীরে শহরের কাছে মেহমান হয়ে থাকতে আমার আর ভালো লাগছে না। তিনি হয়তো একদিন বিরক্ত হয়ে উঠবেন আমার প্রতি। আমার যে কোন ঘর নেই, ঠিকানা নেই, আশ্রয় নেই।'

'এমন কথা চিন্তা করো না। তোমার মতো মজলুম মেয়েরা এখানে হরহামেশাই আসছে। কেউ তোমাকে এখানে অসম্মান করবে না।'

'কিন্তু মানসিক কোন বন্ধন যে আমি এখানে পাই না'–বলতে বলতে হামীরার চোখ পানিতে ভরে গেলো–'আমার ভাই শহরের রঈস ছিলেন। বড় শাহী জীবন কাটিয়েছি তখন।'

'এর চেয়ে শাহী জীবন হবে তোমার ইনশাআল্লাহ'–মুহাম্মদ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো– 'নিজের ব্যাপারে এত পেরেশান হয়ো না।'

'আপনি নিশ্চয় বিবাহিত'–হামীরা নতমুখে মুহম্মদকে জিজ্ঞেস করলো।

'না হামীরা'–মুহম্মদ মুচকি হেসে বললো– 'বিয়ের চিন্তাও করিনি এখনো। মা অবশ্য ভাবছেন এ নিয়ে। কিন্তু সালতানাতের এই চরম অবস্থায় এসব ভাববার অবসর কোথায়'?

হামীরা কিছু বললো না। তার দৃষ্টি মুহাম্মদের মুখের ওপর আটকে গেলো। তারপর তা নুয়ে পড়লো। সে যেন কিছু বলতে চাচ্ছিলো।

'আচ্ছা হামীরা!'–মুহম্মদ জিজ্ঞেস করলো– 'তোমার জীবনে কি তোমার পছন্দের কেউ এসেছিলো?'

'আমার জীবনের ভুলতো এটাই। আপনাকে বলেছিলাম, যাকে আমি আমার মনে তুলেছিলাম তাকেই নিজ হাতে নদীতে ফেলে দিয়েছি... তার নাম জাবের বিন হাজিব...তখন ভালোবাসার কথা শুনলেও আমার বুক কেঁপে উঠে। চোখ দিয়ে মানুষের বাহিরটাই দেখা যায় ভেতরটা দেখা যায় না। আমার চোখ আমাকে ধোঁকা দিয়েছে'।

'কিন্তু আমার চোখ আমাকে ধোঁকা দিচ্ছে না'–মুহম্মদ আনন্দ চাপা গলায় বললো–'আমার চোখ তোমার অন্তর পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে। বলতে পারবো না তোমার বাহ্যিক রূপ সৌন্দর্যে আমি প্রীত হয়েছি, না তোমার সেই বীরত্বপূর্ণ গল্প শুনে মুগ্ধ হয়েছি, নাকি এই সব মিলিয়ে আমি এত আলোড়িত হয়েছি যে, তোমাকে এখানে একলা ছেড়ে যেতে মন চাচ্ছে না।'

এ কথায় হামীরার মুখ লাল হয়ে উঠলো। মাথা নিচু করে বললো– 'এ যদি আপনার মনের কথা হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি, আমার জীবনের এই অসহায়ত্ব ও শূন্যতা আপনার ভালো লাগায় ভরে দিতে পারবে।'

কথায় কথায় দু'জনের মন এক সময় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো। 'মুহতারাম রাজী বড় দূরদর্শী লোক'–মুহাম্মদ একটু পর গাঢ় গলায় বললো– 'তিনি আমাদের দু'জনকে এই কামরায় বিনা উদ্দেশ্যে পাঠাননি। আমর মা তাকে কয়েকবার বলেছিলেন। আমাদের খান্দানের উপযুক্ত দুলহান তালাশ করে দিতে...তবে হামীরা প্রেম তার জায়গায়। আমাদের দু'জনের মনে যে জযবা তোলপাড় হচ্ছে অগ্রাধিকার পাবে সেটাই।'

'এজন্য তো আমি আমার ভালোবাসাও বিসর্জন দিতে রাজী'–দীপ্তকণ্ঠে বললো হামীরা।

দু'জনের কথার মাঝখানে দারোয়ান এসে জানালো, আবু মুসলিম মুহাম্মদকে ডাকছেন। মুহাম্মদ তখনই আবু মুসলিমের কামরায় চলে এলো।

'বেটা মুহম্মদ!'–আবু মুসলিম রাজী বললেন– 'কাল সকাল সকাল তুমি মারু রওয়ানা হয়ে যাও। সেখানকার খবর নিয়মিত পাঠাবে আমাকে। তোমার নিজের আসার প্রয়োজন নেই। আর নিজেকে একা মনে করো না... নায়েবে সিপাহসালার আওরিজীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখো... আর বলো হামীরার ব্যাপারে তোমার মতামত কি?'

'প্রতিশোধের চিন্তা ওকে পেরেশান করছে এবং খুব নিঃসঙ্গ বোধ করছে'–মুহাম্মদ বললো।

'মেয়েটি বড় কাজের'–রাজী রহস্যভরে বললেন– 'আর যে ওর নিঃসঙ্গতার কথা বলছো এর চিকিৎসা তোমার কাছেই আছে। ঠিক আছে এখন যাও। আর মনে রেখো, এই মেয়েকে আমি নষ্ট হতে দেবো না।'

মুহাম্মদ ও হামীরার সাক্ষাতের অনেক আগেই হাসান ইবনে সবা হামীরার খবর জেনে যায়। হাসান ইবনে সবা এরপর বড় নির্দয় এক হুকুম দেয়। তার এক ফেদায়েনকে ডেকে বলে, ওকে অপহরণ করে আলমোত নিয়ে এসো। তারপর তার

অর্ধেক দেহ মাটিতে গেঁথে তার মুখে ও শরীরে মধু মেখে বিষাক্ত পিড়ার স্তূপ ছেড়ে দাও তার ওপর। এতে তার ধুঁকে ধুঁকে মরতে পাঁচ ছয় দিন লাগবে। এই ফাঁকে আমার বেহেশতের সমস্ত মেয়েরা এ দৃশ্য দেখার সুযোগ পাবে। তারা আর কোন দিন হামীরার মতো দুঃসাহস দেখাবে না।

★★★★

সিপাহসালার আবু জাফর হিজাযী বরকিয়ারকের হুকুম অনুযায়ী ফৌজ ছাটাই শুরু করে দিয়েছেন। সুলতান মালিক শাহ যে ফৌজকে বাতিনীদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য তৈরী করেছিলেন ছাটাইয়ের টার্গেট তারাই। ছাটাইকৃত ফৌজদেরকে সৈন্যদুর্গ থেকে সরিয়ে একটি বিশাল ময়দানে আলাদা ছাউনি তৈরী করে রাখা হচ্ছিলো। যত কিছুই হোক, এক কাপড়ে তো আর তাদেকে বিদায় করা যাবে না। বেতন-ভাতার বকেয়াসহ নানান হিসাব নিকাশ বাকী। ছাটাইকৃত সৈন্যসংখ্যা ষোল সতের হাজারও ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। এদের কাছ থেকে তাদের ব্যবহারের ঘোড়া ও অস্ত্র আগেই নিয়ে নেয়া হয়।

অধিকাংশেরই জীবিকার মাধ্যম ছিলো এই সৈন্যের চাকুরী। এই হাজার হাজার লোকের জীবিকা মাধ্যম ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই তারা হতাশ ও ক্ষুব্ধ। তাদের একটাই প্রশ্ন, কোন অন্যায়ে তাদেরকে বের করে দেয়া হচ্ছে? ফৌজে যাদেরকে রাখা হচ্ছে তারা কি আমাদের চেয়ে বেশি যোগ্য? সবার মুখে এই খেদোক্তি ফিরছিলো–

'আমাদেরকে তো বলতো বাতিনীদের খতম করতে হবে।'

'এখন আমাদেরকেই খতম করা হচ্ছে।'

'নয়া সুলতানের স্ত্রী বাতিনী।'

'নয়া সুলতান হাসান ইবনে সবার শিষ্য বনে গেছে।'

এসব বিক্ষুব্ধ আওয়াজে ময়দানের এই সেনা ছাউনি এখন অগ্নিময়। এরা এমনিই তো অন্যায়ভাবে ছাটাই হয়ে ফুটন্ত পানির মতো রাগে টগবগে। তারপর আবার কিছু বাতিনী শহরবাসীর ছদ্মবেশে এসে তাদের মধ্যে এই গুজব ছড়াতে শুরু করে যে, যেসব ফৌজের চাকরী বহাল আছে তারা চাকরিচ্যুত ফৌজের ব্যাপারে বলে বেড়াচ্ছে, এরা বুযদিল আর দুশ্চরিত্র বলেই এদেরকে ফৌজ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। এই গুজব শুনে ছাটাইকৃত ফৌজ উত্তেজনায় এমনভাবে ফেটে পড়লো যে, তাদের কাছে হাতিয়ার থাকলে তখনই মূল সেনাদুর্গে আক্রমণ করে বসতো।

এদের একমাত্র সহমর্মী নায়েবে সিপাহসালার আওরিজী। তিনি একদিন এদের ছাউনিতে গেলে সবাই তাকে ঘিরে ধরে প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করলো যে, এমনিই তো অন্যায়ভাবে তাদেরকে ফৌজ থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে, তারপর আবার শহরে রটানো হচ্ছে, এরা বুযদিল-কাপুরুষ আর বদচরিত্রের লোক। আওরিজী তাদেরকে শান্ত করতে অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা আরো অগ্নি-উত্তপ্ত হতে লাগলো। অবশেষে আওরিজী প্রতিশ্রুতি দিলেন সিপাহসালার হিজাযীর সঙ্গে এখনই তাদের ব্যাপারে আলাপ করবেন। তারা যেন শান্ত থাকে।

তিনি তখনই সিপাহসালার হিজাযীর কাছে গিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলেন।

'ভাই আওরিজী!'-সিপাহসালার আসল কথা না বোঝার ভান করে বললেন- 'আমি জানি তুমি ফৌজ ছাটাইয়ের পক্ষে নও। কিন্তু আমি হয়রান হচ্ছি, তুমি আমার ওপর ও বহাল রাখা ফৌজের ওপর এমন ভিত্তিহীন অপবাদ কেন আরোপ করছো!

'মুহতারাম সিপাহসালার'!-আওরিজী রাগ সামলে নিয়ে বললেন- 'সুলতানকে আপনি অবশ্যই খুশী করবেন। কিন্তু আপনার বুদ্ধির মুখে এমন পর্দা ঝুলাবেন না যে, ভালো মন্দের মধ্যে কোন তারতম্য করতে পারছেন না। আমি কেন অপবাদ দিতে যাবো। আপনাকে আমি সতর্ক করতে এসেছি, শত্রু পক্ষের লোকেরা চাকরিচ্যুত ফৌজদের মধ্যে গুজব ছড়াচ্ছে। আমি জানি আপনার ফৌজ এসব কথা বলেনি। আমিও ফৌজের সালার। আমার ব্যক্তিগত গুপ্তচর দ্বারা আমি সব কিছু জেনে যাই। বাতিনী সন্ত্রাসীরা অপপ্রচার চালিয়ে উভয় পক্ষের ফৌজের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধাতে চাচ্ছে।'

'তাহলে তুমি নিজেই ওদেরকে বলো না এসব গুজব। তোমরা এসবে বিশ্বাস করো না। কিন্তু ভাই আওরিজী! এগুলো আসলে গুজব নয়। ওরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে এসব ছড়িয়েছে। কারণ, ওদেরকে ফৌজ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। আমি জানতে পেরেছি ওরা নাকি উল্টো হুমকিও দিচ্ছে। কেউ কেউ তো বলছে, যাদেরকে ফৌজে বহাল রাখা হচ্ছে ওদেরকে ওরা ফৌজে থাকার উপযুক্ত রাখবে না!'

আওরিজী সিপাহসালারকে অনেক বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে, এটাও দুশমনরাই ছড়িয়েছে। কিন্তু সিপাহসালার হিজাযী আওরিজীর কোন কথা তো শুনলো না, উল্টো আওরিজীকে অভিযুক্ত করলেন, তিনি নিজেই এগুলো বানিয়ে বলছে।

এর দুদিন পর গভীর রাতে বহাল রাখা ফৌজের এক কর্মকর্তা নিজের কামরায় খুন হয়ে গেলো। ঘুমের মধ্যেই তাকে পেটে ও বুকে খঞ্জরের আঘাতে খুন করা হলো। সকাল হতেই এই খুনের ঘটনা সারা সেনা দুর্গে ছড়িয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে এ গুজবও বাতাসে ভাসতে লাগলো যে, ছাটাইকৃত ফৌজদেরকে বহাল রাখা ফৌজ বুযদিল ও কাপুরুষ বলায় তারা এই খুনের মাধ্যমে তাদের অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছে। এই গুজব চাওর হতেই বহাল রাখা ফৌজের কেউ কেউ বলতে লাগলো, আমরাও ছাটাইকৃত ফৌজের সঙ্গে এমন ব্যবহার করবো এবং তাদের ঘরে তাদের লাশ পৌছতে থাকবে।

ফৌজের মধ্যে এমন খুনের ঘটনা এই প্রথম ঘটলো। সিপাহসালার হিজাযী তার নায়েবে সিপাহসালার আওরিজীকে নিয়ে সুলতান বরকিয়ারকের ওখানে গিয়ে হাজির হলেন। বরকিয়ারক তখন জাগলেও বিছানা ছাড়েনি। তাই ভেতরে তাদের আসার খবর গেলে রুজিনা বাইরে এসে বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো এত সকালে কেন তারা এখানে এসেছে?

'এত সকালে আসার কারণে মাফ চেয়ে নিচ্ছি আমরা'-হিজাযী অনুগত ভৃত্যের মতো মাথা গুঁজ করে বললো- 'এক সেনাকর্মকর্তা গত রাতে খুন হয়ে গেছে। সুলতানে মুহতারামকে এই খবর দিয়ে তার হুকুম নেয়া জরুরী।'

রুজিনা ভেতরে চলে গেলো। একটু পর ওদের দু'জনকে ভেতরে ওদের শোয়ার ঘরে নিয়ে গেলো। সুলতান বরকিয়ারক তখনও ঘুমে ঢুলছে।

‘কোন দুর্ভাগা খুন হয়েছে’?–বরকিয়ারক জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করলো।

‘আমাদের এক সেনা কর্মকর্তা মুহতারাম সুলতান!’–হিজাযী বিস্তারিত জানালো।

‘তাহলে খুনিকে বের করে তার গর্দান উড়িয়ে দিন’।

‘মহামান্য সুলতান! ছাটাইকৃত ফৌজেরই কেউ খুনী’–হিজাযী বললেন।

‘সুলতানে মুহতারাম!’–আওরিজী বলে উঠলেন– ‘এটা বাতিনীদের মিথ্যা গুজব। আমাকে অনুমতি দেয়া হলে আমি বলতে পারি, এ মুহূর্তে উভয় ভাগের ফৌজের মধ্যে কেমন উত্তেজনা বিরাজ করছে এবং শহরবাসীও দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে।’

এতে হিজাযী আওরিজীর বিরুদ্ধাচরণ শুরু করলেন। এদের তর্কবিতর্কে বরকিয়ারকের মুখে বিরক্তি ফুটে উঠলো। দু'জনের কেউ কারো কথা শুনতে চাচ্ছিলেন না।

‘সুলতান’!–রুজিনা হঠাৎ দু'জনের ঝগড়ার মাঝখানে বলে উঠলো– এই দু'জনের কথায় আপনি কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবেন না। একমাত্র পথ হলো, হয় খুনীকে পাকড়াও করা হোক যা প্রায় অসম্ভব অথবা ছাটাইকৃত ফৌজ থেকে দু'জনকে ধরে সমস্ত ফৌজের সামনে জল্লাদের মাধ্যমে তাদের গর্দান উড়িয়ে দেয়া হোক। আর ঘোষণা করে দেয়া হোক এ দু'জন অমুক সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করেছে। তখন আর ভবিষ্যতে কেউ এমন কাজের দুঃসাহস দেখাবে না।’

‘শুনেছেন আপনারা! এই নির্দেশ পালন করুন’–সুলতান বরকিয়ারক বললো।

‘খুব সুন্দর ফয়সালা সুলতানে মুহতারাম!’–হিজাযী বললেন– ‘আজ আমি দু'জনকে ধরে কয়েদখানায় ভরে রাখবো। কাল সকালে জল্লাদ দিয়ে ওদেরকে হত্যা করাবো।’

নায়েবে সিপাহসালার আওরিজী কিছুই বললেন না। তার কথা শোনার মতো এখানে কেউ নেই। এরা শুধু সেলজুকি সালতানাতের কপালে ধ্বংস তিলক এঁকে দিচ্ছে।

★★★★

পরদিন সিপাহসালার হিজাযী পনের ষোলজন সশস্ত্র সিপাহী নিয়ে সেনাছাউনি থেকে দু'জন নিরপরাধ সিপাহীকে ধরে নিয়ে কয়েদখানায় বন্দী করলো।

চাকরিচ্যুত সমস্ত ফৌজের কানে এ খবর যেতে সময় লাগলো না। পনের ষোল হাজার এই সাবেক ফৌজের মধ্যে যেন আগুনে ঝড় উঠলো। সেখান থেকে দু' তিনজন সাবেক সেনা কর্মকর্তা আওরিজীর কাছে গিয়ে এই সংবাদ দিলো। আওরিজী তখনই সিপাহসালার হিজাযীর ঘরে গিয়ে হাজির হলেন।

‘আমি জানি তুমি কেন এসেছো’–হিজাযী অলস গলায় বললেন– ‘তুমি বলবে নিরপরাধ দু'জনকে পাকড়াও করা হয়েছে। কিন্তু হুকুম তো তোমার সামনেই দিয়েছেন সুলতান।

‘আপনার জায়গায় আমি হলে কখনো এই অমানবিক নির্দেশ মানতাম না। হিজাযী! আপনি কার গোলাম বনে গেলেন? কেন আপনি বুঝছেন না ক্ষমতা আপনার হাতেও আছে। সুলতানের ক্ষমতাকে আমরাও স্বীকার করি। ইসলাম বলেছে, আমীরের আনুগত্য করতে। তবে এ হুকুমও দিয়েছে যে, আমীর কোন অন্যায় হুকুম দিলে তা মানা যাবে না’–আওরিজী বললেন।

'আওরিজী ভাই! আল্লাহর ওয়াস্তে এটা মেনে নাও। ঐ সাধারণ দুই সৈন্যের মাথা আমরা না কাটলে আমাদের মাথা কাটা হবে।'

'ঐ সাধারণ সিপাহীদের জন্য আমি আমার মাথা কাটতে তৈরী আছি। আমার মনে হয় আপনাকে অযথাই এসব বলছি আমি। আমাকে বলুন, সত্যিই কি ওদেরকে আপনি হত্যা করবেন?'

'তাহলে ওদেরকে বন্দী করলাম কেন? কাল সবার সামনে ওদের গর্দান কাটা হবে।'

'আপনাকে আমি একটা পরামর্শ দিচ্ছি। এটাই আমার আপনার সঙ্গে শেষ কথা। এরপর অবস্থা কোন দিকে যাবে আমি বলতে পারবো না। আপনি এক কাজ করুন, কাল ঐ দুই সিপাহীকে কয়েদখানা থেকে গোপনে ঘরে পাঠিয়ে দিন। আপনার সঙ্গে আমি সুলতানের কাছে গিয়ে বলবো, আমাদের দু'জনের সামনে কয়েদখানায় ওদেরকে কতল করে ওখানেই দাফন করে দেয়া হয়েছে।'

'তারপর সুলতান কি বলবেন জানো? বলবেন, আমার হুকুম মতো সমস্ত ফৌজের সামনে কেন ওদেরকে কতল করা হলো না?'

'এর জবাব আমি দেবো। বলবো, সবার সামনে ওদেরকে কতল করা হলে দুদিকের ফৌজের মধ্যে ফ্যাসাদ বেঁধে যেতো। কারণ, সবাই জানে ওরা নিরপরাধ।'

'ভাই আওরিজী! হুকুম সুলতানের নয়। সুলতানের বেগমের। ঐ মহিলা কয়েদখানা থেকে জেনে নেবে তার হুকুম পালন করা হয়েছে কি না। তুমি চুপ থাকো। তাহলে আমাদের দু'জনের জন্যই ভালো হবে।'

আওরিজী কিছু বললেন না। মাথা নামিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। অনেকক্ষণ পর একেবারে বদলে যাওয়া কণ্ঠে বললেন–

'কাল ওদেরকে কোথায় এবং কখন মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে? আপনার সঙ্গে আমাকে থাকতে হবে। না হয় আপনি মারা পড়বেন।'

'জিন্দাবাদ আওরিজী!'–হিজাযী খুশী হয়ে বললেন– 'তোমার কাছে এটাই আমি আশা করছিলাম। তোমার এই সহযোগিতার জন্য সারা জীবন তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো। আমি তো জানি আমার হাত দিয়ে কি পাপ করানো হচ্ছে।'

'আল্লাহ ক্ষমাকারী। আপনি অপারগ। আল্লাহ আপনাকে মাফ করে দেবেন...ওদেরকে মৃত্যুদন্ড কোথায় দেয়া হবে?'

'সময় ও স্থান তুমি নিজেই ঠিক করে দাও'–হিজাযী প্রত্যয়ের গলায় বললেন– 'তুমি যে স্থান নির্ধারণ করবে আমি তা মেনে নেবো।'

আওরিজী তারপর সিপাহসালার হিজাযীর সঙ্গে করমর্দন করে সেখান থেকে বের হয়ে এলেন।

পরদিন সকালের সূর্য উঠলো এক অমানবিক দৃশ্যপটের সাক্ষী হওয়ার জন্য। বিশাল এক ময়দানের এক দিকে ছাটাইকৃত পনের ষোল হাজার ফৌজ দাঁড়ানো। আরেক দিকে দাঁড়ানো বর্তমান ফৌজের সারি। তাদের মাঝখানে এক প্রৌঢ় আরেক

যুবককে দাড় করিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। দু'জনের কাছ ঘেষে খোলা তলোয়ার নিয়ে দুই জল্লাদ দাঁড়িয়ে আছে। এদের দু'জনকে একটু পর হত্যা করা হবে। ফৌজি সারির পেছনে ভিড় করে আছে শহরের লোকেরা। আসামী দু'জনের মধ্যে যে প্রৌঢ় তার স্ত্রী ও ছোট ছোট দুটি বাচ্চা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তারা গলা ছেড়ে কাঁদছে।

সিপাহসালার হিজাযী ঘোড়ায় করে নিরপরাধ দুই আসামীর কাছে গিয়ে ঘোষণা করলেন, ফৌজের যে একজন কর্মকর্তা খুন হয়েছে, তার খুনী হিসেবে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণে এ দুজন সাব্যস্ত হয়েছে। সবার সামনে এদের মৃত্যুদন্ড কার্যকরী করা হচ্ছে।

'সিপাহসালার মিথ্যা বলছেন'—প্রৌঢ় সিপাহিটি চিৎকার করে বলে উঠলো— 'তাকে জিজ্ঞেস করো কোন বিচারক এই রায় দিয়েছেন।'

এক জল্লাদ তার কথা শেষ হতেই তার মুখ চেপে ধরলো। আর কোন উচ্চবাচ্য হলো না।

সিপাহসালার এক দিকে চলে গেলেন। দুই জল্লাদ দুই সিপাহীকে কাঠের পাল্লায় মাথা রেখে আসন করে বসালো। আর মাত্র কয়েক মুহূর্ত পর এই নিরপরাধ প্রাণ দুটি দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে। হঠাৎ দুই জল্লাদের হাতের দুই তলোয়ার তাদের মাথার ওপর উঠলো। হাজার হাজার ফৌজসহ লক্ষাধিক মানুষের মধ্যে যে ফিস ফিস গুঞ্জন চলছিলো তা থেমে গেলো। এক ভুতুড়ে নিস্তব্ধতা নেমে এলো। তখনই শোঁ শোঁ আওয়াজে দুটি তীর ছুটে এলো। পরমুহূর্তেই হাজার হাজার হতভম্ব চোখ দেখলো দুই জল্লাদ বিদ্ধ তীর নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে।

'কে? কে তীর ছুঁড়লো?'—হিজাযীর ভয় ও ঘাবড়ে যাওয়া গলা ভেসে এলো— 'এখনি ওকে পাকড়াও করো।'

ফৌজের মধ্যে সামান্য তৎপরতা দেখা গেলো। এক কোণ থেকে নায়েবে সিপাহসালার আওরিজী ঘোড়া ছুটিয়ে সেই দুই সিপাহী ও দুই মৃত জল্লাদের কাছে এসে থামলেন।

'খবরদার!'— আওরিজী উঁচু কণ্ঠে বললেন— 'কেউ নড়বে না। আল্লাহ তাআলা ন্যায় বিচার করে দিয়েছেন। এরা দু'জন নিরপরাধ লোক। সিপাহসালারকে জিজ্ঞেস করো ওদের মৃত্যুদন্ড কোন বিচারক দিয়েছেন? কার সাক্ষ্য প্রমাণে এই রায় দিয়েছেন...? তোমরা কি মুসলমান? যাকে ইচ্ছা তাকে ধরে খুনের অপবাদ দিয়ে তাকে হত্যা করার অনুমতি কি ইসলাম দেয়? তোমরা কি সবাই কাফের হয়ে মরতে চাও?'

চারদিক আবার নীরব হয়ে গেলো।

'কয়েকজন এসে তোমাদের এই মাজলুম দুই সঙ্গীকে নিয়ে যাও'—আওরিজী ছাটাইকৃত ফৌজকে লক্ষ্য করে বললেন।

★★★★

সিপাহসালার হিজাযী সেখান থেকে সোজা চলে গেলেন সুলতান বরকিয়ারকের কাছে। নায়েবে সিপাহসালার আওরিজীর এই দ্রোহমূলক আচরণে খুশিই হলেন। কারণ সালার আওরিজীকে এই উপলক্ষে তার পদ থেকে বরখাস্ত করার জন্য সুলতান বরকিয়ারককে তিনি বুক ফুলিয়ে বলতে পারবেন।

'কাজ শেষ করে এসেছেন হিজাযী?'–সুলতান বরকিয়ারক হিজাযীকে দেখে বললো– 'দর্শকদের মধ্যে ভীতি তো ছড়িয়ে গেছে... এখন আর কেউ কাউকে কতল করবে না।'

'গোস্তাখী মাফ সুলতানে মুহতারাম!'–সিপাহসালার হিজাযী সুলতানের ইশারায় বসতে বসতে বললেন– 'আপনার হুকুম পালন করা যায়নি।'

'কেন?'–সুলতান যেন লাফিয়ে উঠলো– 'কেন হুকুম পালন করা যায়নি?'

'তীর মেরে দুই জল্লাদকে মারা হয়েছে।'

'কে মেরেছে? তীরন্দায কে ছিলো। আপনি কি তাকে পাকড়াও করেননি?'

সিপাহসালার হিজাযী সুলতানকে পুরো ঘটনা শুনিয়ে সালার আওরিজীকে সবচেয়ে বড় দেশদ্রোহী ও গাদ্দার হিসেবে সাব্যস্ত করেন।

'মহামান্য সুলতান!'–হিজাযী বললেন– 'সে অনেক করে আমাকে প্ররোচিত করেছে আমি যেন সুলতানের হুকুম না মানি এবং ঐ দুই সিপাহীকে ঘরে পাঠিয়ে দিই।'

'এত বড় দুঃসাহস'?–সুলতান অগ্নিশর্মা হয়ে বললো– 'ওকে কয়েদখানার ভূতলের সেই কামরায় নিক্ষেপ করো যেখানে বিষাক্ত সব পোকামাকড় রয়েছে।'

'সে সুলতানকে অপদস্থ করেছে'–রুজিনা চড়বড়িয়ে বলে উঠলো– 'দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাও ওকে... এখানে ডেকে আনো। তার হাতে পায়ে শেকল পরিয়ে বাজারে বাজারে ঘুরিয়ে ঘোষণা করা হোক সে সুলতানের সাথে গাদ্দারী করেছে।'

'হ্যাঁ তাকে এখানেই ডেকে আনুন'–সুলতান তার স্ত্রীর হুকুম পুনরাবৃত্তি করলো।

সিপাহসালার হিজাযী যখন বরকিয়ারকের কাছে যাওয়ার জন্য রওয়ানা দেন আওরিজী তখন তার ডেরায় ফিরে আসেন। তার সঙ্গে তখন সাবেক ফৌজের কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা ছিলো।

'বন্ধুরা!'–সালার আওরিজী তার ডেরায় ঢুকে সেই চার পাঁচজনকে বললেন– 'আমি জানি হয় আমাকে জল্লাদের হাতে তুলে দেয়া হবে না হয় আজীবন কারাদন্ড দেয়া হবে। যাই হোক আমাকে আগে কয়েদখানায় নিয়ে যাবে। আমি তাই তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি আমার অনুপস্থিতিতে তোমাদের কি করতে হবে। আমরা তো বেশ এগিয়েই গিয়েছি। কিন্তু ভয় পাচ্ছি তোমরা আমার নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে হতাশ হয়ে পড়ো কিনা।'

'আমরা আপনার নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হবো না'–এক প্রৌঢ় ফৌজি কর্মকর্তা বললো–

'পুরো আশাবাদী আমরা যে, আপনাকে জল্লাদ পর্যন্ত পৌছতে দেবো না আমরা।'

'তোমাদেরকে আমি আরেকটি গোপন কথা বলছি'–আওরিজী বললেন– 'সুলতান মালিক শাহর দ্বিতীয় ছেলে মুহাম্মদ ও ছোট ছেলে সাঞ্জার আমাদের সঙ্গে আছে। আমার গ্রেফতারীর পর যা কিছুই হবে তার সব কিছু মুহাম্মদ রায়ের আমীর আবু মুসলিম রাজীর কাছে পৌঁছে দেবে। আমার অনুপস্থিতিতে আবু মুসলিম রাজীই হবেন তোমাদের সালার ও নেতা।'

আওরিজীর কথা শেষ হওয়ার একটু পরেই বরকিয়ারকের লোক এলো তাকে ডেকে নিয়ে যেতে।

'আমি যাচ্ছি এখন'–আওরিজী তার লোকদেরকে বললেন– 'ঘোড়া তৈরি করো। আর আমার মুহাফিজ হিসেবে দু'জন আমার সাথে চলো। যে কোন সালার তার মুহাফিজ নিজের সঙ্গে রাখতে পারে। আমাকে যে শাস্তি-দন্ড দেয়া হবে দুই মুহাফিজ সেখান থেকেই জানতে পারবে। তারা এসে এখানে শাস্তির কথা শোনাবে। তারপর তোমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।... আমি যাচ্ছি। তোমাদের সাহায্যকারী আল্লাহ।'

আওরিজী যখন ঘোড়ায় চড়ে হাবেলির দরজা দিয়ে বের হতে যাবেন এমন সময় তার স্ত্রী ও মেয়ে পথরোধ করে দাঁড়ালো।

'যাবেন না'–মেয়ে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে কান্নাচাপা কণ্ঠে বললো– 'আপনি যা করেছেন সুলতান তার জন্য আপনাকে জীবিত রাখবেন না। যে কোন ভাবেই হোক পালিয়ে যান এখান থেকে। আমরা আপনার পেছন পেছন পৌঁছে যাবো।'

'আমি পালানোর পথ করে দিচ্ছি'–তার স্ত্রী এগিয়ে এসে বললেন– 'সুলতানের সামনে যাবেন না। সে আপনার ধড় দেহ থেকে আলাদা করে ফেলবে।'

'পেরেশান হয়োনা বেটি! আমি জানি তুমি দৃঢ়চেতা এক নারী। আমি যা করছি আল্লাহকে ভরসা করে এবং বুঝে শুনে করছি। ভেতরে যাও এবং আমার জন্য দুআ করো'–একথা বলে তিনি ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

সালার আওরিজী সুলতান বরকিয়ারকের কামরায় ঢুকলেন ঋজু ভঙ্গিতে। মাথা নত করলেন না। স্পষ্ট স্বরে শুধু সালাম দিলেন।

বরকিয়ারক তার সালামের জবাবও দিলো না এবং বসতেও বললো না।

'একি সত্য যে, তুমি দুই জল্লাদকে তীরন্দায দিয়ে মেরে ফেলেছো?'–সুলতান তাকে জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ সুলতানে মুহতারাম! জল্লাদকে আমি মারিয়েছি'–আওরিজী আস্থাপূর্ণ গলায় বললেন।

'তুমি কি জানতে না আমার হুকুমে ঐ দুই সিপাহীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হচ্ছিলো?'

'জানতাম সুলতানে মুহতারাম!'

'তারপরও তুমি কেন আমার হুকুম পালনের সময় বাঁধা দিলে?'–বরকিয়ারক হুংকার ছাড়লো।

'কারণ মৃত্যুদণ্ড দেয়ার যে শর্ত আল্লাহ তাআলা আরোপ করেছেন তা আপনি পূরণ করেননি... আপনি শুধু ঐ নিরপরাধ দুই সিপাহীকেই নয় আল্লাহ ও তার রাসূলের হুকুম হত্যা করছিলেন।'

'এখানে শুধু আমার হুকুমই চলে।'

'আর আমি এক মুসলমান হিসেবে শুধু আল্লাহর হুকুমই মানি... এই সালতানাত আপনার নয়, আল্লাহ প্রদত্ত সালতানাত। ইসলামী সালতানাতে শুধু ইসলামী বিধানই চলবে। আপনি আমাকে হুকুম দিন যে, তোমার পেটে তলোয়ার ঢুকিয়ে দাও। তাহলে এই সালতানাতের কল্যাণ হবে– আমি তখন এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে হুকুম পালন করবো।'

'তোমার মুখ বড় লম্বা'–রুজিনা বলে উঠলো– 'এই সালতানাতে এমন দরাজ যবানের কারো জায়গা নেই। তুমি সালারের উপযুক্ত নও।'

'মুহতারামা!'–আওরিজী কাষ্ঠ হেসে বললেন– 'এটা আলমোত নয়, মারু। বাতিনীদের নয় এটা মুসলমানদের সালতানাত। হাসান ইবনে সবার হুকুম তো এখানে চলবে না।'

'খামোশ বদতমিয!'–বরকিয়ারক খেউ খেউ করে উঠলো– 'এই গোস্তাখীর জন্য এমন শাস্তি দেবো তোমাকে, যে দেখবে শিউরে উঠবে সে।'

'কান খুলে শুনে নাও সুলতান'–আওরিজী বললেন– 'আমি জানি আজকের দিন আমার শেষ দিন। আমি শুধু ভয় পাই আল্লাহকে। তোমার জল্লাদের হাতে আমার মাথা কাটলে তা আল্লাহর কাছে গিয়েই হাজির হবে।'

'এই বেয়াদবকে সালারের পদ থেকে হটিয়ে দিন'–রুজিনা বললো।

'না রুজিনা! ওকে শুধু পদচ্যুতই করবো না, আরো শাস্তি দেবো তাকে' বরকিয়ারক বললো।

'আমার সালারের পদ তুমি দাওনি, তোমার বাপ দিয়েছিলেন'–আওরিজী বললেন– 'তুমি আমার সালারী ছিনিয়ে নিলেও আমার জাতির সালার থাকবো আমি। এই সালতানাতের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য আমি আমার দায়িত্ব পালন করে যাবো। ঐ শহীদদের আত্মার কাছে আমি দায়বদ্ধ যাদের তপ্ত খুন এখনো এই সালতানাতের শিকড়ে লেগে আছে।'

'আমি এর চেয়ে বেশি অপমান সহ্য করতে পারবো না। শুনে নাও আওরিজী.

'এই মহিলা'–আওরিজী বরকিয়ারককে থামিয়ে দিয়ে বললেন– 'এই মহিলা সুলতানের জন্য সবচেয়ে বড় অপদস্থের বিষয়'–'এ জামার হাতার সাপ'–তারপর তিনি হিজাযীর দিকে ইংগিত করে বললেন– 'আর সুলতানের আরেক হাতার সাপ হলো এই লোক। শিগগিরই তুমি তা জানতে পারবে।'

'মহামান্য সুলতান! ওকে এখনই শাস্তির কথা শুনিয়ে দিন'–হিজাযী তড়পে উঠে বললেন।

'ওকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন না'–রুজিনা বললো– 'সে কয়েদখানায় পচে গলে মরুক। মরার আগে ওকে মাঝে মধ্যে শিকল-সুদ্ধ শহরে বের করে লোকদের সামনে দাড় করিয়ে বলা হবে, এ হলো বিদ্রোহ ও গাদ্দারীর শাস্তি।'

বরকিয়ারক আওরিজীকে এই শাস্তিই শুনিয়ে দিলো এবং বললো, ওর তলোয়ার ছিনিয়ে নাও।'

'এই নাও তলোয়ার সুলতান'!-আওরিজী তার তরবারি বরকিয়ারকের দিকে নিক্ষেপ করে বললেন- 'আমি যখন জিহাদের ময়দানে পা দিই তুমি তখন মায়ের দুধ পান করতে। এ হাত তলোয়ার থেকে কখনো শূন্য থাকবে না। আল্লাহই এ হাতে তলোয়ার ফিরিয়ে দেবেন।'

বরকিয়ারক অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। দেখাদেখি রুজিনাও।

'এর বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে'-বরকিয়ারক বললো- 'ওকে আমি কালো কুঠরীতে পাঠাচ্ছি। যেখানে কেউ এক বছরও জীবিত থাকে না। আল্লাহ্ নাকি ওর হাতে তলোয়ার দেবে...আরে দুর্ভাগা! তলোয়ার এলেও তোমার হাতে আসবে না, তা থাকবে জল্লাদের হাতে এবং তোমার মাথা...নিয়ে যাও ওকে'।

'দাড়াও'-রুজিনা বললো- 'আমাদের সামনেই ওর হাত পিছমোড়া করে বাঁধো। বাইরে নিয়ে পায়ে শিকল দেবে। আর ঘোড়ায় করে নয় পায়দল নিয়ে যাবে ওকে। এমন ধীরে ধীরে হাঁটবে যাতে লোকদের বিরাট এক ভিড় তোমাদের পেছনে লেগে যায়। এরপর বাজারের খোলা জায়গায় নিয়ে দাঁড় করিয়ে লোকদেরকে বলবে, ওকে গাদ্দারী আর বিদ্রোহের শাস্তি দেয়া হচ্ছে।'

'নিয়ে যাও ওকে'-বরকিয়ারক বললো-

'সুলতান!'-সালার আওরিজী মুচকি হেসে বললেন- 'আমি ফিরে আসবো... ইনশাআল্লাহ... তখন তুমি সুলতান থাকবে না।'

★★★★

আওরিজীকে যখন বাইরে বের করা হলো তখন তার মুহাফিজরা তাকে শিকলে বাঁধা দেখে বুঝে গেলো তাকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারা সেখান থেকে তাদের গন্তব্যের দিকে ঘোড়া ছুটালো।

হিজাযী বারজন ঘোড়সওয়ার মুহাফিজ নিয়ে শিকলে বাধা আওরিজীকে নিয়ে পথে নেমে পড়লো। শিকলের মাথা বাঁধা হয়েছে হিজাযীর ঘোড়ার জিনের সঙ্গে। আওরিজীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পায়ে হাঁটিয়ে। পথচারীদের মধ্যে যারা আওরিজীকে চিনতে পারলো তারা তার এ অবস্থা দেখে প্রথমে একদম হতভম্ব হয়ে গেলো। তারপর পেছন পেছন আসতে লাগলো আর মুহাফিজদেরকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো তার কি অপরাধ? মুহাফিজরা একটাই উত্তর দিচ্ছে। সালার আওরিজী বিদ্রোহ ও গাদ্দারী করেছে।

বাজারে খোলা চকে পৌছতে পৌছতে বাজারের লোকসহ শহরের হাজার হাজার হতভম্ব লোক সেখানে জুটে গেলো। সিপাহসালার হেজাযী লোকদের কাছে বিরাট একটি টেবিল চেয়ে নিলেন। বাজারের চকের মাঝখানে তা রাখা হলো। সেটার ওপর তিনি আওরিজীকে নিয়ে উঠলেন। ঘোড়সওয়ার মুহাফিজরা তাদেরকে ঘিরে সতর্ক হয়ে রইলো।

মাত্র ঘন্টা দুয়েক আগে শহরের আরেক ময়দানে সেই দুই সিপাহীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য সিপাহসালার হিজাযী দুই জল্লাদ নিয়ে এসেছিলেন। শহরের লোকেরা তখন

দেখেছিলো, আওরিজীর কারণে দুই নিরপরাধী সিপাহী বেঁচে গেছে। এতে লোকদের মনে সালার আওরিজীর জন্য বেশ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি জন্মে। সেই আওরিজীকে এখন তারা এই শিকলে বাধা অবস্থা দেখে এবং নেপথ্যে সেই সিপাহসালার হিজাযীকে দেখতে পেয়ে বেশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো। কিন্তু তারা ছিলো সম্পূর্ণই অপারগ।

হিজাযী তার দু' হাত উপরে উঠাতেই লোকজন নীরব হয়ে গেলো।

'এই লোককে ভালো করে চিনে নাও'–হিজাযী আওরিজীর দিকে ইংগিত করে বললেন– 'একে সুলতানে মুহতারাম যাবজ্জীবন কারাদন্ডের শাস্তি দিয়েছেন...জানো কেন?...সে সুলতানের সঙ্গে গাদ্দারী করেছে...এ লোক খুনীদের সঙ্গী। দুই খুনীকে সে মৃত্যুদণ্ড দিতে না দিয়ে দুই জল্লাদকে খুন করিয়েছে, আর ফৌজের মধ্যে সে বিদ্রোহ সৃষ্টি করছে।'

'আর আমার সঙ্গে এই সিপাহসালারকেও চিনে নাও'–আওরিজী হাসতে হাসতে বললেন– 'এ ভোগে মত্ত সুলতানের পদলেহী। সুলতান নয় আমাকে গাদ্দার বানিয়েছে তার বিবি। এই সিপাহসালার হিজাযী সুলতানের বাতিনী স্ত্রীর সামনে সিজদা করে।'

'খামোশ গাদ্দার'–হিজাযী ধমকে উঠলেন– 'নিজের পাপ ঢাকতে যেয়ো না। না হয় এখানেই মুখ বন্ধ করে দেবো।'

'বলতে দিন তাকে'–ভীড় থেকে কয়েকটি আওয়াজ উঠলো– 'কি হয়েছে জানতে চাই আমরা।'

হিজাযী লোকদের আওরিজীর প্রতি সহমর্মী দেখে একটু দমে গেলেন।

'আজ সকালে আমি দুই নিরপরাধ লোককে জল্লাদের হাতে খুন হওয়া থেকে বাঁচিয়েছি'–আওরিজী উঁচু গলায় বললেন– 'এ কর্মকর্তার খুনের খুনী না পাওয়াতে সুলতানের বাতিনী বিবি হুকুম দিয়েছে, সাবেক ফৌজের মধ্য থেকে যে কোন দু'জনকে পাকড়াও করে তাদের গর্দান উড়িয়ে দাও আর লোকদেরকে বলো, এই দু'জনই সেই খুনী।'

'হে শহরবাসী!'–হিজাযী বললেন–'ওর কথা শুন না তোমরা। সে এক জঘন্য অপরাধী।'

লোকজন এবার সবাই এক সঙ্গে শোরগোল করে উঠলো। হিজাযী চুপ মেরে গেলেন।

'হে ইসলামের সেবকরা!'–আওরিজী লোকদেরকে থামিয়ে বললেন– 'এই ইসলামী সালতানাতের হেফাজতের জন্য সবসময় সজাগ সতর্ক থাকো। হাসান ইবনে সবা আসছে। বাতিনীরা এই শহরকে গ্রাস করতে আসছে। এক বাতিনী মহিলা এখন তোমাদের শাসক। বরকিয়ারক তো নামে মাত্র সুলতান!'

একটু আগে মাত্র বরকিয়ারকের মা ও মুহাম্মদ, সাঞ্জার জানতে পেরেছেন, সালার আওরিজীকে বাজারের চকে হেনস্তা করা হচ্ছে। মুহাম্মদ ও সাঞ্জার বহু কষ্টে নিজেদেরকে সামলালো। কিন্তু মাকে সামলানো গেলো না। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। এক খাদেম সুলতানের মাকে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে গেলো।

'মাদারে সুলতান!'–ঐ খাদেম বললো– 'আমি বাজার থেকে আসছি। সালার আওরিজীকে সিপাহসালার হিজাযী চকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। আর লোকে তামাশা দেখছে।'

‘ঐ বেচারাকে অপদস্থও করা হচ্ছে?’

এই বলে তিনি বরকিয়ারকের কামরার দিকে লম্বা লম্বা পা ফেললেন। আর চিৎকার করে বলতে লাগলেন,

‘হায় কোথায় আমার বেমরদ্ বেটা! আমি তো ওকে বৈধভাবে জন্ম দিয়েছিলাম। ওর বাপকে ধোঁকা দেইনি। আমি তো আমার সন্তানের রক্তে কোন কিছু মিশাইনি। সে নাকি আওরিজীকে গ্রেফতার করেছে...এটা ঐ পেত্নীর কাজ’।

রুজিনা নিজ কামরা থেকে তার আওয়াজ শুনতে পেয়ে জানালার পর্দা সরিয়ে দেখতে পেলো বরকিয়ারকের মা এদিকে আসছেন। সে দ্রুত আরেক দিক দিয়ে কামরা থেকে বের হয়ে দারোয়ানকে ডেকে বললো,

‘উনাকে রোখ! বলবে সুলতান শুয়ে আছেন... ভেতরে ঢুকতে দেবে না তাকে।’

দারোয়ান মার পথ রোধ করে রুজিনার নির্দেশিত বাক্য আওড়ালো। কিন্তু মা দারোয়ানকে ধাক্কা দিয়ে একদিকে সরিয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন।

রুজিনা যখন দেখলো, মাকে রোখা যায়নি সে দৌড়ে বাইরে এসে গলায় মায়া মিশিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তিনি এত ক্ষুব্ধ কেন?

‘তোমাদের দারোয়ান কি আমাকে আবার বাঁধা দেবে?’–মা চোখ লাল করে বললেন।

রুজিনা দারোয়ানকে কপট ধমকে বললো, সে কেন তাকে বাঁধা দিয়েছে? সে কি ভুলে গেছে এই মহান নারী কে?... দারোয়ান হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলো রুজিনার দিকে।

‘বরকিয়ারক কি শুয়ে আছে?’–মা রুজিনাকে জিজ্ঞেস করলো।

‘তিনি শুয়ে থাকলেও আপনার জন্য জেগে উঠবেন। আপনি আমার কামরায় এসে বসুন। আমি তাকে উঠিয়ে এখানে নিয়ে আসছি’–রুজিনা বললো।

মা একটু শান্ত হয়ে রুজিনার কামরায় গিয়ে বসলেন। রুজিনা বরকিয়ারকের কাছে এসে জানালো, তার মা উল্টাপাল্টা বকে যাচ্ছে।

‘তাহলে আমি এর কি করতে পারি?’–বরকিয়ারক বিরক্ত হয়ে বললো।

‘সে তো মা’–রুজিনা বললো– ‘তার সম্মান করা ফরজ। কিন্তু সে এক দেশদ্রোহী ও গাদ্দারের পক্ষ নিচ্ছে। আপনি কি সালতানাতের স্বার্থ দেখবেন না মার স্বার্থ?’

‘আমি প্রথমে সালতানাতের স্বার্থ দেখবো। তুমি আমায় বলো, মার কাছে যাবো নাকি যাবো না?’

‘আপনি এখন এখান থেকে সরে গেলে ভালো হয়।’

ওদিকে মুহাম্মদ ও সাঞ্জার যখন জানতে পারলো, তাদের মা রাগে পাগল হয়ে বরকিয়ারকের ওদিকে গিয়েছেন, তারা পেরেশান হয়ে মার পেছন পেছন দৌড়ালো–বরকিয়ারক না আবার মার সঙ্গে অভদ্র কিছু করে বসে! তাদেরকে জানানো হলো, মা অমুক কামরায়। তারা গিয়ে দেখলো, মা ক্ষুব্ধ পায়ে টহল দিচ্ছে কামরায়।

‘চলুন মা!’–মুহাম্মদ তার হাত ধরে বললো– আপনি এখানে কি নিতে এসেছেন? আপনার এই ছেলের মাথা ঠিক নেই।’

'আমি তার মাথা ঠিক করতে এসেছি। আমি ঠিক না করলে তো কে ঠিক করবে?'

'আমরা দুই ভাই করবো। ব্যবস্থা করেছি আমরা। আপনি চলুন এখান থেকে।'

মা যেতে রাজী হচ্ছিলেন না। অনেক কষ্টে মুহাম্মদ ও সাঞ্জার তাকে রাজী করালো যে, তিনি এই কামরায় বসে থাকবেন। আর তারা দু' ভাই বরকিয়ারকের কাছে যাবে।

'আমি কেন যাবো না তার কাছে?'—মার কণ্ঠে জিদ।

'আপনি কেন যাবেন না আমি বলছি। যদি বড় ভাই বরকিয়ারক আমাদের সামনে আপনার সাথে কোন বদতমিযী করেন তাকে আমরা এখানেই শেষ করে দেবো। আপনি কি ভাইয়ে ভাইয়ে এমন রক্তারক্তি পছন্দ করবেন?'

মা চমকে উঠলেন এ কথায়। আস্তে আস্তে মাথা নুইয়ে এলো। তিনি ইংগিত করলেন, আমি এখানে বসছি, তোমরা যাও।

'এসো...বসো'—বরকিয়ারক তার ভাইদের দেখে বললো এবং জিজ্ঞেস করলো—'মার কি হয়েছে? তিনি নাকি চিৎকার করতে করতে এখানে এসেছেন। পাগল হয়ে যাননি তো তিনি?'

'এখনো হননি তবে হয়ে যাবে'—মুহাম্মদ বললো।

'খুব তাড়াতাড়িই হয়ে যাবেন'—সাঞ্জার বললো।

'অথচ আমাকে এখন তিনি পাগল মনে করেন। তিনি কি বলতে এসেছেন?'

'তিনি সালতানাতের ধ্বংসযজ্ঞ সহ্য করতে পারছেন না। সালার আওরিজীকে আপনি এই শাস্তি দিয়ে ভালো করেননি'—মুহাম্মদ বিদ্রুপাত্মক কণ্ঠে বললো।

'কি রুজিনা! ওদেরকে বলো আওরিজী কি অপরাধ করেছে'—বরকিয়ারক বললো।

'আমরা আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি ভাইজান!'—সাঞ্জার বললো।

'তুমি এখনো অনেক ছোট সাঞ্জার! সালতানাতের এসব কিছু বুঝার উপযুক্ত হওনি তুমি।'

'কিন্তু একটা কথা আমি বুঝি— যে পুরুষ তার স্ত্রীর গোলাম হয়ে তার ঘরের সব কিছুর ফয়সালা তার হাতে তুলে দেয় তার ঘরে লাঞ্ছনা অপদস্থতা আর ধ্বংস ছাড়া কিছুই থাকবে না। আপনি শুধু ঘরেরই নয়; এত বড় সালতানাতের ফয়সালাও আপনার বিবির হাতে দিয়ে দিয়েছেন। এর পরিণতিতে আজ শ্রেষ্ঠ এক সালারকে অপমান করা হচ্ছে, তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে'—সাঞ্জার উত্তেজিত হয়ে বললো।

'তোমরা দু'জন আমার একটা কথা মন দিয়ে শোন। রুজিনা আমার দেমাগ। আমার কান...চোখ...সব।'

'সুলতানে মুহতারাম! এটা গর্বের বিষয় নয়। বরং বলুন, আল্লাহ আপনার মস্তিষ্কে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এক মেয়ের মাধ্যমে আপনার চিন্তাশক্তি ছিনিয়ে নিয়েছেন। আপনার চোখে পর্দা পড়ে গেছে'—মুহাম্মদ বললো।

'কি বাজে বকছো মুহাম্মদ!'—বরকিয়ারক ধমকে উঠলো।

'আমি বকছিনা। আমি পবিত্র কুরআনের কথা বলছি। আল্লাহ বলেছেন, যারা নিজেদের পাপকর্ম নিয়ে গর্ব করে তাদের ওপর এই অভিসম্পাত যে, তাদের মস্তিষ্কে কানে ও চোখে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে...নিজের ওপর শয়তানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে'—মুহাম্মদ বললো।

'আপনার চোখ তখন খুলবে যখন বাতিনীরা সেলজুকি সালতানাত দখল করে নিবে'–সাঞ্জার বললো।

'আপনার জায়গায় বসবে হাসান ইবনে সবা। আপনার লাশও পাওয়া যাবে না। আপনাকে শাসন করবে আপনার এই বেগম'–মুহাম্মদ বললো।

'আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। এরা আমার অস্তিত্ব সহ্য করতে পারছে না'–রুজিনা মুখ কালো করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো।

বরকিয়ারক তার পেছন পেছন রুজিনার কামরায় গিয়ে দেখলো, রুজিনা খাটের ওপর উপুড় হয়ে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদছে। বরকিয়ারক রুজিনার হাতে পায়ে ধরে তার কান্না থামালো।

'আমার কারণে আপনার মা আপনার বিরুদ্ধে চলে গেছে। আপনার ভাইয়েরা আপনার দুশমন হয়ে গেছে। আপনার ও এই সালতানাতের ভালোর জন্য আমি কোন নির্জন পাহাড়ে চলে যাবো। সেখানে গিয়ে আপনার জন্য দুআ করতে থাকবো'–রুজিনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললো।

'তুমি বলো আমি কি করবো? যে ফয়সালা তুমি করবে আমি আমার মা ও ভাইদের শুনিয়ে দেবো'–অনুগত ভৃত্যের মতো বললো বরকিয়ারক।

'আমার নিজের কোন কামনা বাসনা নেই। আমি চাই শুধু, সালতানাতের প্রতি আপনার পূর্ণ মনোযোগ নিবিষ্ট হোক এবং সালার আওরিজীর ব্যাপারে যেমন ফয়সালা করেছেন তেমন ফয়সালা করুন। আমি তো আপনাকে মানসিক প্রশান্তি দিচ্ছি। কিন্তু আপনার মা ভাইরা তা বরবাদ করে দিচ্ছে'–রুজিনা বললো।

'তাহলে তুমি চুপ করে থাকো। আমার মার মুখ বন্ধ না হলে তাকে আমি নজরবন্দী করে রাখবো।'

রুজিনার মুখে হাসি ফিরে এলো এবং বরকিযারকেরও ফিরে এলো প্রাণ।

'আপনার ভাইদের বলুন, তারা যেন এক গাদ্দারের পক্ষ না নেয়। না হলে তোমাদেরকেও ঐ গাদ্দারের জায়গায় পৌঁছে দেবো'–রুজিনা বললো।

বরকিয়ারক গট গট করে সেই কামরায় গিয়ে হাজির হলো যেখানে তার ভাইয়েরা বসেছিলো। কিন্তু ভাইয়েরা সেখানে ছিলো না তখন। তারপর অন্য কামরায় গিয়ে দেখলো তার মাও চলে গেছে।

★★★★

সিপাহসালার হিজাযী সালার আওরিজীকে বাজারের চকে দাঁড় করিয়ে অপদস্থ করার কোন চেষ্টাই বাদ রাখেননি। কিন্তু লোকজনের ভিড় থেকে বিভিন্ন উত্তেজিত আওয়াজ উঠতে লাগলো–

'সিপাহসালার হিজাযী মিথ্যা বলছেন।'

'সিপাহসালার নিজেই গাদ্দার।'

'আমরা ইনসাফ চাই।'

লোকদের মধ্যে আরেকবার শোরগোল শুরু হয়ে গেলো। হিজাযী ঘাবড়ে গিয়ে তার সামনে পেছনে তাকাতে লাগলেন।

হঠাৎ সবাই দেখলো, এক মহিলা ঘোড়সওয়ার ঊর্ধ্বশ্বাসে এদিকে ছুটে আসছে। তার হাতে সালতানাতে সেলজুকির ঝাণ্ডা। লোকেরা ঘোড়সওয়ারকে জমায়েতের মাঝখানে পথ করে দিলো। সওয়ার একেবারে হিজাযী ও আওরিজীর সামনে গিয়ে তার গতিরোধ করলো এবং মুখের নেকাব সরিয়ে দিলো... সবাই হতভম্ব হয়ে দেখলো, তিনি বরকিয়ারকের মা!

'প্রিয় দেশবাসী!' –বরকিয়ারকের মা গলায় সমস্ত শক্তি একীভূত করে বললেন– 'এই ঝাণ্ডার দিকে তাকাও। তোমাদের দ্বীন ও ঈমানের প্রতীক এটা। তোমাদের মা-বোন ও কন্যা সন্তানদের আবরু রক্ষার নিশান। এই ঝাণ্ডা ইসলামী বিশ্বের গগনস্পর্শী গর্বের ধন। মুসলমানদের জ্বলজ্বলে অস্তিত্ব রক্ষার অনির্বাণ শিখা চিহ্ন। এই অবিনাশী ঝাণ্ডা ভূলুণ্ঠিত করার জন্য বাতিনীরা আজ তোমাদের মধ্যে মিশে যাচ্ছে। ওদেরকে চিনে নাও। ভালো মন্দকে চিনে নাও... আমাকে চিনে নাও... আমি তোমাদের মা। সুলতান মালিক শাহকে, তার জীবন উৎসর্গী ঈমান ও জযবাকে স্মরণ করো। ভুলে যাও সুলতান আমার ছেলে। ওকে আমার ছেলে বলতে আমি লজ্জাবোধ করি। তোমরা আমার ছেলে। আমার ছেলে বলে যাকে তোমরা চেনো সে এক বাতিনী পেত্নীর কব্জায়...সেলজুকিদের যে ফৌজ নিয়ে তোমরা গর্বিত ছিলে সেই ফৌজি শক্তিকে বাতিনীরা গুড়িয়ে দিচ্ছে। তোমাদের সালার আওরিজী বাতিনীদের প্রতিরোধ করে ফৌজি শক্তি আরো বাড়াতে চেয়েছিলো। এই অপরাধে তাকে বন্দী করা হয়েছে। বন্দী করা উচিত তো এই হিজাযীকে....'

'মুহতারাম মা!'–হিজাযী বরকিয়ারকের মার বাহু ধরে বললেন– 'সুলতানের হুকুম বড় শক্ত। আপনি খামোশ...'

'ছেড়ে দাও আমাকে তোষামুদে গোলাম'–মা তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন– 'প্রিয় শহরবাসী! তোমাদের মধ্যে মিথ্যা গুজব ছড়ানো হচ্ছে। হাসান ইবনে সবা আলমোতে বসে তোমাদের পরস্পরকে লড়াইয়ে নামাচ্ছে...তোমরা চোখ না খুললে বুদ্ধি না খাটালে দেখবে এক ভাই আরেক ভাইয়ের গর্দান কেটে ফেলেছো। আওরিজী অপরাধী নয়। এ দেশের শ্রেষ্ঠ একজন সালার...।'

বরকিয়ারকের মা বলে যেতে লাগলেন। কিন্তু জনতার উত্তেজিত শ্লোগানে তার কথা চাপা পড়ে গেলো। ভয়ে হিজাযী তার দুই মুহাফিজকে কিছু একটা বললো। এক মুহাফিজ কাছে দাঁড়িয়ে থাকা এক ঘোড়ায় আওরিজীকে জাপ্টে ধরে উঠালো এবং নিজেও পেছনে বসে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। হিজাযীও টেবিল থেকে লাফিয়ে আরেকটি ঘোড়ায় চড়লেন এবং ঘোড়া ছুটাতে ছুটাতে মুহাফিজদেরকে কিছু একটা নির্দেশ দিলেন।

মুহাফিজরা সামনে পেছনে বর্শা উঁচিয়ে তাদের ঘোড়া ছোটালো। ছুটন্ত ঘোড়া আর উদ্যত বর্শার সামনে নিরস্ত্র জনতা কিছুই করতে পারলো না। হিজাযীর এই পলায়ন উদ্যোগ দারুণ সফল হলো।

মুহাম্মদ ও সাঞ্জার একটু পর জানতে পারে ওদের মা বাইরে কোথাও চলে গেছেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর জানা গেলো, তার মা এক ঘোড়া নিয়ে হাতে করে ঝাণ্ডা উঁচিয়ে কোথায় যেন গায়েব হয়ে গেছেন। সবার ধারণা তিনি বাজারের চকে চলে গেছেন।

মুহাম্মদ ও সাঞ্জার ঘোড়া দৌড়ে বাজারে গিয়ে দেখলো এক অভাবিত দৃশ্য। তাদের মা এক উঁচু টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। আর লোকেরা তাকে ঘিরে শ্লোগান দিচ্ছে। দুই ভাই টেবিলে চড়ে মাকে সেখান থেকে চলে আসতে বললো।

'দেখো সংগ্রামী জনতা!'–মা তার দু' পাশে দুই ভাইকে দাঁড় করিয়ে তাদের কাঁধে হাত রেখে বললেন– 'আমার এই দুই ছেলেকে ইসলামী সালতানাতের জন্য উৎসর্গ করে দেবো।'

মুহাম্মদ লোকদেরকে শান্ত সুরে বললো, আপনারা নিজেদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন। আপনারা শান্ত হোন। আমরা হাসান ইবনে সবাকে খতম করার প্রস্তুতি নিচ্ছি। কিন্তু অবস্থা দাঁড়িয়ে গেছে এমন যে, হাসান ইবনে সবা আমাদেরকেই খতম করার বন্দোবস্ত করছে। মুহাম্মদের কথা শুনে লোকেরা শান্ত হয়ে ফিরে গেলো।

হিজাযী ছুটতে ছুটতে বার কয়েক পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো, কেউ ধাওয়া করে আসছে কি না। না কেউ আসছে না। কাফেলা এক জঙ্গলে গিয়ে ঢুকলো।

শিকলে বাঁধা আওরিজী এক মুহাফিজের সামনে ঘোড়ার পিঠে বসে জঙ্গুলে পরিবেশ উপভোগ করতে করতে যাচ্ছেন। তার চেহারায় কোন উদ্বেগ উৎকণ্ঠার ছাপ নেই।

কাফেলা একটু পর আঁকাবাঁকা টিলা টক্করের এলাকায় গিয়ে পড়লো। হঠাৎ দু'দিক থেকে অসংখ্য সশস্ত্র মানুষ এই কাফেলার ওপর হামলে পড়লো। হামলাকারীরা প্রথমেই দু' তিনজন মুহাফিজকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিলো। মুহাফিজরাও রুখে দাঁড়ালো। কিন্তু সেখানে লড়াইয়ের মতো যথেষ্ট জায়গা না থাকায় মুহাফিজরা বেশ মুশকিলে পড়লো। তারা ঘোড়া নিয়ে দ্রুত স্থান বদল করতে পারছিলো না। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার মতো অবস্থা হলে মুহাফিজরা ঘোড়া থেকে নেমে লড়াই করতে লাগলো।

'বীর যোদ্ধারা'–সিপাহসালার হিজাযী মুহাফিজদের উদ্দেশ্যে গর্জে উঠলো– 'কয়েদীকে কোনক্রমে হাত থেকে ছাড়বে না। তাকে কয়েদখানায় পৌছে দাও। ঝুলি ভরে পুরস্কার দেবো তোমাদের। লড়তে লড়তে মরে যাও। কয়দী তোমাদের হাত থেকে যদি ছুটে যায় সুলতান সব কটাকে শূলে চড়াবেন।'

মুহাফিজরা হামলাকারীদের ওপর টুটে পড়লো। কিন্তু হামলাকারীরা হঠাৎ পিছু হটতে হটতে অদৃশ্য হয়ে গেলো। হিজাযী মুহাফিজদের একত্রিত করে গুণে দেখলেন পাঁচজন মুহাফিজ কম। হামলাকারীদেরও কয়েকজন মারা পড়ে।

হিজাযীর নির্দেশে মুহাফিজরা তাদের বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকা ঘোড়াগুলো ধরে এনে তাতে সওয়ার হতে লাগলো। আচমকা এক দিক থেকে পাঁচজন হামলাকারী দৌড়ে আসতে লাগলো। মুহাফিজরা ঘোড়াগুলো ছেড়ে হামলাকারীদের মোকাবেলায় সামনে এগিয়ে গেলো। হামলাকারীরা লড়তে লড়তে এমনভাবে পিছু হটতে লাগলো, যেন মুহাফিজদের ওরা ভয় পাচ্ছে। পিছু হটতে হটতে হামলাকারীরা টিলার প্রান্তরে একটি

মোড় পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগলো। মুহাফিজরা তাদের পিছু ধাওয়া করলো। কিন্তু একটু পর তারা তাদের ভুল বুঝতে পারলো। তারা চেয়ে দেখলো হামরাকারীরা ওদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। অল্প সময়ের মধ্যেই এই মুহাফিজরা হামলাকারীদের হাতে মারা পড়লো। দু' একজন খালি পালিয়ে বাঁচতে পারলো।

এদিকে এক মুহাফিজকে নিয়ে সিপাহসালার হিজাযী সালার আওরিজীকে পাহারা দিচ্ছিলেন। তিনি তার মুহাফিজকে বললেন–

'ওকে কোনভাবেই ছাড়বো না আমি। ওরা যদি আমাদের পিছু না ছাড়ে তাহলে এই কয়দীকে আমরা এখানেই কতল করে রেখে যাবো। সুলতান দারুণ খুশী হবেন।'

আওরিজী মুচকি মুচকি হাসছিলেন। তার এই নির্লিপ্ত হাসি দেখে হিজাযী পিত্তজ্বলা মুখে বললেন–

'হ্যাঁ আওরিজী!' এমন দেঁতো হাসি নিয়ে মরতে পারলে দারুণ হবে।'

আচমকা পাঁচ-ছয় জন লোক হিজাযী ও তার মুহাফিজের ওপর প্রায় আছড়ে পড়লো। হিজাযী প্রথমে একটু লড়াইয়ের চেষ্টা করলেও অবস্থা বেগতিক দেখে এক লাফে ঘোড়ায় চড়ে চোখের নিমিষে সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন। আর সঙ্গের মুহাফিজটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলো। সালার আওরিজীকে তারা উদ্ধার করলো অক্ষত অবস্থায়।

★★★★

সুলতান বরকিয়ারক সিপাহসালার হিজাযীকে দেখে হেসে বললো– 'আপনি তো এত বুড়ো ছিলেন না। ক্লান্তি আপনার বয়স কয়েক বছর বাড়িয়ে দিয়েছে। এক কয়েদীকে কয়েদখানা পর্যন্ত পৌঁছাতে কি লড়াইয়ের চেয়ে বেশি কষ্ট করতে হয়?'

'মহামান্য সুলতান! লড়াই থেকেই এসেছি আমি' হিজাযী ক্লান্তিতে বসে যাওয়া কণ্ঠে বললেন।

'কিসের লড়াই? কয়েদখানার কর্মকর্তাদের সাথে লড়াই... তারা কি কয়েদীকে নিতে চাচ্ছিলো না?...'

হিজাযী বরকিয়ারককে পুরো ঘটনা শোনালেন। 'আমাকে শুধু বলুন, আওরিজীকে ঐ কুঠরীতে বন্দী করে এসেছেন কি না?' বরকিয়ারক জিজ্ঞেস করলো।

হিজাযী কিছু বলতে পারলেন না। তার মাথা হেলে পড়লো।

'তাহলে আওরিজী কোথায়? জঙ্গলে ফেলে এসেছেন?'–রুজিনা কেনকেনিয়ে উঠলো।

'না, হামলাকারীরা ওকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।'

'তাহলে আপনি জীবিত আমার কাছে এলেন কেন? বাকী মুহাফিজ কোথায়?'–বরকিয়ারক গর্জে উঠলো।

'শুধু একজন এসেছে আমার সঙ্গে। অন্যরা সম্ভবতঃ বেঁচে নেই'–হিজাযী বললেন।

'হামলাকারী কারা ছিলো? আপনি কি তাদের কাউকে চিনতে পেরেছেন? –বরকিয়ারক জিজ্ঞেস করলো।

'আমি শুধু সন্দেহের কথা বলতে পারি সুলতানে মুহতারাম! আমার মনে হয় সাবেক ফৌজদের কাজ এটা। আমার সঙ্গে যে মুহাফিজ এসেছে এ ব্যাপারে তার ধারণা একটু শক্ত। আপনি অনুমতি দিলে...।

বরকিয়ারকের ইংগিতে হিজাযী বাইরে গিয়ে সেই মুহাফিজকে ভেতরে নিয়ে এলেন।

'তুমি কি হামলাকারীদের চিনেছিলে?'–বরকিয়ারক মুহাফিজকে জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ আলীজাহ!'–মুহাফিজ বললো– 'ওরা আমাদের সাবেক ফৌজের সঙ্গী...তিনজন ফৌজকে আমি তখনই চিনতে পেরেছিলাম।'

তারপর হিজাযী মুহাফিজকে বিদায় করে দিয়ে বললেন–

'সুলতানে আলী মাকাম! আপনি আমাকে সাজা দিন বা যাই দিন তবুও একটা কথা বলতে চাই। কিন্তু এর সম্পর্ক যেহেতু আপনার শ্রদ্ধেয়া মা ও ভাইদের সঙ্গে তাই ভয় হয়...।

'যা বলার পরিষ্কার করে বলুন। আমি শুনবো। আমার সম্পর্ক সালতানাতের সঙ্গে। মা ভাইদের কথা এর পর। তাদের ব্যাপারে চরম অপমানকর কিছু বললেও শুনবো আমি'–বরকিয়ারক বললো।

'সুলতানে মুহতারাম! আপনি দীর্ঘজীবি হোন'–হিজাযী বললেন– 'আমাদের ওপর হামলা করার দুঃসাহস কারোরই হতো না। কিন্তু এ হামলা করিয়েছে আপনার মা ও ভাইয়েরা'–একথা বলে হিজাযী বরকিয়ারকের মা ও ভাইদের বাজারে যাওয়া ও লোকদের উত্তেজিত করে বক্তৃতা দেয়ার পুরো ঘটনা খুলে বললেন।

বরকিয়ারকের চেহারা অস্বাভাবিক হয়ে উঠলো। রুজিনার দিকে তার চোখ গেলো। রুজিনা দাঁতে দাঁত পিষছিলো। হিস হিস করে বলে উঠলো রুজিনা–

'তিনি যদি আমার মা হতেন তাহলে জানি না কি করতাম! তিনি আপনার মা বলে আমি কিছু করতে পারছি না। মার এতটুকু খেয়ালও নেই, তিনি সালতানাতকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন... আর আপনার ভাই মুহাম্মদ... এক বেওকুফও। সে আপনার সিংহাসন উল্টাতে চায়। তার মাথায় সওয়ার হয়েছে সুলতানী।'

'আমি আপনাকে কোন শাস্তি দিচ্ছি না হিজাযী! আপনাকে ঐ হামলাকারীদের ধরার জন্য আবার সুযোগ দিচ্ছি। তারপর দেখবেন আমি কেমন শাস্তি দিই ওদেরকে–' বরকিয়ারক বললো।

'গোস্তাখী মাফ সুলতানে মুহতারাম!'–হিজাযী বললেন– 'আমি তো ঐ সব বিশ্বাসঘাতকদের ধরতে রাত দিন একাকার করে দেবো। কিন্তু আপনার মা ও ভাইয়েরা আমার জন্য অনেক বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়াবেন। ওদেরকে যদি আপনি বন্দী বা...।

'মা কে গৃহবন্দী করে দিন'–রুজিনা বরকিয়ারককে বললো– 'নিজ মাকে কয়েদখানায় বন্দী করা খুবই খারাপ কাজ। তাকে গৃহবন্দী করে রাখুন। ভাইদের বুঝাতে চেষ্টা করুন, ওরা যেন লোকদেরকে আপনার বিরুদ্ধে খেপিয়ে না তোলে। তাদেরকে মনে করিয়ে দিন, হাসান ইবনে সবা সেই দিগন্ত থেকে কালো মেঘ হয়ে আসছে। ভাইদের মধ্যে যদি এখন এমন বিরোধ থাকে তাহলে সালতানাতকে তা ধ্বংস করে দেবে।'

'শোনো হিজাযী'–বরকিয়ারক এই প্রথম তাকে 'তুমি' করে বললো– 'আজ থেকে তিন দিন পর গভীর রাতে তোমার পুরো ফৌজকে জাগিয়ে সাবেক ফৌজদের ছাউনি ঘিরে ফেলবে। আগেই ওদেরকে সশস্ত্র করে রাখবে। একটি সংকেতে যেন মাঝরাতে সৈন্যরা নিঃশব্দে এবং দ্রুত উঠে ঐ ছাউনি ঘিরে ফেলে। রাতে কোন কিছু করা যাবে না। সকালে ওরা জাগতেই সব কটাকে ধরে আলাদা আলাদা করে দাঁড় করাবে। ঐ মুহাফিজ সেই তিন হামলাকারীকে খুঁজে বের করবে। কিছু হামলাকারীকে মুহাফিজরা আহত করে। তাই আহত যাকেই পাবে তাকেই চিহ্নিত করবে। এটা করতে গিয়ে কাউকে যদি প্রাণে মারতে হয় সেই অনুমতিও আছে। এখন তুমি দুই তিন দিন এমনভাবে থাকো যেন তুমি ভয় পেয়ে গেছো। আর আমার মা ও ভাইদের ব্যবস্থা আমি নিজেই করবো।'

কথা শেষ হলে হিজাযী প্রায় রুকুতে চলে গেলেন এবং সে অবস্থাতেই পিছু হটতে হটতে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

হিজাযী বেরিয়ে গেলে রুজিনা বরকিয়ারকের দিকে এগিয়ে গেলো। তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে বললো–

'আপনাকে এরা বেঁচে থাকতে দিবে না... দিন, মাথাটা আমার কোলে রাখুন। আপনাকে ওরা পাগল করে ফেলবে। অন্য কেউ হলে কথা ছিলো...আপন মা ও আপন ভাইয়েরা আপনাকে কি করে জাহান্নামে ঠেলে দিচ্ছে ভেবে দেখুন?...

'মাকে কি ডেকে কিছু বলবো?–বরকিয়ারক জিজ্ঞেস করলো।

'মুহাম্মদ ও সাঞ্জারকে ডাকুন। ওদেরকে বলুন, মাকে তার কামরায় গৃহবন্দী করা হচ্ছে। ওদেরকে ভালো করে বুঝিয়ে দিন যাতে ওরা দায়িত্বহীন কিছু করে না বসে।'

বরকিয়ারক তখন রুজিনার যৌবনের জাদুতে নেশাতুর। সে অবস্থাতে সে তার ভাইদের ডেকে আনালো।

'আমার প্রিয় ভাইয়েরা!'–বরকিয়ারক বললো– 'কল্পনা করে দেখো, আমার স্থলে তোমরা কোন হুকুম দিয়েছো এবং কিছু লোক সেই হুকুম পালনের পথে সেভাবে বাঁধা দিয়েছে যেভাবে আমার মুহাফিজদের ওপর হামলা হয়েছে–সত্যি করে বলো তখন তোমরা কি ব্যবস্থা নিবে এর বিরুদ্ধে? এটা বলো না যে, আমার হুকুম ভুল ও ইসলাম পরিপন্থী ছিলো। আমি মানুষ বলে নিশ্চয় ভুল করতে পারি। কিন্তু কোন সুলতান বিদ্রোহ ও গাদ্দারী বরদাশত করতে পারে না। তুমি মুহাম্মদ! মাকে সঙ্গে নিয়ে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসেছো। এ কারণেই আওরিজীকে যে মুহাফিজরা কয়েদখানায় নিয়ে যাচ্ছিলো তাদের ওপর হামলা হয়েছে। আমার জায়গায় হলে তোমরা কি করতে?'

'হামলাকারীদের গ্রেফতার করে শাস্তি দিতাম'–মুহাম্মদ বললো।

'আমি যদি বলি তুমি ও মা মিলে এই হামলা করিয়েছো, তুমি কি বলবে তখন?

'ভিত্তিহীন অপবাদ বলবো আমি। এটা ঠিক যে, মা ওখানে গিয়ে লোকদেরকে যে কথা বলেছেন তা সালার আওরিজী ও সালতানাতের পক্ষে যাচ্ছিলো। তিনি বার বার বলেছেন, আমি আমার ছেলেদের কুরবান করে দেবো তবুও সালতানাতের এই ঝাণ্ডা

ভূলুণ্ঠিত হতে দেবো না। এই ঝাণ্ডা ইসলামী বিশ্বের গর্বের ধন। তিনি আরো বলেছেন, এই শহর বাতিনী সন্ত্রাসীতে ভরে যাচ্ছে।'

'ঠিক আছে। কিন্তু মা ও তুমি এটা তো দেখলে না যে, লোকেরা উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা জ্বলে উঠছে। ওখানে সাবেক ফৌজও ছিলো। তোমাদের দ্বারা উত্তেজিত হয়ে তারা এই ফৌজি হামলা করেছে। এখন বলো আমি কি করবো?'

ভাইদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক ও তিক্ত কথাবার্তা চলতে লাগলো। হঠাৎ রুজিনা বরকিয়ারকের পক্ষে কিছু একটা বলে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে মুহাম্মদ ধমকে উঠলো- 'তুমি চুপ থাকো মেয়ে। সুলতান আমাদের ভাই। তোমার অধিকার তো শুধু একজন স্ত্রীর। আগ বেড়ে আমাকে কিছু বলতে যেয়ো না।'

'এখন আমার ফয়সালা শোন মুহাম্মদ ও সাঞ্জার! আমি আমার মাকে তার কামরায় গৃহবন্দী করে দিচ্ছি। তোমরা আমার হুকুম তাকে পৌঁছে দাও। তিনি যেন কামরা থেকে বের না হন। কামরার বাইরে দু'জন প্রহরী বসানো হবে। আমি জানি আমার ফয়সালা না তোমাদের ভালো লাগবে না মার ভালো লাগবে। তিনি বরং চিৎকার চেচামেচি করবেন। কিন্তু আমাকে আমার সালতানাতও দেখতে হবে এবং মা যেন বিশৃংখলা সৃষ্টি না করেন তাও। তার বর্তমান আচরণ তার ব্যক্তিত্বের পরিপন্থী। আমার তো আশংকা, তিনি যেভাবে বলেন এই শহরে বাতিনীরা জমা হচ্ছে, একদিন না আবার কোন বাতিনী তাকে কতল করে ফেলে!'

'বাতিনীরাই আমাদের মাকে গৃহবন্দী করছে'-মুহাম্মদ উঠতে উঠতে বললো- 'আমরা আপনার হুকুম মার কাছে পৌঁছে দেবো। তিনি চিৎকার করবেন না, কিছু বলবেনও না। কিন্তু আমি শেষবারের মতো বলে দিচ্ছি, যে বাতিনীদের ব্যাপারে আপনি আশংকা করেছেন যে, আমাদের মাকে কতল করবে, সেই বাতিনীরাই এখন সালতানাতের ওপর হুকুমত করছে। নিজের মাকে গৃহবন্দী করার হুকুম আপনি নয় হাসান ইবনে সবা দিয়েছে। আমাদের বড় ভাইয়ের দ্বীন ঈমান বাতিনীদের হাতে কতল হয়ে গেছে। এখন আমাদের সামনে যেটা চলাফেরা করে সেটা আপনার দেহ। ভাবে অন্য কেউ আর বাস্তবায়ন করে আপনার দেহ। আজকের পর আপনি আমাকে আর দেখবেন না।'

'ভাইজান! আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে'-সাঞ্জার বললো- 'ভবিষ্যতে আপনার কোন হুকুম যেন আমাদের কাছে না পৌঁছে। অন্যথায় আমরা সে পর্যন্ত পৌঁছে যাবো যেখানে আপনার ফেরেশতারাও পৌঁছতে পারবে না। আমরা পালিয়ে যাবো না, মরেও যাবো না। আমাদের মহান পিতার এই সালতানাতকে সমুন্নত রাখার জন্য সব কিছু করবো আমরা। প্রাণ দিতে হলে তাও দেবো আমরা।'

দুই ভাই কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো। আর বরকিয়ারক আহমকের মতো হা করে তাদের গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলো। তার হুশ ফিরলো তখন রুজিনার গাল যখন তার সঙ্গে লেপ্টে গেলো।

★★★★

হামলাকারীরা মুহাফিজদের থেকে আওরিজিকে ছিনিয়ে নিয়ে এক বিজন পাহাড়ী এলাকায় নিয়ে যায়। তারা ঘন ঝাড়ে আচ্ছাদিত এক পাহাড়ি গুহায় তাদের নতুন আস্তানা তৈরি করে। এসব ব্যবস্থা সব আওরিজীই করে রেখেছেন। আওরিজী সেখানে পৌঁছেই সঙ্গীদের হুকুম দিলেন, হামলাকারীদের যেসব লাশ ওখানে পড়ে আছে সরকারী ফৌজ আসার আগেই সেগুলো উঠিয়ে আনো এবং যখমীদের উদ্ধার করে নিয়ে এসো।

আওরিজী তার সঙ্গে মাত্র চারজন রেখে অন্যদের গুপ্তচরবৃত্তিতে পাঠিয়ে দিলেন। ওদেরকে বলে দিলেন, সামান্য ঘটনাও যাতে এ গুহা পর্যন্ত পৌঁছে।

'সাবেক ফৌজকে এখন প্রস্তুত থাকতে বলবে'–আওরিজী তার লোকদের বলে গেলেন– 'এ কথাও ফৌজকে বলবে, খুব দ্রুতই তারা হাতিয়ার পেয়ে যাবে। এখন সরকারী ফৌজের সঙ্গে আমাদের লড়াই হবে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, বরকিয়ারককে হটিয়ে তার স্থানে মুহাম্মদকে সুলতান বানানো। এরপর ফৌজ তৈরী করে হাসান ইবনে সবাকে শায়েস্তা করা... কিন্তু বন্ধুরা! খুনের দরিয়া আমাদের অতিক্রম করতে হবে। চেষ্টা তো থাকবে, ভাই ভাইয়ে যেন লড়াই না হয়। কিন্তু এটা সম্ভব হবে না মনে হয়। গৃহযুদ্ধ হবেই। পাঁচ সাতদিন পর পরবর্তী পদক্ষেপ জানতে পারবে। মাটির নিচে এখন আমাদের আত্মগোপন করে থাকতে হবে।'

চার পাঁচ মাস ধরে বাইরে থেকে এক ডাক্তার এসে একটি ডাক্তারখানা খুলেছে। সারা শহরে তার প্রসার ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক পুরাতন ও দুরারোগ্য রুগী তার কাছে এসে জাদুমন্ত্রের মতো সুস্থ হয়ে গেছে। লোকে তাকে দারুণ শ্রদ্ধার চোখে দেখে। আওরিজীর সেই ঘটনার দুই তিন দিন পরের এক রাতের ঘটনা। সেই ডাক্তার রোগী দেখা শেষ করে তার বাড়ির বাইরের দিকের দরজা বন্ধ করে দিলেন। তার সামনে তখন চারজন লোক বসা।

'এখানে যা কিছু হচ্ছে সব আমাদের পক্ষেই যাচ্ছে'–ডাক্তার লোকগুলোকে বললেন– 'আওরিজীর ফেরারও আমাদের পক্ষে যায়। জানি, সাবেক ফৌজরাই তাকে ফেরার করিয়েছে। রুজিনা মহল থেকে আমার কাছে খবর পাঠিয়েছে, সুলতান তার মাকে গৃহবন্দী করেছেন। সিপাহসালার হিজাযী বলেছেন, হামলাকারীদের তিনি খুঁজে খুঁজে পাকড়াও করবেন। এসব খেলায় আমাদের লোকেরাই সক্রিয় ছিলো বেশি। আর আওরিজীর ফেরার বর্তমান ও সাবেক ফৌজের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে...

'আলমোত থেকে ইমাম হাসান ইবনে সবার হুকুম এসেছে, মারু শহর খুনের গঙ্গায় ডুবিয়ে দাও। আর নিজেদের লোককে এমনভাবে ব্যবহার করবে যাতে অধিকাংশই অক্ষত থাকে। ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে লাগিয়ে দাও। সুলতানের ফৌজকে দু' ভাগে কেটে ফেলো। ইমামের হুকুম হলো, প্রতিদিন তিন চারজন করে এই শহরে খুন হতে হবে... ইমামের এই হুকুম বাস্তবায়ন এখনই শুরু করতে হবে আমাদের...।

'তোমরা দুই তিন দিন পর রাতে সাবেক ফৌজদের দু' তিনজনকে খুন করে গুজব ছড়িয়ে দাও, সরকারী ফৌজ তাদের মুহাফিজ হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে। এরপর দু' একদিন বিরতি দিয়ে সরকারী ফৌজের আরো কয়েকজনকে কতল করে দাও।'

৮

মুহাম্মদ ও সাঞ্জার বরকিয়ারকের কাছ থেকে বের হয়ে রুজিনার ঘরে বসে থাকা তাদের মাকে নিজ ঘরে পৌঁছে দিলো। একটু পরই দু'জন সশস্ত্র লোক দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো।

'এরা কেন এসেছে?'–মা কপাল কুচকে জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনার সুলতান ছেলে আপনাকে গৃহবন্দী করেছেন। আর আমাদেরকে এই নির্দেশ আপনার কাছে পৌঁছে দেয়ার হুকুম করেছেন'–মুহাম্মদ বললো।

মা নির্বাক হয়ে গেলেন। শুধু তার ঠোঁট দুটি একটু কাঁপলো। মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের হলো না। দু'গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

'আপনি এত পেরেশান কেন হচ্ছেন? আমরা তো তার গোলাম নই। আর গোলামী বা আযাদীর সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্কও নেই। এই সালতানাতকে আমরা আযাদ করতে চাই। হাসান ইবনে সবার কব্জায় চলে গেছে সালতানাত। হুকুমত চালাচ্ছে রুজিনা। আমরা দু' ভাই সালতানাতের হুকুমত চাই না। বরং ইসলামী হুকুমত চাই আমরা। আপনি একদম চুপ থাকুন। বরকিয়ারকের সামনে এখন আর যাবেন না। আমরা মেনে নিচ্ছি, আমাদেব বড় ভাইকে এই সালতানাতের জন্য কুরবান করে দিয়েছি। এখন আমাদেরকে অনুমতি দিন, কুফরের এই ধ্বংসলীলার সামনে আমরা যেন বুক পেতে দাঁড়াতে পারি।'

'দুঃখিনী মা!'–সাঞ্জার বললো– 'আপনি শুধু আমাদের জন্য দুআ করুন। আপনার দুআ আমাদের জন্য মজবুত ঢাল বনে যাবে। লড়তে আমাদের হবেই। তাই আজকের পর থেকে সেলজুকি সালতানাতের ইতিহাস রক্ত দিয়ে লেখা হবে।'

'আমার মুজাহিদরা! আমার দুআ তোমাদের সঙ্গে সবসময় থাকবে। তোমাদের মতো আমার বিশটি সন্তান থাকলেও আমি এই ইসলামী সালতানাতের জন্য কুরবান করে দিতাম। লড়তে হলে মেধা খাঁটিয়ে লড়ো। আবু মুসলিম রাজীকে খবর দাও। তিনি খুবই বিচক্ষণ লোক। তিনি সবরকম সহযোগিতা করবেন।'

'মুযাম্মিল আফেন্দী এসেছেন'–পাহারাদার এসে বললো– ' তিনি তো ভেতরে আসতে পারবেন না। কারণ আমাদেরকে কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মুহতারাম মুহম্মদ ও সাঞ্জার দেখা করতে পারবেন তবে অন্য কামরায়...আমার জন্য এখন কি হুকুম?'

'তোমার জন্য হুকুম হলো, তুমি এ মুহূর্তে এই কামরা থেকে বেরিয়ে যাও এবং কুকুরের মতো বাইরে দাঁড়িয়ে থাকো'–মা বলে উঠলেন।

পাহারাদার বিস্ফারিত চোখে মুহাম্মদের দিকে তাকিয়ে রইলো।

'মুযাম্মিল আফেন্দীকে অন্য কামরায় বসাও। আমরা আসছি।'

'শ্রদ্ধেয় আম্মীজান!'–পাহারাদার মার সামনে মাথা নামিয়ে বললো– 'আমরা হুকুমের গোলাম। আমাদেরকে আপনার বিরুদ্ধে হুকুম দিতে পারবে; কিন্তু আমাদের হৃদয় থেকে আপনার ভালোবাসা ছিনিয়ে নিতে পারবে না।'

মা একটু আগের কথার জন্য অনুতপ্ত হলেন। পাহারাদার পূর্ণ সম্মান দেখিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো।

★★★★

বরকিয়ারক সিপাহসালার হিজাযীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে বিদায় করার পর রুজিনা তাকে বললো, ওযীরে আজমকে ডেকে যেন এসব নির্দেশাবলি লিখিয়ে দেয়।

'সব সমস্যাই আপনি নিজের মাথায় নিয়ে নেন'–রুজিনা বলে– 'আপনি তো একটা মানুষ। সারা সালতানাতের সমস্যা মনে পুষে রাখলে আপনি বাঁচবেন কি করে? আপনার মনের শান্তি তো আপনার মা ও ভাইয়েরা মিলে ধ্বংস করে দিয়েছে। ওদেরকে আমি বলতে চাই, তোমরা এসে দুদিন সুলতানী চালিয়ে দেখো। এটা আপনার সততা ও দৃঢ়তা যে, আপনি ঐ পাহাড়গুলোর সঙ্গে একা লড়ে যাচ্ছেন।'

বরকিয়ারকের ভেতরটা জুড়িয়ে গেলো। রুজিনাকে এক হাতে তার দিকে টেনে নিলো। একটু পর রুজিনা ওযীরে আজমকে ডেকে পাঠালো।

ওযীরে আজম আবদুর রহমান সামিরী এলে বরকিয়ারক আজ যা কিছু হয়েছে এবং যে হুকুম জারী করা হয়েছে সব তাকে জানালো।

'এসব বিষয়ের তত্ত্বাবধান আপনাকেই করতে হবে। এসব হুকুম পালনের ব্যাপারে এটা দেখা যাবে না যে, একি আমার মা না ভাই'–বরকিয়ারক বললো।

'সুলতানে মুহতারাম! আমি শুধু আপনাকেই জানি। আপনি যদি হুকুম করেন আপনার এক ছেলের মাথা কেটে আপনার সামনে পেশ করতে বিনা আপত্তিতে তা পালন করবো আমি'–সামিরী বললেন।

'আপনি দেখতেই পাচ্ছেন সুলতানকে কেমন ক্লান্ত শ্রান্ত দেখাচ্ছে'–রুজিনা বললো– 'তার মুখ কেমন বসে গেছে। তার আর কিছু বলা উচিত নয়। যা হয়েছে তা আমি বুঝিয়ে বলছি। আর আপনি তো সালার আওরিজীর ফেরার ও মুহাফিজদের হত্যার কথা শুনেছেন!'

'হ্যাঁ শুনেছি। জানিনা সুলতানে মুহতারাম এ ব্যাপারে কি ফয়সালা দিয়েছেন। তবে আমি হলে আওরিজী ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের মৃত্যুদণ্ড দিতাম। এ তো গাদ্দারী।'

'সুলভান হুকুম দিয়েছেন, তিন দিন পর রাতে সাবেক ফৌজের ছাউনি সরকারী ফৌজ ঘিরে ফেলবে'–রুজিনা বরকিয়ারকের পুরো হুকুম শোনালো। তারপর বললো– 'এই অভিযান ব্যর্থ হওয়া চলবে না। আওরিজীকেও এর মধ্যে খুঁজতে হবে। আপনার কাছে গুপ্তচর আছে। আপনি জানেন, কি করে ফেরারি আসামী বের করতে হয়।'

'মহামান্য সুলতান! এসব আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন। আমি এই গাদ্দারকে সপ্তম স্তর যমীনের নিচ থেকে হলেও ধরে আনবো'–সামিরী বললেন।

'আমার মাকে নজরবন্দী করে দিয়েছি। মা-ই তো লোকদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে যে, আওরিজীকে অন্যায়ভাবে কয়েদ করা হচ্ছে। সে আমার মা না হলে জল্লাদ দিয়ে তাকে হত্যা করাতাম। আপনি দেখবেন তার কাছে যেন আমার দু' ভাই ছাড়া আর কেউ না যায়।'–বরকিয়ারক বললো।

'এটা আপনার মহৎপ্রাণের নজির সুলতানে মুহতারাম! আপনি এ ধরনের মাকেও এত সম্মান করেন। গোস্তাখী না নিলে বলবো আমি যে, আপনার মরহুম বাবার যে

পবিত্র জযবা ছিলো আপনার শ্রদ্ধেয় মার মধ্যে তার ছিটে ফোটাও নেই। তা আছে শুধু আপনার মধ্যে।'

'আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। আমি জানি আমার মা আপনাকে অনেক তাজীম করেন। আপনি উনার কাছে যেয়ে উনাকে ও আমার দুই ভাইকে আপনি কিছু ভালো মন্দ বলে বুঝিয়ে দিন। ওরা যেন আমার জন্য জটিলতা সৃষ্টি না করে। আমাকে সাহায্য করে'–বরকিয়ারক বললো।

'আসল কথা ভিন্ন। সুলতান আমাকে অসহায় দেখে বিয়ে করাতে তার মা এই ফয়সালা মানতে পারেননি। তারা তো এটা বুঝছে না যে, আমি সুলতানের স্ত্রীর চেয়ে দাসী থাকতেই বেশি পছন্দ করি। তার সেবা ও শান্তির জন্য আমার জীবন আমি উৎসর্গ করে দিয়েছি'–রুজিনা বললো।

'হ্যাঁ আমি জানি আপনি সুলতানের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করছেন। আমি সুলতানের মা ও ভাইদের সুপথে আনার সবরকম চেষ্টা করবো। আশা করি ওরা আমার কথা মেনে নিবে।'

ওযীরে আজম সামিরী সেখান থেকে বেরিয়ে আসার সময় রুজিনাকে চোখের ইশারায় বাইরে ডাকলো।

'বিশেষ কোন কথা আছে?'–রুজিনা চাপা গলায় সামিরীকে জিজ্ঞেস করলো।

'সুলতান অত্যন্ত পেরেশান! আমি জানি, সবসময় আপনি তার প্রতি খেয়াল রাখেন। কিন্তু তার আরো অনেক বেশি প্রশান্তি দরকার। আমি আপনার ত্যাগের প্রশংসা না করে পারছি না। তবুও বলবো, সুলতানের আপনার পক্ষ থেকে আরো বেশি সঙ্গ প্রয়োজন। আমি সুলতানের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে যাবো। কিন্তু ঘরে আপনিই তার একমাত্র অবলম্বন হয়ে থাকবেন... ব্যস এতটুকুই'–সামিরী বললেন।

'আমি আপনার কাছে এই সহযোগিতাটুকুই চেয়েছিলাম'–রুজিনা কৃতজ্ঞতার সুরে বললো।

★★★★

'বরকিয়ারক বলো না'–মুযাম্মিল আফেন্দী মুহাম্মদ ও সাঞ্জারের মুখে সব শুনে বললো– 'রুজিনা বলো... বরকিয়ারক শুধু এখন মুখের সুলতান। ফয়সালা রুজিনাই করে।... এ কোন নতুন কথাও নয়। আমি বলতে এসেছি, সালার আওরিজীর মুক্তি আমাদের জন্য অনেক বড় খুশির কথা। এতে প্রমাণিত হয়, আমাদের অবস্থান অনেক মজবুত। এখন সামনের করণীয় নিয়ে ভাবতে হবে। সালার আওরিজীর খোঁজ পেলেই তার কাছে চলে যাবো। তাকে জিজ্ঞেস করবো, এখানে আমরা কী করবো এখন।'

এ সময় কামরায় ওযীরে আজম সামিরী ঢুকলেন। তিনজন দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান প্রদর্শন করলো।

'এই যে ছেলেরা! কি কথা হচ্ছিলো... মুযাম্মিল! তোমাকে অনেক দিন পর দেখলাম'–সামিরী কৌতুক করলেন।

'সালার আওরিজীর কথা বলছিলাম। মুযাম্মিল এজন্যই এসেছে। আপনি আসাতে আরো ভালো হলো। না এলে আপনার কাছে যেতাম আমরা'–মুহাম্মদ বললো।

ওযীরে আজম সামিরী বললেন, তিনি সুলতান বরকিয়ারকের ওখান থেকে এসেছেন। সেখানে রুজিনা ও বরকিয়ারকের সঙ্গে তার কি কথা হয়েছে তার সব তিনি ওদেরকে জানালেন। তারপর বললেন, সুলতান তোমাদের দু' ভাই ও গৃহবন্দী তোমাদের মাকে বুঝানোর জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন।'

'আজ নিজের মাকে নজরবন্দী করেছে। কয়েক দিন পর দুই ভাইকে দেবে মৃত্যুদণ্ড' –মুযাম্মিল বললো।

'সে সুযোগ হবে না'–ওযীরে আজম বললেন– 'আমি এখনো জীবিত আছি। আমি সুলতান ও সালতানাতের শিকড়ে বসে আছি এখন। সেখানে আমি যেভাবে কথা বলেছি, যে ভঙ্গিতে তাদের কথা শুনেছি তোমরা দেখলে আমাকে বলতে, এ এক খান্দানী গোলাম ও চাটুকার। কিন্তু আমি ওদের দু'জনকে মুঠোয় পুরে নিয়েছি। রুজিনা তো আমার মুরিদ হয়ে গেছে। এখন করণীয় নিয়ে ভাবতে হবে আমাদের। আওরিজীর মুক্তি একটা বড় সফলতা।'

'আওরিজী কোথায় আছে তা জানতে হবে। তার দিকনির্দেশনাও দরকার' –মুযাম্মিল বললো।

'আজ রাতে না হয় কাল রাতে জেনে যাবো। তবে তোমরা তাকে খুঁজতে যেয়ো না। সরকারী গোয়েন্দারা দেখবে তোমাদের পিছু নিয়ে আওরিজী পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তোমাদের যা দিক নির্দেশনা দরকার তা আমি দেবো'–সামিরী বললেন।

'বাতিনীদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী কিছু একটা করতে মুযাম্মিল ব্যাকুল হয়ে আছে এখন–মুহাম্মদ বললো।

'ব্যাকুল হয়ো না মুযাম্মিল! আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা খুবই জরুরী এখন। মন দিয়ে শোন আমার একটি কথা। তোমার স্মৃতি এখনো রাসূলুল্লাহ (স) এর রক্তমাখা লড়াই, খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) ও সাদ ইবনে ওয়াক্কাস (রা) এর মতো পৃথিবী-বিখ্যাত বীরদের লড়াই তোলপার করছে। সেসব দিগ্বিজয়ী রণাঙ্গনের অতুলনীয় দৃশ্যপট তো আমাদের মনকে সতেজ করবেই। কিন্তু আজ আমরা যে লড়াইয়ের সম্মুখীন তা সেসব লড়াই থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমাদের শত্রুরা রণাঙ্গনের যোদ্ধা নয়। তারা মাটির নিচে সিঁদ কেটে এগুচ্ছে। মুসলমান এ ধরনের যুদ্ধের সম্মুখীন হয়নি কখনো। আমাদের এখন যমিনের ওপরেও লড়তে হবে নিচে গিয়েও লড়তে হবে।'

'আমিও তো এই চিন্তাই করছি'–মুযাম্মিল বললো– 'হাসান ইবনে সবা যেমন রুজিনাকে বড় সুন্দর বিষধর নাগিনা বানিয়ে সালতানাতের বুকে সওয়ার করিয়ে দিয়েছে, আমিও এমন একটি নাগিনাকে পাঠাতে চাই যে রুজিনাকে দংশন করতে পারবে।'

'কোত্থেকে আনবে এই নাগিন?'

'আমার কাছে আছে। সে হলো সুমনা। মুহাম্মদ ও সাঞ্জার তাকে ভালো করে চিনে। সুখের কথা হলো বরকিয়ারক তাকে দেখেনি। সে হাসান ইবনে সবার

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেয়ে! সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা ওর মধ্যে আছে তা হলো হাসান ইবনে সবা ও বাতিনীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের আগুন।'

'আমি ওকে দেখেছি'–ওযীরে আজম বললেন– 'তার শারীরিক গঠন ও রূপ সৌন্দর্যে সেই উপযুক্ত মেয়ে। তবে এজন্য আমাদের আরো ভাবতে হবে।'

'আপনি তো শুধু দেখেছেন ওকে। ওর প্রতিশোধ স্পৃহার অদম্যতা অনুভব করতে পারবেন এ থেকে যে, আমরা পরস্পরকে পাগলের মতো ভালবাসি এবং সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বিয়ে আমার সঙ্গেই হবে। ওর মাও তাই চান। কিন্তু সুমনা বলে, হাসান ইবনে সবাকে সে যে পর্যন্ত শেষ না করতে পারবে বিয়ে করবে না। সে তো নির্দ্বিধায় রুজিনাকে শায়েস্তা করতে পারবে।'

'তবুও বলবো, ওকে ব্যবহার করো; কিন্তু ভেবে চিন্তে'–ওযীরে আজম বললেন– 'তোমাদেরকে আমি আরেকটা গোপন তথ্য দিচ্ছি, বর্তমান ফৌজ দ্বারা সাবেক ফৌজের ছাউনি ঘেরাও সম্পর্কে বরকিয়ারক হিজাযী ও ওযীরে আজমকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা ওদেরকে উজিরে আজম জানালেন এবং বললেন– 'যাদেরকে পাকড়াও করা হবে পরের দিন তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। এমন কাউকে যেন পাকড়াও না করা হয় সেটাই আমাকে ব্যবস্থা করতে হবে।'

'সিপাহসালার হিজাযী এমন বদ লোক যে, তিনি এমনি পনের বিশজন লোক পাকড়াও করে বলবে এরাই হামলাকারী, আগামীকাল ওদের হত্যা করা হবে... ওদেরকে বাঁচানোর কোন ক্ষমতা নেই আমাদের–মুহাম্মদ বললো।

'একটা না একটা ব্যবস্থা করে ফেলবো। যদি তাতে ব্যর্থ হই তাহলে এমন গোপন বন্দোবস্ত করবো যে, ওদেরকে যখন হত্যার জন্য নিয়ে যাওয়া হবে তখন উদ্ধার করা হবে...যা হোক রক্তপাত ঘটবেই'–ওযীরে আজম বললেন।

'এখানকার পরিস্থিতি রায়-এ পৌঁছানো উচিত। আম্বু মুসলিম রাজী আমাকে বলে দিয়েছেন, সামান্য ঘটনাও যেন তৎক্ষণাত তাকে জানানো হয়'–মুহম্মদ বললো।

'হ্যাঁ জরুরী কথাই বলেছো। আচ্ছা তাহলে মুযাম্মিলের এখনই রওয়ানা হয়ে যাওয়া ভালো হয় না? আমার খাস লোকেরা অন্য কাজে ব্যস্ত এখন। তাই ওদেরকে পাঠানো যাবে না'–ওযীরে আজম বললেন।

'আমি এখনই রওয়ানা হয়ে যাচ্ছি। সেখানে কি বলতে হবে না হবে তা আমি জানি। এও জানি যে, আমাদের ফৌজের ঘোড়া ও হাতিয়ার দরকার। আমাদের এই প্রয়োজন আবু মুসলিম রাজীই পূরণ করতে পারবেন।'

'তিনি সবরকম সহযোগিতার ওয়াদা করেছেন। এমনকি তিনি তার পুরো ফৌজ পাঠিয়ে দেয়ার কথা বলেছেন'–মুহাম্মদ বললো।

'আমি যাচ্ছি। আপনি সুমনার ব্যাপারে ভেবে দেখবেন, কি করে ওকে সুলতান ও রুজিনার কাছে পাঠানো যায়'–মুযাম্মিল বললো।

'তুমি ফিরে এসো। তারপর এ নিয়ে কথা হবে... এখন রওয়ানা হয়ে যাও...খালি হাতে যেয়ো না'–ওযীরে আজম বললেন।

★★★★

সে রাতেই তিন বাতিনী সাবেক ফৌজের ছাউনির আশে পাশে ঘাপটি মেরে রইলো। পর পর তিন জন সৈন্য প্রস্রাব করতে তাঁবু থেকে বের হলো এবং ঐ তিন বাতিনীর হাতে খুন হয়ে গেলো। খুনের কাজ শেষ করে এরা তিনজন আবাদীর মধ্যে এক বাড়ির দরজায় গিয়ে টোকা দিলো এবং বিড়াল আওয়াজে মিঁয়াও করলো। ভেতর থেকেও এক লোক মিয়াও করে দরজা খুললো এবং ওদেরকে ঘরের ভেতর নিয়ে গেলো।

'তোমাদের কাপড় বলছে তোমরা কাজ করেই এসেছো। কত জন?'–সে লোক জিজ্ঞেস করলো।

'তিন। আজ রাতে এই যথেষ্ট'–একজন জবাব দিলো।

'হ্যাঁ ইমামের নামে আজ রাতে তিনজনই যথেষ্ট। এখন বিশৃংখলা আর রক্তপাত ওরা নিজেরাই শুরু করে দেবে... তোমরা শুয়ে পড়ো। পরের কাজ যারা করবে তারা তাড়াতাড়িই উঠে পড়বে'–সে লোক বললো।

এ ছিলো সেই ডাক্তারের ঘর যিনি খুব অল্প সময়েই শহরে এসে প্রসার জমিয়ে ফেলেছেন।

পরদিন ভোরে সাবেক ফৌজি ছাউনিতে বিরাট উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো। এক আওয়াজ উঠলো। সরকারী ফৌজ তাদের ফৌজি কর্মকর্তা খুনের বদলা নিতে গিয়ে এই তিনজনকে খুন করেছে। বাতাসে ভেসে এই আওয়াজ শহরের সবার কানে গিয়ে বাড়ি খেলো। যে কারো মুখে ঘুরতে লাগলো এক কথা–সরকারী ফৌজ সাবেক ফৌজের তিনজনকে হত্যা করেছে।

সিপাহসালার হিজাযী খবর পেয়ে ঘোড়া দৌড়ে ঘটনাস্থলে পৌছলেন। সাবেক ফৌজের সবাই তাকে ঘিরে ধরে হাঙ্গামা শুরু করে দিলো। কে কি বলছে কিছুই বুঝা যাচ্ছিলো না। হিজাযী বহু কষ্টে ওদেরকে চুপ করিয়ে বললেন, দায়িত্ববান কেউ কথা বলুক।

'আমি কথা বলছি'–ছাটাইকৃত এক নায়েবে সালার বললো– 'সরকারী ফৌজের এক কর্মকর্তা খুন হলে আমাদের দুই লোককে অন্যায়ভাবে ধরে নেয়া হয়েছিলো। এখন আমাদের তিনজন খুন হয়েছে। তাই সরকারী ফৌজের ছয়জনকে ধরে আমাদের সামনে জল্লাদের হাতে তুলে দিন।'

হিজাযী তাদেরকে বহু কষ্টে বুঝাতে সক্ষম হলেন যে, তিনি সুলতানের কাছে যাচ্ছেন। সেখান থেকে হুকুম নিয়ে ফিরে আসবেন।

হিজাযী একা সুলতানের কাছে গেলেন না। ওযীরে আজম আবদুর রহমান সামিরীকে নিয়ে সুলতানের কাছে গিয়ে সব শোনালেন।

'মহামান্য সুলতান! আমার মনে হয় বর্তমান ও সাবেক ফৌজের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে গেছে। আমার পরামর্শ হলো, সাবেক ফৌজকে হিসাব কিতাব চুকিয়ে দিয়ে তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হোক'–হিজাযী বললেন।

'এটা কখনো করবেন না। এখানে ওরা নিরস্ত্র। এখান থেকে বের হতে পারলে হাতে তারা অস্ত্র উঠিয়ে নিবে। তখন বড় এক হাঙ্গামা বেঁধে যাবে'—ওযীরে আজম শক্ত গলায় বাঁধা দিলেন।

তারপর কিছু বাকবিতণ্ডার পর বৈঠক ভেঙ্গে গেলো।

ওদিকে সাবেক ফৌজের মধ্যে শ্লোগান উঠলো, ওরা এই খুনের বদলা নিবে। শহরেও ছড়িয়ে পড়লো সরকারী ফৌজ সাবেক ফৌজের তিন সৈন্যকে হত্যা করেছে।

এ অবস্থায় হিজাযীকে নিয়ে ওযীরে আজম সাবেক ফৌজের ছাউনিতে গেলেন। তিনি দীর্ঘ বক্তৃতার পর ওদেরকে ক্ষণিকের জন্য শান্ত করলেন। আর বললেন, খুনীকে ছাড়া হবে না।

তারপর সেই নির্ধারিত রাতে ওযীরে আজম সামিরী ও সিপাহসালার হিজাযী সরকারী ফৌজের ছাউনিতে পৌঁছলেন। আজ তারা সাবেক ফৌজের ছাউনি ঘেরাও করবে। নির্বাচিত সরকারী ফৌজ কিছুক্ষণ পর হিজাযী ও সামিরীর নেতৃত্বে সশস্ত্র হয়ে পায়দল রওয়ানা হলো। হিজাযী ওদেরকে বলে দিলেন। সাবেক ফৌজের সবাই যেহেতু নিরস্ত্র তাই ওদের ওপর কোন হামলা করা যাবে না। সেখানে যাওয়া হচ্ছে শুধু ছাউনি ঘেরাও করার জন্য। কিছু পথ যাওয়ার পর ওযীরে আজম সামিরী ফিরে এলেন। তার ওপর নির্দেশ ছিলো মূল সেনা দপ্তর থেকে এই অবরোধ কর্মের তত্ত্বাবধান করা।

সরকারী সেনারা সাবেক সেনাদের ছাউনিতে পৌঁছলো খুব সন্তর্পণে। কেউ কোন শব্দ করলো না। মশালও জ্বালালো না কেউ। হিজাযীর নির্দেশে মশালধারীরা সবাই এক সঙ্গে মশাল জ্বালালো। পুরো তাঁবুর এলাকা দিনের মতো আলোকিত হয়ে উঠলো। সামনে এগুনোর ইংগিত পেয়েই সবাই এগুতে লাগলো ধীরে ধীরে। সবার তলোয়ার কোষবদ্ধ। বর্ষার ফলা নতমুখী। এ মুহূর্তে সেগুলো উদ্যত করার অনুমতি ছিলো না ওদের।

প্রথমে একটি তাঁবুর পর্দা উঠিয়ে মশালের আলোয় ভেতরটা দেখা হলো। না, সেখানে কেউ নেই। কোন তাঁবুতেই কেউ নেই। পুরো তাঁবু-পল্লী জনশূন্য।

আচমকা সবাই এক পাশে লোকের দৌড়ে আসার আওয়াজ শুনলো। যেন তুফান ছুটে আসছে। সরকারী ফৌজ কিছু বুঝে উঠার আগেই ওদের ওপর হামলা হয়ে গেলো। তবে হামলাকারীদের হাতে হাতিয়ার ছিলো না। লাঠিসোটা, বাঁশ, কঞ্চি ও ইটপাথর দিয়ে ওরা হামলা চালায়। তাই হামলাকারীরা প্রথমে মনোযোগ দেয় সরকারী ফৌজ থেকে হাতিয়ার ছিনিয়ে নেয়ার দিকে। এবং ঝটপট বেশ কিছু হাতিয়ার ওরা কেড়ে নিতে সক্ষম হয়। সরকারী ফৌজও সামান্য সময়ের মধ্যেই সামলে উঠে পাল্টা হামলা শুরু করে। এরপরই শুরু হয় তুমুল লড়াই। কিছু কিছু হামলাকারী সরকারী ফৌজ থেকে জ্বলন্ত মশাল কেড়ে নিয়ে ফৌজের মধ্যখানে ছুঁড়ে মারে। এতে কয়েকজন জীবন্ত দগ্ধ হয়। এই নির্মম দৃশ্য দেখে অন্যরাও ভয়ে পালাতে শুরু করে।

সিপাহসালার হিজাযী এ অবস্থা দেখে দিশাহারা হয়ে যান। তিনি তার দুই মুহাফিজ হন্তদন্ত হয়ে হুকুম দিলেন, এখনই সেনা ব্যারাক থেকে সৈন্যদের তৈরী হয়ে আসতে বলো।

এ হুকুম দিয়ে তিনি ওযীরে আজম সামিরী যেখানে থাকার কথা সেখানে গিয়ে ওযীরে আজমকে তাঁবুপল্লীতে কি ঘটছে তা জানালেন।

'তাহলে আমাদের এ পরিকল্পনার কথা নিশ্চয় ফাস হয়ে গেছে'–ওযীরে আজম বললেন।

ওযীরে আজম সিপাহসালারকে নিয়ে তাঁবুপল্লীতে গিয়ে দেখলেন পুরো তাঁবুপল্লী দাউ দাউ করে জ্বলছে। তার পাশে রীতিমতো যুদ্ধের ময়দানের মতো লড়াই চলছে। এদিকে সরকারী ফৌজের পক্ষে একটু পর অতিরিক্ত সৈন্য পৌঁছলো।

কিন্তু ততক্ষণে লড়াই খতম হয়ে গেছে এবং কয়েকজনকে জঙ্গলের দিকে দৌড়ে যেতে দেখা গেলো এবং মুহূর্তের মধ্যেই তারা অদৃশ্য হয়ে গেলো। কোন ফৌজ তাদের পিছু ধাওয়া করলো না।

ওযীরে আজম ও সিপাহসালার তাঁবুপল্লীর সবটা ঘুরে দেখেন, এদিক ওদিক যখমীরা মৃত লাশের পাশে পড়ে কাতরাচ্ছে। কোথাও কোথাও তাঁবুর ধ্বংসস্তূপ থেকে কালো ধোয়ার ফ্যাকাসে কুন্ডুলি উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে।

★★★★

সাহায্যকারী হিসেবে যেসব ফৌজ এসেছিলো তারা যখমী ও মৃতদের উদ্ধার করতে লাগলো। সিপাহসালার হিজাযী বার বার ওযীরে আজম সামিরীকে জিজ্ঞেস করছেন কিভাবে এটা সম্ভব হলো? ওযীরে আজমও দু'দিকে মাথা নেড়ে হতাশা প্রকাশ করছেন।

সকাল হতেই হিজাযী ও সামিরী সুলতান বরকিয়ারকের কাছে ছুটে যান। বরকিয়ারকের জাগার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ তাদের বসে থাকতে হলো। তারপর তাদেরকে ভেতরে ডেকে পাঠালো।

'রাতের কাজ ঠিকঠাক হয়েছে তো? কাউকে শনাক্ত করা হয়েছে'–সুলতান জিজ্ঞেস করলো।

'সুলতানে মুহতারাম! সেখানে তো অন্য ঘটনা ঘটেছে'–ওযীরে আজম বললেন–আমাদের ফৌজ সেখানে গিয়ে দেখে সমস্ত তাঁবুপল্লী খালি। তারপর কেউ কিছু বুঝে উঠার আগেই ফৌজের ওপর আচমকা হামলা হয়ে গেলো।'

বরকিয়ারক এতক্ষণ ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে কথা বলছিলো। একথা শুনতেই প্রায় লাফিয়ে উঠে বললো,

'কি বলছেন আপনারা? নাকি আমি এখনো ঘুমিয়ে আছি আর আপনাদের কথা বুঝতে পারছি না!'

'না সুলতানে মুহতারাম! আপনি ঠিকই শুনেছেন। কষ্ট না হলে তাঁবুপল্লীতে গিয়ে দেখতে পারেন। রক্ত আর তাঁবুর জ্বলন্ত ছাই ছাড়া সেখানে আর কিছুই দেখবেন না আপনি। যখমীদের ক্ষতে ব্যান্ডেজ বাঁধা চলছে এখনো।'

'কিন্তু এসব হলো কি করে? আমার নির্দেশ কি আপনারা জানতেন না। এখন বুঝতে পারছি ওরা আগ থেকেই আমার নির্দেশ জেনে যায়। এজন্যই ওরা ওখান থেকে বেরিয়ে যায় এবং সময় মতো পেছন থেকে জবাবী হামলা করে। আমাকে বলুন ওদেরকে কে এই তথ্য দিলো?'

'সুলতানে মুহতারাম! আমাদের ছাড়া এ হুকুম একমাত্র আপনার বেগম সাহেবাই জানতেন। কিন্তু তার ওপর সন্দেহ করার দুঃসাহস আমার নেই।'

'না তার ওপর সন্দেহ করা যাবে না।'

'আরেকজন আছে। আওরিজী। সে হয়তো জেনে ফেলেছিলো'–হিজাযী বললেন।

'কিন্তু ওর কাছেই কি করে এ খবর পৌছলো? এ প্রশ্নের উত্তর আমাকে পেতে হবে সবার আগে'–সুলতান বললো।

এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। রুজিনা এজন্য দারুণ খুশি। হাসান ইবনে সবা যা চেয়েছে তাই এখানে ঘটে চলেছে। সে সুলতানকে বললো, আপনার হুকুম কি করে তাঁবুপল্লীতে পৌছলো সেটা খুঁজতে গেলে এখন সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছু হবে না। এখন ঐ সব লোকদের পেছনে ফৌজ লাগাতে হবে। যেখানেই পাওয়া যাবে ওদের জোর হামলা চালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে ওদের।

'হ্যাঁ, আমাদের এখন এটাই করতে হবে। আমরা যদি এখানে চিন্তাভাবনা আর কথাবার্তায় লেগে যাই, আমাদের শত্রুরা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে পারবে। তখন কোথায় পাবো আমরা ওদের? দ্রুত ওদেরকে পাকড়াও করে শাস্তি দিতে হবে।'

'হ্যাঁ আমাদের এটাই করা উচিত। হিজাযী! আপনি এখন থেকেই এ হুকুম কার্যকরী শুরু করুন'–বরকিয়ারক হুকুম দিলো।

এদিকে হাসান ইবনে সবার মারু শহরের মিশন প্রধান যে ডাক্তার ছিলো, তার লোকজন সারা শহরে খবর ছড়িয়ে দিলো যে, রাতে সরকারি ফৌজ সেই নিরস্ত্র ছাটাই করা ফৌজের ওপর তাদের ঘুমন্ত অবস্থায় হামলা চালিয়েছে। এই গুজবের কারণে শহরবাসীর মধ্যে সুলতানের ফৌজের বিরুদ্ধে ঘৃণা সঞ্চার হতে লাগলো। লোকজনও দলে দলে তাঁবু পল্লীতে গিয়ে দেখে এলো, সেখানে তাঁবুর জ্বলন্ত ছাই ও রক্ত ছাড়া কিছুই নেই। অন্য দিকে একই উদ্দেশ্যে– সুলতানের ফৌজের প্রতি যাতে লোকজন ক্ষেপে উঠে এজন্য ওযীরে আজম সামিরী ও তার লোকদের মাধ্যমে একই গুজব শহরময় ছড়িয়ে দেন যে, সরকারি ফৌজ অন্যায়ভাবে এতগুলো নিরস্ত্র নিরপরাধ লোককে হত্যা করেছে। এতে বাতিনীদের ময়দান আরো শক্তিশালী হয়। কিন্তু ওযীরে আজম চাচ্ছিলেন, বাতিনীদের হাতের পুতুল বরকিয়ারককে গদি থেকে সরিয়ে মুহাম্মদকে সুলতান বানানো। তাই এই পথ অবলম্বন ছাড়া তার আর কিছুই করার ছিলো না।

★★★★

মুযাম্মিল সময় মতোই রায়ের হাকিম আবু মুসলিম রাজীর কাছে পৌছে যায়। তাকে মারুর পূর্ণ সংবাদ শোনায়।

'আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত'–আবু মুসলিম রাজী বললেন– 'আমার কাছে অবশ্য কিছু ফৌজ আছে। সংখ্যায় তা যথেষ্ট না হলেও বেশ অভিজ্ঞ ও জযবাদীপ্ত। এছাড়া কিছু শহরবাসীকেও প্রস্তুত করে রেখেছি। যখনই প্রয়োজন হবে প্রয়োজনীয় লশকর রওয়ানা করিয়ে দেবো। দরকার হলে আমিও যাবো।'

মুযাম্মিল সেদিনই আবার মারুর দিকে রওয়ানা করে। আবু মুসলিম তার কাছে ওযীরে আজম সামিরী ও মুহাম্মদের জন্য জরুরী একটি পয়গাম দিয়ে দেন। পথে মুযাম্মিলের এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়। আবু মুসলিম রাজীর কাছে সে এক পয়গাম নিয়ে যাচ্ছিলো। মুযাম্মিলকে সে জানালো, মারুতে ভয়ংকর এক লড়াই হয়ে গেছে। এতে সরকারি ও ছাটাইকৃত ফৌজের অনেকে নিহত হয়েছে। এখন ছাটাইকৃত ফৌজকে সরকারি ফৌজ খুঁজে বেড়াচ্ছে। মুযাম্মিল আবার তার সঙ্গে রায়ের দিকে রুখ করে।

এরা দু'জন রাতে আবু মুসলিম রাজীর কাছে পৌঁছে। কাসেদের মুখে মারুর ঘটনা শুনে রাজী বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন। পরদিন সকালে আবু মুসলিম রাজী তার ফৌজ ও শহরবাসীকে এক ময়দানে একত্রিত করে তিনি ঘোড়ায় চড়ে উচ্চ কণ্ঠে ভাষণ দেন–

'ইসলামের বীর সেনানীরা! তোমাদের আজ ত্যাগ ও পরীক্ষায় দাঁড়ানোর সময় এসে গেছে। মারুতে সুলতানের ফৌজ নিরস্ত্র নিরপরাধ লোকদের ওপর হামলা চালিয়ে পাইকারী হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। এর পেছনে ছিলো হাসান ইবনে সবার বাতিনীদের নোংরা হাত। সুলতান বরকিয়ারকের স্ত্রীকে পাঠিয়েছে হাসান ইবনে সবা। সুলতানকে মরণ নেশা পান করিয়ে তার বুদ্ধি বিবেচনা কেড়ে নিয়েছে সে। সুলতান যে হুকুমই জারি করে তার সব তার বিবির মুখ দিয়ে বের হয়। সেখানে ভাইকে ভাইয়ের বিরুদ্ধে লড়ানো হচ্ছে। সেখানে এখন পঙ্গপালের মতো বাতিনীরা গিজ গিজ করছে। আমাদের এই দেশ এখন বাতিনীদের কব্জায়। এখানে প্রশ্ন শুধু সালতানাত নয় আমাদের দ্বীনের অস্তিত্বের প্রশ্ন। ইসলামের শাশ্বত আলোকে চিরদিনের জন্য নিভিয়ে দেয়া হচ্ছে। যদি ইসলাম তোমাদের প্রাণাধিক প্রিয় হয় তাহলে ঘুম থেকে উঠো এবং বাতিলের এই অশুভ শক্তিকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দাও যেমন আমাদের পূর্বপুরুষরা রোম পারস্যের ভয়াবহ শক্তিকে তুলোধুনো করে ছেড়েছে। মনে রেখো, হাসান ইবনে সবা যদি আমাদের এই প্রিয় সালতানাত কব্জা করতে পারে তাহলে তোমাদের বোন ও নিষ্পাপ কন্যাদের ভোগে নিয়ে নেবে বাতিনীরা। তোমাদের মধ্যে যদি আত্মমর্যাদাবোধ থাকে সশস্ত্র হয়ে মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে বাইরে বেরিয়ে এসো। মারুতে আমি এক শক্তিশালী লশকর পাঠাতে চাই। আমাদের এখানে যথেষ্ট পরিমাণ ফৌজ নেই। তাই স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যারা ফৌজে যোগ দিতে চায় তারা একদিকে সরে এসো। হাতিয়ার ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা তাদেরকে দেয়া হবে। তবে ঘোড়া নিজেদের আনতে হবে।'

আবু মুসলিম রাজীর জোশদীপ্ত ও দরদভরা কণ্ঠের এই বক্তৃতা নিমিষেই সবার মধ্যে ছুঁয়ে গেলো। দেখতে দেখতে অর্ধেক শহর এক দিকে হয়ে গেলো। তাদের থেকে গগনবিদারী কণ্ঠে বিক্ষোভ উঠতে লাগলো হাসান ইবনে সবার বিরুদ্ধে। চারদিক মুখরিত হতে লাগলো জিহাদ জিহাদ শব্দে। আশপাশের দালানের ছাদ থেকে নারীরাও পুরুষদের উৎসাহ দিতে লাগলো।

'আমীরে শহর!'–এক দালানের ছাদ থেকে এক মহিলার উচ্চকিত আওয়াজ উঠলো– 'যদি লড়াইয়ের ব্যাপার হয় তাহলে নারীদেরও প্রয়োজন আছে। যখমীদের উদ্ধার, সেবা শুশ্রূষা ও পানি পান করানো মেয়েদের কাজ। লশকরের সঙ্গে আমাদেরও পাঠিয়ে দিন।'

'লোকবল কম হলে আমরাও লড়তে পারবো'–আরেক নারী কণ্ঠের আওয়াজ উঠলো।

'না, এখন নয়'–রাজী সেই ছাদের কাছে তার ঘোড়া দৌড়ে নিয়ে গিয়ে উঁচু আওয়াজে বললেন– 'যে পর্যন্ত পুরুষরা জীবিত থাকবে নারীদের ঘর থেকে বের করা হবে না সে পর্যন্ত। তোমরা নিজেদের সন্তানদের শেখাও ইসলাম কি এবং ইসলামের দুশমন কারা? আমি এটা দেখে পরম আনন্দিত, আমার মা বোনদের মধ্যেও জিহাদের তাজা আবেগ উদ্বেলিত হচ্ছে। তোমরা ঘরে থেকে মুজাহিদদের জন্য দুআ করতে থাকো।'

দু' তিন দিন পর রায় শহর থেকে শাহরিক স্বেচ্ছাসেবকসহ মোটামুটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এক লশকর রওয়ানা হলো। তাদের গন্তব্য মারু নয়, মারুর কাছের এক পাহাড়ি দুর্গম অঞ্চল। মুযাম্মিলও এই লশকরের সঙ্গে রওয়ানা দেয়।

পরে মুযাম্মিল মারুতে গিয়ে সোজা মুহাম্মদের কাছে যায়। ওযীরে আজম সামিরীর কাছে তখনই যাওয়াটা নিরাপদ ছিলো না। সে মুহাম্মদকে রায়ের আগত লশকর সম্পর্কে অবহিত করে।

'ওযীরে আজম সব ব্যবস্থাপনা এত সংগোপনে করেছেন যে, আগত লশকর পর্যন্ত তার নির্দেশাবলি যাতে পৌঁছে দ্রুতই। রাজীর লশকর পাঠানোর অপেক্ষাতেই ছিলাম আমি। জানিনা তিনি হাতিয়ারের অতিরিক্ত মজুদ পাঠিয়েছেন কি না'–মুহাম্মদ বললো।

'পাঠিয়েছেন। অসংখ্য উটের ওপর বর্শা, তলোয়ার, তীর ও ধনুকের বিশাল এক মজুদ এসেছে'–মুযাম্মিল বললো।

'এসব হাতিয়ারের বড় প্রয়োজন ছিলো। ছাটাইকৃত ফৌজের কাছে এগুলো পৌঁছাতে হবে এখন।'

সরকারি ফৌজ ছাটাইকৃত ফৌজকে তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ফৌজ যখন অভিযান করে পাহাড়ের বেষ্টনীতে এসে যায় তখন তারা আচমকা হামলার শিকার হয়। এভাবে প্রতিদিনই তাদের বেশ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। কয়েকজনের লাশ পেছনে রেখে রাজধানীতে ফিরে যেতে হয়। এসব গেরিলা হামলা হতো আওরিজীর নেতৃত্বে এবং এ কৌশল তারই আবিষ্কার। এজন্য তিনি ছাটাইকৃত সমস্ত ফৌজকে পুরো পাহাড়ি ও জঙ্গুলে এলাকায় ছড়িয়ে দেন। তাই সরকারি ফৌজ যেদিকেই রুখ করতে চাইতো সেখান থেকেই গেরিলা হামলার শিকার হতো।

সুলতান বরকিয়ারক প্রতি দিনই সিপাহসালার হিজাযীকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, বিদ্রোহী ফৌজের কোন হদিস মিলেছে কি না। হিজাযী ঝুলে পড়া চোয়ালে একই জবাব দেন যে, না কোন হদিস মিলেনি। তবে আজ অমুক অমুক খণ্ড দলের এতজন আহত ও এতজন নিহত হয়েছে।

একদিন মুহাম্মদ আবু মুসলিম রাজীর এক মৌখিক পয়গাম পেলো যে, তিনি অত্যন্ত ভরাক্রান্ত হয়ে আছেন। কারণ, এক মুসলমান আরেক মুসলমানের রক্ত ঝরাচ্ছে। এখন যদিও তা সুলতানের পক্ষের ক্ষতি। কিন্তু আসলে তো তা ইসলাম ও মুসলমানদেরই অপূরণীয় ক্ষতি। তাই মুহাম্মদ যেন তার ভাই বরকিয়ারককে ইসলাম ও সালতানাতের দোহাই দিয়ে বুঝায় যে, সে যদি ইসলাম ও মুসলমানের ব্যাপারে আগ্রহ

হারিয়ে ফেলে তাহলে কমপক্ষে এই সালতানাতকে যেন বিপদমুক্ত করে। আর তা সম্ভব না হলে সে যেন সুলতানী পদ থেকে পদত্যাগ করে বা তার বাতিনী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে। তাহলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

মুহাম্মদ তখনই ওযীরে আজম সামিরীর কাছে গিয়ে রাজীর মৌখিক পয়গামটি শোনায়।

ওযীরে আজম বলেন,

'আমি তার এমন একটি পয়গামেরই আশা করছিলাম। এ পয়গাম তোমার ভাইয়ের কাছে তোমারই নিয়ে যেতে হবে। আমি তো প্রকাশ্যে তার ও তার বেগমের লোক। তবে তোমাকে এও বলে দিচ্ছি, এ পয়গাম তার ওপর মোটেও প্রভাব বিস্তার করবে না। উল্টো তোমাকে শাসাবে। যা হোক আমাদের কর্তব্য আমাদের পালন করতে হবে।'

একটুপর মুহাম্মদ বরকিয়ারককে ঘটনাক্রমে একা পেয়ে গেলো। তাকে দেখেই বরকিয়ারক বলে উঠলো–

'দেখেছো মুহাম্মদ! কী খুন খারাবি শুরু হয়েছে? তুমি তো এও জানো, মা যদি লোকদের না ভড়কাতো তাহলে ওরা আওরিজীকে উদ্ধার করতো না। এসব খুন খারাবি তখন থেকেই শুরু হয়েছে।'

'আমার সুলতান ভাই!'–মুহাম্মদ বললো– 'আজ আমি শেষ কথাটি বলতে এসেছি... চোখ খুলে দেখুন এখানে কি হচ্ছে এসব... গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এখন আপনি ইচ্ছা করলে এই খুন খারাবি বন্ধ করতে পারেন ইচ্ছে করলে অব্যাহত রাখতে পারেন বা তা আরো বৃদ্ধি করতে পারেন।'

'তুমি ভেবো না মুহাম্মদ! আমি ফৌজ মোতায়েন করেছি। কয়েক দিনের মধ্যে বিদ্রোহীদের পাকড়াও করা হবে বা ফৌজ ওখানেই তাদেরকে খতম করে দিবে।'

'সুলতানে আলী মাকাম! আপনার ফৌজ একজন বিদ্রোহীও ধরতে পারবে না। আমি তো দেখছি প্রতিদিন আমাদের বিশ পঁচিশজন লোক মারা যাচ্ছে। আপনাকে আমি পরিষ্কার করে বলছি, যদি আপনি আন্তরিক হয়ে যান এই রক্তপাত বন্ধ হোক, ইসলামের ঝাণ্ডা সুউচ্চ হোক এবং এই সালতানাতের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন থাকুক তাহলে সুলতানী ছেড়ে দিন বা ঐ বাতিনী মেয়ে রুজিনাকে পরিত্যাগ করুন। কে না জানে, আপনার মুখের সব হুকুমই আপনার বেগমের। এখন সুলতানী পরিত্যাগ বা বেগম পরিত্যাগ ছাড়া আর কোন পথ আপনার সামনে খোলা নেই।'

'সাবধানে কথা বলো মুহাম্মদ! আমার মাকে আমি নজরবন্দি করেছি। এখন যেন আমার ভাইকে কয়েদখানায় ভরতে না হয়। আমি তোমাকে ও সাঞ্জারকে ত্যাগ করতে পারবো কিন্তু আমার বিবিকে ছাড়তে পারবো না... আর সুলতানী? সে তো আমার মা চান তোমাকে গদিতে বসাতে...'

'ঠিক আছে সুলতানে মুহতারাম! আপনার বিবেক বুদ্ধি এখন আর আপনার হাতে নেই। আপনি আমাকে কয়েদখানায় পাঠান বা জল্লাদের হাতে সোপর্দ করুন কোন

অসুবিধা নেই। কিন্তু এ রক্তপাত বন্ধ হবে না। বরং আরো বাড়বে এসব। এর যে পরিণাম হবে তা আপনার ও আপনার বাতিনী বিবির জন্য হবে খুবই ভয়াবহ ব্যাপার।'

মুহাম্মদ সেখান থেকে বের হয়ে ছোট ভাই সাঞ্জারকে নিয়ে তাদের মার কাছে ছুটে যায়। মাকে আবু মুসলিম রাজীর পয়গাম ও বরকিয়ারকের জবাব এবং তাকে কয়েদ করার হুমকি ইত্যাদি শোনায়। তারপর বলে,

'মহীয়ান মা! আপনার কাছে অনুমতি নিতে এসেছি। আমাকে জিহাদ ডাকছে। আপনি ও সাঞ্জার এখানেই থাকবেন। আর আমাদের কামিয়াবীর জন্য দুআ করবেন। এছাড়া আর কারো সঙ্গে কথাও বলবেন না, ঝগড়া বিবাদেও যাবেন না। শুধু একটি মেয়ে ভাইকে ভাইয়ের দুশমন বানিয়ে ছেড়েছে এবং এক মুজাহিদ জাতিকে দু' অংশে কেটে বিভক্ত করে দিয়েছে। এ অবস্থায় আমার এখানে থাকা উচিত নয়। ওযীরে আজম সামিরীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সালার আওরিজীও আমার অপেক্ষা করছেন। আজ রাতেই আমি গায়েব হয়ে যাবো'–মুহাম্মদ বললো।

'তুমি যেখানেই যাও আমার দু'আ তোমাদের সঙ্গে থাকবে। ঐ যে ঐতিহাসিক বর্ণনা আছে, মুসলমান মায়েরা তাদের সন্তানদের কুরবান করে আসছে, সেই খুনরাঙা বর্ণনা আমি তরতাজা রাখবো। তোমাদের পিতা বীর মুজাহিদ ছিলেন। তিনি তার জীবন ইসলামের জন্য উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। যাও বেটা! আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন।'

★★★★

পাঁচ সাত দিন পর এক রাতে শহরের এক কোণ থেকে আওয়াজ উঠলো, বিরাট এক লশকর শহর অবরোধ করেছে। লোকেরা জেগে উঠতে লাগলো। শহরের প্রতিটি ফটকে ফৌজি চৌকি আছে। চৌকির ফৌজরা কোন ঝুঁকি না নিয়ে প্রথমবারেই সমস্ত ফটক বন্ধ করে ছিলো এবং সিপাহসালার হিজাযীকে সংবাদ দিলো। হিজাযী ছিলেন গভীর ঘুমে। তিনি অবরোধের শব্দ শুনতেই হড়বড় করে উঠে বসলেন এবং রাতের পোশাকেই শহর-প্রাচীরের এক বুরুজে গিয়ে দাঁড়ালেন।

'শহরের ফটক খুলে দাও। না হয় আমরা ফটক ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকবো। তারপর আমরা আর কাউকে জীবিত ছাড়বো না'–বাইরে থেকে চিৎকার শোনা গেলো।

ফৌজের বিরাট একটা অংশ সাবেক ফৌজের সন্ধানে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে সমস্ত জঙ্গলে এলাকা চষে বেড়াচ্ছিলো। শহরে অবশিষ্ট যত ফৌজ ছিলো তারা শহর-প্রাচীরের ওপর গিয়ে দাঁড়ালো। একটুপর তারা তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করলো। অবরোধকারী ফৌজ থেকে আবার চিৎকার ভেসে এলো, মোকাবেলা করার চেষ্টা করবে না। তাহলে শহরবাসীর চরম ক্ষতি হবে। কিন্তু হিজাযী তীরন্দাযি অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিলেন এবং চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? কোন দেশ থেকে এসেছো? আমাদের সঙ্গে কিসের শত্রুতা? এর কোন জবাব এলো না। খবর পেয়ে সুলতান বরকিয়ারকও দৌড়ে এলো এবং হিজাযীর সঙ্গে একই বুরুজের ওপর গিয়ে দাঁড়ালো।

রাতটা এভাবেই এক পক্ষ আরেক পক্ষকে হুমকি ধামকির মধ্যে কেটে গেলো। সকাল হতেই জানা গেলো, শত্রুপক্ষ নিজেদেরই লোক। এতে সাবেক ফৌজও রয়েছে। শহরে নিয়মিত ফৌজ কম থাকায় সুলতানের হুকুমে শহরবাসীকেও লড়াইয়ের জন্য তৈরী করা হতে লাগলো। আর এটাও জানা হয়ে গেলো, এই লশকর রায়ের হাকিম আবু মুসলিম রাজী পাঠিয়েছেন। শহরবাসীরা এ খবর শুনে লড়াইয়ে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানালো। কিন্তু তখনই হাসান ইবনে সবার এজেন্ট সেই ডাক্তার তার লোকজন সারা শহরে রটিয়ে দিলো, আবু মুসলিম রাজী বিদ্রোহী হয়ে গেছে এবং হাসান ইবনে সবার শিষ্য বনে গেছে। তার হুকুমেই এ শহর জয় করতে এসেছে।

সামান্য সময়ের মধ্যে এ গুজব ছড়িয়ে পড়লো শহরময়। শহরবাসী আরেকবার জোশদীপ্ত হয়ে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো এবং শহর প্রাচীরের ওপর এক মানব দেয়াল দাঁড়িয়ে গেলো। আর তীরবৃষ্টি ছুটে যেতে লাগলো প্রাচীরের বাইরের দিকে। অবরোধকারীরাও জবাবি তীরন্দাযি শুরু করে দিলো। এতে লোকজন তীরবিদ্ধ হয়ে প্রাচীরের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। ক্ষতি উভয় পক্ষেরই হতে লাগলো।

ওযীরে আজম সাম্মিরী দেখলেন, শহরবাসী এক ভুল গুজব শুনে উত্তেজনার মুখে ক্রমাগত আহত নিহত হচ্ছে। তিনি তখন তার লোকজন দিয়ে উল্টো খবর ছড়িয়ে দিলেন, আবু মুসলিম রাজী হাসান ইবনে সবার শিষ্য হননি কখনো। বরং আমাদের সুলতান তার বিবির মাধ্যমে হাসান ইবনে সবার শিষ্য বনে গেছে। আর এই শহরে অসংখ্য বাতিনী ঢুকে পড়েছে। এই খবরে শহরের অনেকে প্রতিরোধ ছেড়ে শহর-প্রাচীর থেকে নিচে নেমে এলো।

এদিকে বিদ্রোহ দমনে যেসব সরকারি ফৌজ দূরদূরান্তে ছিলো তারা এই অবরোধের খবর পেয়ে একাট্টা হলো এবং একদিন সুযোগ বুঝে অবরোধকারীদের ওপর পেছন থেকে অতর্কিতে হামলা করে বসলো। হিজাযী এ দৃশ্য দেখে শহরের সবগুলো ফটক খুলে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। ফটকগুলো খুলে দিতেই ভেতরের ফৌজ ও শহরবাসীর একাংশ বাইরের অবরোধকারীদের ওপর টুটে পড়লো।

বড়ই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলতে লাগলো। সূর্যাস্তের পর ফৌজ ও শহরবাসী শহরের ভেতর চলে এলো। তারা লক্ষ্য করলো না, পিছু পিছু অবরোধকারী ফৌজও ভেতরে চলে এসেছে। একটুপর অবরোধকারীরা শহরের সবগুলো ফটকে তেল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিলো।

গভীর রাত পর্যন্তও এ লড়াই বন্ধ হলো না। শহরের অলিগলিতে রক্তের বন্যা বইতে লাগলো। অবরোধকারীদের পক্ষ থেকে বার বার ঘোষণা হলো। আমরা তোমাদের ভাই, আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো না। আমরা বাতিনীদেরকে এখান থেকে বের করতে এসেছি। কিন্তু লড়াই চলতেই থাকলো। আর শহরবাসী দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলো। কেউ সেই ডাক্তারের গুজবে বিশ্বাস করলো, আর কেউ ওযীরে আজমের খবরকে বিশ্বাস করলো।

তারপর হপ্তা দিন অতিক্রান্ত হলো। তবুও সংঘর্ষ বন্ধ হলো না। সুলতান বরকিয়ারকের মহলের আশেপাশের নিরাপত্তা খুবই জোরদার ও নিশ্চিদ্র করা হলো।

অবরোধের পরপরই পরিষ্কার হয়ে গেলো, বরকিয়ারক এক দিকে আর ছোট দুই ভাই আরেক দিকে। ওযীরে আজম সামিরী রইলেন ওপরে ওপরে সুলতান ও তার বেগমের কেনা গোলামের মতো অতি বাধ্য। আর গোপনে গোপনে মহলের সব খবরাখবর এবং সুলতান ও রুজিনার সামান্য নির্দেশও আবু মুসলিম রাজী ও মুহাম্মদের কাছে পৌঁছে দিতে লাগলেন।

একদিন ওযীরে আজম সামিরী গোপনে মুযাম্মিলের সঙ্গে দেখা করে বললেন, এখন সময় হয়েছে তোমার সুমনাকে ব্যবহারের। কারণ, রুজিনাকে হত্যা করা বা বরকিয়ারকের মাথা থেকে নামানোর আর কোন পথ নেই। অভিনয়ে কৌশলে সুমনাকে এর একটা বিহিত করতে হবে। আর এই গৃহযুদ্ধেরও পাঁচ ছয় মাস চলে গেছে। রুজিনাকে না সরালে তা বন্ধও হবে না।

একদিন ওযীরে আজম সামিরী রুজিনার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। নিয়ম মতো তাকে রুজিনা গৃহযুদ্ধের কথা প্রথমে জিজ্ঞেস করলো।

'আজকে একটি দরখাস্ত নিয়ে এসেছি। একটি নেক কাজ করতে হবে এবং তা আপনি পারবেনও'–ওযীরে আজম বললেন।

'বলুন কি কাজ? আমি আপনার খেদমত করবো না তো কার খেদমত করবো?' –রুজিনা বললো।

'এই গৃহযুদ্ধ তো দেশের অস্তিত্বই বিলীন করে দিচ্ছে। আমি আবু মুসলিম রাজী, মুহাম্মদ ও সাঞ্জারকে হত্যার ব্যবস্থা করছি। তবে এখন অন্য আরেকটি অনুরোধ করবো। আমার এক প্রিয় বন্ধু ছিলো। এ শহরে অত্যন্ত সম্মানিত ও অভিজাত। সেদিন সে ঘর থেকে বের হতেই কোত্থেকে এক বর্শা এসে তাকে বিদ্ধ করে। সেখানেই সে মারা যায়। তার দুই ছেলে ছিলো। এরা আগেই গৃহযুদ্ধে মারা যায়। তখন শুধু তার এক স্ত্রী ও এক মেয়ে জীবিত আছে। ঘরে একটি দানাও নেই তাদের। মেয়েটি যুবতী এবং অসম্ভব সুন্দরী। ভয় হয় যদি বিদ্রোহীরা তার সন্ধান পায়...আমি তো আগেই বলেছি আপনার এখানে দাসদাসী অনেক থাকলেও একজন ভদ্র ও সুন্দরী দাসী থাকা জরুরী। মেয়েটিকে যদি আপনি গ্রহণ করতেন তাহলে আপনার প্রয়োজনও পূরণ হতো এবং ইয়াতীম একটি মেয়েকে আশ্রয় দেয়ার মহৎ কাজটিও হতো।'

'আহা এত লম্বা কথার প্রয়োজন ছিলো না। ওকে নিয়ে এলেই আমি রেখে দিতাম। সঙ্গে ওর মা আসতে চাইলেও অসুবিধা নেই।'

'না মুহতারামা বেগম! তার মা নিজের ঘরেই থাকতে পছন্দ করবে। ওকে আপনি মাঝে মাঝে ঘরে যাওয়ার ছুটি দিয়ে দিলেই হবে।'

সেদিনই সুমনাকে নাগীনা নামে রুজিনার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। প্রথম সাক্ষাতেই সুমনা হাউমাউ করে বাপ ভাইয়ের জন্য কাঁদতে শুরু করলো। এমন অভিনয় করলো সুমনা, যেন সে একেবারে সাদাসিধে পর্দাবতী এক মেয়ে। বাইরের দুনিয়ার কোন হাওয়া তার গায়ে এখনো লাগেনি।

'আমাকে কি করতে হবে আপনি শুধু বুঝিয়ে দেবেন'–সুমনা বললো– 'আপনাকে সন্তুষ্ট করার সবরকম চেষ্টা করবো আমি। আর আমার কোন ভুল হলে এটা ভেবে মাফ করে দেবেন যে, আমি সাধারণ ঘরনার এক মেয়ে। এমন শাহী পরিবেশ তো স্বপ্নেও দেখিনি।'

সুমনার এই সাদাসিধা ও আন্তরিক কথাবার্তা রুজিনার খুব ভালো লাগলো। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সুমনা রুজিনার মন জয় করে নিলো। আর দু' চার দিনের মধ্যেই শিখে নিলো শাহী চালচলন ও শাহী কাজকর্ম। সুমনা তো এসব আগ থেকেই জানতো। তবুও রুজিনার কাছ থেকে এসব শিখেছে চরম বাধ্যগত ছাত্রীর মতো। তার প্রতি মুগ্ধ হয়ে রুজিনা একদিন তাকে বরকিয়ারকের সামনে নিয়ে গেলো। বললো, এ এক দুর্লভ তোহফা।

'এ আমার ও আপনার শখের দাসী। এর নাম যেমন নাগীনা কাজও নাগীনার মতো চটপটে'–রুজিনা বললো।

'হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি'–বরকিয়ারক তার দু'বাহু সুমনার দিকে বাড়িয়ে বললো– 'এসো এখানে বসো আমার কাছে।'

'না না'–সুমনা লজ্জায় মরে যাওয়ার ভান করে বললো– 'আপনার পালংকে আমার স্থান নয়। এ তো মুহতারামা বেগমের স্থান। বেগমের এজাযত পেলে অবশ্য আপনার পাশে বসতে পারি।'

'আমি তো তোমাকে আমার বেগমের স্থানে বসাচ্ছি না। আমি যদি তোমাকে একটি ফুল দিই তাহলে তুমি তা একবার হলেও তো শুঁকে দেখবে'–বরকিয়ারক হাসতে হাসতে বললো।

সুমনা রুজিনার দিকে তাকালো। রুজিনা মাথা দিয়ে হালকা ইংগিত করলো। সুমনা আলতো করে বসে পড়লো খাটের ওপর। বরকিয়ারক তার কোমরে হাত দিয়ে তাকে কাছে টেনে আনলো।

'আপনি তো ফুল শুঁকে ফেলেছেন। এখন ফুল তার মালিকের কাছে যাচ্ছে'–সুমনা বরকিয়ারকের বাহুবন্ধন থেকে বের হতে হতে বললো।

রুজিনা বরকিয়ারক এ কথায় হো হো করে হেসে উঠলো। সুমনার মুখের জাদুতে দু'জনেই মুগ্ধ।

মাসখানেকের মধ্যে সুমনা রুজিনার দাসী নয় সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সখী হয়ে উঠলো। একদিন সুমনা রুজিনাকে বড় সরল মুখে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা এই ইমাম হাসান ইবনে সবা কে? আর বাতিনীই বা কাদেরকে বলে? হাসান ইবনে সবা নাকি ইমাম ও নবী। আমি কিন্তু মনে মনে তার শিষ্য হয়ে গেছি।

রুজিনা হাসান ইবনে সবার গুণগান শুরু করে দিলো। আর প্রমাণ করলো, সে এই দুনিয়ার ইমাম আর আকাশের নবী। আরো বললো, আলমোতে আল্লাহ তাআলা তাকে একটি 'জান্নাত' দান করেছেন। সুমনা একথা শুনে চোখ মুখে মুগ্ধতা ফুটিয়ে বললো–

'আমার খুব ইচ্ছা...শুধু একবার...একবার আল্লাহর ঐ পবিত্র বান্দাকে দেখবো...আগেও আমি তার সম্পর্কে এমন কথাই শুনেছি। আপনি কি তার সঙ্গে আমাকে যিয়ারত করাবেন না?'

'কেন নয় নাগিনা! যে কোন সময় তোমার এই ইচ্ছা পূরণ করবো।'

এরপর থেকে সুমনা সবসময়ই কথায় কথায় রুজিনার সঙ্গে হাসান ইবনে সবার প্রসঙ্গ টেনে আনতো। আর এমনভাবে কথা বলতো যেন সে এখন হাসান ইবনে সবার ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে। এর মধ্যে সুমনা সেই মহিলাকেও চিনে নিলো যে রুজিনা ও ঐ ডাক্তারের মধ্যে যোগাযোগ রাখে ও চিঠির আদান প্রদান করে। সুমনা গোপনে ওযীরে আজম সামিরীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতো। সেদিন ওযীরে আজমের সঙ্গে দেখা হলে সুমনা তাকে বললো, শাহী ডাক্তারকে বলবেন ঐ 'সুফুফ' নামক ঔষধ এখন থেকে সরবরাহ করতে যা দিয়ে মুযাম্মিল আফিন্দীকে হাসান ইবনে সবার হাশীষের ব্যাধি থেকে সুস্থ করা হয়েছে। তবে এতে যেন কোন ধরনের ভিন্ন গন্ধ ও স্বাদ না থাকে।

পরের দিনই শাহী ডাক্তার সুমনার কাছে 'সুফুফ' পৌঁছে দেয়। সুমনার প্রতি রুজিনার এত দিনে পূর্ণ আস্থা জমে গেছে। রুজিনা প্রতিদিন একটি কাঁচের পেয়ালায় হাশীষ মিশ্রিত শরবত নিয়ে বরকিয়ারককে পান করায়। একদিন রুজিনা সেই শরবতের পেয়ালা সুমনাকে দিয়ে বলে, এটা সুলতানের কামরায় রেখে দাও। সুমনা পেয়ালা কামরায় না নিয়ে সোজা গোসলখানায় নিয়ে গিয়ে সবগুলো উপুড় করে ফেলে দিলো। সুমনা জানে রুজিনা এখন এখানে আসবে না। এখান থেকে অনেক দূরে। তবুও খুব দ্রুত শাহী ডাক্তারে 'সুফুফ' দিয়ে তেমন স্বাদেরই শরবত বানিয়ে সুলতানের কামরায় রেখে এলো। বরকিয়ারক কামরায় এলে রুজিনা দৌড়ে গিয়ে সেই শরবত তাকে পান করায়।

সুমনা সেদিন আরো কয়েকবার নানান ছুতোয় বরকিয়ারকের কামরায় যায় এবং সুমনার কলাকৌশলে সে শরবত বরকিয়ারককে সেদিন আরো অনেকবার পান করানো হলো। এর মধ্যে সুমনা দু'বার এসে দেখে গেছে সুফুফে বরকিয়ারকের প্রতিক্রিয়া কি হয়। বরকিয়ারকের দিবা নিদ্রার অভ্যাস ছিলো। কিন্তু সেদিন বরকিয়ারক ঘুমুতে পারলো না। শুয়ে শুধু এপাশ ওপাশ করে কাটালো।

সকালে প্রতিদিনের মতো সুমনা রুজিনার কামরায় গেলে প্রথমেই বললো, জানো! সুলতান কাল সারা রাত ঘুমুতে পারেননি। ছটফট করে কাটিয়েছেন।

'ছটফট করবে না তো কি করবে'–সুমনা বললো– 'যে সুলতানের সালতানাতে পরস্পরের রক্তপাত ও গৃহযুদ্ধের কারণে দিন দিন ভয়ংকর অবস্থায় পৌঁছাচ্ছে সে সুলতান কি করে শান্তিতে থাকবে।'

সুমনা তার কাজ চালিয়ে গেলো। রুজিনা তাকে প্রতিদিন শরবতের পেয়ালা দেয় আর সে তা ফেলে সুফুফের শরবত ভরে দেয়। সুমনা একদিন ওযীরে আজম সামিরীকে জানালো, সুলতানের মধ্যে এখন বেশ পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। তিনি প্রায়ই গভীর চিন্তায় ডুবে যান এবং গম্ভীর হয়ে থাকেন। ওযীরে আজম একথা ডাক্তারের কাছে জানালে তিনি বললেন, যে কোন নেশা জাতীয় বস্তু হোক–তা 'হাশীষ' হলেও এর মধ্যে দ্বিগুণ 'সুফুফ' মিশিয়ে দিলে তার মাদকতা দূর করে দেয়।

সুমনার জন্য ডাক্তারের এই নতুন নির্দেশনার কারণে কাজ সহজ হয়ে গেলো। কারণ প্রতিদিন এভাবে রুজিনার দেয়া শরবত ফেলে আবার শরবত তৈরী করাটা

ঝুঁকিপূর্ণ এবং ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তারপর থেকে রুজিনা তাকে হাশীষ মিশ্রিত শরবত দিলে সুমনা তাতে দ্বিগুণ সুফুফ মিশিয়ে দিতো।

একদিন সুমনা ওযীরে আজমের সঙ্গে সাক্ষাত করে বললো, ডাক্তারকে বলতেন আমাকে যেন এমন ধরনের বিষ দেয় যাতে দেহ নিষ্প্রাণ হয়ে যায়। ওযীরে আজম তাকে সে বিষ এনে দিলে সে তা লুকিয়ে রেখে দিলো।

১০

এর কয়েকদিন পর সুলতান বরকিয়ারক তার বিশ্রাম কক্ষে ওযীরে আজমকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন,

'আপনি কি এই গৃহযুদ্ধ বন্ধের কোন কিছু এখনো বের করতে পারেননি?'–একথা বলে গভীর শ্বাস ফেলে বললেন– 'মুহতারাম সামিরী! আপনি আমার বাবার মতো। কিছু একটা করুন। এই রক্তপাত মস্তিষ্কে রক্তপাত ঘটাচ্ছে।'

সামিরী জানতেন, বরকিয়ারক খুব দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসছেন। তবুও অনেক দিন পর তার এই স্বাভাবিক এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত গলা শুনে চমকে উঠলেন। এ সময় কামরায় রুজিনা এসে ঢুকলে বরকিয়ারক তার দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে বললেন, তুমি এখন বাইরে গিয়ে বসো। রুজিনা বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে কয়েক পা এগিয়ে এলো। কোন রকমে ওযীরে আজমকে জিজ্ঞেস করলো, মুহতারাম! বাইরের অবস্থা কি?'

'রুজিনা!'–সুলতানের ভারী কঠোর গলা– 'আমি যেখানে আছি সেখানে তোমার কথা বলার প্রয়োজন নেই। আমি তোমাকে বাইরে দাঁড়াতে বলেছি।'

রুজিনা মাথা নিচু করে দাবানো পায়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো।

'কি যেন বলছিলাম আপনাকে'–সুলতান বললেন– 'ও হ্যাঁ, কোন একটা সমাধান বের করুন এই গৃহযুদ্ধ বন্ধের জন্য।'

'আমি তো এ নিয়ে সবসময়ই চিন্তাভাবনা করছি'–ওযীরে আজম বললেন– 'আমি তো আপনার সাথে কথা বলতে অস্বস্তি বোধ করি। কথা আপনার সঙ্গে বললে উত্তর আসে আপনার বেগমের কাছ থেকে... সুলতানে মুহতারাম! এই রক্তপাতের সব দায় আমার ও আপনার ঘাড়েই বর্তাবে। এর পরিণতিই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এই সালতানাতও থাকবে না, এর সুলতানও থাকবে না, থাকবে না এর কোন ওযীরে আজম। আমরা হবো শিকলে বাঁধা গোলাম। ...আপনি ইযাযত দিলে সন্ধির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

'যা হোক আপনি এর একটা বিহিত করুন।'

সুমনা এই প্রথম রুজিনার চেহারায় হতাশার ছাপ দেখলো। সুমনা তাকে জিজ্ঞেস করলো, মুহতারামার তবিয়ত কি ঠিক নেই? রুজিনা বসে যাওয়া কণ্ঠে জবাব দিলো–

'আমার তবিয়ত ঠিক আছে। সুলতানের তবিয়ত ঠিক নেই। তার জন্য এই বিশেষ শরবত বানাচ্ছি'–রুজিনা তখন শরবত তৈরী করছিলো– 'সালতানাতের দুশ্চিন্তা তাকে প্রায় পাগল করে তুলেছে। অনেক সময় উনার এ অবস্থা হয়। তখন আমি এই শরবত উনাকে পান করাই। ওযীরে আজম চলে গেলে এই শরবত উনাকে পান করিয়ে দেবে। দেখবে ঠিক হয়ে গেছে।'

সুমনা বুঝে গেলো এ শরবতে হাশীষ বা তীব্র নেশাযুক্ত কিছু মেশানো হয়েছে। রুজিনা সুমনাকে নির্দেশ দিয়ে সেখান থেকে বের হয়ে গেলো। ডাক্তারের দেয়া বিশ সুমনা তার কাপড়েই লুকিয়ে রেখেছিলো। খুব দ্রুত সে কাপড় থেকে একটি পুরিয়া বের করে শরবতে মিশিয়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গেই রুজিনা কামরায় ঢুকে বললো, ওযীরে আজম লম্বা কথা বলা শুরু করেছে। তাই এখনই উনাকে এ শরবত পান করিয়ে দেয়া দরকার। রুজিনা পেয়ালা উঠিয়ে সুলতানের কামরায় চলে গেলো। সুমনা কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে রইলো। সুমনা সেখান থেকে রুজিনার গলা শুনলো– 'সুলতানে মুহতারাম! আপনি অনেক ক্লান্ত। শরবতটুকু পান করে নিন'–একথা বলে রুজিনা কামরা থেকে বের হবে এ সময় সুমনা কামরায় ঢুকলো। দেখলো, শরবতের পেয়ালা হাতে নিয়ে সুলতান ওযীরে আজমের সঙ্গে কথা বলছেন।

সুলতান কথার মাঝখানে বিরতি দিয়ে যেই শরবতের পেয়ালা মুখে তুলতে গেলো, ওমনি সুমনা দৌড়ে গিয়ে সুলতানের সামনে গিয়ে ঘাবড়ানো কণ্ঠে বললো– 'এ শরবত পান করবেন না সুলতান'–এই বলে সুমনা সুলতানের হাত থেকে পেয়ালাটি কেড়ে নিলো। রুজিনা কামরা থেকে প্রায় বেরই হয়ে গিয়েছিলো। সুমনার এই আচরণে আবার ফিরে এলো। প্রথমে হতভম্ব তারপর ক্ষিপ্ত হয়ে বললো, 'এ কি বেদতমিজি সুমনা! সুলতানের হাত থেকে পেয়ালা কেন নিয়ে নিলে?'

'সুলতানে মুহতারাম!'–সুমনা রুজিনাকে কোন পাত্তা না দিয়ে বললো– 'এখনই কাউকে একটি বিড়াল বা কুকুর আনিয়ে এ শরবত পান করিয়ে দেখুন...আপনার বেগম এতে বিষ মিশিয়ে দিয়েছেন। আমি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হলে আমার গর্দান তো আপনার সামনেই রয়েছে।'

রুজিনা তো শাপ শাপান্ত করে মুখে গালির বান ছুটালো। আর সুলতান বরকিয়ারক হয়রান হয়ে কখনো রুজিনার দিকে কখনো সুমনার দিকে তাকাতে লাগলেন। ওযীরে আজম এতক্ষণে বুঝতে পারলেন, সুমনা কেন বিষ চেয়েছিলো। তিনি সুলতানের হুকুমের অপেক্ষা না করে নিজেই বাইরে গিয়ে এক খাদেমকে নির্দেশ দিলেন একটি বিড়াল বা কুকুর ধরে আনতে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই হাজির করা হলো একটি কুকুর। সুলতানের হুকুমে খাদেম কুকুরটির মুখ ফাঁক করে ধরলো। আর সুমনা কুকুরের মুখে অর্ধেক পেয়ালা শরবত ঢেলে দিলো। সুলতান কুকুরটিকে ছেড়ে দিতে বললেন।

কুকুরটি কুঁই কুঁই করতে করতে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো এবং দরজার সামনে গিয়ে পিলে চমকানো বিকট এক চিৎকার করে পড়ে গেলো। তারপর দু' একটি খিঁচুনি দিয়ে সেটি স্থির হয়ে গেলো।

সুলতান আগুন চোখে রুজিনার দিকে তাকালেন। তেপায়ার ওপর তার খঞ্জরটি রাখা ছিলো। সেটি নিয়ে কোষমুক্ত করে রুজিনার দিকে এগিয়ে গেলেন। রুজিনা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলো সুলতানের দিকে। সে কাঁপছিলো থর থর করে।

'না সুলতান!'–ওযীরে আজম বরকিয়ারককে বাঁধা দিতে গিয়ে বললেন– 'এ কাজ আপনার নয়, জল্লাদের'...

কিন্তু ওযীরে আজমের কথা শেষ হওয়ার আগেই সুলতানের খঞ্জর ততক্ষণে ঢুকে গেছে রুজিনার পেটে। রুজিনা কিছুই বলতে পারলো না। তার ঠোঁট দুটি শুধু ফাঁক হলো। সুলতান তার পেট থেকে রক্তাক্ত খঞ্জরটি বের করে কাঁপা গলায় বললেন– 'লোকে সত্যই বলতো এ বাতিনী এবং হাসান ইবনে সবা ওকে পাঠিয়েছে'–রুজিনা পড়ে যাওয়ার আগে সুলতান আরেকবার তার পাজরে খঞ্জর বিদ্ধ করে দিলেন। কাটা গাছের মতো রুজিনা পড়ে গেলো। সুলতান খঞ্জরটি বের করে ফরশের ওপর ছুঁড়ে ফেললেন। আর রুজিনার দিকে তাকিয়ে দেখে কয়েকটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তার চোখ দু'টি তখন ভিজে উঠলো।

'মুহতারাম সামিরী!'–বরকিয়ারক বুঁজে যাওয়া গলায় বললেন– 'লাশ এখান থেকে নিয়ে যেতে বলুন। ওর কাফন ও জানাযা পড়ানো হবে না। কুকুর আর ওর লাশ কোন পরিত্যক্ত জায়গায় যেন পুঁতে ফেলা হয়।'

এতটুকু বলতেই সুলতানের মাথা দুলে উঠলো। ওযীরে আজম তাকে ধরে ফেললেন।

'আমাকে আমার মার কাছে নিয়ে চলুন'–বরকিয়ারক বললেন।

'আপনি হাঁটতে পারবেন?'

'হ্যাঁ পারবো।'

ওযীরে আজমের কাঁধে ভর দিয়ে বরকিয়ারক তার মার কামরায় গিয়ে ঢুকলেন। তাকে দেখতেই মার চেহারা রাগে লাল হয়ে উঠলো। বরকিয়ারক সে দিকে না তাকিয়ে ছুটে গিয়ে মায়ের পায়ে গিয়ে পড়লেন।

'মাফ করে দাও আমাকে মা!'–বরকিয়ারক হাউমাউ করে উঠলেন– 'তোমার হারিয়ে যাওয়া ছেলে তোমার কোলে ফিরে এসেছে।'

'সুলতান রুজিনাকে কতল করে দিয়েছেন'–ওযীরে আজম বললেন– 'সুলতান আপনার মনোবাসনা পূর্ণ করে আপনার পায়ে এসে পড়েছেন।'

মার চোখে প্রথমে অবিশ্বাস। তারপর খুশির ঝিলিক ভরে উঠলো তার চোখ মুখ। তিনি তার ছেলের মুখ তুলে চুমুতে ভরে দিতে লাগলেন।

★★★★

ওদিকে কয়েকজন শাহী কর্মচারী রুজিনার লাশ উঠাচ্ছিলো। তাদের একই জিজ্ঞাসা কে এই ডাইনী রানীকে হত্যা করলো?

'সুলতান তাকে নিজ হাতে কতল করেছেন'–সুমনা জবাব দিলো বড় তৃপ্ত গলায়।

'কি অপরাধে?'

'কেন আপনারা জানেন না এ ছিলো হাসান ইবনে সবার পাঠানো এক শয়তান।'

'আহ কি যে ভালো হলো'–দু'জন অফিসার আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে বললেন– 'শুকরিয়া আল্লাহ! সব প্রশংসা তোমারই...সুলতান কোথায় এখন?'

'তিনি তার আম্মীজানের কাছে। মহান আল্লাহ এই সালতানাতের ওপর বড়ই অনুগ্রহ করেছেন। এখন পরস্পরের রক্তপাত বন্ধ হয়ে যাবে।'

'আমার দু' ভাই ফৌজি কর্মকর্তা ছিলো। এই গৃহযুদ্ধে দু'জনেই মারা গেছে।' এক অফিসার কান্নাভেজা কণ্ঠে বললো।

'আহ! এই যে এর হাতেই এসব হয়েছে যার লাশ আপনি দেখতে পাচ্ছেন'–সুমনা বললো।

'সুলতান হুকুম দিয়েছেন এর কতলের খবর যেন কেউ না জানে। একটি হোগলায় পেচিয়ে ওকে নিয়ে যেতে বলেছেন তিনি।'

তারপর একটি বড় হোগলায় রুজিনার লাশ ও সেই মৃত কুকুরটাকে পেচিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো।

'এটাই কি মানুষের আসল পরিচয়?'–সুমনা এক খাদেমার দিকে তাকিয়ে বললো– 'মানুষ তার প্রকৃত সত্তাকে কেন যে ভুলে যায়। এই হতভাগা ভেবেছিলো, চিরদিন সে এই সালতানাতের সম্রাজ্ঞী হয়ে থাকবে। আল্লাহকে ভুলে সে হয়ে গিয়েছিলো শয়তানের পূজারী।'

'কেউ তো আর শিক্ষা গ্রহণ করে না'–খাদেমা বললো– 'যার মাথায় সুলতানির মুকুট রাখা হয় সে সবার আগে ভুলে যায় এ সুলতানী তো মহান আল্লাহর–এর পরিণাম কি হচ্ছে... এক কুকুরের সঙ্গে কবর ছাড়া এক গর্তে দাফন হচ্ছে।'

খাদেমা বের হয়ে গেলে সুমনা গভীর চিন্তায় ডুবে গেলো। একটু পর সেই খাদেমা আবার ফিরে এলো।

'শয়তানের দু'নম্বর পূজারী সেই মহিলা এসে গেছে'–খাদেমা বললো।

'শোন! রুজিনার খুনের কথা সে যেন না জানে। তুমি তো জানো, বাইরের ঐ দারোয়ানও জানেনা ঘোড়ার ওপর করে যে হোগলার গাঠুরি নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাতে ছিলো রুজিনার লাশ...তুমি আর এখন এখানে এসো না।'

এ ছিলো সেই মহিলা যে সেই বাতিনী ডাক্তার ও রুজিনার মধ্যে সংবাদ আদান প্রদান করতো। সেই ডাক্তারের কাছে হাসান ইবনে সবা পয়গাম পাঠাতো। আর ডাক্তার এই মহিলার মাধ্যমে সে সংবাদ রুজিনার কাছে পৌঁছে দিতো। সুমনার সঙ্গে এই মহিলার পরিচয় দেয় এভাবে যে, এ হলো তার সহ দাসী এবং হাসান ইবনে সবার দারুণ ভক্ত। মহিলার সঙ্গে সুমনার দারুণ ভাব জমে উঠে। মহিলাকে দেখেই সুমনা তার মুখে হাসি ছড়িয়ে তাকে স্বাগত জানালো।

'কোন কামরায়?'–মহিলা সুমনাকে রুজিনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো।

'মাত্র তো এলেন। আজ একটু দেরী হবে। তিনি সুলতানের কাছে গেছেন। বলে গেছেন, আপনি এলে যেন আপনাকে কামরায় বসাই...আসুন আমার সঙ্গে।'

সুমনা মহিলাকে সে কামরায় নিয়ে বসালো যেখানে রুজিনা এর সঙ্গে কানাঘুষা করতো। সুমনা বললো, আপনি বসুন। আপনার জন্য কিছু একটা নিয়ে আসছি। এই মহিলা এলে রুজিনা খুব খাতির যত্ন করতো।

একটুপর সুমনা যখন সে কামরায় এলো তখন তার সঙ্গে ছিলো মহলের দু' মুহাফিজ। একজনের হাতে লম্বা রশি।

'ওর হাত পা শক্ত করে বেঁধে ফেলুন'–সুমনা মহিলার দিকে ইশারা করে বললো।

মুহাফিজদের এগিয়ে আসতে দেখে মহিলা বড় বড় চোখ করে সুমনার দিকে তাকিয়ে রইলো। মুহাফিজরা তাকে মাটিতে ফেলে তার হাত পা শক্ত করে বাঁধলো। মহিলা চিৎকার চেচামেচি করে সুমনাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, তার সাথে এসব কি আচরণ হচ্ছে।

'ওকে মাটিতে ফেলে দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিন'–সুমনা বললো।

মুহাফিজদের সঙ্গে সুমনা বাইরে বেরিয়ে এলো এবং দরজা বন্ধ হয়ে গেলো।

'আপনারা দু'জন এখানে দাঁড়ান। আমি সুলতানকে খবর দিতে যাচ্ছি।'–সুমনা মুহাফিজদের বলে সামনে হাঁটা দিলো।

সুলতান বরকিযারক তখনো তার মার ওখানে। ওযীরে আজমও সেখানে ছিলেন। এ সময় কামরায় এসে বললো, সুমনা বিবি এসেছেন।

'ওকে এখনই ভেতরে পাঠিয়ে দাও'–বরকিয়ারকের মা বললেন– 'এতো আল্লাহর প্রেরিত ফিরিশতা। যে আমার বেটার প্রাণ বাঁচিয়েছে। সেলজুকি সালতানাতকে অনেক বড় বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে।'

সুমনা কামরায় ঢুকতেই বরকিয়ারকের মা উঠে গিয়ে সুমনাকে জড়িয়ে ধরে চুমুতে লাগলেন আর তাকে জানাতে লাগলেন কৃতজ্ঞতা।

'আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি মাত্র'–সুমনা বললো– 'আমি এ উদ্দেশ্যেই রুজিনার দাসী হয়ে এসেছিলাম...আচ্ছা একথা পরে হবে। আমি মহামান্য সুলতানকে জানাতে এসেছি, রুজিনার লাশের ব্যাপারে সুলতানের আদেশ কার্যকরী হয়েছে। এর চেয়ে জরুরী কথা হলো, রুজিনা হাসান ইবনে সবার সঙ্গে এক মহিলার মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতো। রুজিনার মতো এর সঙ্গেও আমি ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলি। একটু আগে মহিলা আসলে তাকে বলি যে, আপনি অমুক কামরায় বসুন আমি রুজিনাকে খবর দিচ্ছি। তারপর দুই মুহাফিজ নিয়ে তার হাত পা বেঁধে সে কামরায় বন্দি করে রেখে এসেছি। এ সেই মহিলা যে খুব মূল্যবান ও চমকে উঠার মতো তথ্য দেবে আপনাকে। তখন বুঝতে পারবেন এই সালতানাত এখন কত বড় বিপদের মধ্যে আছে। জানতে পারবেন এ শহরে কত অগণিত বাতিনী আছে।'

সুলতান বরকিয়ারক এখনো সুমনার পূর্ণ পরিচয় জানতে পারেননি। তিনি শুধু তাকে নিছক দাসী ভেবেই বসে আছেন।

'তুমি এসব কথা কিভাবে জানতে পারলে?'–বরকিয়ারক জিজ্ঞেস করলেন।

‘এ প্রশ্নের উত্তর পরে দেবো আমি। হয়তো অন্য কেউ সুলতানকে এর উত্তর দিয়ে দেবে।’

‘ঠিক আছে, তুমি ওখানে যাও। ঐ মহিলাকে বন্দি অবস্থায় থাকতে দাও।’

সুলতান বরকিয়ারক ওযীরে আজমকে দ্রুত গৃহযুদ্ধ বন্ধের কথা বললেও এত সহজ নয় তা বন্ধ করা সম্ভব ছিলো না। কারণ গৃহযুদ্ধ শহর ছাড়িয়ে গ্রামে বন্দরে এবং দূরদূরান্তে গিয়ে পৌঁছেছে অনেক আগে। সরকারী ফৌজের কাছে যুদ্ধ বন্ধের হুকুম পৌঁছানো সম্ভব হলেও বিদ্রোহীদের কাছে পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব ছিলো। কারণ, তাদের সালার আওরিজী, মুহাম্মদসহ অন্যরা কে কোথায় ছিটিয়ে আছে তা কেউ জানে না। ওযীরে আজম তিন চারজন কাসেদ ডেকে একজনকে হিজাযীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন নিজ ফৌজ নিয়ে শহরে ফিরে আসতে। আর অন্যদেরকে দায়িত্ব দিলেন যেভাবেই হোক সালার আওরিজী ও মুহাম্মদকে খুঁজে তাদেরকে জানাতে যে সুলতান ও তার মা লড়াই বন্ধ করার সাধারণ ঘোষণা দিয়েছেন।

এদিকে যুদ্ধের উন্মাদনায় অনেক আগে থেকেই বাতিনীরা বিভিন্নভাবে রঙ চড়াতে লাগলো। সরকারি বা বিদ্রোহী ফৌজের কোন লাশ শহরে এলে তার আত্মীয় স্বজনরা এটাকে ব্যক্তিগত বা বংশগত লড়াই ভেবে প্রতিশোধের জন্য যুদ্ধে যোগ দিতো। বাতিনীরা এটা লক্ষ্য করে তাদের ডাক্তার লিডারকে জানালো। ডাক্তার এই রক্তপাতকে আরো উস্কে দেয়ার জন্য তাদের লোকদেরকে নতুন এক পদ্ধতি শিখিয়ে দিলো। লড়াই থেকে শহরে কোন লাশ এলে তার ঘরের লোকদেরকে বাতিনীরা গিয়ে বলতো, একে অমুক ঘরের লোকেরা হত্যা করেছে। সঙ্গে সঙ্গে নিহতের লোকেরা সে ঘরের লোকদের ওপর হামলে পড়তো। এভাবে শহরে খুন যখমের মাত্রা কয়েকগুণ আরো বেড়ে গেলো। বছরাধিককাল এভাবে গৃহযুদ্ধ চলার পর রুজিনা ও বাতিনীদের মুখোশ উন্মোচিত হয়।

সিপাহসালার হিজাযী শহরে থেকেই সরকারি ফৌজের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন। তাই কাসেদের পয়গাম পেয়েই পেরেশান হয়ে তিনি সোজা সুলতানের দরবারে এসে হাজির হলেন।

‘হিজাযী! এখনই লড়াই বন্ধ করে দিয়ে ফৌজ শহরে ডেকে নিয়ে আসুন’–বরকিয়ারক বললেন।

‘মুহতারাম! সুলতানের নির্দেশ পালনে বিলম্ব হবে না। কিন্তু সৈন্যদল এমনভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে যে, তাদেরকে লড়াই থেকে ফিরিয়ে শহরে নিয়ে আসা খুব কঠিন ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার’–হিজাযী বললেন।

‘এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে কাজ শুরু করুন। আর শুনুন আমরা সালার আওরিজীকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আর কেউ যেন গ্রেফতার বা নিহত না হয়। তলোয়ার এভাবে কোষবদ্ধ করুন।’

হিজাযী রওয়ানা হয়ে গেলেন।

★★★★

'সুলতানে মুহতারাম!'–ওযীরে আজম সামিরী বললেন– 'লড়াই বন্ধ করে উভয় পক্ষের সৈন্যকে পৃথকভাবে শহরে আনতে কিছু সময় তো লাগবেই। তাই এখন ঐ গ্রেফতার করা মহিলাকে জিজ্ঞেস করে কিছু তথ্য পাওয়া যায় কিনা দেখা দরকার। তবে কথা হলো হাসান ইবনে সবার লোকেরা প্রাণ দেয় কিন্তু ভেদ দেয় না।'

'হ্যাঁ সে আশংকা তো আছেই। তবে চেষ্টা করলে হয়তো মহিলার মুখ খোলা যাবে। অন্যথায় সে জীবিতও থাকতে পারবে না। আমি ঐ নাগিনা মেয়ের অনুগ্রহের কথা সারা জীবনেও ভুলতে পারবো না। মা ইজাযত দিলে আমি ওকে শাদী করতেও রাজী।'

'বেটা আমার!'–বরকিয়ারকের মা বললেন– 'এই খুন খারাবি ও সালতানাতের ওপর যে বিপদ ঘনিয়ে এসেছে তা বন্ধ হয়ে গেলে তোমাকে বিয়ের এজাযত দেবো। আমার মতে এর চেয়ে উপযুক্ত আর কোন মেয়ে নেই।'

একটু পর বরকিয়ারক ও ওযীরে আজম সেই বন্দি মহিলার কামরায় গিয়ে মহিলার হাত পায়ের বাঁধন খুলালেন।

'তুমি কে? এখানে কি নিতে এসেছিলে?'–সুলতান জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি মহামান্য সুলতানের বেগমের সখী। প্রায়ই তার কাছে আমি আসা যাওয়া করি। কিন্তু আজ আসতেই আপনার কানিয' মহিলা বললো।

'তুমি কে? কার মেয়ে'–সুলতান তাকে বাঁধা দিয়ে বললেন– 'বা কার স্ত্রী? ঘর কোথায় তোমার? ঠিক ঠিক উত্তর দাও। আমি তোমার সঙ্গে তোমাদের ঘরে যাবো।'

'আমার নাম রাবেআ। আমি শাহদরের মেয়ে। এখানে আমার স্বামীর সঙ্গে থাকি। কিন্তু আমি আপনার কাছে আরজ করছি আমাদের ঘরে যাবেন না। কারণ আমার স্বামী খুবই জালিম লোক এবং অত্যন্ত সন্দেহবাতিক। আপনি বা অন্য কেউ আমাদের ঘরে এলে আমার ওপর আমার স্বামী অপবাদ দিয়ে আমার হাড়গোড় ভেঙ্গে দেবে। আমি শাহদরের এক গোত্র সরদারের মেয়ে।'

'তোমার নাম রাবিআ নয়'–ওযীরে আজম বলে উঠলেন– 'তোমার বাপ কোন গোত্র সরদার নয় এবং তোমার কোন স্বামীও নেই। আমার কথা শোন! নিজের আসল পরিচয় এখনই জানিয়ে দাও। যদি মনে করো মুখ খোলার আগে নিজেকে ধ্বংস করে দিবে তাহলে সে চিন্তা দূর করে দাও'–সামিরী এক মুহাফিজকে বললেন– 'এর দুই হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলো।'

ওযীরে আজমের কথা শেষ হতে হতেই রাবিআ এক ঝটকায় উটে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে তার হাত দুটি নাভীর কাছে চলে গেলো। মুহাফিজও বিদ্যুৎগতিতে রাবিআর হাত শক্ত করে ধরে ফেললো এবং হাত মুচড়িয়ে পেছন দিকে নিয়ে গেলো। আর সামিরী তার নাভীর নিচের কাপড় থেকে উদ্ধার করলেন একটি ধারালো খঞ্জর।

'সুলতানে মুহতারাম!'–সামিরী বরকিয়ারককে বললেন– 'এই খঞ্জরের ফলায় নিশ্চয় বিষ মাখানো আছে। যে কোন একটা জন্তুকে মেরে দেখুন।'

সামিরী মহিলার চুল ধরে খুব জোরে ঝাঁকি দিলেন। মহিলার দাঁতে দাঁত বাড়ি খেলো ঠক ঠক আওয়াজে।

'আমরা তোমাকে মরতে দেবো না'–সামিরী বললেন– 'তোমাকে এমন কষ্ট দেবো যে, তুমি মরবেও না জীবিত থাকতে চাইবে না। হাসান ইবনে সবা তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। সত্যি বলবে?'

'সত্য কী বলবো? আপনাদের মধ্যে এতটুকু ভদ্রতাও নেই...আমি এত বড় বাপের মেয়ে... ।'

রাবিআর কথা শেষ হওয়ার আগেই সামিরী তার চুল ধরে প্রায় আছড়ে ফেললেন। তার মাথা ঠুকে গেলো শক্ত দেয়ালের সাথে। মুহাফিজ কমাণ্ডারের দেহ দৈত্য আকৃতির। তিনি সুলতানের কাছে এজাযত চাইলেন– 'আমি এজাযত পেলে ওর মুখ খুলতে পারবো।'

সুলতান অনুমতি দিলে কমাণ্ডার মহিলার গর্দানের শাহরগ তার মুষ্টিতে নিয়ে জোরে চেপে ধরে বললেন, 'বলো আমি বাতিনী'।

একথা বলে তিনি চাপ আরো বাড়ালেন। রাবিআর চোখ রক্তলাল হয়ে গেলো। সে ছটফট করতে করতে মাথা নাড়িয়ে স্বীকার করলো সে বাতিনী। কমাণ্ডার তাকে ছেড়ে দিলে সে মেঝেতে পড়ে গেলো।

'বলো'–কমাণ্ডার তার পা দিয়ে জোরে লাথি মেরে বললেন।

'আমাকে কতল করে দিন'–আপনাদের সামনে মুখ খুললেও আমাকে কতল করে দেয়া হবে। শুধু আমার গর্দানই কাটা হবে না। ভয়ংকর কষ্ট দিয়ে আমাকে মারবে। আমার সমস্ত শরীরে মধু মেখে হাত পা বেঁধে জঙ্গলে নিক্ষেপ করবে। আপনারা কি জানেন বিষাক্ত সাপ বিচ্ছু পোকা মাকড় আমাকে কিভাবে দংশন করতে করতে মারবে! এক মহিলাকে আমি এভাবে মরতে দেখেছি। সে পুরো দশ দিন মরণ চিৎকার করতে করতে মরেছে।'

'ভয় পেয়ো না'–বরকিয়ারক বললেন– 'সমস্ত জীবন তোমাকে এ মহলে রাখবো। চাইলে উপযুক্ত লোকের সঙ্গে বিয়েও দিয়ে দেবো।'

'আর যদি মিথ্যা বলো কয়েদখানার পুঁতিগন্ধময় এবং অতি ভয়াবহ এক কুঠুরীতে নিক্ষেপ করা হবে। রাতের বেলা বিষাক্ত ইঁদুর আর পোকামাকড় তোমাকে নিয়ে খেলবে। আর দিনে মাথা নিচে পা ওপরে ঝুলিয়ে নিচে আগুনের অঙ্গার জ্বলবে। আর লাকড়ি কয়লার ধোঁয়া তোমার নাকে মুখে দিয়ে ঢুকবে। তখন তোমার কি অবস্থা হবে। বাঁচতে চাইলে তোমার আসল পরিচয় জানাও। বাতিনী ও হাসান ইবনে সবার বিশেষ লোকেরা কোথায় কোথায় আছে বলে দাও। ওদেরকে কখনো তোমার কথা বলা হবে না।'

'আমি আমার বাচ্চা দুটির জন্য জীবিত থাকতে চাই। ওরা এখনো ছোট'–রাবিআ ভেজা চোখে বললো।

'এর অর্থ হলো তোমার স্বামী আছে এবং সে নিশ্চয় ফেদায়েন।'

'আমার কোন স্বামী নেই। আমি কারো স্ত্রীও নই। এদের দু'জনের বাপ ভিন্ন দু'জন লোক। আমি আমার জীবন হাসান ইবনে সবার নামে উৎসর্গ করে দিয়েছিলাম। আমার পুরো জীবন কেটেছে ধোঁকাবাজিতে'।

'তা তো আমরা জানিই। ফেদায়েন নারী পুরুষের কর্মকাণ্ড কি তাও জানা আছে। এখন বলো, এখানে যেসব ফেদায়েন আছে তারা কোথায় কোথায় থাকে?'

'এই শহরের এক-চতুর্থাংশ লোক বাতিনী। যাদের কেউ এ শহরের স্থানীয় নয়। এত মানুষের কথা তাই বলতে পারবো না। এক জায়গার কথা বলবো যেখানে সব ফেদায়েনরা থাকে। রাতে চোরাগুপ্তা হামলা চালালে সবগুলো পাকড়াও করা যাবে'–একথা বলে রাবিআ ডাক্তারের বাড়ির ঠিকানাসহ আরো কয়েকজনের নাম জানালো– 'এই সালতানাতে হাসান ইবনে সবাই গৃহযুদ্ধ শুরু করিয়েছে। সুলতানকে মুঠোয় পুরে কাঠের পুতুল হিসেবে ব্যবহারের জন্য রুজিনাকে পাঠানো হয়েছিলো। রুজিনা সকাল সন্ধ্যা সুলতানকে এক ধরনের 'হাশীষ' পান করাতো এবং তার রূপযৌবনের কারিশমা ব্যবহার করতো... এবং আমি ডাক্তার ও রুজিনার মধ্যে এক মাধ্যম হিসেবে ছিলাম। রুজিনা অস্বীকার করলে ওকে আমার সামনে নিয়ে আসুন। যেখানে সে হাশীষ রাখতো সে জায়গাও আমি দেখাতে পারবো।'

'রুজিনা কি আমাকে কতল করতে চাইতো?'–সুলতান জিজ্ঞেস করলেন।

'না। আপনি তো সম্পূর্ণ ওর মুঠোয় পুরা। আপনাকে কতল করার প্রয়োজন নেই। কতল তখনই করা হবে যখন আপনি পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠবেন...আরেকটা ব্যাপারে আমি সন্দিহান। নাগিনা নামে আপনার যে কানিয আছে ওর নাম নাগিনা নয় অন্য কিছু। হাসান ইবনে সবার কাছে আমাকে কিশোরী বয়সে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। আমার স্মৃতি বলছে , আমি তখন এই কানিযকে ওখানে দেখেছিলাম। রুজিনার সাথেও ওর সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। হাসান ইবনে সবার কথা প্রায়ই ওরা আলোচনা করতো। রুজিনা আমাকে বলেছে, এ মেয়ে স্বভাবজাত বাতিনী এবং গায়েবীভাবে হাসান ইবনে সবার মুরিদ।'

বরকিয়ারক সামিরীর দিকে তাকালেন। সামিরী চোখ দিয়ে কি যেন ইশারা করলেন।

'তুমি কি তোমার বাচ্চাদের এখানে আনতে চাও'?–সামিরী রাবিআকে জিজ্ঞেস করলেন।

'আমাকে কি এখান থেকে চলে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে না?'

'না, তুমি তোমার বাচ্চাদের জীবিত দেখতে চাও। তা শুধু সম্ভব হবে এখানে থাকলে। তোমার বাচ্চারা কোথায় আছে তাই বলো।'

'শুধু তো বাচ্চাই নয়, আমার অনেক মূল্যবান জিনিসও ওখানে পড়ে আছে।'

'সবই চলে আসবে'–বরকিয়ারক বললেন– 'তুমি শুধু তোমার ঘরের ঠিকানা দাও।'

রাবিআ তার ঘরের ঠিকানা দিয়ে দিলো।

'বাচ্চাদের এখন আর জিনিসপত্র রাতে আনলে ভালো হবে'–রাবিআ বললো– 'কারণ, কোনভাবে এসব জানাজানি হয়ে গেলে আমি তো মারা যাবোই। আমার

বাচ্চারাও নিরাপদ থাকবে না। তবে আরেকটা কথা আমি চিন্তা করে কূল পাচ্ছি না–যদি রুজিনা এসব জানতে পারে তাহলে কিভাবে আমি এখানে থাকবো? সে তো যে কোন সময় আমাকে কতল করে দেবে বা বিষ খাইয়ে মারবে। আর আমাকে কতল না করলেও আমার বাচ্চাদের অবশ্যই কতল করাবে। ওর কাছে এমন এক বিষ আছে যার কোন প্রতিষেধক নেই।'

'রুজিনাকে তুমি আর কোন দিন এখানে দেখবে না'–সুলতান বললেন– 'সে দাফন হয়ে গেছে। সারা মহলে ঘুরে ফিরে দেখতে পারো। সে নেই কোথাও।'

'দাফন হয়ে গেছে?'–রাবিআ হয়রান হয়ে বললো– 'কেন? সে কি অসুস্থ হয়ে মারা গেছে, না....'

'ওর সবকিছু আমাদের কাছে ফাঁস হয়ে গিয়েছিলো। আমি জানি না হাসান ইবনে সবার কাছ থেকে তুমি কি পেতে। বললে এর দ্বিগুণ তোমাকে দেবো। হাসান ইবনে সবার জন্য যা করতে এখন আমাদের জন্য তাই করবে। আগে ছিলে ভাসমান এক মেয়ের মতো। এখন তুমি এই মহলের এক অভিজাত সদস্য হয়ে থাকতে পারবে।'

★★★★

তারপর সুলতান বরকিয়ারক ওযীরে আজম সামিরীকে বললেন রাবিআর জন্য প্রহরীর বন্দোবস্তসহ তাকে চমৎকার একটি কামরার ব্যবস্থা করতে এবং ওর বাচ্চাদের এখানে নিয়ে আসতে। এরপর গৃহযুদ্ধ কত তাড়াতাড়ি বন্ধ করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা ও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিলেন। সামিরী চলে গেলেন। বরকিয়ারকও চলে এলেন তার কামরায়। রুজিনার রক্ত ধুয়ে মুছে সেখানে এখন নতুন আরেকটি গালিচা বিছানো হয়েছে। বরকিয়ারক তার প্রহরীকে ডেকে বললেন, কানিয নাগিনাকে ডেকে আনো। সুমনা এক কানিযের সহবত দেখিয়েই কামরায় প্রবেশ করলো এবং গালিচার ওপর বসে পড়লো।

'নাগিনা!'–সুলতান বরকিয়ারক গম্ভীর গলায় বললেন– 'এখন তুমি কানিয নও। আমার হৃদয় আজ তোমার আসন। উঠে এসো। আমার পাশে এসে বসো।'

সুমনা উঠে একটি কুরসী টেনে বসে পড়লো।

'তুমি আমাকে নয়া যিন্দেগী দিয়েছো। এই সালতানাতকে বাঁচিয়েছো কঠিন এক অবস্থা থেকে। আমি তোমাকে এর পুরস্কার দিতে চাই...বলো তুমি কি চাও?'

'সুলতানে মুহতারাম!'–সুমনা বললো– 'আমি আপনার শ্রদ্ধেয়া আম্মীজান ও আপনাকেও বলছি, আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি শুধু...নতুন জীবন বা মৃত্যুদাতা তো একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাকে কেবল এর ওসীলা বানিয়েছেন। এ আমার কৃতিত্ব নয়। তাই কোন পুরস্কারও চাই না আমি।'

'কিন্তু আমি তোমাকে পুরস্কৃত করতে চাই। তুমি শুধু আমার প্রাণই বাঁচাওনি বরং আমার অস্তিত্ব ও সুলতানী ব্যক্তিত্বকে ভয়াবহ এক ধ্বংস থেকে বাঁচিয়েছো। এক

শয়তানের মুঠোয় চলে গিয়েছিলাম আমি। আমার দ্বারা যে আমার মাকে অপদস্থ করেছে। ঐ শয়তান আমাকে আমার ভাইদের দুশমন বানিয়ে দিয়েছে। আর এই যে রক্তপাত হচ্ছে এও আমার কর্মফলে লেখা হবে। তুমি আসাতে আমি সরল পথে চলে এলাম। এ কি কোন সাধারণ কৃতিত্ব?'

'আমি পুরস্কার পেয়ে গেছি সুলতানে মুহতারাম! আমি যা করেছি তা তো ছিলো আমার স্বপ্ন। আমি সফল হবো এমন বাড়তি আশা ছিলো না আমার। কিন্তু মহান আল্লাহ্ আমাকে সফল করেছেন। যা আমি করতে চেয়েছি তা হয়েছে এটাই আমার বড় পুরস্কার।'

'আমি তোমাকে যে পুরস্কার দিতে চাই সেটা হলো, তুমি রুজিনার স্থান নিয়ে নাও...আজ থেকে তুমি আমার কানিয নও...দেশের অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে এলেই আমি তোমাকে বিয়ে করবো। আমার আশা তুমি প্রত্যাখ্যান করবে না।'

'সুলতানে মুহতারাম!'–সুমনা মুচকি হেসে বললো– 'আমার প্রত্যাখ্যানের আশা পোষণ করতেই বলবো আমি। এই প্রত্যাখ্যানের এক কারণ ও প্রেক্ষাপটও আছে...আপনি আগে তা শুনুন তারপর বিয়ের কথা ভাবুন।'

'এর অর্থ তুমি বিবাহিত!'

'না বিবাহিত নই'–সুমনা একথা বলে তার পুরো অতীত সুলতান বরকিয়ারককে শোনালো। হাসান ইবনে সবার হাতে কিভাবে অপহৃত হয়ে তার জীবন লালিত পালিত হয়েছে। কি করে অন্ধকার জীবন থেকে আলোর জীবনে ফিরে এসেছে। তার জীবনে মুযাম্মিল এবং হারিয়ে যাওয়া মা ফিরে এসেছে। বরকিয়ারকের বাবা সুলতান মালিক শাহ মরহুম কোন প্রেক্ষিতে তাকে ও তার মাকে এবং মুযাম্মিলকে এ মহলের বাসিন্দা করেছিলো এবং মুযাম্মিল ও তার মধ্যকার তীব্র ভালোবাসার কথা ইত্যাদি সবই সুমনা বরকিয়ারককে জানালো।

'তাহলে তোমরা দু'জন এখনো বিয়ে করোনি কেন?'

'আমাদের দু'জনের অভিন্ন উদ্দেশ্য ও অঙ্গীকারই আমাদের দুজনের ভালোবাসার সেতুবন্ধন। আমাদের অঙ্গীকার– হাসান ইবনে সবাকে আমরা হত্যা করবো। এ অঙ্গীকার পূর্ণ করেই আমরা বিয়ে করবো। কিন্তু মুশকিল হলো, আমাদের দু'জনকে আলমোতের অনেকে চিনে। ওখানে গেলেই আমরা ধরা পড়ে যাবো। ইবনে সবার বিরুদ্ধে কিছু একটা করার চিন্তা সবসময় তাড়িয়ে বেড়ায় আমাদের। রুজিনার সাথে আপনার বিয়ে হলে আমরা একে একে জানতে পারি তার সব বাতিনী কর্মকাণ্ড। সে আপনার সুস্থ বোধ শক্তি কেড়ে নেয়। তার মাধ্যমেই শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। তাই রুজিনাকে কতল করার জন্য অস্থির হয়ে উঠি আমি। কিন্তু কোন পথ পাচ্ছিলাম না। তারপর ওযীরে আজম আবদুর রহমান সামিরীকে পেয়ে যাই। তিনিই আমাকে কানিযের ছদ্মবেশে এখানে নিয়োগ দেন।'

রুজিনার সাথে কিভাবে এত ঘনিষ্ঠ হয় এবং কিভাবে তার এত আস্থাভাজন হয় বিস্তারিত সে সুলতানকে শোনায়।

'সুলতানে আলী মাকাম!'–সুমনা বলে– 'আপনি যদি আমাকে ভাবাবেগে আক্রান্ত হয়ে জবরদস্তি করে বিয়ে করেন সেটা তো পুরস্কার হবে না। দেশে কত সুন্দরী মেয়ে আছে যাকেই চাইবেন সে আপনার পায়ে এসে লুটিয়ে পড়বে। আমাকে আমার মতো থাকতে দিন। এটাই পুরস্কার। এখনো আমার অঙ্গীকার পূর্ণ হয়নি। প্রতিনিয়তই আমার বুকে হাসান ইবনে সবার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও প্রতিশোধের তুফান জিগিয়ে উঠে। বড় কষ্টে আমি তা চেপে রাখি। ঐ শয়তান পর্যন্ত আমি পৌঁছতে না পারলেও যেখানেই কোন ফেদায়েনের সন্ধান পাবো সেখানেই চলে যাবে আমার বিষমাখা হাত।'

'আমি কখনো তোমাকে জোর করবো না। মুযাম্মিল আফেন্দী কোথায়?'

'সে সালার আওরিজীর সঙ্গে আছে। আপনার দুই ভাই মুহাম্মদ ও সাঞ্জারের সঙ্গে তার নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। সে জানে উভয় পক্ষের ফৌজের মধ্যে বাতিনী আছে, যারা জ্বলন্ত আগুনে ঘি ঢালছে। ঐ বাতিনীদের হত্যার জন্য মুযাম্মিল সবসময় উন্মাদ হয়ে থাকে। ওর সঙ্গে আপনাকে সাক্ষাত করাবো।'

বরকিয়ারকের চোখে তন্দ্রার ভাব এসে গিয়েছিলো। আচমকা তিনি এক লাফে উঠে বসে সুমনার হাত স্পর্শ করলেন। তারপর তা তার চোখে ছোঁয়ালেন। আলতো করে চুমু খেলেন এবং সসম্ভ্রমে হাত ছেড়ে দিয়ে কাঁপা আওয়াজে বললেন,

'যদি এক নারী এত মহৎ কাজ করতে পারে তাহলে এক সুলতানের পক্ষে আরো বড় মহৎ কাজের সুযোগ রয়েছে। বিয়ে করাই তো শুধু এ জীবনের গন্তব্য নয়। আমাকে অনেক কিছু করতে হবে। আমি করবোও তা।'

'এখন আমার জন্য কি হুকুম? আমি আমার ফরজ আদায় করেছি। অনুমতি দিলে আমি আমার মার কাছে চলে যাবো...আমি আমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলছি। এখান থেকে চলে যাওয়াই এখন উচিত আমার। আমি আপনার সামনে থাকলে আপনার একটু আগের সেই অস্বস্তিকর ইচ্ছাটা আবার ফিরে আসতে পারে। কোন প্রয়োজনে আমাকে স্মরণ করলে তৎক্ষণাৎ আপনার কাছে পৌঁছে যাবো আমি।'

'হ্যাঁ সুমনা! আমাকে তুমি জাগিয়ে তুলেছো। দৃঢ় এক সংকল্প আমার মধ্যে উদ্ভাবন করে দিয়েছো। আর তুমি যা বলেছো ঠিকই বলেছো। তোমার মার কাছে চলে যাও তুমি। এমন যেন না হয় যে, আমি আমার হৃদয়ের ডাকে বাধ্য হয়ে তোমাকে বিয়ের জন্য বাধ্য করবো। সালতানাতের কাজেই আমি এখন ডুবে যাবো।'

★★★★

সুমনা চলে যাওয়ার পর সুলতান বরকিয়ারক ওযীরে আজম সামিরীকে ডেকে আনলেন। বললেন,

'ঐ বাতিনী ডাক্তারের ঘরে আজ রাতেই হামলা চালাতে হবে। অর্ধেক রাতের পর চালানো হবে এ গুপ্ত হামলা।'

'ব্যবস্থা হয়ে যাবে'–ওযীরে আজম বললেন– 'তবে ওদেরকে জীবিত ধরা সম্ভব হবে না। তাই অনুমতি চাইবো যে, ওরা লড়াই করলে ওদেরকে জীবিত ধরার চেষ্টা করা হবে না, তবে দু' একজন তো অবশ্যই জীবিত ধরা যাবে।'

'এসব ভাববার কাজ আপনার। সকাল বেলা এদেরকে জীবিত বা মৃত আমি দেখতে চাই।'

সে রাতে ডাক্তারের হাবেলিতে প্রায় বিশজনের মতো ফেদায়েন একত্রিত হয়। তাদের আলোচনার বিষয়– সুলতানের পক্ষ থেকে লড়াই বন্ধের হুকুম দেয়া হয়েছে। এখন আমাদের করণীয় কি?

'ভেবে দেখো তো সুলতান কেন এ হুকুম দিয়েছেন'–ডাক্তারের ঘনিষ্ঠ একজন বললো– 'এর অর্থ হলো, রুজিনা ব্যর্থ হয়েছে।'

'আমিও এটা ভেবেই রাবিআকে রুজিনার কাছে পাঠিয়েছিলাম'–ডাক্তার বললো– 'কিন্তু রাবিআর এখনো ফেরার নাম নেই। ওর বাড়িতে লোক পাঠিয়ে জানা গেছে, ওর বাচ্চারাও নেই বাড়িতে, ঘর খালি পড়ে রয়েছে।'

'তাহলে মনে হয়, সে ধরা পড়েছে। নাকি সুলতান বরকিয়ারককে তার ভাইয়েরা কতল করে দিয়েছে। গৃহযুদ্ধ বন্ধের হুকুম দিয়েছে মনে হয় মুহাম্মদ।'

এই হাবেলির অবকাঠামো অনেকটা কেল্লার মতো মজবুত। এর ছাদ পাশের বড় একটি বাড়ির ছাদের সঙ্গে লাগোয়া। এই লাগোয়া ছাদের ওপর দিয়ে ওযীরে আজমের গুপ্ত হামলাকারীরা এই হাবেলির ছাদে পৌঁছে যায়। এ সময় ভেতরে এক বাতিনী বলে উঠে, ছাদ থেকে মনে হয় কারো পায়ের শব্দ আসছে। সবাই নীরব হয়ে গেলো। আর কয়েকজন দৌড়ে উঠোনের দিকে বেরিয়ে গেলো।

হামলাকারীরা বাতিনীদের দেখে ফেললো। একজন এক বাতিনীকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়ে মারলো। বর্শা বাতিনীর পিঠে বিদ্ধ হলো এলোপাতারিভাবে। এর পাশের আরেক বাতিনী এটা দেখে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা না করে তার সঙ্গীর পিঠ থেকে বিদ্ধ বর্শাটি নিয়ে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। এ সময় হামলাকারীরা ক্ষিপ্রগতিতে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলো।

কামরা থেকে সব বাতিনী তলোয়ার বর্শা নিয়ে বেরিয়ে এলো। দেখতে দেখতে হাবেলির আঙ্গিনা রূপ নিলো তুমুল রণাঙ্গনে। ফটকে দুটি মশাল জ্বলছিলো। তার আলোয় শুধু দেখা যাচ্ছিলো তলোয়ারের ঝলক। বাতিনীদের কুপোকাত হতে বেশি সময় লাগলো না। শুধু একজন বাতিনীকে জীবিত এবং আহত অবস্থায় ধরা গেলো। আরো কয়েকজনকে এমন আহত করার পর তারা নিজেরা নিজেদের পেটে খঞ্জর মেরে আত্মহত্যা করে। সে ডাক্তারও মারা যায়।

সেই জীবিত বাতিনীকে ওযীরে আজমের কাছে নিয়ে গেলে তিনি তাকে মহলের এক বিশেষ কামরায় নিয়ে যেতে বললেন। সে কামরাটি ছিলো এই শহরের সবচেয়ে নিকৃষ্ট কামরা। সেখানে কেউ ঢুকলে তীব্র দুর্গন্ধের জন্য নাকে কাপড় দেয়া ছাড়া দু' তিন মুহূর্তের বেশি টিকতে পারতো না। একাধারে কাউকে কয়েকদিন সেখানে রাখার পর পেট ফুলে মরে যেতো বা বিলকুল পাগল হয়ে যেতো।

সে বাতিনীকে ঐ কামরায় নিয়ে যাওয়া হলো। একটু পর ওযীরে আজম দু'জন লোকসহ সেখানে গেলেন। বাতিনীকে বললেন, যদি সে সত্য বলে প্রাণে বেঁচে যাবে এবং পুরস্কারও দেয়া হবে। আর না হয় তার করুণ মৃত্যু ঘটবে।

'শায়খুল জাবালকে আমি ধোঁকা দেবো না'–বাতিনী বললো– 'আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেটে ফেলুন এবং আমার মুখ অক্ষত রাখুন তবুও আমার মুখ থেকে সে কথা বের হবে না যা আপনারা শুনতে চান।'

তারপর তাকে অনেক বুঝানোর চেষ্টা করা হলো। লোভ দেখানো হলো ভয়ও দেখানো হলো। কিন্তু তার নির্বিকার হাসি হাসি মুখের পরিবর্তন হলো না। ওযীরে আজম প্রহরীদেরকে কিছু নির্দেশ দিয়ে সেদিনের মতো চলে এলেন।

পরদিন সকালে ওযীরে আজম নিজ দফতরে না গিয়ে সে কামরায় চলে গেলেন। দেখলেন, বাতিনীকে উল্টো লটকিয়ে তার দু' হাতে দশ কেজি ওজনের পাথর ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাকে বলা হলো, সে এখনো মুখ খুলেনি। তিনি চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে চলে এলেন।

চার পাঁচ ঘন্টা পর আবার গেলেন। বাতিনী তখনো উল্টোভাবে লটকানো। সামিরী হতভম্ব হয়ে গেলেন এ কি মানুষ না পাথর। এখনো সে একটি শব্দও মুখ থেকে বের করেনি। এ সময় হঠাৎ করে খুব জোরে সে কামরার দরজা খুলে গেলো। সামিরীসহ কামরার সবাই চমকে উঠে সেদিকে তাকালেন। পাগল বেশে উসখুস চুলে মলিন কাপড়ে এক মহিলা কামরায় ঢুকে উল্টো ঝুলিয়ে রাখা বাতিনীকে গিয়ে জাপ্টে ধরলো। পরমুহূর্তে বাতিনীকে ছেড়ে মহিলা ওযীরে আজমের পায়ে গিয়ে পড়লো।

'আল্লাহ তোমাকে অনেক বড় পদ দিয়েছেন'–মহিলা কেঁদে কেঁদে ফরিয়াদ করলো– 'এ আমার ভাই...একটাই ভাই। ওকে বাতিনী ভাববেন না। বাতিনীদের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই...আল্লাহর দিকে চেয়ে ওকে ছেড়ে দিন, না হয় আমার বাচ্চারা না খেয়ে মারা যাবে।

দু'জন প্রহরী মহিলাকে সামিরীর পা থেকে উঠিয়ে ধাক্কিয়ে বাইরে বের করে দিচ্ছিলো। কিন্তু সামিরী বাঁধা দিয়ে মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, ভেতরে ঢুকলো কি করে সে?

'দারোয়ানদের কাছে আমি কেঁদে কেঁদে ফরিয়াদ করি। দারোয়ানের দয়া হলে সে আমাকে দেখিয়ে দেয় আমার ভাই এ কামরায় রয়েছে।'

'আরামে কথা বলো'–সামিরী বললেন– 'আমরা অকারণে কারো ওপর জুলুম করি না। তোমার ভাইকে আমরা ঐ ডাক্তারের বাড়ি থেকে ধরেছি যে হাসান ইবনে সবার এজেন্ট। এ তো আমার লোকের সঙ্গে লড়াইও করেছে। তোমার ভাইকে জীবিত ধরা হয়েছে। সে ওখানে কেন গিয়েছিলো বলো!'

সে আসলে ডাক্তারের চিকিৎসার জন্য সেখানে গিয়েছিলো। তাছাড়া ডাক্তারও ওকে পছন্দ করতো। ঘরের টুকটাক কাজ ওকে দিয়ে করাতো এবং পয়সাও দিতো।

'কিন্তু সে নিজেই তো বলেছে, আমি বাতিনী। শায়খুল জাবালকে ধোঁকা দেবো না এবং সত্যও বলবো না।'

'ওকে জিজ্ঞেস করুন। সে কি জানে শায়খুল জাবাল কে? ঐ শয়তান তাকে বলেছে, শায়খুল জাবাল আল্লার প্রেরিত নবী বা ইমাম। ওকে জিজ্ঞেস করুন হাসান ইবনে সবার কথা। দেখবেন ঘৃণায় সে থুথু ছিটাবে।'

সামিরী মহিলাকে নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলেন। চিন্তিত কণ্ঠে তিনি প্রহরীকে বললেন, বাতিনীকে খুলে দাও এবং তাকে পানি পান করাও।

'আমার একটা কথা শোন'–সামিরী মহিলাকে বললেন– 'তোমাকে তোমার ভাইয়ের কাছে একা রেখে যাচ্ছি। দেখো সে তোমাকে বলে কিনা হাসান ইবনে সবার চেনা সে। যদি না বলে তাহলে সে যে ওদের কেউ নয় তার প্রমাণ আমাকে দেবে। আমি যদি তা মেনে নিই ওকে ছেড়ে দেবো।'

বাতিনীকে নামানো হলো পানি পান করানো হলো। কিছু খাওয়ানোও হলো। তারপর সবাই মহিলা ও বাতিনীকে রেখে বেরিয়ে গেলো।

'বেওকুফ!'–মহিলা বাতিনীকে জড়িয়ে ধরে বললো– 'কি করে জীবিত ধরা পড়লে? পালিয়ে যেতে পারলে না?'

'আমি তো দরজা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলাম'–বাতিনী কাতরাতে কাতরাতে বললো– 'কিন্তু ওরা আমাকে আহত করে ধরে ফেললো। তুমি তো কামাল করে দিয়েছো। এখান থেকে কি আমাকে বের করতে পারবে?'

'যে কাজে হাত দিই আমি তা করেই ছাড়ি। আশা করি তোমাকে আমি এখান থেকে বের করে নিয়ে যাবো। আচ্ছা তোমাকে আমি কি করে জানাবো যে, অমুক সময় তোমাকে ফেরার করাবো, প্রস্তুত হয়ে থেকো! আমি তো আমাদের সবাইকে চিনি না।'

বাতিনী তাকে সবার নামধাম বলতে শুরু করলো।

শেষ বিকেল। ওযীরে আজম সামিরী বরকিয়ারকের সঙ্গে গৃহযুদ্ধ বন্ধ নিয়ে কথা বলছেন। এ সময় দারোয়ান কামরায় ঢুকে বললো, এক মহিলা মোলাকাতের এজাযত চাইছে।

সুলতান তখন কাউকে সাক্ষাত দেয়ার মুডে ছিলেন না। এজন্য তিনি ওযীরে আজমের দিকে শুকনো চোখে তাকালেন।

'আমি জানি সে কে?'–সামিরী বললেন– 'ওকে আসতে দিন সুলতানে মুহতারাম!'

রাবিআ কামরায় প্রবেশ করলো। সুলতান তার অবস্থা দেখে পেরেশান হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ তোমার কি হয়েছে রাবিআ? রাবিআর কাপড় চোপড় চুল মুখ সব ধূলিমলিন তখন।

'আপনাকে আমি বলবো সুলতানে মুহতারাম!'–সামিরী বললেন– 'আগে সেটা শুনে নিন যার জন্য ওকে আমি ডেকেছি।'

'কাজ যা করার আমি করে এসেছি। ঐ বাতিনীর পেট থেকে আমি সব কথাই বের করে নিয়েছি। আর না হয় ওকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললেও আপনি ওর মুখ খোলাতে পারতেন না'–রাবিআ হেসে বললো।

সামিরী সুলতানকে ব্যাখ্যা করে বুঝালেন রাবিআ কিভাবে ঐ বাতিনীর বোনের অভিনয় করে এবং ওকে ধোঁকা দিয়ে তার থেকে তথ্য উদ্ধার করেছে। সামিরী আরো জানালেন, গতকাল রাতে তিনি আর রাবিআ মিলে এই পরিকল্পনা করেন এবং সকালে তা মঞ্চস্থ করা হয়। এটাও জানালেন, রাবিআ ছাড়া এ কাজ আর কারো দ্বারা সম্ভব ছিলো না।

'তুমি অনেক বড় পুরস্কার প্রাপ্তির কাজ করেছো রাবিআ!' তোমার থাকার জন্য এই মহলে আমি বিশেষ ব্যবস্থা নেবো। তোমার সন্তানের শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্ব আমাদের–এখন যাও। বেশ পাল্টিয়ে পরিচ্ছন্ন হও। পরে তোমাকে ডাকবো আমি'–সুলতান বললেন।

রাবিআ বিজয়ী পায়ে সেখান থেকে বের হয়ে গেলো। আর সুলতান বরকিয়ারক এক সৈনিককে ডেকে সেই বাতিনীকে কতল করে লাশ জঙ্গলে পুঁতে ফেলার নির্দেশ দিলেন। তারপর সুলতান ওযীরে আজমের মাধ্যমে নির্দেশ জারী করলেন যাদেরকে বাতিনী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদেরকে পাকড়াও ও কতল করা হবে। এরপর শুরু হলো ব্যাপকভাবে বাতিনীদের পাকড়াও। বাতিনীদের বড় বড় সন্ত্রাসীদের কেউ এ থেকে বাঁচতে পারলো না। এদের গর্দান দ্বিখণ্ডিত করা হলো সুলতানের সামনে। চার পাঁচ দিন পর্যন্ত এই বাতিনী নিধন অভিযান চললো। চার পাঁচ দিন পর প্রায় অপ্রত্যাশিতভাবেই গৃহযুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেলো এবং সব সালার ও কমান্ডাররাও এক ছাদের নিচে সমবেত হলো।

একদিন পর সিপাহসালার হিজাযী, নায়েবে সিপাহসালার আওরিজী, মুহাম্মদ ও সাঞ্জার বরকিয়ারকের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। এদের সবাইকে এক সঙ্গে দেখে সুলতান দারুণ খুশী হয়ে সবাইকে বসতে বললেন। কিন্তু তাদের পেছনে যখন আবু মুসলিম রাজীকে দেখলেন তিনি হয়রান হয়ে গেলেন। পরম শ্রদ্ধা নিয়ে দাঁড়িয়ে তাকে স্বাগত জানালেন। তারপর সবার জন্য আপ্যায়নের নির্দেশ দিলেন।

'মুহতারাম রাজী! আপনাকে দেখে আজ আমার বাবার কথা মনে পড়ছে। কিন্তু আপনি এখানে কি করে এলেন? নাকি আমি অযথাই বিস্ময় প্রকাশ করছি?'–বরকিয়ারক আবু মুসলিম রাজীকে বললেন।

'না বেটা! তোমার বিস্ময় প্রকাশ ঠিকই আছে। তুমি জানো না, আমি আমার লশকর নিয়ে তোমার দারুস সালতানাতের সামান্য দূরে অবস্থান করছিলাম। আর তা তোমার থেকে এই সালতানাত ছিনিয়ে নেয়ার জন্য নয় বরং হাসান ইবনে সবা থেকে সালতানাতকে রক্ষার জন্য করা হয়েছে। কিন্তু তুমি এক বাতিনী মেয়ের কবলে এমনভাবে পড়ে গিয়েছিলে যে, কেউ আর তোমার প্রতি ভরসা রাখতে পারছিলো না। তারপর এখন যখন কাসেদ খবর দিলো, তুমি গৃহযুদ্ধ বন্ধের হুকুম দিয়েছো। তখন ছেলেরা এ খবর বিশ্বাসই করতে চাচ্ছিলো না। কিন্তু আমি তো যুগের কত বিচিত্র ঘটনা দেখেছি। তাই ওদেরকে বললাম, চলো, কথা বলে দেখি সমস্যার সমাধান হয় কিনা।'

'সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। ঐ বাতিনী মেয়েকে আমি নিজ হাতে কতল করেছি এবং সবার আগে আমি আমার মহান আম্মীজানের পায়ে গিয়ে পড়েছি। তারপর ওযীরে আজমের সঙ্গে অনেক বিষয়ে আলোচনা করেছি। সেগুলো এখন আপনাকে শোনাবো।'

বরকিয়ারক রাজীকে বিস্তারিত শোনালেন কি করে এখানকার অসংখ্য বাতিনী সন্ত্রাসীদের খুঁজে বের করে হত্যা করা হলো। তারপর বললেন,

'এখন আমি উভয় পক্ষের লশকরকে একত্রিত করে এক লশকরে রূপ দিতে চাই। তারপর ওদেরকে কিছু দিন প্রশিক্ষণ দিয়ে কেল্লা আলমোতে হামলা করা হবে। শুধু

কয়েকজন বাতিনীকে হত্যা করে হাসান ইবনে সবাকে রুখা যাবে না। খবর আসছে ঐ শয়তান বিশাল এলাকা দখল করে নিয়েছে। সেসব এলাকায় তার এমন প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে যে, আমাদের সৈন্যদল আলমোতের দিকে রুখ করলে ঐসব এলাকার জনগণ পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে কোন পরওয়া করবে না।'

আবু মুসলিম রাজীর প্রস্তাবে সেখানে বরকিয়ারকের মাকে নিয়ে আসা হলো। মা দীর্ঘদিন পর আবু মুসলিম রাজীসহ তিন ছেলেকে এক সঙ্গে দেখে আবেগে কেঁদে ফেললেন। আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে তাদের এই প্রীতি ঐক্য দীর্ঘজীবী হওয়ার জন্য দুআ করলেন। তারপর সবার মধ্যে রুদ্ধদ্বার বৈঠক হলো। আবু মুসলিম রাজী সেখানে এক যুগদর্শী প্রস্তাব পেশ করলেন। তা হলো, তিন ভাইয়ের এক সঙ্গে এক দারুসসালতানাতে থাকা ঠিক হবে না। কারণ নেতৃত্বের প্রতি সব মানুষেরই দুর্বলতা আছে। তাই এই সালতানাতকে দু'ভাগে ভাগ করা হবে। এক অংশের শাসক থাকবেন সুলতান বরকিয়ারক। আরেক অংশের মুহাম্মদ ও সাঞ্জার। তবে কেন্দ্রীয় সুলতান বরকিয়ারকই থাকবেন। যাতে সালতানাতের বিকেন্দ্রীকরণ ও ঐক্য উভয়টাই অটুট থাকে। এরকম হলে ভবিষ্যতে আর দ্বন্দ্ব ও অনৈক্য সৃষ্টি হবে না।

এ প্রস্তাবকে ওযীরে আজম সামিরী, সিপাহসালার হিজাযী ও নায়েবে সিপাহসালার আওরিজী এবং সুলতানের মাও এক বাক্যে সমর্থন করলেন। সবার তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত তখনই সালতানাতের মানচিত্র সামনে রেখে সালতানাতকে দু'ভাবে ভাগ করে দেয়া হলো। কিন্তু এর কার্যকারিতা এজন্য মুলতবী রাখা হলো যে, সরকারি ও বিদ্রোহী ফৌজ আগে শহরে এসে একত্রিত হোক এবং বাতিনীদের জঞ্জাল পরিষ্কার করুক। তারপর নিশ্চিন্তে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে।

ভাগ হওয়ার পর মুহাম্মদ ও সাঞ্জারকে যে অংশ দেয়া হলো, তার মধ্যে সিরিয়া, ইরাক, মুসেল, আজারবাইজান ও আরমেনিয়া উল্লেখযোগ্য। অবশিষ্ট অংশ দেয়া হলো বরকিয়ারককে এবং এ ফয়সালাও হলো কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা থাকবে বরকিয়ারকের হাতে।

এরপর বিক্ষিপ্ত ফৌজকে একত্রে জড়ো করা শুরু হলো। আর বরকিয়ারক হুকুম জারী করলেন, কোন বাতিনীকে কতল ব্যতীত রেহাই দেয়া হবে না। তবে ব্যক্তিগত আক্রোশে বাতিনী নাম দিয়েও কাউকে হত্যা করা যাবে না। এ ধরনের প্রমাণ পাওয়া গেলে হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে। শহরে অপরিচিত বা সন্দেহজনক কাউকে দেখা গেলে তাকে কঠিনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর কয়েকদিনের জন্য শহর পুরোপুরি সিল করে দেয়া হবে। কেউ ভেতরে ঢুকতেও পারবে না। ভেতর থেকে কেউ বেরও হতে পারবে না। শুধু বাইরে রয়ে যাওয়া বিক্ষিপ্ত ফৌজ শহরে ঢুকতে পারবে। এ হুকুমের কারণে শহর থেকে পালাতে গিয়ে অনেক বাহিনী ধরা পড়ে এবং কতল হয়ে যায়।

শহর ধীরে ধীরে শান্ত হতে শুরু করলো। বিক্ষিপ্ত ফৌজও ব্যারাকে ফিরে এলো। একদিন ফৌজের সব সদস্যকে বিশাল এক ময়দানে জড়ো করা হলো। সবাই ফৌজি

বিন্যাসে ঘোড়সওয়ার ছিলো। একটুপর ঘোড়ায় চড়ে এলেন সুলতান বরকিয়ারক, ওযীরে আজম সামিরী, আবু মুসলিম রাজী, মুহাম্মদ, সাঞ্জার, সিপাহসালার হিজাযী ও আওরিজী। সুলতান বরকিয়ারক এতদিন পর বিভক্ত হয়ে যাওয়া সেনা সদস্যদের এভাবে একত্রিত হতে দেখে প্রথমে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। তারপর উঁচু আওয়াজে অভিভূত কণ্ঠে বললেন, 'আমার প্রিয় সৈনিক ভাইয়েরা! তোমরা আল্লাহর সৈনিক। ইসলামের হেফাজতই তোমাদের ঈমান। আমি খুবই বেদনাহত যে, এক শয়তান আমার ওপর জেঁকে বসেছিলো। তার চাল আমাদের কেউ বুঝতে পারেনি। ভাই ভাই পরস্পরের রক্তে ভেসে যেতে লাগলো.....

'আজ আমি অনুতপ্ত। এই রক্তপাতের সব পাপ আমার ওপর। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই আমি। এ ছিলো হাসান ইবনে সবার উস্কে দেয়া ধ্বংসযজ্ঞ। তার লোকেরা আমাদের হামদর্দ হয়ে আমাদের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে এবং আমাদের মধ্যে বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে। কেউ আমরা ওদেরকে চিনতে পারিনি। ইহুদী খ্রিষ্টান ইসলামের চিরশত্রু। কিন্তু হাসান ইবনে সবা ও তার উদ্ভাবিত ফেরকা ইসলামের সবচেয়ে ভয়ংকর দুশমন। নিজেকে মুসলমান পরিচয় দিয়ে সে মানুষকে সবচেয়ে বড় ধোঁকাটা দেয়। এখন মহান আল্লাহ আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন। তার দরবারে জানাই লাখো কোটি কৃতজ্ঞতা। তিনি আমাদের জন্য এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, আমরা শয়তানের কবল থেকে বেরিয়ে এসেছি। তোমাদেরকে আজ আমি বলতে চাই, আমি সুলতান ঠিক, কিন্তু তোমাদেরকে আমার প্রজা মনে করি না আমি। আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তোমরাও সে দায়িত্ব থেকে মুক্ত নও। সে দায়িত্ব পূরণ করাই আমাদের ঈমানের ভিত্তি.....

'তোমরা যে পরস্পরের রক্ত ঝরিয়েছো আজ সে রক্তের দাম মাফ করে দাও। ইসলাম শিক্ষা দেয় ঐক্যের। ঐক্য এমন এক শক্তি যা কোন বৈরী শক্তি পরাজিত করতে পারে না। দেখো, আমরা দ্বিধা-বিভক্ত হতেই দুশমন তার ফায়দা উঠাতে কসুর করলো না। আমাদের অনেক এলাকা দুশমনের দখলে আজ। আজ থেকে আমাদের নতুন জীবন শুরু করতে হবে। তোমাদের ও ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু হাসান ইবনে সবা। তার বিরুদ্ধে আমাদের এক ফৌজ তৈরী করতে হবে......

'তাই বাতিনীদের খতম করার এ লড়াইয়ে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে শরীক হয়ে যারা ফৌজে থাকতে চায় তারা তাদের নাম বলুক। আর যারা শরীক হতে চায় না তারা অব্যাহতি দিয়ে বাড়ি চলে যাক। তবে ভুলে যেয়ো না, মুসলমান হিসেবে এ লড়াইয়ে সবারই অংশগ্রহণ করা ফরজ। কারণ এটা জিহাদ। যার জন্য প্রতি মুহূর্তেই তৈরী থাকা অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহর পথেই যেহেতু এ লড়াই হবে তাই সবসময় তিনি তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।'

★★★★

মুযাম্মিল এখনো শহরে ফিরে আসেনি। বিদ্রোহী ও সরকারি ফৌজের যারা শহরের বাইরে ছিলো তারা সবাই ফিরে এসেছে। যখমীদেরও নিয়ে আসা হয়েছে। আর নিহতদের লাশও যার যার পরিবারের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে। কিন্তু মুযাম্মিলের কোন পাত্তা নেই। এজন্য সুমনা ও তার মা মায়মুনার পেরেশানীর অন্ত ছিলো না। ওরা দূরে কোথাও মুযাম্মিলের খোঁজে যে যাবে সে উপায়ও নেই। কারণ সুমনা হাসান ইবনে সবার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান মেয়ে। তার লোকেরা সুমনার ছায়া ধরতে পারলেও আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে। তাই মুযাম্মিলের জন্য সুমনা ও মায়মুনার অক্ষম হা-হুতাশ ছাড়া আর কিছুই করার ছিলো না।

একদিন দু'জনে সুলতানের ছোট ভাই মুহাম্মদের কাছে ছুটে গেলো। মুযাম্মিলের কোন খবর আছে কিনা জিজ্ঞেস করলো।

'না, এখন কিছুই বলতে পারবো না, ও কোথায়'–মুহাম্মদ বললো– 'আমার সঙ্গেই ছিলো ও। ও আমার সঙ্গেই থাকতো। তোমরা তো জানো, বাতিনীদের বিরুদ্ধে ও কেমন ক্ষেপাটে মানুষ। সে দশ বারজনের ভয়ংকর লড়াকু একটা দল গড়ে তুলে। ওরা গভীর রাতে সরকারি ফৌজের ওপর গুপ্ত হামলা চালাতো। সরকারি ফৌজের জন্য ওরা আসমানী গজব বা আচমকা বজ্রপাত হয়ে উঠেছিলো। ওর ব্যাপারে সর্বশেষ খবর যেটা পাওয়া গেছে সেটাও ছিলো এক গুপ্ত হামলার খবর। তোমাদের সে জায়গায় যাওয়ার রাস্তা বুঝিয়ে দেবো আমি, তোমরা যদি কাউকে ওখানে পাঠাও তাহলে সম্ভবত....মুহাম্মদ হঠাৎ থেমে গেলো।

সুমনার ভিত যেন কেঁপে উঠলো। সে বুঝে গেলো মুহাম্মদ বলতে চায়, সম্ভবত তোমরা মুযাম্মিলের লাশ পেয়ে যাবে।

'আপনি সে জায়গার নামটা বলে দিন'–সুমনার গলা কেঁপে উঠলো– 'আমি ও আমার মা নিজেরাই যাবো ওখানে।'

'তোমাদের যাওয়া ঠিক হবে না। ঐ জঙ্গল বিয়াবানে তোমাদেরকে কেউ চিনে ফেলে তখন তো আরো বড় বিপদ ঘটবে।'

এ সময় সুলতান বরকিয়ারকের দারোয়ান এসে জানালো, মুহাম্মদকে সুলতান ডাকছেন। এখন প্রশাসনের সর্বত্রই কয়েকগুণ ব্যস্ততা। তাই মুহাম্মদের আর সেখানে থাকা সম্ভব ছিলো না। তাই মুহাম্মদ খুব সংক্ষেপে ওদেরকে রাস্তা বুঝিয়ে দিলো এবং সালার আওরিজীর কাছে খোঁজ নিতে বলে চলে গেলো।

যথাস্থানে ওরা সালার আওরিজীকে পেয়ে গেলো।

'মনে হয় সে বেঁচে নেই'–'সালার আওরিজী বললেন– 'আমি সে জায়গা চিনি যেখানে মুযাম্মিল আট জন মুজাহিদ নিয়ে এক সরকারি তাঁবুতে গুপ্ত হামলা চালায়। বড়ই রক্তক্ষয়ী লড়াই হয়। ঐ আটজনের কেউ ফিরে আসেনি। পরদিন মুযাম্মিলদের

অবস্থা দেখার জন্য আমি সেখানে যেতাম। কিন্তু সেদিনই সুলতানের তড়িৎ নির্দেশে বিক্ষিপ্ত ফৌজকে যথাসম্ভব একত্রিত করে শহরে ফিরে আসতে বাধ্য হলাম। শুধু এ অপারগতার কারণে মুযাম্মিল ও তার জানবায সঙ্গীদের দেখতে যেতে পারিনি। যা হোক মুযাম্মিল বেঁচে থাকলে আমি অন্তত জানতে পারতাম।'

আওরিজীও ওদেরকে সে জায়গার ঠিকানা বলে দিলেন।

সুমনা ফিরেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। মুযাম্মিলের লাশ না দেখে তার মৃত্যু সুমনা মেনে নিতে পারছিলো না।

'বেটি!'–মায়মুনা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন– 'এই তিক্ত সত্যটি মেনে নাও যে, মুযাম্মিল আর নেই। তুমি বা আমরা দু'জন ওর সন্ধানে বের হলে আমরা ধরা পড়ে যেতে পারি। ভেবে দেখো কি হবে তখন?'

'যাই হোক হোকগে। মুযাম্মিলের মৃত্যু হলে আমি ওর লাশ এনে নিয়মমত দাফন করবো....আর মা! তুমি ভয় পেয়ে যেয়ো না। আমি একা চলে যাবো'–সুমনার গলায় দৃঢ় সংকল্প।

মা সুমনাকে অনেক বুঝালেন। কিন্তু এর ফলে মুযাম্মিলের জন্য সুমনার ভেতরের ঝড় আরো দাপিয়ে উঠলো। রাতে সুমনার শিশুদের অনবরত বিলাপ আর বিষ খাওয়া রুগীর মতো ছটফটের কারণে মাও ঘুমুতে পারেননি। তাই মা সকালে সুমনার সঙ্গে মুযাম্মিলের খোঁজে যাবেন বলে কথা দেন।

পরদিন সকালে দু'জনই পুরো দেহ কালো কাপড়ে আবৃত করে প্রয়োজনীয় অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সুমনা হাসান ইবনে সবার সর্বোচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেয়ে। শাহসওয়ারী, খঞ্জর চালনা, তলোয়ার চালনা, নেযাবাজি এবং তীরন্দাজিতে হাসান ইবনে সবা মেয়েদেরকে অসামান্য দক্ষ করে তোলে। নিজ শিকারকে কিভাবে বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে হবে তাও শিক্ষা দেয়। মেয়েদের মন শক্ত কঠোর করার জন্য প্রত্যেক মেয়েকে দিয়ে কয়েদখানার চারপাঁচজন জীবিত কয়েদীকে খঞ্জর বা তলোয়ার দিয়ে হত্যা করায়। এসবের ভেতর দিয়েই সুমনাকে হাসান ইবনে সবা গড়ে তুলেছিলো। সুমনার মা মায়মুনাও লড়াইয়ের কলাকৌশল ভালোই জানতেন। তারা তাদের এসব শক্তিকে পুঁজি করেই বের হয়ে পড়ে।

ওরা যেখানে যাবে সেটা শহর থেকে প্রায় পনের মাইল দূর। এলাকাটি দারুণ সবুজ ও মনোরম। কোথাও সমতল ভূমি, কোথাও পাহাড়ি টিলা। কোথাও ঘন ঝোপঝাড়। কোথাও ঝর্ণায় সিক্ত স্নিগ্ধ পটভূমি। অবশেষে তারা যেখানে পৌঁছলো সেটা যেন মানুষ মারার এক বধ্যভূমি। এলোমেলো ছিন্নভিন্ন মানুষ ও ঘোড়ার লাশ। কুকুর শৃগালে সেগুলো খাচ্ছে। নিজেদের মধ্যে টানা হেঁচড়া আর মারামারি করছে। উৎকট গন্ধ আর এসবের ভয়ংকর দৃশ্য দেখে ওদের গা ছমছম করে উঠলো। সুমনা একবার আর্তনাদ করে উঠলো। এক নেকড়ে কোন মৃত মানুষের ডানা মুখে নিয়ে ওদের দিকে দৌড়ে আসছিল। কিন্তু নেকড়েটি ওদেরকে কোন পাত্তা না দিয়ে এক দিক দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

'না...না'–সুমনার গলা প্রায় চিড়ে গেলো–'মুযাম্মিল অবশ্যই বেঁচে আছে–কেউ ওর কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'

'বেটি! আমার কথা শোন। চল্ আমরা চলে যাই এখান থেকে। মুযাম্মিলকে পেলেও ওর বিকৃত ছিন্নভিন্ন লাশ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে? ওর বিকৃত লাশ দেখে তুই তো পাগল হয়ে যাবি।'–মায়মুনা সুমনাকে সান্ত্বনা দিলেন।

'না!'–সুমনা চাপাভাবে দৃঢ় কণ্ঠে বললো– 'আমার মন বলছে মুযাম্মিল জীবিত আছে। ওকে না দেখে আমি যাবো না। যদি ওর খণ্ডিত মাথাও পেয়ে যাই তবুও এই সান্ত্বনা পাবো যে, মুযাম্মিল চলে গেছে। তখন পরকালে ওর সাক্ষাত পাবো।'

চলতে চলতে একটি মরা নদী পড়লো ওদের সামনে। ঘোড়া নিয়ে ওরা নদী পার হয়ে গেলো। সামনে পড়লো একটি কবরস্থান। মুহাম্মদ ও আওরিজীও এই কবরস্থানের কথা বলেছিলেন। কবরস্থানের একপাশে স্বল্প আবাদীর একটি গ্রাম আছে। অনেকগুলো তাজা কবর ওদের নজরে পড়লো। যেগুলোর মাটি এখনো ভেজা। লাঠিতে ভর দেয়া এক বৃদ্ধকে এই কবরগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওরা বৃদ্ধের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

'একি আপনার কোন আত্মীয়ের কবর?'–সুমনা বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলো।

'শুধু এটাই নয়'–বৃদ্ধ ঘুরে সমস্ত কবরস্থানের দিকে ইংগিত করে বললেন– 'এসব আমার আত্মীয়...শুধু আত্মীয় না আমার পুরো খান্দানই এখন কবরবাসী। নতুন কবরের সবাই আর তোমরা রাস্তায় যেসব লাশকে দেখেছো হিংস্র প্রাণীরা খাচ্ছে ওরাও আমারই রক্তের মানুষ। মনের ভালো দরজাটি যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন মন্দ দরজাটি খুলে যায়। আর তাতে কুফরী, শিরেকি, লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, অশুভ সব মন্দত্ব তাতে ঢুকতে থাকে। আর পর্দা পড়তে থাকে তখন বুদ্ধির দরজায়। আর বিবেক বুদ্ধি যখন পর্দাবৃত হয়ে যায় আপন ভাইকেও তখন শত্রু মনে হয়। আমাদের কওম ও সুলতান এই পাপেই লিপ্ত ছিলো। এর শাস্তি দেখো আমরা কিভাবে পাচ্ছি। কত মায়ের বুকের সন্তান আজ কুকুর শৃগালের খোরাক। ওদের ক্ষতবিক্ষত খণ্ডিত খুপড়িগুলো কেমন ড্যাবড্যব করে তাকিয়ে দেখছে আমাদের। তবুও তো যাদের অক্ষত লাশ তাদের আত্মীয়রা উঠিয়ে নিতে পেরেছে তাদের তো জানাযা ও দাফন হয়েছে। কিন্তু যাদেরকে উঠিয়ে নেয়া হয়নি দেখো তাদের ভাগ্যে কি ঘটেছে...তোমরা কোত্থেকে এসেছো আর কোথায় যাচ্ছো?'

'এ আমার মেয়ে'–মায়মুনা সুমনাকে দেখিয়ে বললো– 'আমরা এক আত্মীয়ের খোঁজে বের হয়েছি। বারবার ওকে বলেছি এখান থেকে চলে যেতে। আমি জানি পাওয়া গেলেও বিকৃত লাশ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না।'

'ওকে খুঁজতে দাও'–বৃদ্ধ কম্পিত আওয়াজে বলল– 'না হয় এই অতৃপ্তি সারা জীবন ওকে তাড়া করে ফিরবে। আমার এই যুবক ছেলেকে এই লড়াইয়ে হারিয়েছি। লাশ পায়নি ওদের। আমি এখানে এসে ফাতেহা পড়ি আর নিজেকে সান্ত্বনা দেই। এই তাজা কবরগুলোতে যারা শায়িত সব আমার ছেলে।'

★★★★

সুমনারা বৃদ্ধের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এগিয়ে গেলো। সামনে মৃদু প্রবাহের একটি ঝর্ণা দেখে মা-মেয়ে পানি পান করতে ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়ালো। দু'জনে ঝর্ণার ধারে উবু হয়ে বসলো। সুমনা পানিতে দু'হাত ডুবিয়ে দিয়ে অঞ্জলি ভরে পানি উঠাচ্ছিলো এমন সময় ডান দিক থেকে ঘোড়ার হালকা খুরধ্বনি কানে পৌঁছলো। সে ও মায়মুনা ডান দিকে তাকালো। দুটি ঘোড়া সওয়ার নিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। সুমনার চেহারা তখন নেকাবমুক্ত। দু'জনের একজন প্রৌঢ় আরেকজন কমবয়সী। প্রৌঢ়কে দেখে সুমনার হাত থেকে পানি ছলকে গেলো। ভয়ে তার চেহারা রক্তশূন্য হয়ে গেলো। আর প্রৌঢ়ের মুখে খেলে গেলো হাসি। ঘোড়সওয়ার দু'জন ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো। সুমনা মাকে তাড়া দিলো, মা, ওঠো, চলো।

'কেন? কি হয়েছে?'–সুমনার ফ্যাকাসে মুখ দেখে মায়মুনা ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো।

'ঐ লোকটি আমাকে চিনে ফেলেছে। তাড়াতাড়ি এসো মা! এ লোক শয়তান হাসান ইবনে সবার খাস লোক'–সুমনা তার ঘোড়ার দিকে দৌড়ে যেতে যেতে বললো।

মায়মুনা ও সুমনার ঘোড়া লোকগুলোর কাছাকাছি জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘাস খাচ্ছিলো। সুমনা সে পর্যন্ত যেতে পারলো না। প্রৌঢ় লোকটি তার পথ রোধ করে দাঁড়ালো। এবার তার দ্যাঁতো হাসি আরো বিস্তৃত হয়েছে।

'হারিয়ে যাওয়া সাথী জীবনের কোন এক মোড়ে ঠিকই মিলে যায়। ইমাম হাসান ইবনে সবার কোন হীরা হারিয়ে গেলে হীরা নিজেই ইমামের কাছে পৌঁছে যায়'–লোকটি বড় উদার কণ্ঠে বললো।

'কে তুমি? মনে হয় কোন ডাকাত তোমরা। আমরা মহিলা বলে আমাদেরকে কাবু করতে পারবে এই ভুল ধারণায় থেকো না।'–সুমনা চেহারা নেকাব আবৃত করে ক্রুদ্ধ গলায় বললো।

'তুমি কি ভুলে গেছো আমি কে? ইমাম আজও তোমার পথ চেয়ে আছেন। এসো...'

'ভেবে চিন্তে আমার দিকে হাত বাড়াবে। না হয় পরিণাম তোমার ভয়াবহ হবে।'

'তোমরা কি চাও? আমার মেয়ের পেছনে কেন লেগেছো?'–মায়মুনা এগিয়ে গিয়ে লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন।

'সুমনা!'–লোকটি মায়মুনাকে এড়িয়ে গিয়ে বললো– 'কাকতালীয়ভাবে যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে, ইমামের হারানো রত্ন চোখে পড়লো। কি করে ফেলে যাই এ রত্ন?... আমার সঙ্গে তোমার যেতেই হবে।'

লোকটি মায়মুনাকে হাত দিয়ে সরিয়ে সুমনার দিকে হাত বাড়ালো। ঝর্ণার কিনারায় থাকায় সুমনার পেছনে হটার পথ বন্ধ ছিলো। লোকটি হঠাৎ সুমনার নেকাবে হাত রাখলো। সুমনা খুব দ্রুত নিজের কাপড়ের ভেতর হাত ঢুকালো। সুমনা কি করছে লোকটি বুঝতে পারলো না। পরক্ষণেই বিদ্যুৎবেগে সুমনা হাত বের করে আনলো।

তার হাতে ধরা ছিলো তখন চৌক লম্বা ও ধারালো একটি খঞ্জর। মুহূর্তও দেরী করলো না। আরো ক্ষিপ্রতায় সে লোকটির ঠিক বুকের মাঝখানে খঞ্জরটি ঢুকিয়ে দিলো। আবার বের করলো এবং ঢুকালো আবার। লোকটা পড়ে গেলো। শেষ মুহূর্তে লোকটি তলোয়ার বের করে এনেছিলো। সেটি ছিটকে ঝর্নার মধ্যে গিয়ে পড়লো।

লোকটির যুবা বয়সের সাথী ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলো। নিজেকে সামনে তলোয়ার উচিয়ে মায়মুনার দিকে দৌড়ে আসতে লাগলো। কাছে আসতেই মায়মুনা সরে গিয়ে তাকে পাশ থেকে সজোরে ধাক্কা মারলো। লোকটি চারদিক পানি ছিটিয়ে ঝর্নার পানিতে পড়ে গেলো উপুড় হয়ে। পড়েই সে উঠতে যাচ্ছিলো। কিন্তু সুমনার খঞ্জর তাকে উঠতে দিলো না। তার খঞ্জর দুবার যুবকটির পিঠে আরেকবার তার পাঁজরে গেঁথে আবার বের হয়ে এলো। অপরিসর এই ঝর্ণাধারা টুকটুকে লাল হয়ে উঠলো।

'চলো মা! কুকুর, শৃগালরা এখন তাজা গোশত খেতে পারবে।'—সুমনা ঘোড়ায় চড়তে চড়তে বললো।

মায়মুনা লোক দু'জন থেকে ওদের তলোয়ার নিয়ে নিলেন এবং ঘোড়া দুটিও ধরে নিয়ে এলেন। একটি ঘোড়ার জিনের সঙ্গে একটি বড় চামড়ার থলে বাধা দেখলেন। সেটি খুলে দেখলেন ভেতরটি ভরা। ওপরে কয়েকটি দিরহাম আছে। আর বাকী সবগুলো ছোট ছোট স্বর্ণের টুকরো। মা থলেটি সুমনাকে দেখালেন।

'মানুষ কেনার জন্য এগুলো নিয়েছিলো ওরা। শহরে যদি পৌছতে পারতো ওরা তাহলে নতুন ঝড় শুরু হয়ে যেতো'—সুমনা বললো।

'আমার মন এখন দৃঢ় হয়ে গেছে'—মায়মুনার সংকল্পমাখা স্বর- 'আমি নিশ্চিত হয়ে গেছি, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। আর নইলে একটি মেয়ে এমন শক্তিশালী দুই পুরুষকে এমন সহজে কি করে খতম করলো। এটাই প্রমাণ যে, আমরা সঠিক পথে আছি এবং মহান আল্লাহ আমাদের হাত ধরে আছেন।'

'মজার কথা কি জানো মা! আমি যখন হাসান ইবনে সবার ওখানে ছিলাম তখন ঐ প্রৌঢ় লোকটি আমাকে খঞ্জর ও তলোয়ার চালনা, নেযাবাজি, ঘোড়সওয়ারী ইত্যাদি শিখিয়েছিলো। খঞ্জর কি করে মারতে হবে, কত দ্রুত ও বুকের কোথায় মারতে হবে এবং শত্রুর কোন অবস্থায় কি কৌশল গ্রহণ করতে হবে সব শিখিয়েছিলো ঐ লোকটি। মরার সময় সে নিশ্চয় খুশী হয়েছিলো যে, তার এই ছাত্রীটি তার শেখানো কৌশল এখনো ভুলেনি।

'আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর বেটি! আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কেউ কিছু করতে পারে না।'

'কিছু দিন সে আমার মুহাফিজ ছিলো। হাসান ইবনে সবা যখন প্রথম শিকারে আমাকে পাঠায় সে আমার সঙ্গে ছিলো। প্রথম শিকার খুব সফলতার সঙ্গে বাগিয়েছিলাম। তখন সে আমার দক্ষতার প্রতি আস্থাভাজন হয়ে চলে যায়.... সে আমাকে হাসান ইবনে সবার কাছে ধরে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলো বলে ওকে আজ কতল করিনি আমি। ওকে দেখে আমার মনে ঘৃণার ঝড় উঠে। ঐ শয়তান যত দিন আমার

মুহাফিজ বনে ছিলো আমার ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চাইতো। অথচ হাসান ইবনে সবার হুকুম ছিলো, কেউ যেন কোন মেয়েকে ভোগ না করে। যাতে অনেক বয়স পর্যন্ত তার যৌবন অটুট থাকে। আমিও তখন এসব পাপ মনে করতাম না। কারণ হাসান ইবনে সবার ওখানে আমার ইজ্জতের কোন নামগন্ধও ছিলো না। আমি তো এসব পাপ বলে জেনেছি এখানে এসে। মুযাম্মিলকে পেয়ে। আজ ঐ লোকটিকে এখানে দেখে আমার ভেতর প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠে। প্রতিশোধ নেয়ার পর এখন কিছুটা হালকা হয়েছি। দুআ করো মা! মুযাম্মিলকে যেন পেয়ে যাই।'

'একটা কথা শোন বেটি! মুযাম্মিলকে জীবিত পাবি এই কল্পনাই মন থেকে দূর করে ফেল। না হয় অনেক বেদনা সইতে হবে। বরং এই বিশ্বাস রাখ যে, মুযাম্মিলকে জীবিত পাওয়া যাবে না। এটাই অপ্রিয় বাস্তব। তারপরও যদি ওকে জীবিত পাওয়া যায় দেখিস কি আনন্দ লাগে তোর।

★★★★

মুহাম্মদ ও সালার আওরিজীর বলে দেয়া কথামতো একটি বর্ণনার নালা পাওয়ার কথা ওদের। সেটি পেয়ে ওরা নালার কিনারা ধরে এগিয়ে গেলো। এখানেই মুযাম্মিল ও তার সঙ্গীরা গুপ্ত হামলা চালাতে এসেছিলো।

'এই তো সে জায়গা!'-মায়মুনা বললেন- ঐ যে দেখো লম্বা টিলার প্রান্তর...কোথায় মুযাম্মিল ও তার সঙ্গীরা? দেখ বেটি! একটু বুদ্ধি খাটা। মুযাম্মিল তো কোন পরন্তু বস্তুর নাম নয় যে দমকা হাওয়া তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে।'

'আমার মনের আওয়াজ শোন মা!-সুমনার গলায় যেন অপার্থিব কোন শব্দ-এটা আমার আত্মার আওয়াজ...আমার মনের কল্পনা মনে করো না...কোন এক গায়েবী শক্তি যেন বলছে তোমরা এগিয়ে যাও। মুযাম্মিলকে পেয়ে যাবে।'

সুমনার এ ভঙ্গি দেখে মায়মুনার চোখে পানি এসে গেলো। আহা! মেয়েটির মাথা বুঝি এবার বিগড়েই যাচ্ছে। সুমনা চতুর্দিকে তীক্ষ্ণ চোখ রাখতে রাখতে এগুচ্ছিলো। আর মায়মুনা এগুচ্ছিলেন সুমনার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে।

'ঐ যে দেখো মা!'-সুমনা চমকে উঠে ব্যাকুল হয়ে বললো- 'ঐ যে দেখো কোন মানুষ হবে।'

মায়মুনা সামনে তাকিয়ে দেখলেন। ঘন ঝোপঝাড় ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়লো না। এবার তিনি নিশ্চিত হয়ে গেলেন, তার মেয়ের মাথা বিগড়ে গেছে।

'একটু হুশ নিয়ে কথা বল বেটি!'-মায়মুনা বেদনাহত কণ্ঠে বললো- 'আমি তো কোন মানুষ দেখতে পাচ্ছি না।'

'ঐ যে দেখো। ও হাটতে হাটতে বসে গেছে...ঐ যে।'

এবার মায়মুনা সুমনার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকিয়ে দেখলো, একটি লোক একটি গাছের ডাল ধরে উঠার চেষ্টা করছে; ওদের থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ কদম দূরে। তার

কাপড় লাল হয়ে আছে। সে উঠে দাঁড়াতে পারলো। হাতে তার কি যেন একটা ঝুলছে। গাছের ডালটি ছেড়ে কয়েক কদম খুব কষ্টে এগিয়ে গেলো। আবার বসে পড়লো। একটু একটু করে হামাগুড়ি দিয়ে পানির নালার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। মায়মুনা ও সুমনা ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিলো।

মা মেয়েকে দেখে হামাগুড়ি দেয়া লোকটি উঠতে চেষ্টা করলো। কিন্তু ছোট একটি গাছের সামনে পড়ে গেলো। হাচড়ে পাচড়ে সে গাছের গুড়ি ধরে উঠে গাছের সঙ্গেই ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো এবং কোষ থেকে তলোয়ার বের করলো। মা মেয়ে একেবারে তার কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামলো।

'আমার কাছে আসবেনা'–রক্তাক্ত লোকটি বললো– 'তোমরা বাতিনী। কাছে ঘেষলে দু'নটাই মারা পড়বে। মরতে মরতেই দুটাকে মেরে মরবো।'

'আমরা বাতিনী নই। এক আত্মীয়কে খুঁজতে এসেছি। তোমাকে এ অবস্থায় রেখে যাবো না। আমাদের কাছে অতিরিক্ত দুটি ঘোড়া আছে। যেখানে বলবে পৌঁছে দেবো তোমাকে। ভয় পেয়ো না আমাদের। আমার মতে শহরের আশেপাশের কোন এলাকায় আর কোন বাতিনী জীবিত নেই'–মায়মুনা বললেন।

'তাহলে তোমাদের আত্মীয়কে খুঁজতে থাকো। এখন এখানে শুধু লাশই পাবে'–লোকটির অস্ফুট গলা।

'তুমি এখানে কি করছো? বলো তোমায় কোথায় নিয়ে যাবো?'–সুমনা বললো।

'আমি পানি এই পাত্র ভরে আমার এক সাথীর জন্য পানি নিয়ে যাবো। সে আমার চেয়ে বেশি যখমী'–লোকটি হাতের পাত্র দেখিয়ে বললো।

সুমনা তার হাত থেকে মশকটি নিয়ে ঝর্ণা থেকে পানি নিয়ে এসে তাকে পান করালো। যখমী লোকটি তৃপ্ত ভরে লম্বা শ্বাস ছাড়লো।

'এখানে কাছেই এক পর্বত গুহা আছে'–লোকটি একদিক দেখিয়ে বললো– 'আমার এক সঙ্গী আমার চেয়ে বেশি যখমী হয়ে ওখানে পড়ে আছে। ওকে আমার পানি পান করাতে হবে। হয়তো সে বাঁচবে না। আর সে না থাকলে আমিও হয়তো বাঁচবো না।'

'তোমাদের দু'জনকে আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাবো'–মায়মুনা বললেন– 'চলো তোমাকে আমরা ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছি।'

মা মেয়ে দু'দিক থেকে ওকে ধরে নিয়ে যেতে লাগলো।

'শুধু একটা দুঃখ আছে। আমার হাতে আমার ভাই নিহত হয়েছে। সরকারি ফৌজে ছিলো আমার ভাই। সব শেষ হওয়ার পর জানতে পারি, বাতিনীরাই এই রক্তপাতের মূল। বেঁচে থাকতে চাই শুধু হাসান ইবনে সবাকে হত্যা করতে।'

মা মেয়ে যখমীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে একটি টিলা প্রান্তর পার হয়ে প্রশস্ত একটি গুহার কাছে পৌঁছলো। রক্তাক্ত একটি লোককে সেখানে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখলো।

‘মুযাম্মিল ভাই!’–ঐ যখমী লোকটি বলে উঠলো– ‘এরা তোমার জন্য পানি নিয়ে এসেছে। আর দেখো, আল্লাহ আমাদের জন্য ঘোড়াও পাঠিয়ে দিয়েছেন।’

মায়মুনা ও সুমনা চমকে উঠলো। ওদিকে গুহার মুখে পড়ে থাকা যখমী লোকটিও একটু পাশ ফিরতেই ওরা তার চেহারা দেখতে পেলো। এ তো মুযাম্মিল আফিন্দীই। তার মাথায়ও পট্টি বাঁধা। সুমনা তার ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লো যেমন বাঘ তার শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর ‘মুযাম্মিল মুযাম্মিল’ বলে তাকে উঠিয়ে পানি পান করাতে লাগলো।

মুযাম্মিল চোখ বড় বড় করে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলো। কয়েকবার চিড়ে যাওয়া ঠোঁট জোড়া কেঁপেও উঠলো। কিন্তু কিছু বলতে পারলো না। মুখের মতো সমস্ত শরীরও রক্তশূন্য-সাদা হয়ে গেছে। বুঝাই যাচ্ছে আর মাত্র কয়েক ফোটা রক্তই অবশিষ্ট আছে ওর শরীরে।

খুব যত্ন করে ওদের দু’জনকে দুই ঘোড়ায় বসিয়ে দিলো। আর ছোট্ট এই কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেলো শহরের দিকে।

মুযাম্মিলের সঙ্গীর নাম রহিম বিন ইউনুস। মুযাম্মিলের চেয়ে ওর যখম একটু কম হলেও দু’জনকে দেখেই মনে হচ্ছিলো ওরা আর কয়েক ঘন্টার মেহমান মাত্র।

‘সুমনা।’–মায়মুনা আস্তে আস্তে বললেন– ‘আমি ওদের চিকিৎসা শাহী ডাক্তার ও শল্য চিকিৎসক দ্বারা করাবো। সাধারণ কোন ডাক্তার ওদের দেহে প্রাণ আনতে পারবে না।’

‘ওদের সুলতানের মহলে দিয়ে যাবো আমি। সুলতানের খাস ডাক্তার ওদের চিকিৎসা করবে’–সুমনা বললো।

চার ঘোড়সওয়ার যখন সুলতানের মহলে ঢুকলো সূর্যাস্ত তখনো হয়নি। যখমী দুজন তো ঘোড়ার ওপর উপুড় হয়ে পড়েছিলো। সুমনাকে জানানো হলো, মহলে সুলতান, মুহাম্মদ, সাঞ্জার ও সামিরী কেউ নেই। সুমনা দৌড়ে সুলতানের মার কামরায় গিয়ে হাজির হলো। রুজিনার কবল থেকে বরকিয়ারককে সুমনা বাঁচানোতে সুমনার মর্যাদা মহলে এখন অনেক উঁচুতে। বরকিয়ারকের মা সুমনাকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলেন।

‘মাদারে মুহতারাম!’–সুমনার কান্নাভাঙ্গা গলা– ‘মুযাম্মিল আফেন্দী মারা যাচ্ছে....আল্লাহর ওয়াস্তে ওকে বাঁচান....ওর এক সঙ্গীও আছে....ওর এক সাথীরও একই অবস্থা....এক ফোটা রক্তও বোধ হয় ওদের দেহে আর অবশিষ্ট নেই। আপনার খাস হাকিমকে ডাকুন।’

বরকিয়ারকের মা সুমনাকে নিয়ে বাইরে দৌড়ে গিয়ে দেখলেন, দুই যখমী ঘোড়ার ওপর নিথর হয়ে পড়ে আছে। তিনি দ্রুত হাকিম ও শল্য চিকিৎসককে ডেকে আনার নির্দেশ দিলেন।

বরকিয়ারকের মার হুকুমে তখনই যখমী দু’জনকে সুসজ্জিত এক কামরায় নিয়ে যাওয়া হলো। হাকিম ও শল্যচিকিৎসকও তাদের চিকিৎসা শুরু করে দিলেন।

★★★★

হাসান ইবনে সবা শুধু আলমোত নয় যেসব এলাকা সে কব্জা করে নিয়েছে তাকে ইমাম বা শায়খুল জাবাল বলে। সে এখন নিজেই এক পরাশক্তি। অন্যান্য রাজা বাদশাদের মতো ছিলো না সে। সে শাসন করতো মানুষের হৃদয়রাজ্য।

মুযাম্মিল ও তার সঙ্গী ইবনে ইউনুসের যখন চিকিৎসা চলছে হাসান ইবনে সবা তখন তার প্রমোদ উদ্যানে পায়চারী করছে।

'মারু থেকে আজও কোন খবর এলো না' হাসান ইবনে সবা তার এক খাস শাগরেদকে বললো– 'ওখানকার গৃহযুদ্ধ তো এখন আরো জমে উঠার কথা। মারু তো রক্তে ডুবে যাচ্ছে। আমি চাই আবু মুসলিম রাজীর শহর রায়ের অলিগলিও রক্তে ভেসে যাক! কিন্তু এখন আর ওদিক থেকে কোন খবর আসছে না কেন?'

'এসে যাবে শায়খুল জাবাল! সেলজুকি সালতানাতের ভিত্তি নড়ে গেছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমি সেলজুকিদের লাশ চিরা চ্যাপ্টা করে আমাদের ঘোড়া মারুতে বিজয়ী পায়ে ছুটে বেড়াচ্ছে–হাসানের এক শাগরেদ বললো।

সূর্যাস্তের একটু আগে এক ঘোড়ার খুরধ্বনি শোনা গেলো। হাসান ইবনে সবা সেদিকে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইলো। একটুপর ঘোড়সওয়ারকে দেখা গেলো। কাছে এসেই সওয়ার ঘোড়া থেকে এক লাফে নেমে দ্রুত হাসান ইবনে সবার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

'মারু থেকে এসেছো?' –জিজ্ঞেস করলো হাসান।

'হ্যাঁ শায়খুল জাবাল! মারু থেকে এসেছি'–সওয়ার বললো।

'মারুবাসীরা কি এখনো পরস্পরের রক্ত ঝরাচ্ছে?'–হাসান মর্মর পাথরের একটি তখতে বসতে বসতে বললো।

'ইয়া শায়খুল জাবাল! ভালো কোন খবর আমি আনিনি। সুলতান বরকিয়ারকের হুকুমে গৃহযুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেছে। এর পরপরই হুকুম জারী হয়, যেখানেই বাতিনীদের পাওয়া যাবে কতল করা হবে। সর্বপ্রথম আমাদের ডাক্তার ও তার সঙ্গীরা নিজের ধরে কতল হয়। আমাদের লোকেরা পালানোরও সুযোগ পায়নি। বাতিনী হিসেবে যাকে সামান্যতম সন্দেহ হয়েছে তাকেই কতল করা হয়েছে।'

'এসব হলো কি করে?'–হাসান মাটিতে সজোরে লাথি মেরে বললো– 'ঐ মেয়ে রুজিনা কি ধোঁকা দিয়েছে না মারা গেছে?'

'ওকে সুলতান বরকিয়ারক নিজ হাতে হত্যা করেছে।'

'তুমি সবকিছু জেনে থাকলে সব খুলে বলছো না কেন?'

কাসেদ গৃহযুদ্ধের বিস্তারিত শোনাতে শুরু করলো। দু'পক্ষের সৈন্যরা শহরের বাইরে কতদূর ছড়িয়ে পড়লো, আবু মুসলিম রাজীর সসৈন্যে অংশগ্রহণ এবং কি করে আচমকা লড়াই থেমে গিয়ে বাতিনীদের ব্যাপক হারে কতল শুরু হলো সব বললো সে।

'ইয়া শায়খুল জাবাল! গৃহযুদ্ধ বন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই আমি রওয়ানা দিতাম। কিন্তু কেন গৃহযুদ্ধ বন্ধ হলো, সুলতান কোন চাপের মুখে এ হুকুম দিয়েছেন খুব কষ্ট হলেও এসব জেনে আসতে হলো। আমাদের ডাক্তার সুলতানের মহলের দুই কর্মচারীকে হাত

করে নিয়েছিলেন। ওরা বলেছে রুজিনাকে আমাদেরই এক পলাতক মেয়ে সুমনা কতল করিয়েছে। সুমনা রুজিনার কানিজ হয়ে মহলে ঢুকে। এর মধ্যে ওযীরে আজম সামিরীরও হাত ছিলো'–কাসেদ বললো।

'ঐ মেয়ে সুমনাকে এখনো কেন ওখান থেকে উঠিয়ে আনা হয়নি?'–ক্রুদ্ধ হয়ে বললো হাসান ইবনে সবা– 'আমি সেই কবে এ হুকুম দিয়েছি, ঐ মেয়েকে যেন জীবিত এখানে আনা হয়। আমার ফেদায়েনরা কি এ হুকুম ভুলে গেছে না ওদের মধ্যে সেই সাহস নেই।'

'কেবল সুমনাই নয় শায়খুল জাবাল! রাবিআ নামে আমাদের আরেক মেয়েও সুলতানের মহলে এখন। সেই আমাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের নাম ঠিকানা ফাস করে দিয়েছে। এছাড়া সুলতানের গোয়েন্দা বাহিনী আমাদের কিছু লোককে ধরে এমন ভয়ানক নির্যাতন চালিয়েছে যে, ওরা অনেকের নাম ফাস করে দেয়। এভাবে আমাদের প্রায় সবাই খতম হয়ে যায়....।

'এও জানা গেছে। আমাদের ফেরকার পাইকারী হত্যাকাণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন আবু মুসলিম রাজি ও ওযীরে আজম সামিরী....আরেকটি খবর হলো, আবদুর রহমান সামিরী, আবু মুসলিম রাজী ও সুলতানের মা সেলজুকি সালতানাতকে দু'ভাগে ভাগ করে দিয়েছেন। এক অংশে বরকিয়ারকই সুলতান থাকবেন। আরেক অংশে তার ভাই মুহাম্মদ ও সাঞ্জার। তবে কেন্দ্রীয় শাসন থাকবে সুলতান বরকিয়ারকের হাতে।'

'রাজী ও সামিরীকে এতদিন জীবিত রাখা উচিত হয়নি। আমার কাছে খবর এসেছে, রায়ের এক প্রসিদ্ধ আলেম আবুল মুজাফফর ফাদেল ইস্পাহানী রাজীর পীর। তিনি তারই পরামর্শে চলেন। একেও ঐ দু'জনের সঙ্গে খতম করতে হবে। আমি রায় যাওয়ার পর যে রাজী আমার গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী করেছিলো সেটা আমি কি করে ভুলবো? এ লোক ইসলাম ও সেলজুকি সালতানাতের অনেক বড় কল্যাণকামী শক্তি। এখন আর তার বেঁচে থাকার অধিকার নেই।

এরপর সেখানে ফানুস জ্বালানো হলো। অর্ধ-উলঙ্গ আগুন ঝরা রূপসী মেয়েরা সুরাহী ভরে মদ পরিবেশন করতে লাগলো। হাসান ইবনে সবা তার কয়েকজন বিশেষ ফেদায়েনকে ডেকে এনে সারা দেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আরো কয়েক গুণ বাড়ানোর নির্দেশ দিলো।

'এক এক বাতিনীর বদলায় দশজন করে মুসলমান কতল করা হবে'–হাসান ইবনে সবা বললো– 'তবে সবার আগে তাদের প্রধান তিন মাথা খতম করবে... তিনটি নাম মনে গেঁথে নাও... রায়ের হাকিম আবু মুসলিম রাজী, সুলতানের ওযীরে আজম আবদুর রহমান সামিরী ও রায়ের আলেম আবুল মুজাফফর মজিদ ফাদেল ইস্পাহানী... এদের খতম করার পর বলবো এরপর কাদের খতম করতে হবে।'

হাসান ইবনে সবা তার আরেকটি হত্যাযজ্ঞ গড়তে চাচ্ছিলো ইস্পাহানে। তাই সে ঐ বৈঠকেই নির্দেশ দিলো, ইস্পাহানে মুসলমানদের এমনভাবে একের পর এক হত্যা করতে হবে যাতে হত্যাকারীর ছায়ারও কেউ সন্ধান না পায়। আর হত্যা করেই গায়েব করে দিতে হবে লাশ। কেউ যেন জানতে না পারে, যে গায়েব হয়েছে সে জীবিত আছে না মারা গেছে।

★★★★

মারু এখন অনেক শান্ত হলেও যেসব ঘরের কেউ লড়াইতে শহীদ হয়েছে সেসব ঘরের মাতম এখনো শহরের বাতাস ভারী হয়েছে। ওরা যদি কাফেরদের বিরুদ্ধে কোন লড়াইয়ে শহীদ হতো তবুও কিছুটা সান্ত্বনা পাওয়া যেতো। কিন্তু সেখানে তো ভাইয়ের হাতে ভাই মরেছে। তবে হাসান ইবনে সবা ও তার ফেরকার বিরুদ্ধে মানুষের মনে ঘৃণার ঝড় বইছে।

আবু মুসলিম রাজী তখনো মারুতেই ছিলেন। সালতানাত ভাগকরণ ও প্রশাসনের কিছু কাজ বাকি আছে তখনো। রাজী ও বরকিয়ারক যখন মুযাম্মিলের মুমূর্ষু অবস্থার কথা শুনলেন দু'জনেই দৌড়ে মুযাম্মিলের কামরায় গিয়ে পৌঁছলেন। তারা হাকিমকে বললেন, এ অত্যন্ত মূল্যবান এক রোগী আপনার হাতে সোপর্দ করছি, যে কোন মূল্যে ওকে আগের চেয়ে সুস্থ করে তুলুন।

'আমীরে মুহতারাম!'–মুযাম্মিল আবু মুসলিম রাজীকে বললো– 'এখনই আমি বলে রাখছি, পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পর আমি আমার সঙ্গী ইবনে ইউনুসকে নিয়ে কেল্লা আলমোতে যাবো এবং হাসান ইবনে সবাকে কতল করেই ফিরে আসবো। আর না হয় আমাদের কেউ ফিরবে না আর।'

'আগে তো সুস্থ হও। হাসান ইবনে সবা ও তার ফেরকার বিরুদ্ধে আমাদের জান কুরবান করতে হবে... এখনই রক্ত গরম করো না, আগে ঠিক হয়ে নাও'–রাজী তার মাথায় হাত রেখে বললেন।

মুযাম্মিল ও তার সঙ্গী ইবনে ইউনুস ডাক্তারদের সার্বক্ষণিক চিকিৎসায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলো।

তিন চার দিন পর আবু মুসলিম রাজী মারু থেকে রায় রওয়ানা হয়ে গেলেন। সুলতান বরকিয়ারক, তার দু' ভাই ও তার মা রাজীকে শাহী কায়দায় বিদায় জানালেন। আর ওযীরে আজম সামিরী শহরের বাইরে পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিতে গেলেন। দু'জনের ঘোড়া চলতে লাগলো পাশাপাশি। তাদের পেছনে রইলো আট দশজনের এক মুহাফিজ দল।

'সামিরী ভাই'–চলতে চলতে আবু মুসলিম রাজী ওযীরে আজমকে বললেন– 'বরকিয়ারককে পথে রাখা ও তার ওপর নজর রাখা কিন্তু আপনার কাজ। যদিও সে এখন পথেই আছে কিন্তু এই বয়সে পথহারা হতে সময় লাগবে না। ওর ভাইয়েরা ছোট এখনো। তাই যুক্তি ছাড়া ব্যক্তিগত চিন্তা-আবেগ যেন তাকে পেয়ে না বসে। হাসান ইবনে সবাকে ধ্বংস করা এত সোজা নয়। প্রকাশ্য লড়াইয়ে আলমোত খতম করা যাবে না। আমাদের আরো অন্য কোন পথ ভেবেচিন্তে বের করতে হবে।'

'আপনি তো দেখেছেন আমি কি ধরনের গুপ্ত কৌশল অবলম্বন করেছি'–সামিরী বললেন– আপনার মতই আমার মত। সবসময় আপনার সাথে যোগাযোগ রাখবো। ঠিকই বলেছেন আপনি। অভিজ্ঞ ও গভীর চিন্তার অধিকারীরাই এ কাজ করতে পারবে... আল্লাহ আপনাকে নিরাপদে রাখুন'।

সামিরীর কথা শেষ হয়নি। মধ্যবয়সী এক হতদরিদ্র লোক তাদের পথে এসে দাঁড়ালো। উস্কখুস্ক চুল দাড়ি, পরনে তার মলিন একটি আলখেল্লা। দেখে মনে হচ্ছিলো, অসহায় সম্বলহীন এক লোক সে। রাজী ও সামিরী দু'জনেই অত্যন্ত রহমদিল মানুষ। তারা ঘোড়া দাঁড় করিয়ে ফেললেন।

'ইয়া আমীর'–লোকটি হাতজোড় করে এগিয়ে এসে বললো– 'একটু দাঁড়ান। এক মজলুম বাবার ফরিয়াদ শুনে যান।'

'বলো ভাই! কি বলতে চাও তুমি বলো! যথাসাধ্য করবো তোমার জন্য'–রাজী বললেন।

'ইয়া আমীর!' –লোকটি মাটিতে হাঁটু রেখে কাঁদতে কাঁদতে বললো– 'লড়াই তো ছিলো আমীর ও বাদশাহদের। কিন্তু এ গরিবের একটি মাত্র ছেলে ছিলো সে এ লড়াইতেই মারা গেলো। কাফেরদের সঙ্গে লড়াই করে যদি মরতো আজ আমার এ অবস্থা হতো না। বরং আমি মাথা উঁচু করে বলতাম, আমার একমাত্র ছেলেকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করেছি। কিন্তু এ কেমন লড়াই'....।

'আরে ভাই তোমার ফরিয়াদ শোনাও। কি হয়েছে তা তো জানিই আমি।'

'হে রহমদিল আমীর! আপনার ব্যাপারে যা শুনেছি আপনি এর চেয়ে বেশি রহমদিল। আমার প্রতিও রহম করুন' –এই বলে লোকটি উপুড় হয়ে সিজদায় চলে গেলো এবং বললো– 'আমি জানি সিজদা শুধু আল্লাহকে করা হয়। কিন্তু আজ আমি আপনাকেও সিজদা করছি'....

'দাঁড়িয়ে কথা বলো ভাই! আমাকে গুনাহগার বানিয়ো না। যা বলার বলে ফেলো।'

লোকটি মাথা উঠিয়ে হাতজোড় করে বললো– 'হে আমীর! বলুন আমি কোথায় যাবো...কে আমার ফরিয়াদ শুনবে...আপনি ঘোড়ায় সওয়ার আর আমি মাটিতে লুটাচ্ছি... আমার আওয়াজ তো আপনার কান পর্যন্ত পৌঁছবে না।'

আবু মুসলিম রাজীর খুব দুঃখ হলো, আহা লোকটি তার একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে কত অসহায় হয়ে পড়েছে। তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে ঘোড়া থেকে নেমে এলেন। তার কাছে পৌঁছতেই লোকটি আবার সিজদায় গিয়ে কাঁদতে শুরু করলো। আবু মুসলিম রাজী ঝুঁকে পড়ে লোকটিকে উঠাতে গেলেন। লোকটি উঠতে উঠতে তার ডান হাত আলখেল্লার ভেতর ঢুকালো এবং খুব দ্রুত একটি খঞ্জর বের করে আনলো। রাজী শুধু তার হাতের নড়াচড়া ছাড়া আর কিছুই দেখলেন না। ততক্ষণে খঞ্জর রাজীর বুকে বিদ্ধ হয়ে গেছে। সাথে সাথে আবু মুসলিম রাজী ধনুকের ছিলার মতো সোজা হলেন। লোকটি উঠে আরেকবার খঞ্জর দিয়ে তার বুকে আঘাত করলো। রাজীর দেহ কয়েকটি মোচড় দিয়ে পড়ে গেলো। আর ফিনকি বের হতে লাগলো রক্ত।

মুহাফিজ ঘোড়সওয়ার ও সামিরী হায় হায় করে নিচে নেমে এসে রাজীকে ধরলেন। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে। হত্যাকারীকেও কেউ জীবিত ধরতে পারলো না। সে সেখান থেকে একটু পিছু হটে হাতের খঞ্জরটি নিজের বুকে আমূল বসিয়ে দিলো এবং নারা লাগালো– 'ইয়া শায়খুল জাবাল! তোমার হুকুম তামিল করে তোমার নামে আমার জান কুরবান করছি।' এক মুহাফিজ তাকে ধরতে গিয়ে দেখে সে মরে পড়ে আছে।

রায়ের আমীর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে শুনে আগেই লোকজন পথের দু'ধারে ভীড় করেছিলো তাকে দেখার জন্য। তারা যখন রায়ের আমীর রাজীকে এভাবে নিহত হতে দেখলো হত্যাকারীর ওপর সবাই টুটে পড়লো। তলোয়ার ও খঞ্জরের আঘাতে আঘাতে তাকে কিমা বানিয়ে ফেললো। যাদের হাতে কিছুই ছিলো না তারা পাথরাঘাত করতে করতে তার লাশ ছিন্নভিন্ন করে ফেললো।

রাজীর লাশ ঘোড়ায় তুলে সুলতান বরকিয়ারকের মহলে আবার ফিরিয়ে নেয়া হলো। সেখানে শুরু হলো চারদিক স্তব্ধ করা শোক ও মাতম।

আবু মুসলিম রাজীকে মারুতেই গোসল দিয়ে কাফন পড়ানো হলো। এক কাসেদকে রায় পাঠিয়ে দেয়া হলো, সে যেন রাজীর আত্মীয় স্বজনকে এই দুর্ঘটনার সংবাদ দিয়ে বলে তার লাশ রায় আনা হচ্ছে।

রাজীর লাশ যখন রায় পৌঁছালো সারা শহর তখন ভেঙ্গে পড়লো। প্রতিটি চোখ অশ্রুতে প্লাবিত। মুখে আগুন ঝরা সংকল্প, তারা তাদের আমীরের খুনের বদলা নেবেই।

শহর ও শহরের বাইরের দূরদূরান্ত পর্যন্ত তার হত্যার খবর ছড়িয়ে পড়লো। দলে দলে লোক তাদের অতি প্রিয় অভিভাবককে শেষ দেখা দেখার জন্য আসতে লাগলো। যখন জানাযার জন্য তার লাশ উঠানো হলো শহরের চারদিক থেকে হাজার হাজার নারীকণ্ঠের আহাজারীতে আকাশ বাতাস গোমট হয়ে উঠলো। ঘোড়দৌড়ের ময়দানে জানাযা অনুষ্ঠিত হলো। এত বড় জামাত স্মরণকালে কেউ আর দেখেনি। জানাযা পড়ান আবুল মুযাফফার মজিদ ফাদেল ইস্পাহানী। জানাযার পর তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে উঁচু কণ্ঠে বলেন,

'প্রিয় দেশবাসী! সচেতন হোন। নিজেদের দ্বীন ও ঈমান আরো মজবুত করুন। ঐ ইবলিস হাসান ইবনে সবা আবু মুসলিম রাজীকে হত্যা করিয়েছে। এতে জাতির যে ক্ষতি হলো তার ক্ষতিপূরণ কেবল আবু মুসলিম রাজী দ্বারাই সম্ভব। তাই সবাই সংকল্প করুন আমাদের নতুন এক রাজী তৈরী করতে হবে। সলতে জ্বলতে জ্বলতে পুড়ে গেলেও আগুনের শিখা কিন্তু অনড় থাকে। ইসলামের চিরঞ্জীব শিখা জ্বলতেই থাকবে। আর তাতে আমাদের সলতে হয়ে জ্বলতে হবে। মানুষের মৃত্যু হয় কিন্তু তার দ্বীন ও ঈমান থাকে চিরঞ্জীব। কিছু মানুষ আসে যারা পূর্বসুরীদের রেখে যাওয়া পথে নিজেদের গড়ে তোলে। তাই এখন প্রত্যেকের ঈমানের এক অংশ এটাও মনে করো যে, হাসান ইবনে সবাকে কতল করতে হবে এবং তার ফেরকার নাম ঠিকানা মুছে ফেলতে হবে....তবে যুক্তি দিয়ে সব করতে হবে, আবেগ দিয়ে নয়।'

লোকেরা আবেগে উত্তেজনায় শ্লোগান দিতে লাগলো। ফাদেল ইস্পাহানী হাত উঠিয়ে লোকদের থামালেন তারপর দুআ পড়তে লাগলেন।

এসময় ভীড় ঠেলে এক লোক এগিয়ে এসে ফাদেল ইস্পাহানীর পাশে এসে দাঁড়ালো। লোকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে উঁচু আওয়াজে বলতে লাগলো-

'হে লোকসকল! তোমরা জোশে জযবায় নারা লাগাচ্ছো। তোমরা জানো না হাসান ইবনে সবাকে হত্যা করা কত কঠিন কাজ। আমি এজন্য দুই তিনজন লোক চাই মাত্র। এজন্য আমি আমার জান দিয়ে দেবো। শুধু দু' তিনজন'....

'এখন বসো ভাই'–ফাদেল ইস্পাহানী তাকে কাঁধের ওপর হাত রেখে থামিয়ে দিয়ে বললেন 'এটা আবেগ দিয়ে সামলানোর ব্যাপার নয়। এখন বসো, পরে এ নিয়ে ভাবা যাবে।'

'আমি ভেবেছি'–এই বলে লোকটি অতি ক্ষিপ্রগতিতে তার জামার ভেতর থেকে খঞ্জর বের করলো। সেটি একবার বাতাসে পাক খেলো এবং ফাদেল ইস্পাহানীর বুকের মাঝখানে দু'বার বিদ্ধ হলো। লোকজন তাকে ধরার আগেই 'শায়খুল জাবালের নাম'–বলে খঞ্জরটি তার বুকে গেঁথে দিলো এবং সে পড়ে গেলো। আবু মুজাফফর মজিদ ফাদেলের লাশ তখন ভেসে যাওয়া রক্তের মধ্যে নিথর হয়ে পড়ে আছে। লোকেরা তার হত্যাকারীর মৃতদেহটাই ছিন্নভিন্ন করে ফেললো। কেউ কেউ তার অক্ষম আক্রোশ প্রকাশ করতে গিয়ে হত্যাকারীর ছিন্নভিন্ন অংশকেই আরো টুকরো টুকরো করতে লাগলো।

অনেক পরে আবু মুসলিম রাজীর লাশ দাফন করা হলো। পরদিন ক্ষুব্ধ, শোক স্তব্ধ, রাগে উন্মত্ত রায়বাসী ফাদেল ইস্পাহানীর জানাযা পড়লো। জানাযা পড়ালেন ওযীরে আজম আব্দুর রহমান সামিরী। জানাযার পর তিনি লোকদের ভাষণ দিয়ে বললেন, এই প্রথম তিনিও নিজেকে নেতৃত্বশূন্য মনে করছেন। তাই সবার উচিত উত্তেজনা ও ক্ষুব্ধ মনকে নিয়ন্ত্রণ করা। ইনশাআল্লাহ এই মহান ব্যক্তিদ্বয়ের খুনের বদলা নেয়া হবে।

★★★★

শোক ও বেদনার পাহাড় নিয়ে কয়েকদিন পর বরকিয়ারক তার সভাসদ ও সালারদের ডেকে এক সভায় বসলেন। হাসান ইবনে সবাকে রুখার জন্য সেখানে কয়েকটা বিষয় চূড়ান্ত করা হয়। এর মধ্যে একটা হলো, সালতানাত এখন দু'ভাগে ভাগ করা হলেও ফৌজ এখন ভাগ করা হবে না। কারণ, দুশমন এতই চালবাজ যে, তারা সালতানাতের দু' অংশকে পরস্পরের প্রতি লেলিয়ে দিতে পারে।

সভা ভেঙ্গে গেলে সুলতানও ওযীরে আজমকে জানানো হলো, অনেক দূর থেকে তিনজন লোক দরবারের সাক্ষাতপ্রার্থী হয়ে এসেছে।

'আগে শক্ত করে ওদের সব কিছুতে তল্লাশী চালাও। ছোট একটি চাকু তো দূরের কথা একটি কাঠিও যেন না থাকে ওদের সঙ্গে'–সুলতান হুকুম দিলেন।

একটু পর তিনজনকে উপস্থিত করা হলো। ওরা জানালো, শহর আবরাহার অধিবাসী এবং ব্যবসায়ী ওরা। কাছেই কেল্লা ওসিমকুহ ওসিমকুহ একটি পাহাড়ের নাম। এর ওপরই সেই কেল্লা। কেল্লাটি এখন বাতিনী ফেদায়েনদের দখলে। সেখানকার কোন মুসলমানকেই তারা জীবিত রাখেনি। সে কেল্লার পাশ দিয়ে অনেক ব্যবসায়ী ও সাধারণ কাফেলা আসা যাওয়া করে। এই বাতিনী ফেদায়েনরা তাদের লুট করে সমস্ত মাল কেল্লায় উঠায় এবং পরে তা আলমোতে চালান করে। ফেদায়েনদের সংখ্যা সেখানে বেশি নয়। সৈন্যদের মতো ওদের মধ্যে শৃংখলাও নেই। ওদের শক্তি হলো হাতে জান নিয়ে ওরা লড়তে পারে।

'ফৌজ নিয়ে গেলে সেখানকার লোকজনেরও সহযোগিতা পাওয়া যাবে।'–তাদের একজন বললো– 'সেখান থেকে কেল্লা আলমোত অনেক দূর। কেল্লা অবরোধ করলে বাতিনীরা সেখান থেকে বা অন্য কোথাও থেকে কোন সাহায্য পাবে না...কেল্লা দখল করা গেলে অনেক বাতিনী ধরা পড়বে এবং গনীমতও পাওয়া যাবে প্রচুর।'

আরো কিছু আলোচনার পর সালার আওরিজী বললেন, ঐ কেল্লা অবরোধে তিনি ইনশাআল্লাহ্ সফল হবেন...সুলতান ও ওযীরে আজম তাকে এর অনুমতি দিয়ে দিলেন।

দু'দিন পর সালার আওরিজী প্রয়োজনীয় সৈন্য প্রস্তুত করে রওয়ানার প্রস্তুতি নিলেন। রেওয়াজ মতো ওযীরে আজম সামিরীর তাদের বিদায় দেয়ার কথা। সৈন্যরা যেখান থেকে রওয়ানা দেবে সেদিকে তিনি ঘোড়া নিয়ে চলতে লাগলেন। রাস্তায় দেখলেন, মলিন কাপড় পরিহিত এক মহিলা মাটিতে হায় হায় করে মাতম করে কাঁদছে। এক লোক তাকে পাশে বসে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু মহিলা চিৎকার করে এক কথাই বলছে, 'হায় আমার বাচ্চা! আমার বাচ্চা আমাকে ফিরিয়ে দাও...সুলতান মরে গেছেন...তিনি আমার বাচ্চাকে ফিরিয়ে দিতে পারতেন।'

সামিরী ঘোড়া থামিয়ে পাশে বসে থাকা লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, এ মহিলার এ অবস্থা কি করে হলো।

'এই বেচারীর এক শিশু বাচ্চাকে বাতিনীরা উঠিয়ে নিয়ে গেছে'–লোকটি জানালো– এ বলছে, যারা নিয়েছে তাদের ও চেনে এবং এখনো ওরা শহরেই আছে। কিন্তু তার ফরিয়াদ কেউ শুনে না।'

সামিরীর খুব দুঃখ হলো মহিলার জন্য। মহিলাকে তার বাচ্চা উদ্ধার করে দেবেন এই সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তিনি ঘোড়া থেকে নামলেন। তিনি মহিলার কাছে গিয়ে তাকে মাটি থেকে উঠানোর জন্য একটু ঝুঁকলেন। তখনই পাশে বসে থাকা লোকটি বিদ্যুৎগতিতে খঞ্জর বের করলো এবং আবদুর রহমান সামিরীর পিঠে সজোরে আঘাত করলো। তাকে আর সোজা হাতে দিলো না। আরো দু'বার একই জায়গায় আঘাত করলো। ওযীরে আজম সামিরী মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

আশপাশ থেকে লোকজন হত্যাকারীকে ধরার জন্য ছুটে এলো। কিন্তু সে পালানোর চেষ্টা করলো না। চোখের পলকে খঞ্জরটি দিয়ে মহিলার পিঠে দু'বার আঘাত করলো। তারপর নিজের বুকে ঢুকিয়ে দিলো। ওযীরে আজম সামিরীর পাশেই দু'জনে ছটফট করতে করতে থেমে গেলো। পৃথিবীর ইতিহাস আরেকবার মূক-শোকে স্তব্ধ হয়ে গেলো।

১৬

বাতিনীদের নাম নিতে যারা ঘৃণায় মুখ কুচকায়, বাতিনীদের রক্তে গোসল করতে যারা স্বপ্ন দেখে এবং লড়াইয়ে যারা শ্রেষ্ঠ জানবায তাদেরকে নিয়েই সালার আওরিজী তার ফৌজ তৈরী করেন। কেল্লা ওসিমকুহে রওয়ানা করার কয়েকদিন আগে দু'তিনজন লোক দ্বারা সারা শহরে খবর রটিয়ে দেন, ফৌজ কেল্লা মুলাযখান যাচ্ছে। তিনি জানতেন, ওসিমকুহ রওয়ানা দেয়ার আগেই এ খবর হাসান ইবনে সবার কাছে পৌঁছে

যাবে। তখন ওসিমকুহ বাতিনী দখলমুক্ত করা কষ্টকর হবে। তাই তিনি এ কৌশল অবলম্বন করলেন। কেল্লা মুলাযখান পারস্য ও খুযিস্তানের মধ্যবর্তী স্থানে এবং কেল্লা ওসিমকুহ থেকে একশ মাইল দূরে।

হাসান ইবনে সবাকে জানানো হলো, সালার আওরিজী বিরাট ফৌজ নিয়ে কেল্লা মুলাযখান হামলা করতে যাচ্ছে। হাসান ইবনে সবা হো হো করে হেসে বললো,

'পাগল সেলজুকি! কেল্লা মুলাযখান গিয়ে সে কি করবে? তার প্রাণ যে আমার হাতে সে এখনো সেটা বুঝতে পারেনি। আমি এখানে কল্পনায় কারো গলা চেপে ধরবো আর সে মারু বা রায় যেখানেই থাকুক মারা যাবে... আওরিজী যখন মারু থেকে কোচ করবে সঙ্গে সঙ্গে যেন আমি জানতে পারি, আওরিজীর সঙ্গে কতজন পায়দল ও কতজন ঘোড়সওয়ার সৈন্য যাচ্ছে।

হাসান ইবনে সবা রণক্ষেত্রে পারদর্শী তার কয়েকজন শিষ্যকে ডেকে নির্দেশ দিতে লাগলো, কিভাবে কেল্লা মুলাযখান হেফাজত করা হবে। সে এ নির্দেশও দিলো, মারু থেকে মুলাযখান পর্যন্ত যেন জায়গায় জায়গায় গুপ্ত হামলার ব্যবস্থা করা হয়।

'তাহলে ওরা রাস্তা থেকেই ফিরে যাবে'–হাসান বললো– আর যদি তারা মুলাযখান পৌঁছেও যায় অসুবিধা নেই। তাদের তখন অর্ধেক ফৌজ গায়েব থাকবে। এতে কেল্লা অবরোধও পূর্ণ হবে না। আর মুলাযখানে আমাদের জানবাজদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে বলো যখনই ওরা সেলজুকি লশকর আসতে দেখবে তখন অনেক দূর থেকে পথ ঘুরে যেন দু'দিক থেকে সেলজুকিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সিপাহী থেকে সালার পর্যন্ত কেউ জীবিত ফিরে যেতে না পারে।'

সালার আওরিজীর ফৌজ কোচ করার জন্য তৈরী। ওযীরে আজম সামিরী আসলেই সবাই কোচ করবে। কিন্তু তখনই তার কাছে খবর গেলো, ওযীরে আজম সামিরী এক বাতিনীর হাতে খুন হয়ে গেছেন। এ খবরে আওরিজী প্রথমে চোখে অন্ধকার দেখলেও সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিলেন। এই চরম সংকটে তিনি তার করণীয় কি হবে তা ভেবে নিলেন অতি ঠাণ্ডা মাথায়। তারপর ফৌজের উদ্দেশ্যে সংযত গলায় বললেন,

'সালতানাতে ইসলামিয়ার অগ্রপথিকরা! বাতিনীরা আরেকটি আঘাত হেনেছে। এইমাত্র খবর এসেছে, আমীর আবু মুসলিম রাজী ও আমাদের পীর মুরশিদ আবুল মুজাফফর মজিদ ফাদেলকে বাতিনীরা যেভাবে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করেছে ওযীরে আজম আবদুর রহমান সামিরীকেও সেভাবেই হত্যা করেছে। এখন আর আমরা কারো জানাযার জন্য দাঁড়াবো না। এখন আমরা আমাদের শহীদদের রক্তের প্রতিটি ফোটার বদলা নিতে যাবো। এখন আমাদের পেছনে ফিরে দেখা যাবে না। এগিয়ে যেতে হবে। শপথ করো সবাই, হাসান ইবনে সবা ও তার বাতিল ফেরকাকে খতম করবো বা নিজেরাই খতম হয়ে যাবো। আল্লাহু আকবার বলে নারা লাগাও এবং এই জযবা নিয়ে এগিয়ে যাও যে, আমরা আর ঘরে ফিরে আসবো না।'

পুরো ফৌজ যখন আল্লাহু আকবার বলে নারা লাগালো, আকাশ ও যমীনের বুক যেন বিদীর্ণ হয়ে গেলো। তাদের ঈমান যেন গর্জে উঠলো।

ফৌজ এগিয়ে যেতে লাগলো। তবে সালার আওরিজী সেখানেই মাটির একটি উঁচু টিবিতে দাঁড়িয়ে ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার পেছনে চৌদ্দ পনের জন মুহাফিজ

ঘোড়সওয়ার তার হেফাজতে দাঁড়িয়ে রইলো। আল্লাহু আকবারের গর্জন করতে করতে ফৌজ এগিয়ে যেতে লাগলো। আওরিজী তাদের পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। এক মুহাফিজ দেখলো, এক দিক থেকে লম্বা দাড়িওয়ালা এক দরবেশ সালার আওরিজীর দিকে এগিয়ে আসছে। তার এক হাতে কুরআন আরেক হাতে লাঠি। চেহারায় তার আত্মবিশ্বাস। মুহাফিজ ঘোড়া নিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলো।

'আমার পথে এসো না সওয়ার'-দরবেশ মুহাফিজকে বললো- 'আমি সে পথে যাচ্ছি আল্লাহর এই কিতাব আমাকে যে পথ দেখিয়েছে। এটা কুরআন। ঘোড়া থেকে নামো। এর অমর্যাদা করো না। সিপাহসালারের কাছে যাবো আমি।'

'মনে প্রাণে আপনাকে শ্রদ্ধা করছি হুজুর!'-মুহাফিজ বললো- কিন্তু আপনার দেহ তল্লাশি ছাড়া আগে যেতে দেবো না। আপনি তো শুনেছেন তিন জন মহান ব্যক্তিকে বাতিনীরা ধোঁকা দিয়ে হত্যা করেছে।'

'আমি তোমাকে তোমার কর্তব্যে অবহেলা করতে দেবো না। আমার দেহ তল্লাশী করো। তারপরও সন্দেহ থাকলে আমার হাত পিছমোড়া করে শিকল দিয়ে বেঁধে দাও। সিপাহসালারকে আমি আল্লাহর নূর দেখাবো। সে ইবলিসকে ধ্বংস করতে যাচ্ছে। আমি জানি এই সিপাহসালারের দৈহিক শক্তিও আছে দেমাগের শক্তিও আছে। কিন্তু তার আত্মাকে আরো শক্তিশালী করতে চাই আমি। যাও। আগে ওকে জিজ্ঞেস করো। ওর কাছে আমাকে যেতে দেবে কি না!'

'উনাকে আসতে দাও। আর নিজেদের কর্তব্য পালন করো'-আওরিজী নির্দেশ দিলেন মুহাফিজকে।

মুহাফিজ ভালো করে দরবেশের দেহ তল্লাশি করে আর দুই মুহাফিজ দুই দিক থেকে তাকে প্রহরা দিয়ে সালার আওরিজীর ঘোড়ার কাছে নিয়ে গেলো।

'আমার হাতে কুরআন শরীফ'-দরবেশ সালার আওরিজীর দিকে কুরআন উঁচু করে বললেন- 'যদি সালার ঘোড়া থেকে নেমে আসে তাহলে আমি কুরআনের সঙ্গে বেয়াদবী থেকে বেঁচে যেতে পারবো। তোমার জন্যই এনেছি কুরআন শরীফ।'

আওরিজী ঘোড়া থেকে নামতেই তিন মুহাফিজ তিন দিক থেকে দরবেশের একেবারে কাছ ঘেষে দাঁড়ালো। আর ছয়টি চোখ তার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দিকে তাকিয়ে রইলো তীক্ষ্ণচোখে।

'আমার জন্য কি হুকুম হুজুর?'-আওরিজী জিজ্ঞেস করলেন।

'হুকুম দেয়ার মালিক শুধু আল্লাহ। আমি যা দেখেছি তা তোমাকে দেখাতে এসেছি। তোমার দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতার ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। তবে তোমার আত্মার মুক্তির জন্য কিছু দিতে হবে। তোমাকে কতল করতে আসিনি আমি। আমি সিপাহী হলে তোমার সঙ্গে যেতাম। কিন্তু আমার যিন্দেগীর রাস্তা ভিন্ন। তোমার বিজয়ের জন্য আমি রাতভর যিকির করবো। আল্লাহ আমাকে একটি আলো দিয়েছেন। তোমার রুহে সেটা সঞ্চারের জন্য এসেছি....পুরো নাম কি তোমার?'

'ইবনে হাশেম আওরিজী।'

'যাচ্ছো কোথায় তুমি?'

'কেল্লা মুলাযখান।'

দরবেশ রাস্তার ধুলোর ওপরেই বসে পড়লেন এবং সালার আওরিজীকেও বসতে বললেন। তারপর তিনি শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে দুটি বৃত্ত আঁকলেন। একটি বৃত্তে আওরিজীর পুরো নাম আরেকটি বৃত্তে এর বিপরীতে 'মুলাযখান' লিখলেন। তারপর কুরআন শরীফ খুলে একটু চিন্তা করে একটি আয়াতে আঙ্গুল রেখে আওয়াজ করে পাঠ করলেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বললেন তারপর দুই বৃত্তে আর কিছু আঁকিবুকি করে আওরিজীর দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে রইলেন।

'তোমার ফৌজ দু' জায়গায় পরাজয়ের মুখে পড়েছে। এবার তুমি বিজয়ী হয়ে ফিরবে'–দরবেশ একথা বলে কুরআনের আগের আয়াতটি বের করে আঙ্গুল রেখে বললেন– 'এ আয়াতটি মুখস্থ করে নাও।'

আওরিজী কয়েকবার জোরে জোরে আয়াতটি পড়ে বললেন, তার মুখস্থ হয়ে গেছে।

'আল্লাহ বড় না ইবলিস'–দরবেশ জিজ্ঞেস করলেন।

'আল্লাহ'–আওরিজী জবাব দিলেন।

'যাও আল্লাহ তোমার সঙ্গে আছে– দরবেশ উঠতে উঠতে বললেন– 'তুমি কেল্লা মুলাযখান যাওয়ার কথা বলেছো। দেখো, রাস্তায় যেন রুখ অন্যদিকে করো না। কেল্লা মুলাযখানের দরজা তোমার জন্য খোলা। খেয়াল রেখো, একটাও যেন জীবিত না ফেরে।'

'এমন হবে না হুজুর! আমি কেল্লা মুলাযখানই যাচ্ছি। সেটাই আমার মঞ্জিল।'

দরবেশ কুরআন শরীফটি আওরিজীর মাথার ওপর একবার ঘুরালেন।

'ঘোড়া তোমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। এই ঘোড়াই তোমাকে বিজয়ী বেশে ফিরিয়ে আনবে। আমি তোমাকে সোপর্দ করছি আল্লাহর কাছে'–দরবেশ বললেন এবং চলে গেলেন।

আওরিজী ঘোড়া ঘুরিয়ে এগিয়ে যাওয়া ফৌজের দিকে ফিরলেন। এখন তার সামনে দিয়ে লশকরের সামানপত্র ও প্রয়োজনীয় জিনিস বহন করা ঘোড়া ও উটের বহর যাচ্ছে। তিনি এর পেছন পেছন ঘোড়া ছুটালেন। তার মুহাফিজ কমান্ডার একেবারে তার পাশে পাশে ঘোড়া রাখলেন।

'সালারে মুহতারাম!'–চলন্ত ঘোড়া থেকে মুহাফিজ কমান্ডার জিজ্ঞেস করলো– 'আমরা কি সত্যিই কেল্লা মুলাযখান যাচ্ছি? আপনি কেল্লা ওসিমকুহ ও এর আশেপাশের চিত্র সবার মনে এঁকে দিয়েছেন এবং কিভাবে তা দখল করবো তাও বলে দিয়েছেন। কিন্তু কেল্লা মুলাযখান সম্পর্কে তো আমাদের ফৌজ ওয়াকিফহাল নয়!'

'দরবেশের কথা মতো আমরা কেল্লা মুলাযখানই যাচ্ছি'–আওরিজী মুচকি হেসে বললেন– আর আমার কথামতো আমরা ওসিমকুহ যাচ্ছি।'

মুহাফিজ কমান্ডার আওরিজীর দিকে এমনভাবে তাকালো যেন আওরিজীর কথা সে বুঝেনি, বুঝতে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে।

সেই দরবেশ সালার আওরিজী থেকে বিদায় নিয়ে শহরের একটি গলিতে ঢুকলেন এবং এক বাড়ির ফটকে গিয়ে দাঁড়ালেন।

'ঐ যে এসেছে'-ভেতরে চার পাঁচজন অপেক্ষায় ছিলো। একজন বললো- 'কি খবর এনেছো?'

'মুলাযখানই যাচ্ছে'-দরবেশবেশী লোকটি বসতে বসতে বললো- 'খোঁজ নিয়ে এসেছি। এখনই একজন রওয়ানা হয়ে যাও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আলমোতে পৌঁছে শায়খুল জাবালকে বলো, সালার আওরিজী তার লশকর নিয়ে কেল্লা মুলাযখানই কোচ করেছে।'

আমি তৈরী হয়ে আছি-এক যুবক উঠে বললো- ঘোড়াও তৈরী। আমি তোমার অপেক্ষাতেই ছিলাম- আর কোন সংবাদ?'

'না, আর কিছু না।'

সাধারণ লোকদের ধারণা হলো, শহরে কোন বাতিনী নেই। কিন্তু হাসান ইবনে সবার পাঠানো এই দলটি অতি গোপনে তাদের তৎপরতা ততদিনে পুরোদমে শুরু করে দিয়েছে। সালার আওরিজী গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সেই দরবেশের মতলব ধরে ফেলেন। না হয় যে কেউ এ ধরনের বুজুরগিতে বিশ্বাস না করে পারতো না। আওরিজী আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। এই দরবেশ তার কাছে এসে গেছে এবং হাসান ইবনে সবার কাছে বিশ্বাসযোগ্যভাবে খবর পৌঁছে যাবে। এই ফৌজ কেল্লা মুলাযখান যাচ্ছে।

'রাস্তায় শুধু একটি ছাউনি ফেলা হবে'-আওরিজী তার সহকারীদের হুকুম দিলেন- 'এই ছাউনিও কয়েক ঘন্টার জন্য হবে। পুরো রাতের জন্য নয়। বাকী রাত কোচ করা হবে। খুব দ্রুত আমাদের কেল্লা ওসিমকুহ পৌঁছতে হবে।'

★★★★

মুযাম্মিল আফেন্দী ও ইবনে ইউনুস শংকামুক্ত হয়ে গেলেও যখমের গভীরতা ও রক্তশূন্যতা ওদেরকে বিছানার সঙ্গে একেবারে লাগিয়ে দিয়েছে। তাদের কামরায় আচমকা সুমনা দৌড়ে এলো এবং হাঁপাতে হাঁপাতে বললো,

'মুযাম্মিল! ওযীরে আজম আবদুর রহমান সামিরীও কতল হয়ে গেছেন...লাশ নিয়ে যাচ্ছে এখন।'

মুযাম্মিল ও ইবনে ইউনুস এক ঝটকায় উঠে বসলো। সঙ্গে সঙ্গেই দু'জনে আর্তনাদ করে বিছানায় পড়ে গেলো। কাতরাতে কাতরাতেই তারা জিজ্ঞেস করলো, সামিরী কোথায় কিভাবে কার হাতে কতল হয়েছেন...? সুমনা বিস্তারিত শোনালো ওদের।

'এই শহরে আমি এখন আর বসে থাকবো না'-সুমনা উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বললো- 'আমি কেল্লা আলমোতে গিয়ে নিজ হাতে হাসান ইবনে সবাকে কতল করবো। তোমাদের এখন ঘরে বসে মহিলাদের মত কাঁদা উচিত নয়। এখন আমাদের কিছু একটা করতে হবে। সালার আওরিজী এক লশকর নিয়ে কেল্লা ওসিমকুহ অবরোধ

করতে গেছেন। কিন্তু শুধু এক কেল্লা দখল করে কি হবে? হয়তো এ কেল্লাও দখল করতে পারবেন না। আরেকবার যেমন আমাদের লশকর পরাজিত হয়ে এসেছে।'

'সামিরীর শাহাদাতের জন্য কাঁদছি না আমরা সুমনা!'–মুযাম্মিল আহত গলায় বললো– 'নিজেদের এ করুণ অবস্থার জন্য কাঁদছি যে, যখন আমাদের ময়দানে থাকার কথা ছিলো তখন নিজেদের দেহের ওজনও বহন করতে পারছি না তুমি এত উত্তেজিত হয়োনা। যুক্তি ও বাস্তবতা দেখো। আমি কি তোমার সঙ্গে শপথ করিনি যে, আমরা হাসান ইবনে সবাকে হত্যা না করে কিছু করবো না?'

'চলাফেরার মতো সুস্থ হতে দাও আমাদের। হাসান ইবনে সবা আমাদের হাতেই মরবে'–ইবনে ইউনুস বললো।

'তোমরা তো দেখেছো, বাতিনী ও হাসান ইবনে সবার ফেদায়েনদের যমিনের ওপরে নয় যমিনের নিচে পাওয়া যায়। ওরা ময়দানের লড়াকু নয়। বরং অন্যদের ময়দানে নামিয়ে পরস্পরের সঙ্গে লড়াই বাঁধিয়ে দিতে পারে। ওরা তা করে দেখিয়েছে। আমি ও মুযাম্মিল হাসান ইবনে সবার কাছে ছিলাম। কিন্তু আমি যা জানি তা মুযাম্মিল তুমিও জানো না। আমাদের যমিনের নিচ দিয়ে হাসান ইবনে সবার কাছে পৌছতে হবে'–সুমনা বললো।

হাসান ইবনে সবার কাছে যখন খবর পৌছলো, সালার আওরিজী তার লশকর নিয়ে কেল্লা মুলাযখান রওয়ানা দিয়েছেন তখন সালার আওরিজী কেল্লা ওসিমকুহ অবরোধ করে ফেলেছেন। আওরিজী ভেবেছিলেন, কেল্লা ওসিমকুহ খুব সহজে নিয়ে নেয়া যাবে। কিন্তু কেল্লা অবরোধ করে তিনি দেখলেন কেল্লার দেয়ালে হাজারো মানুষের ভীড়। সেই ভীড় থেকে তীর বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আওরিজী তার ফৌজ পিছু হটাতে বাধ্য হলেন এবং কেল্লা ভাঙ্গার কৌশল ভাবতে বসলেন।

এদিকে হাসান ইবনে সবা ওযীরে আজম সামিরীর হত্যার খবর পেয়ে তার সন্ত্রাসী বাহিনীকে নির্দেশ দিলো, এভাবে দেশের ও সমাজের বড় বড় হাকিম, আমলা ও আলেমদের ধোঁকা দিয়ে হত্যার মিশন অব্যাহত রাখতে হবে। এরই পরিণতিতে পরবর্তী বাতিনীরা একই কায়দায় হত্যা করে ইসলাম ও জাতির প্রধান স্তম্ভগুলোকে। আবু জাফর, শাতিবী রাজী, আবু উবাইদ মাসতুকী, আবুল কাসিম কারখী, আবুল ফারাহ, কাযী কিরমান ও কাযী আবদুল্লাহ ইস্পাহানী এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

তারপর বাতিনী ফেদায়েনরা আরেকটি কৌশল অবলম্বন করে। তারা সেলজুকি ফৌজের সালার ও নায়েবে সালারদের ঘরে ঘরে উড়ন্ত চিঠি দিলো। সেগুলোতে লেখা ছিলো, শায়খুল জাবাল হাসান ইবনে সবার আনুগত্য স্বীকার করে তার হাতে বায়আত হয়ে যাও। না হলে তোমাদের নিহত নেতাদের মতোই তোমাদের অবস্থা হবে। সালার চিঠিগুলো সুলতান বরকিয়ারককে দেখালেন।

'ঐ ইবলিসদের এই ধমক তোমরা উড়িয়ে দিয়ো না'–সুলতান বরকিয়ারক সালারদের বললেন– 'তোমাদের খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কোন সালার একা যেন কোথাও না যায়। প্রত্যেকের সঙ্গে তিন চারজন মুহাফিজ রাখতে হবে।

রাতে প্রত্যেকের বাড়ির আশেপাশে প্রহরী থাকবে। কেউ যেন নিজেকে কখনো নিরস্ত্র না রাখে। আরেকটা হলো, তাদের দখলকৃত কেল্লাগুলো উদ্ধার করতে হবে। তোমরা জানো সালার আওরিজী ওসিমকুহ গিয়েছে। আর আমরা যে বাতিনীদের পাইকারী হত্যা করেছি তাও যথেষ্ট নয়। এই চিঠিগুলোই এর প্রমাণ যে, বাতিনীরা এখনো এখানে আছে। তলে তলে ওরা খুব তৎপর। আমার গোয়েন্দারা তাদের কাজ করছে তোমরাও তোমাদের গোয়েন্দাদের তৎপর করো।

একদিন সিপাহসালার আবু জাফর হিজাযী সুলতান বরকিয়ারকের কাছে গেলেন। সুলতানকে তিনি বললেন,

'সুলতানে মুহতারাম! গোস্তাখী মাফ করবেন। আমি একটা খটকার মধ্যে আছি। সেটাই বলতে এসেছি। একটা সময় ছিলো যখন আপনি সালতানাতে ছোট বড় সব বিষয়ে আমার সঙ্গে পরামর্শ করতেন। কিন্তু এখন দেখছি আমি সর্বত্রই উপেক্ষিত। আর দেখা যাচ্ছে সালার আওরিজী না থাকলে সালতানাতের ভিত্তিই টলে যেতো'....

'মুহতারাম হিজাযী! আপনি আমার মরহুম আব্বাজানের সময় থেকে সালার। আমার কাছে আপনি পিতার মতোই। এক সময় আপনাকে যে মর্যাদা দেয়া হতো এখন সেটা দেয়া হচ্ছে না এ অভিযোগও ঠিক। আপনি মনের কথা স্পষ্ট করে বলে পরিষ্কার হয়ে গেছেন। এটা আমার পছন্দ। আমিও মনের গভীর থেকে কথা বলবো। আপনি যে সময়ের কথা বলছেন সে সময় আমাকে গোমরাহ করে দেয়া হয়েছিলো। এক রূপসী তার রূপের জাদু ও হাশীষের নেশা দিয়ে আমাকে অন্য জগতে নিয়ে গিয়েছিলো। তখন আপনি আমাকে হুশিয়ার করেননি। বরং তোষামোদি করেছেন। আমার যেসব হুকুম সালতানাতের জন্য ক্ষতিকর ছিলো সেগুলোও আপনি মুখ বুজে সমর্থন করেছেন। মহান আল্লাহ যখন আমাকে জাগ্রত করেছেন, ভালো মন্দ, সাদা কালো, সঠিক বেঠিক চেনার শক্তি দিয়েছেন আমাকে তখন আমি বুঝতে পারি আমাকে গোমরাহ করার ব্যাপারে আপনারও হাত আছে। আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা না থাকলে কবে আপনাকে জল্লাদের হাতে তুলে দিতাম। আশা করি, আপনার প্রতি আমার মনের এই সম্মান আপনি সবসময় বহাল রাখতে চেষ্টা করবেন। মনে সব সময় আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই লালন করবেন। কোন হাকিম বা সুলতানের নয়। এ হাদীস কি শুনেননি, জালিম সুলতানের সামনে সত্য কথা বলাই সর্বোত্তম জিহাদ।'

'আপনি কি আমার এখনকার মনের অবস্থা গ্রহণ করবেন'–হিজাযী বললেন– 'আমি স্বীকার করছি যে, আমি আপনার সব অন্যায় সিদ্ধান্তকে চোখ বুজে সমর্থন দিয়েছি। কিন্তু সুলতানে মুহতারাম! গৃহযুদ্ধ ও এই রক্তপাত আমাকে সেভাবে জাগিয়ে দিয়েছে যেমন করে আপনাকে জাগিয়ে দিয়েছে। আমাকে সময় দিন, আমি আপনাকে নয় মহান আল্লাহকে রাজী খুশী করবো।'

সিপাহসালার হিজাযী শপথ করলেন, কোন বাতিনীকে তিনি পেলে বাঁচতে দেবেন না। বাতিনীদের ব্যাপক হত্যাকাণ্ডে হিজাযীরও অবদান ছিলো।

★★★★

সিপাহ্সালার হিজাযীর বাড়িটি ছোটখাটো মহলের মতো। কয়েকজন নওকর, একজন কর্মচারী ও দুই তিনজন ঘোড়ার সহিস ছিলো তার বাড়িতে। খুব শক্ত করে তিনি তার বাড়ির হেফাজতের ব্যবস্থা করলেন। রাতের জন্য রাখলেন দু'জন নৈশ প্রহরী। কয়েকজন নিজস্ব গোয়েন্দা তিনি শহরে ছড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, যমিনের নিচ থেকেও বাতিনীদের বের করে আনবে। কয়েকজন বাতিনীকে তিনি তার সামনে হত্যা করিয়েছেন।

তার এক গোয়েন্দাকে তিনজন লোক জানায়, সিপাহ্সালারের এক সহিস সন্দেহজনক। সেই গোয়েন্দা হিজাযীকে জানালো একথা। তিনি সেই গোয়েন্দাকে সেই সহিসের ব্যাপারে আরো খোঁজ খবর করতে বললেন। আর অন্য দুই সহিসকেও সেই সহিসের ওপর নজর রাখতে বললেন। এই সহিস ছিলো তার খাস সহিস। হিজাযীর ছয় সাতটি ঘোড়ার মধ্যে একটি ঘোড়া তার খুবই পছন্দ। সেই ঘোড়াটিই তিনি বেশি ব্যবহার করতেন। এই সহিস ঐ ঘোড়ার জন্যই নিযুক্ত ছিলো এবং সে হিজাযীর খুব বিশ্বস্তও। হিজাযী নিয়ম করে দিয়েছেন, ঘরের কোন চাকর নওকর ও সহিস নিজেদের কাছে হাতিয়ার তো দূরে কথা ছোট একটি চাকুও রাখতে পারবে না সঙ্গে। সহিসরা যখন আস্তাবলে ঢুকবে তখন বাইরের পোশাক খুলে কাজের পোশাক পড়তে হবে।

একদিন হিজাযী তৈরী হয়ে বেরোচ্ছেন এ সময় তার এক খাস নওকর দৌড়ে এসে তাকে জানালো, তার খাস সহিসের বাইরের পোশাকে একটি খঞ্জর পাওয়া গেছে।

'মহামান্য! ও যাতে টের না পায় যে, তার খঞ্জর দেখে ফেলেছি। তাই আপনি নিজে এসে দেখুন'—সেই নওকর বললো।

হিজাযী তখনই সেই নওকরকে নিয়ে তার আস্তাবলে চলে গেলেন এবং সেই সহিসকে ডেকে তার খঞ্জরটি বের করতে বললেন।

'খঞ্জর? কোন খঞ্জর মুহতারাম সিপাহসালার!'—সহিস অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে বললো।

'আমি তো আপনার অনেক পুরাতন খাদেম সিপাহসালার! আপনার হুকুম হলো, কোন সহিস বা নওকর নিজেদের কাছে কোন হাতিয়ার রাখতে পারবে না। তাই আমার কাছে খঞ্জর রাখার প্রয়োজন কি?...আপনার সন্দেহ হলে আমার কাপড় যেখানে রাখা আছে সেখানে চলুন।'

একটি ঘরে সহিসদের কাপড় রাখা হয়। হিজাযী সহিসকে নিয়ে সে ঘরে গেলেন। সহিস তার কাপড় দেখিয়ে দিলো। হিজাযী নিজে কাপড় উঠিয়ে তার ভেতর হাত ভরে দিলেন। একটি খঞ্জর উঠে এলো তার হাতে। খঞ্জরের বাটে ফেদায়েনদের উল্কি আকা। হিজাযী নিশ্চিত হয়ে গেলেন এই সহিস বাতিনী। আজই তাকে হত্যা করবো এই খঞ্জর দিয়ে।

সহিস চিৎকার করতে শুরু করলো, এই খঞ্জর তার নয়। তার সঙ্গে এ খঞ্জর আনেনি। কে জানি দুশমনি করে এ খঞ্জর তার কাপড়ে রেখে দিয়েছে।

'এখানে কে তোমার দুশমন? তুমি কি দেখাতে পারবে কে তোমার দুশমন?' হিজাযীর এক মুহাফিজ তাকে জিজ্ঞেস করলো।

সহিস এবার কাঁদতে শুরু করলো এবং খঞ্জর আমার নয় আমার নয় বলতে বলতে হিজাযীর পায়ে লুটিয়ে পড়লো। কিন্তু হিজাযীর চোখ মুখ আরো কঠোর হয়ে গেলো। তিনি এক মুহাফিজকে খঞ্জরটি দিয়ে ইংগিত করলেন। মুহাফিজ ইংগিত বুঝে গেলো। সে সহিসের দিকে এগিয়ে গেলো এবং এক ঝটকায় তাকে উঠিয়ে সবেগে তার বুকে খঞ্জর চালিয়ে দিলো। দু' দু'বার তার বুকে আঘাত করলো। সহিস চোখে চরম বিস্ময় নিয়ে পড়ে গেলো এবং নিথর হয়ে গেলো। হিজাযী তার লাশ দূরের এক জঙ্গলে পুঁতে আসতে বললো।

পরে জানা যায়, ঐ সহিস বাতিনী ছিলো না, বরং অন্য এক বাতিনী শত্রুতা করে ওকে বাতিনী বলে বদনাম ছড়ায়।

কয়েকদিন পর সিপাহসালার হিজাযীর সঙ্গে এক লোক সাক্ষাত করতে আসলো। তার দেহ ভালো করে তল্লাশি করে হিজাযীর কাছে পাঠানো হলো। সে এসে বললো, তার আস্তাবলের সহিস হতে চায়। দু' জায়গায় সে সহিসের চাকুরী করেছে। আগে সৈনিক ছিলো, দুটি লড়াইও করেছে। কিন্তু দেহের কয়েক জায়গায় যখমী হওয়াতে সৈনিক হিসেবে সে বেকার হয়ে যায়। যখম দুটিও সে দেখালো। হিজাযী তার অভিজ্ঞতা দেখে তাকে তার আস্তাবলের সহিস করে নিলেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই এই সহিস কাজে ও আচার আচরণে আস্তাবলের অন্যদের মনোযোগ কেড়ে নিলো। সবাই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

হিজাযী একদিন এমনিই আস্তাবলে এসে তার পছন্দের ঘোড়াটি দেখতে লাগলেন। নতুন সহিস ঘোড়াটির ভালো যত্ন নিচ্ছে। সহিস এসে তার পাশে দাঁড়ালো এবং তার ঘোড়ার নানান গুণাগুণ বলতে লাগলো। আচমকা নতুন সহিস তার কাপড়ের ভেতর থেকে খঞ্জর বের করে হিজাযীর বুকে গেঁথে দিলো। হিজাযীর দুই মুহাফিজ তার কাছে পৌছতে পৌছতে তার নিজের বুকেও খঞ্জরটি আমূল বিদ্ধ করে দিলো।

বাতিনীদের ঐ বাড়ি যেটাতে সেই দরবেশ ঢুকেছিলো সেই বাড়িতে ঐ দরবেশসহ আরো কয়েকজন বাতিনী বসেছিলো। হঠাৎ খট করে ঘরের দরজা খুলে গেলো। ওদের এক সঙ্গী কামরায় ঢুকে বললো,

'হয়ে গেছে কাজ হয়ে গেছে। আমাদের ঐ সহিস ফেদায়েন সিপাহসালার হিজাযীকে কতল করে নিজে আল্লাহর কাছে চলে গেছে।'

এরকম ঘটনা একটা নয় হাজার হাজার ঘটে। আমীর উমারা হাকিম ও সালাররা যখন এসব হত্যাকাণ্ড দেখে তখন নিজেদের হেফাজত ব্যবস্থা আরো মজবুত করে গড়ে তোলে। পথেঘাটে এমনকি বাথরুমের পাশেও মুহাফিজ প্রহরা রাখতে শুরু করে। এ অবস্থায় তাদের এভাবে কতল করা কঠিন হয়ে পড়ে। তখনই ফেদায়েনরা এভাবে মজলুম হয়ে, দরিদ্র হয়ে, অসহায় বেশে এসব নেতৃস্থানীয়দের চাকুরী গ্রহণ করে এবং তাদের শিকারদের খতম করে।

হাসান ইবনে সবা তখন সবচেয়ে বেশি ফেদায়েন মোতায়েন করে ইস্পাহানে। ইস্পাহানের একদিকে অনেক পুরনো বাড়ি রয়েছে। এলাকাটি বেশ ঘনবসতিপূর্ণ। অলিগলিতে এলাকাটি ভরতি। এক বাতিনী অন্ধের বেশ ধরে একদিন এক গলিমুখে দাঁড়ালো। শহরের কে বাতিনী আর কে মুসলমান তার সব চেনা আছে। সেই অন্ধের পাশ দিয়ে কোন মুসলমান যাওয়ার সময় সে বলতো, ভাই আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে এই গলির অমুক জায়গায় পৌঁছে দাও। লোকটি তাকে অসহায় পথভোলা অন্ধ ভেবে গলির ভেতর নিয়ে যেতে থাকতো। গলির মাঝামাঝিতে যাওয়ার পর এক বাড়ির ভেতর থেকে হঠাৎ কয়েকজন বের হয়ে এসে সেই লোকটিকে বাড়ির ভেতরে টেনে হিচড়ে নিয়ে যেতো এবং গলা টিপে হত্যা করতো। আর সেই অন্ধবেশী বাতিনীটি আবার সেই গলির মুখে গিয়ে দাঁড়াতো এবং আরেকজন মুসলমানকে শিকার করতো।

এভাবে এক মাসের মধ্যে অসংখ্য মুসলমান লাপাত্তা হয়ে গেলো। সারা শহরে আতংক ছড়িয়ে পড়লো। কোন বাড়ির কেউ যদি সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়িতে না ফিরতো সে বাড়ির সবাই শোকে ভেঙ্গে পড়তো। এত মানুষ কোথায় লাপাত্তা হয়ে গেছে কেউ এর খোঁজ পেলো না। শহরে অনেক গণক ও জ্যোতিষী ছিলো। লোকেরা তাদের কাছে ভিড় করে জিজ্ঞেস করতো, তার অমুক লাপাত্তা হয়েছে। বলুন কোথায় গেছে সে? কেউ কোন উত্তর দিতে পারতো না। শুধু একজন গণক বললো, হারিয়ে যাওয়া সবাই মারা গেছে। কেউ জীবিত নেই। তবে কিভাবে তাদের মৃত্যু হয়েছে সেটা বলতে পারলো না সেই গণক।

একদিন এক লোক সেই অন্ধকে দূর থেকে লক্ষ্য রাখলো। দেখলো সে একজনকে ধোঁকা দিয়ে গলির ভেতর নিয়ে গেছে এবং অনেকক্ষণ পর একা একা ফিরে এসেছে। লোকটি আরো চার-পাঁচজনকে ব্যাপারটি জানালে তারা তলোয়ার নিয়ে গলির একদিকে লুকিয়ে পড়লো। আর সেই লোকটি সেই অন্ধের পাশ দিয়ে পথ চলার ভান করলো। অন্ধ সেই লোকটিকে থামিয়ে বললো, ভাই আমাকে দয়া করে গলির ঐ মোড় পর্যন্ত পৌঁছে দিন। লোকটি অন্ধের হাত ধরে গলির ভেতর ঢুকে পড়লো। লোকটির সঙ্গীরাও পা টিপে টিপে তাদের অনুসরণ করলো। অন্ধ লোকটিকে নিয়ে এক বাড়ির সামনে দাঁড়াতেই সেই লোকটির সঙ্গীরা পাশের বাড়ির দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। বাড়ির ভেতর থেকে তখনই তিনজন লোক বেরিয়ে এসে সে লোকটিকে ধরে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যেতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে সেই লোকের লুকিয়ে থাকা সঙ্গীরা তলোয়ার উচিয়ে দৌড়ে এসে তাদেরকে আটকালো। ওরা ভেতরের দিকে পালাচ্ছিলো। কিন্তু অন্ধসহ তিন বাতিনীর মাথা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলো।

সবাই বাড়ির ভেতর ঢুকলো। ভেতর ঢুকতেই ওদের নাকেমুখে পঁচা মরার অতি কুটগন্ধ এসে ঢুকলো। বাড়ির আঙ্গিনার এক জায়গায় বড় বড় কয়েকটি কাঠের তক্তা পড়ে আছে। পুরো বাড়ি খুঁজে দেখা হলো। তার সবগুলোই খালি। একজন কি মনে করে কাঠের তখতাগুলো সরাতেই দেখা গেলো এর নিচে বড় এক গর্ত। গর্তে অসংখ্য মানুষের লাশ। সেখান থেকে এই দুর্গন্ধ আসছে। সবার ওপরের লাশটি একদম তাজা। একেই একটু আগে সেই অন্ধ নিয়ে এসেছিলো।

এই খবর পেয়ে শহরবাসী এত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো যে, শহরে তারা যে কোন অন্ধ ব্যক্তি দেখলো তাকেই কতল করলো। তারপরও মুসলমানরা গায়েব হতেই থাকলো। কোথায় গায়েব হচ্ছে তার কোন খোঁজ পাওয়া গেলো না।

একদিন এক লোক ফজরের আযান শুনে মসজিদে যাচ্ছিলো। পথে সে দেখলো দুই তিনজন লোক এক লোককে টানাহেচড়া করে একটি বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে। মুসল্লীটি নিরস্ত্র ছিলো বলে তাকে ছাড়াতে চেষ্টা করলো না। বরং মসজিদে গিয়ে সব নামাযীকে ঘটনা জানালো। নামাযের পর সবাই সেই বাড়িতে গিয়ে দরজা ধাক্কা দিলো। তাদের অধিকাংশের কাছেই তলোয়ার ছিলো। কিন্তু কেউ জবাব দিলো না ভেতর থেকে। সবাই নড়বড়ে দরজাটি ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকলো। এটিও অতি প্রাচীন আমলের একটি হাবেলি। বাড়িতে কাউকে পাওয়া গেলো না। সমস্ত কামরা খোঁজ করা হলো। কেউ নেই। যেন বহু বছর ধরে এ বাড়িটি পরিত্যক্ত।

'এদিকে এসো'–এক লোক জোরে আওয়াজ দিলো– 'এই কূপের ভেতরে দেখে যাও।'

হাবেলির আঙ্গিনাটি বিশাল। এর এক কোণে এক কূপে গিয়ে দেখা গেলো অর্ধেক কূপ লাশে ভরা। ওপরে তিনটি লাশ তাজা। একটি একদম তাজা। হা করা গলা দিয়ে তাজা রক্ত ঝরছে। সম্ভবত একেই একটু আগে টেনে হেচড়ে ভেতরে আনা হয়েছিলো।

ইস্পাহানে শায়েখ মাসউদ ইবনে মুহাম্মদ খুজনুদি শাফেয়ী নামে একজন বড় আলেম আছেন। দূরদূরান্ত পর্যন্ত তার ভক্তবৃন্দ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। অনেক পথ সফর করে লোকেরা তার ওয়াজ শুনতে আসতো। তিনি এক ওয়াজে ফতোয়া দেন, হাসান ইবনে সবা ও তার শিষ্যদের কতল করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ। কোন মুসলমান এই ফরজ আদায়ে অবহেলা করলে সে কবীরা গুনাহ্ করবে। এর আগে সিয়াহপোশ নামেও আরেক আমীর এই ফতোয়া দেন।

শায়েখ মাসউদ তার ভক্তদের দিয়ে শহরের কয়েক জায়গায় পরিখা খনন করান। লোকজনও নিজেদের কাজকর্ম রেখে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে এ কাজে যোগ দেয়। পরিখা খনন শেষ হলে সেগুলোতে মনকে মন লাকড়ি ফেলে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এরপর উকুন বাছার মতো বাতিনীদের খোঁজা শুরু হলো। প্রতিদিনই চার পাঁচজন করে বাতিনী ধরা পড়তো আর তাদেরকে সেই অগ্নিকুণ্ডগুলোতে নিক্ষেপ করা হতো। এক সময় শহর চার দিক থেকে বন্ধ করে দেয়া হলো। কারণ, বাতিনীরা পালাতে শুরু করে। কেউ পালাতে লাগলেই তাকে ধরে সোজা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হতো।

শায়েখ মাসউদ সরকারি কোন পদাধিকারে না থাকায় তার জন্য সরকারি কোন মুহাফেজ ছিলো না। কিন্তু তার ভক্তদের মধ্য থেকেই সবসময় ছয় সাতজন তার মুহাফিজ হয়ে থাকতো। ইমামতির সময়ও তার পেছনে ছয় সাতজন নিয়োজিত থাকতো।

হাসান ইবনে সবা যখন দেখলো ইস্পাহানে তার ফেদায়েনরা সমূলে মারা পড়েছে সে তখন হুকুম দিলো ইরাকের দিকে নজর দিতে। সে ইরাকের রাজধানী বাগদাদ দখলের চেষ্টায় ছিলো। আরো হুকুম দিলো, সর্বপ্রথম সেখানকার আলেমদের হত্যা করতে হবে।

কিছু দিন পর ইস্পাহানের মতো ইরাকেও মুসলমানরা এভাবে কতল হতে শুরু করলো। বাগদাদে এ খবর পৌছলে সরকারি গোয়েন্দা বাহিনী হত্যাকারীদের বের করতে তদন্ত শুরু করলো। এ দিকে ইস্পাহানে বাতিনীরা যে খুনখারাবি করেছে সে খবরও বাগদাদে পৌছলে হুকুমতের টনক নড়লো এ সব ঘটাচ্ছে বাতিনীরা।

ইমাম শায়খে শাফিয়া আবুল ফরজ রাজী নামে বাগদাদের একজন সর্বমান্য আলেম ছিলেন। তিনি মসজিদে ঘোষণা দিলেন, বাতিনীদের ব্যাপারে শুধু সতর্ক থাকলেই হবে না ওদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করে হত্যা করতে হবে। লোকেরা ইমামের এ হুকুমকে আল্লাহর নাযিলকৃত হুকুমের মতো গ্রহণ করলো। আর শায়েখে শাকিয়ার জন্য পাঁচজন ভক্ত মুহাফিজ হিসেবে নিযুক্ত হয়ে গেলেন। আর লোকজন খুঁজে খুজে বাতিনী বের করে কতল করতে শুরু করলো।

এক জুমুআর দিনে শায়েখ শাফেয়ী খুতবা শুরু করেছেন। এমন সময় উঁচু আওয়াজে মসজিদের বাইরে কেউ আল্লাহু আকবার শ্লোগান দিয়ে উঠলো। ইমাম খুতবা স্থগিত করলেন। সবাই তাকিয়ে দেখলো, এক লোক রক্তাক্ত কাপড়ে এবং হাতে রক্তধোয়া একটি খঞ্জর নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করছে।

'এই মাত্র আমি ইমাম শায়েখে শাফিয়ার হুকুমে তিন ইবলিসকে কতল করে এসেছি'-সে নামাযীদের ডিঙ্গিয়ে মিম্বরের দিকে যেতে যেতে বললো- 'ইয়া ইমাম! সাক্ষী থাকুন আজ আমি অনেক বড় সওয়াব কামিয়েছি।'

'আমার আহলে সুন্নত ভাইয়েরা!'-লোকটি খঞ্জর ধরা হাতটি ওপরে তুলে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললো- 'আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমি ইমামের হুকুম পালন করেছি। আমার পাঁচটি শিশু সন্তান আছে। আর দুই তিন দিন হয়তো আমি বাঁচবো। কারণ বাতিনীরা এই খুনের বদলা অবশ্যই নেবে। আমি আমার বিবি বাচ্চাদের আপনাদের সবার কাছে সোপর্দ করছি। তাদের সম্মানজনক জীবন জীবিকার দায়িত্ব আপনাদের কাঁধে রাখলাম।

মুসল্লীরা সবাই উঁচু আওয়াজে তার প্রশংসা করতে লাগলো। কয়েকজন বললো, তারা তার বিবি বাচ্চার যিম্মাদারী নেবে। শায়েখে শাফিয়াও মিম্বর থেকে তার কাঁধে হাত রাখলো। 'সবার রিযিকের মালিক মহান আল্লাহ'-ইমাম উঁচু আওয়াজে বললেন- 'তুমি কতল হয়ে যাবে এটাতো নিশ্চিত নয়। আর এমন হলেও আল্লাহ তোমার স্ত্রী সন্তানদের এর পূর্ণ প্রতিদান দেবেন। এই কাপড় পাল্টিয়ে পরিষ্কার হয়ে এসো। এই বাতিনীদের রক্ত শূকরের রক্তের চেয়েও অপবিত্র।'

ইমাম শাফিয়ীর দিকে লোকটি ঘুরলো। তিনি বলে যাচ্ছিলেন। ওমনিই ইমামের বুকে ক্ষিপ্রগতিতে দুবার খঞ্জরটি বিদ্ধ করে দিলো এবং এক লাফে মিম্বরে চড়ে 'ইয়া ইমাম শায়খুল জাবাল! তোমার হুকুম তামিল করে তোমার জান্নাত থেকে আল্লাহর জান্নাতে যাচ্ছি'-একথা বলে খঞ্জর দিয়ে নিজেও আত্মহত্যা করলো। পরে অবশ্য মুসল্লীরা কুপিয়ে তার দেহ কিমা বানিয়ে ফেললো এবং পরীক্ষা করে দেখলো, তার কাপড় ও খঞ্জরে কোন মানুষের রক্ত নয় গাঢ় লাল রং মাখানো ছিলো।

ইস্পাহানের হাকিম ও জনগণ নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলো যে, তারা এই শহর থেকে বাতিনী উৎখাত করতে পেরেছে। কিন্তু এমনই এক শুক্রবারে কাযী আবুল আলা নিশাপুরী নামে এক প্রসিদ্ধ আলেমকে জুমুআর খুতবার সময় বাগদাদের মতো একই ধরনের নাটক করে এক বাতিনী হত্যা করে নিজেও আত্মহত্যা করে।

বাতিনীদের এই অব্যাহত হত্যাকাণ্ড যখন ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগলো তখন হাকিম আমীর উমারা ও আলেম উলামারা শুধু মুহাফিজ রেখে নিশ্চিত হলেন না। তারা কাপড়ের নিচে বর্ম পরতে শুরু করলেন। যাতে আচমকা কেউ তলোয়ার বা খঞ্জর মারলে দেহে না লাগে। কারণ, হাজার হাজার বাতিনী হত্যা করেও মুসলমানরা আগের মতোই নিহত হচ্ছিলো।

রায় শহরে একদিন এক হাজীদের কাফেলা পৌঁছলো। কিন্তু তাদের সবার চেহারায় শোকের ছায়া। অধিকাংশের চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াচ্ছে। এর কারণ জিজ্ঞেস করে জানা গেলো, রায় থেকে একটু দূরে বাতিনী লুটেরারা তাদের সবকিছু লুট করে নিয়ে গেছে এবং অনেককে হত্যা করেছে। আমীরে শহর তখন তার ফৌজ সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু সপ্তাহখানেক পর লুটেরাদের চিহ্নও না পেয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো। সেখানে যা পাওয়া গেলো তা হলো অসংখ্য লাশ। হিংস্র জন্তুরা লাশের গা থেকে গোশত খুবলে খুবলে খাচ্ছে।

দেড় দু'মাস পর রায় শহরে আরেকটি ব্যবসায়ী কাফেলা এলো। তাদেরও সবকিছু বাতিনীরা ছিনিয়ে নিয়েছে এবং যুবতী যত মেয়ে ছিলো তাদেরকেও নিয়ে গেছে।

আমীরে শহর সেই লুটেরাদের ধরার একটা কৌশল অবলম্বন করলেন। প্রায় মাসখানেক পর রায় থেকে বিরাট এক কাফেলা অনেক দূরের পথ সফর করার ঘোষণা দিলো। কাফেলার সঙ্গে যাচ্ছে মালপত্র বোঝাই করা অসংখ্য উট ও মহিষের গাড়ি। যেগুলোর ওপরের মালপত্র ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। নিয়ম হলো কোন শহরে কাফেলা থামলে সেখান থেকে কখন কোথায় কাফেলা রওয়ানা হবে কাফেলার লোকেরা সতর্কতার জন্য সেকথা গোপন রাখে। কিন্তু এই কাফেলার লোকেরা সে তথ্য গোপন রাখলো না। নির্ধারিত দিনে এই বাণিজ্য কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেলো। কাফেলা যত এগিয়ে গেলো এতে আরো ব্যবসায়ী যোগ দিতে লাগলো।

কাফেলা রায় থেকে ১৬/১৭ মাইল দূরের সেই এলাকায় পৌঁছলো যেখানে ডাকাত ও লুটেরাদের আড্ডা লেগে থাকে। এলাকাটি অনেক টিলাপ্রান্তর ও কম উঁচু পাহাড় এবং ঘন বৃক্ষে ছাওয়া। পাহাড়ের মাঝখানে প্রশস্ত সমতল ভূমিও অনেক। কাফেলাও এই ধরনের দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে তাঁবু ফেললো। এ ধরনের জায়গা কিছুটা নিরাপদ। আর দিনের বেলায় সাধারণত কাফেলা লুট হয় না। কিন্তু আচমকা কাফেলার সামনে ও পেছন থেকে অসংখ্য ঘোড়সওয়ার উদয় হলো এবং কাফেলাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেললো। সবার মধ্যে ভীতি ও আতংক ছড়িয়ে পড়লো।

'যদি প্রাণ বাঁচাতে চাও সবাই মন দিয়ে শুনে নাও'–লুটেরাদের পক্ষ থেকে ঘোষণা হলো– 'প্রত্যেকের মালপত্র ও উট ঘোড়া রেখে সবাই একদিকে সরে যাও। আর

তোমাদের কাছে যত টাকা পয়সা, সোনা রুপা আছে সব একখানে জমা করো। আমাদের কথা না শুনলে তোমরা লাশ হয়ে যাবে।'

কাফেলার সবাই এ হুকুম তামিল করে দু'ভাগে ভাগ হয়ে দূরে সরে গেলো। লুটেরারা দু'দলকে ধাক্কিয়ে ধাক্কিয়ে পেছনে হটাতে হটাতে দু'দিকের পাহাড়ের দিকে নিয়ে গেলো। সংখ্যায় লুটেরারা কাফেলার প্রায় অর্ধেক হবে। সবাই ঘোড়া থেকে নেমে মালপত্র জমা করার জন্য চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। তারা প্রথমে এলো মাল বোঝাই উট ও মহিষগুলোর কাছে। আরেক দিকে কাফেলার যুবতী মেয়েরা স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে ছিলো। কিছু গেলো সেই মেয়েদের দিকে। লুটেরারা যেই উট ও মহিষের ওপর থেকে ত্রিপল সরাতে শুরু করলো ওমনিই ত্রিপলগুলোর নিচ থেকে অসংখ্য অস্ত্র সজ্জিত লোক বের হয়ে লুটেরাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। লুটেরারা তাদের তলোয়ার ও খঞ্জর বের করা প্রয়োজন মনে করেনি এতক্ষণ। তারা তো দারুণ খুশী তলোয়ারের ব্যবহার ছাড়াই এতগুলো মাল তারা পেয়ে গেছে। কিন্তু আচমকা জমদূতের হাতে পড়ে তলোয়ার বের করারও সুযোগ পেলো না। সমূলে কচুকাটা হতে লাগলো। ওদিকে কাফেলার লোকেরাও লুটেরাদের ওপর দুদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিছু লুটেরা পালাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু কাফেলার লোকেরা সে সুযোগ তাদেরকে দিলো না।

ত্রিপলের নিচে এরা ছিলো রায়ের ফৌজ। আর মেয়েদেরকে আনা হয়েছিলো লুটেরাদের এই কাফেলার প্রতি আকর্ষণ করতে। আর তাদের গন্তব্য ও যাওয়ার সময় গোপন রাখেনি যাতে লুটেরাদের কাছে এসব তথ্য সহজে পৌঁছতে পারে।

তিন লুটেরা ছাড়া একজনও বাঁচতে পারলো না। সেই তিনজন মারাত্মক যখমী হলো। যখমীরা হাতজোড় করে মিনতি করলো, দয়া করে ওদেরকে উঠিয়ে চিকিৎসা করা হোক। ভবিষ্যতে তারা তওবা করবে এবং এ কাজ আর করবে না। ফৌজ তাদেরকে বললো, তারা কে কোত্থেকে এসেছে এসব বললে হয়তো তাদেরকে বাঁচানো হবে। তারা জানালো তারা বাতিনী। হাসান ইবনে সবার হুকুমে লুট করতে এসেছে। লুট করা সব কিছু আলমোতে পৌঁছে দিতে হয়।

হাকিমে রায়কে জানানো হলে তিনি যখমীদের চিকিৎসা করাতে হুকুম দিলেন। এদের কাছ থেকে হাসান ইবনে সবা সম্পর্কে তথ্য আদায় করতে চাচ্ছিলেন। এক ঘোড়ার গাড়িতে রায় আনা হলো ওদেরকে। একটি কামরায় রেখে ডাক্তার ডাকা হলো। আমীরে রায়ও সেখানে পৌঁছে গেলো।

'যদি বাঁচতে চাও সব বলে দাও। আর যদি জানের মায়া না থাকে করুণ মৃত্যু হবে তোমাদের। তোমাদের যখমের ওপর লবণ ছিটিয়ে দেয়া হবে। ছটফট করতে করতে মরবে তোমরা'—আমীরে রায় বললেন।

তিনজন ছটফট করে বলে উঠলো, ওরা সবকিছু বলে দেবে দয়া করে ওদের চিকিৎসা করা হোক। আমীরের হুকুমে ডাক্তার তার কাজ শুরু করে দিলেন।

'হে আমীরে শহর!'—তিন যখমীর মধ্যে মধ্যবয়সী একজন বললো— 'আমি সব বলে দেবো। জানি, আমাদের জীবিত রাখা হবে না। কিন্তু এরপরও আমি সত্যি কথাই

বলবো। মৃত্যুর ভয় ও জীবনের লোভ দেখাবেন না আমাদের। সবই বলবো আমি। এর আগে বলবো, আলমোত থেকে যে তুফান উঠেছে সে তুফান সমস্ত সেলজুকি ফৌজও রুখতে পারবে না।'

ডাক্তার তার দুই ছাত্রকে ডেকে এনে অন্য দুই যখমীকে ছেড়ে দিয়ে মধ্যবয়সী সেই যখমীকে অন্য কামরায় নিয়ে যেতে অনুরোধ করলেন আমীরকে। অন্য আরেক কামরায় তাকে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তার ও আমীরে রায়ও সেখানে গেলেন এবং তার সব কাপড় খুলে ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে শুরু করলেন। আমীরে বাতিনীকে জিজ্ঞেস করলেন, হাসান ইবনে সবা এত দূরে বসে হাজার হাজার বাতিনীকে তার ইচ্ছামাফিক কি করে চালায়? আর ফেদায়েনরা কি করে প্রাণ দিয়ে দেয় যে কোন মুহূর্তে?

'আমীরে শহর!'–যখমী বাতিনী বললো– 'মানুষ আল্লাহকে ভয় পায় কিন্তু শয়তানের হুকুম মেনে চলে। আপনি হয়তো যাহেদ ও মুত্তাকী। কিন্তু সবাই এমন নয়। কেন এমন হয়?....কারণ, ইবলিসি কর্মকাণ্ডে যে আকর্ষণ আছে খোদায়ী কর্মকাণ্ডে সে আকর্ষণ নেই। হাসান ইবনে সবা বলে, বান্দাকে খোদা প্রতিশ্রুত জিনিস দিতে বিলম্ব করেন। তিনি জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। কিন্তু এজন্য মৃত্যু জরুরী এবং সমস্ত জীবন নেকীর মধ্যে কাটানোও জরুরী। কিন্তু শায়খুল জাবাল হাসান ইবনে সবা দুনিয়াতেই আমাদেরকে জান্নাত দিয়েছেন। আমি সেই জান্নাতে থেকেছি। শায়খুল জাবাল শুধু প্রতিশ্রুতিই দেয়না–প্রাপ্যের চেয়ে বেশি দেয় আরো। আপনারা তাকে ইবলিস বলেন। কিন্তু আমরা বলি ইমাম।

হাসান ইবনে সবার অনেক কিছুই সে জানালো। আলমোতের ভেতরে কি আছে, তার ফৌজ কতজন ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কি সবই জানালো সে।

'আমি প্রথমেই বলেছি শায়খুল জাবালের কোন ক্ষতিই আপনি করতে পারবেন না'–যখমী গর্বের সঙ্গে বললো– 'সালার আওরিজী ৬ মাস ধরে কেল্লা ওসিমকুহ অবরোধ করে রেখেছেন। কিন্তু কেল্লার দেয়াল পর্যন্তও পৌঁছতে পারেননি। যখনই পৌঁছতে চেষ্টা করেছেন নিজের অনেক সিপাহীর মৃত্যু দেখতে হয়েছে তাকে। তিনি সফল হবেন না। হলেও শায়খুল জাবালের কোন ক্ষতি হবে না। আর শায়খুল জাবাল যে এই অবরোধ ভাঙ্গার চেষ্টা করছে না এর কারণ হলো, তিনি নিশ্চিত সেলজুকিরা এ কেল্লা উদ্ধার করতে পারবে না। তিনি নিশ্চিত সেলজুকি সালার যখন তার অর্ধেক লশকরকে হারাবেন তখন বাকী অর্ধেকের জীবন নিয়ে তিনি ফিরে আসবেন।

ডাক্তারের কাজ শেষ হলে ডাক্তার ও আমীরে রায় সেখান থেকে বের হয়ে গেলেন।

বাইরে এসে ডাক্তার আমীরে শহরকে বললেন,

'আমীরে মুহতারাম! রুগী ও যখমীদের চিকিৎসা করতে করতে বয়স অনেক হয়েছে। দুনিয়ার রহস্য কম দেখিনি আমি। আপনি হয়তো হয়রান হচ্ছেন ঐ বাতিনী যখমী এমন আত্মবিশ্বাস ও স্বাচ্ছন্দ নিয়ে কি করে এসব কথা বললো। কিন্তু আমি হয়রান হচ্ছি, যার এতগুলো রক্ত বের হয়ে গেছে তার বেঁচে থাকারই কথা নয়। অথচ সে জীবিত এবং তার মাথা তার দেহের চেয়ে বশি প্রাণবন্ত...একেই বলে জযবা ও

বিশ্বাস বা আকীদা। এটা ভিন্ন কথা যে, তার জযবা ও আকীদা ইবলিসি। কিন্তু এটাই হাসান ইবনে সবার আসল শক্তি। ঐ যখমীর মৃত্যুর কোন ভয় নেই বেঁচে থাকারও লোভ নেই। দেখবেন সে হাসান ইবনে সবা নারা লাগিয়ে মরবে। মুসলমানদেরও এমনই জযবাওয়ালা হওয়া উচিত। এটি সম্ভব হলে হাসান ইবনে সবার ফেরকাও খতম করা যাবে। ইসলামকে এ ধরনের জযবার মাধ্যমেই টিকিয়ে রাখা যাবে।'

ডাক্তার চলে গেলেন। আর আমীরে শহর তার মুহাফিজ কমান্ডারকে ডেকে ঐ তিন বাতিনীকে খতম করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

★★★★

কেল্লা ওসিমকুহ অবরোধের ছয় মাস কেটে গেছে। সালার আওরিজীর এই লশকরে সবাই অসাধারণ জযবাধারী ও জানবায। জানবাযদের একটি দল একদিন কেল্লার দরজা ভাঙ্গতে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কিন্তু কেল্লার দেয়ালের ওপর থেকে অসংখ্য জ্বলন্ত অঙ্গার ও তীরবৃষ্টির মুখে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয় তারা। আহত নিহত হয় কয়েকজন। এমন আরো কয়েকবার দরজার কাছে গিয়ে লাশ হয়ে ফিরে আসে। সালার আওরিজী একবার সুড়ঙ্গ খনন করে কেল্লার ভেতর আক্রমণের চিন্তা করেন। কিন্তু সুড়ঙ্গে একবারে সব লশকর তো আর ঢুকতে পারবে না। তিন চারজন করে ঢুকতে হবে। এতেও সৈন্য আরো বেশি করে মারা পড়বে।

হাসান ইবনে সবা মাসখানেক পরই জানতে পারে তাকে ধোঁকা দিয়ে সেলজুকিরা কেল্লা মুলাযখান না গিয়ে কেল্লা ওসিমকুহ অবরোধ করেছে। একথা শুনে হাসান ইবনে সবার ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি খেলে গেলো। সে বললো,

'ঐ সেলজুকিরা এখনই বুঝতে পারছে। ওরা এই আশায় আমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে যে, কেল্লা ওসিমকুহ অল্প কয়েকদিনে কব্জা করে নেবে। কেল্লা ওসিমকুহ অবরোধ করতে পারবে। কিন্তু এক সেলজুকিও কেল্লার ভেতর ঢুকতে পারবে না।'

'ইয়া ইমাম! ওদের অবরোধের পেছন দিয়ে হামলা করলে কেমন হয়'–তার এক প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা বললো।

'এখনই নয়। ওদের শক্তি ওখানেই খতম হয়ে যেতে দাও। যখন দেখবে ওদের দম ফুরিয়ে গেছে অর্ধেক লশকর ওসিমকুহের তীরন্দাযদের টার্গেটে পরিণত হবে তখন আমরা ঐ চিন্তায় যাবো। ওদেরকে আগে তৃপ্ত হতে দাও।'

কিন্তু সালার আওরিজীর মনে অবরোধ উঠিয়ে নেয়ার মতো চিন্তা কখনো জাগেনি। তিনি বুঝতে পারছিলেন হাসান ইবনে সবা অনেক আগেই তার ধোঁকা টের পেয়েছে এবং যে কোন সময় এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বাতিনীদের দ্বারা পেছন থেকে হামলা চালাতে পারে।

এর মধ্যে মুযাম্মিল ও ইবনে ইউনুস সুস্থ হয়ে একদিন কেল্লা ওসিমকুহে অবরোধরত সালার আওরিজীর কাছে পৌঁছে। আওরিজী তাদেরকে অবরোধের সঠিক

পরিস্থিতি জানান এবং বলেন তার অর্ধেক পৌজ খতম হয়ে গেছে এতদিন। এখন যে কোন সময় আমাদের ওপর পেছন থেকে হামলা হয়ে যেতে পারে।

'পেছন থেকে হামলা হওয়ার আশংকা আছে?'–মুযাম্মিল জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ মুযাম্মিল ভাই!'–সালার আওরিজী বললেন– 'আমি তো হয়রান হচ্ছি হাসান ইবনে সবা এখনো কেন এই পদক্ষেপ নিলো না? আমি হলে তো তাই করতাম। কারণ অবরোধকারী ফৌজকে অবরোধ করলে সে ফৌজ কখনো বাঁচতে পারে না।'

মুযাম্মিল আফেন্দী গভীর চিন্তায় ডুবে গেলো। তারপর সালার আওরিজীর সঙ্গে গোপনে কিছু সলাপরামর্শ করলো এবং ইবনে ইউনুসকে নিয়ে মারু ফিরে এলো।

এর পনের ষোল দিন পর সালার আওরিজীর আশংকাই সত্যি হলো। দূর থেকে দেখলেন শত শত ঘোড়সওয়ার লশকর আসছে। তিনি অবরোধ থেকে তার সমস্ত সৈন্য ফিরিয়ে এনে এক জায়গায় জমা করলেন এবং যুদ্ধের সাজে সাজালেন।

ঘোড়সওয়ার লশকরের দুই সওয়ারের হাতে হাসান ইবনে সবার ঝাণ্ডা দেখা গেলো। তারা বাতিনীদের শ্লোগান দিচ্ছে। আওরিজী তার ফৌজকে কেল্লা থেকে আরো পেছনে সরিয়ে এনে দেখতে লাগলেন কোন জায়গাটা তার ফৌজের পক্ষে সুবিধাজনক। তার লশকরকে তিনি তিন ভাগে ভাগ করে দু'দলকে আগে এবং একদলকে পেছনে রাখলেন। সৈন্যরা সবাই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত।

ঘোড়সওয়ার লশকর কেল্লার আরেক দিকে অবস্থান নেয় এবং ঘোষণা করতে থাকে, কেল্লার ভেতরের সবাই বাইরে এসে মুসলমানদেরকে ঘেরাওয়ের মধ্যে ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়ো। এই ঘোষণা দিয়ে ঘোড়সওয়ার বাতিনী লশকর ধীরে ধীরে মুসলমানদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। যেন সালার আওরিজীকে ঘেরাওয়ের মধ্যে নিতে যাচ্ছে ওরা।

এসময় কেল্লার দরজা খুলে গেলো। ভেতর থেকে লশকর বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মতো আসতে লাগলো। সালার আওরিজী তখনই তার ফৌজকে হুকুম দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফৌজের একদল ভেতর থেকে আসা লশকরের ওপর হামলে পড়লো। আরেকদল তলোয়ার ঘুরাতে ঘুরাতে কেল্লার ভেতর ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলো। তখনই সাহায্যস্বরূপ আসা বাতিনী ঘোড়সওয়াররা ভেতর থেকে আসা বাতিনী লশকরদের ওপর হৈ হৈ করে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ভেতর থেকে আসা লশকররা তো নিশ্চিত ছিলো এ হাসান ইবনে সবার প্রেরিত সওয়ার ফৌজ। কিন্তু এ কী ঘটছে! তাদের বিস্ময়ভাব কাটার আগেই সমানে কাটাতে পড়তে লাগলো অবরোধকারী ফৌজ ও নতুন ঘোড় সওয়ার লশকরের হাতে। এক সেলজুকিও এখন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে পারবে না এই ফুর্তি নিয়ে ওরা জোয়ারের মতো কেল্লার বাইরে বেরিয়েছিলো।

আর যে ফৌজি দল কেল্লার ভেতরে গিয়েছিলো তারাও ভেতরে গণহত্যা শুরু করে দিলো এবং কেল্লার দরজা খুলে দিলো। তখন আওরিজীর অন্য দুই ফৌজি দল এবং বাতিনীরূপী ঘোড়সওয়ার লশকরও আল্লাহুআকবার নারা লাগিয়ে ভেতরে

ঢুকলো। তাদের হাতে যে হাসান ইবনে সবার ঝাণ্ডা উড়ছিলো ভেতরে গিয়ে সেটি তারা ছিড়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলো। ততক্ষণে কেল্লা ওসিমকুহ মুসলমানদের দখলে এসে গেছে।

বাতিনীদের ধোঁকা দেয়ার এ চালটা আসে মুযাম্মিলের মাথা থেকে। যেদিন সে ইবনে ইউনুসসহ কেল্লা ওসিমকুহ এসেছিলো সেদিনই আওরিজীর সঙ্গে এ পরিকল্পনা করে যায় যে, মারু গিয়ে সে সুলতান বরকিয়ারকের কাছে থেকে দুই হাজার ঘোড়সওয়ার চেয়ে নেবে এবং তাদেরকে প্রস্তুত করে ঘুরপথে আলমোতের পথ থেকে অতি গোপনে ওসিমকুহের দিকে আসবে। তাদের হাতে থাকবে মারুতে তৈরী করা হাসান ইবনে সবার ঝাণ্ডা। আর ওসিমকুহের সামনে এসে তারা বাতিনীদের শ্লোগান দিতে থাকবে। মুযাম্মিলের এই চাল বাস্তবায়ন না হলে কেল্লা ওসিমকুহ কখনো জয় করা সম্ভব হতো না।

'সালারে মুহতারাম!'–বিজয়ের প্রথম রাতে মুযাম্মিল আফেন্দী সালার আওরিজীকে বললো– 'হাসান ইবনে সবাকে পরাজিত করতে হলে এমন ধোঁকা দিয়েই করতে হবে...তার আগাগোড়া সবটাই ধোঁকা আর প্রতারণা। তাই আমাদেরও ওর জন্য প্রতারক হতে হবে...আল্লাহ আপনার বিজয়কে মোবারকময় করুন।'

লড়াই শেষ হওয়ার পর আওরিজী কেল্লার ভেতরের দিকে মনোযোগ দিলেন। ভেতরে শুধু লাশ আর লাশ। রক্ত পিচ্ছিল হয়ে আছে কেল্লার বিশাল আঙ্গিনা। কোথাও পা ফেলার জায়গা নেই। সালার আওরিজী হুকুম দিলেন, প্রতি ঘরে তল্লাশি চালাতে। তবে মেয়েদের ওপর কেউ হাত তুলবে না। পুরুষদের ঘরের বাইরে বের করে নিয়ে এসো। যেসব বাতিনীর কাপড়ে রক্তের চিহ্ন পাবে বুঝতে হবে এরা লড়াইয়ে অংশ নিয়েছে। তাদেরকে বিশেষভাবে পাকড়াও করা হবে। কারণ কেল্লার ভেতরের সবাই বাতিনী। আর এদের মধ্যে অনেক লুটেরাও আছে। যারা অনেকদিন ধরে ওসিমকুহের আশপাশে লুটপাট চালিয়েছে এবং অসংখ্য মানুষ মেরেছে। অনেকের যুবতী মেয়ে এনে তাদের সবকিছু কেড়ে নিয়ে তারপর হত্যা করেছে। এদেরকে আলাদাভাবে শাস্তি দেয়া হবে।

সালার আওরিজীর হুকুমে চারদিক তৎপর হয়ে উঠলো। ঘরের বিভিন্ন কোণ থেকে চোরা ঘর থেকে বাতিনীদের ধরা শুরু হয়ে গেলো। কেল্লার বুরুজের ভেতরও অনেক বাতিনী পাওয়া গেলো। এরা সবসময় দেখে এসেছে বাতিনীরা সব শহরে মুসলমানদের গণহারে হত্যা করে। কিন্তু এই মুসলমানরা বিজয়ী হয়েও এদেরকে শুধু জীবিতই রাখেনি এদের মেয়েদের সম্ভ্রমও রক্ষা করছে। মেয়েরা এতে খুব প্রভাবান্বিত হয়। তাই ডাকাত ও লুটেরাদেরকে যখন সামনে এসে ধরা দিতে বলা হলো তখন অনেক লুটেরাই গা ঢাকা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু মেয়েরা তাদেরকে ধরিয়ে দেয়।

সালার আওরিজী ও মুযাম্মিল ও ইবনে ইউনুস একটু দূরে দাঁড়িয়ে আলাপ করতে থাকে।

'শোন ভাই!'–সালার আওরিজী বললেন– 'কেল্লা আলমোত থেকে বয়ে আসা বাতাসে এখনো আমি এই শংকার গন্ধ পাচ্ছি যে, হাসান ইবনে সবা আমাদের ওপর অবশ্যই হামলা করবে।'

'আপনি চাইলে কালই আমি মারু রওয়ানা হয়ে যাবো এবং সেখান থেকে সেনাসাহায্য নিয়ে আসবো'–মুযাম্মিল বললো।

'মারু থেকে আমি আর অধিক ফৌজ আনাতে চাচ্ছি না। সেখানে ফৌজ কমে গেলে নিরাপত্তার অভাব দেখা দেবে। আমরা একটা কাজ করতে পারি যে, কাল সকালে আমরা লশকরকে বাইরে কোথাও লুকিয়ে রাখি। যাতে আচমকা কেল্লার ওপর হামলা হয়ে গেলে হামলাকারীরা অবরোধ করার সুযোগ না পায়।'

★★★★

সালার আওরিজীর এক ফৌজি অফিসারের নাম সুমাইর আবলাক। তিনি চার সিপাহী নিয়ে কেল্লার বুরুজগুলো থেকে লুকিয়ে থাকা অনেক বাতিনী পাকড়াও করেন। দুই সিপাহীর দুটি মশাল। আর অন্য দুই সিপাহীসহ তিনি বাতিনীদের খুঁজে খুঁজে বের করেন।

কেল্লার বড় ফটকের ওপর বুরুজের আদলে বড় একটি কামরা আছে। সুমাইর তার সিপাহীদের নিয়ে ঐ বুরুজে ঢুকলেন। এর ভেতরে আরেকটি সিঁড়ি আছে। সিঁড়ি উঠে গেছে ওপর তলায়। সিঁড়ি দিয়ে সুমাইর ওপরে উঠার সময় এক সিপাহীর চোখ গেলো সিঁড়ির নিচে। সেখানে কিছু কাপড়ের পুটলি পড়েছিলো। তার মনে হলো সে পুটলিগুলির ভেতরে দুটি জ্বলজ্বলে চোখ দেখেছে। সুমাইর অর্ধেক সিঁড়ি উঠে গিয়েছিলেন। সিপাহীর আওয়াজ পেয়ে নিচে এসে রক্তাক্ত জামাকাপড় ও তলোয়ারসহ এক বাতিনীকে পাকড়াও করেন। বাতিনীটি যখমী। কিন্তু চোখেমুখে এখনো সতেজ-বলদীপ্ত। সুমাইর তাকে বললেন,

'তুমি নিরপরাধ হতে পারো না। তোমার চেহারা বলছে তুমি ডাকু। না জানি কত মানুষকে এ পর্যন্ত হত্যা করেছো...তোমার তলোয়ার বলছে আজও তুমি আমাদের রক্ত ঝরিয়েছো...নিচে চলো।'

'হ্যা আমি ডাকু'–সে বললো– 'এবং হাসান ইবনে সবার অনুসারীও। তোমাদের তিনজনকে আজ হত্যা করেছি...এখন কতল হতে তৈরী আমি। আমি জানি আমার পরিণতি এটাই হবে। তবে একটা কথা শুনে নাও। আমাকে কতল করলে তোমরা নিজেদেরই ক্ষতি করবে। আর বাঁচিয়ে রাখলে এত সম্পদের মালিক হবে যে একটি কেল্লা কিনতে পারবে।'

'বেঁচে থাকার কোন ফন্দিই এখন কাজে আসবে না'–সুমাইর বললেন– 'হাসান ইবনে সবা তোমাকে ছাড়াতে আসবে না। তুমি যে খাযানার কথা বলছো তা আমরা কেল্লার পাতাল ঘরে পেয়ে গেছি। সেখানে কেল্লার খাযানা রাখা আছে।'

'আমি জানি শায়খুল জাবাল আমাকে ছাড়াতে আসছে না। জানি আপনাদের হাতে আমি নিশ্চিত কতল হবো। কিন্তু একটা কথা– আমি কেল্লার খাযানার কথা বলছি না। আমি যে খাযানার কথা বলছি সেটা এখান থেকে অনেক দূরে। আমি ছাড়া কেউ জানে না। আমি চাই সেটা আপনি নিয়ে নিন– আপনার সিপাহীদের একটু দূরে যেতে বলুন। দেখুন আমার কাছে কোন হাতিয়ার নেই। আমি ধোঁকা দিতেও পারবো না। পাঁচজন আপনারা সশস্ত্র আর আমি নিরস্ত্র এবং একা।'

সুমাইর তার কথায় বেশ প্রভাবান্বিত হলেন। সিপাহীদের তিনি বুরুজ থেকে বের হয়ে দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে বললেন। তারা চলে গেলো।

'আমি শামী এলাকার লোক। আমার নাম আবু জান্দাল'–ডাকাত বললো– 'আমার দু'জন ইয়াতীম ভাতিজী আছে। অতিশয় সুন্দরী ওরা। আমার সঙ্গীরা আমাকে পরামর্শ দিয়েছে, আমি যেন ওদেরকে হাসান ইবনে সবার কাছে পেশ করি। তাহলে সেখানে আমাকে অনেক উঁচু পদ দেয়া হবে। আমার সেলজুকি বন্ধু! অন্যের মেয়েকে আমি অপহরণ করে ইমামের কাছে পাঠাই। কিন্তু নিজের ভাতিজীদের দিকে তাকালে আমার মরা ভাইয়ের কথা মনে পড়ে। ওদেরকে আমি তাই লুকিয়ে রাখি।'

'আমি মুসলমান! সুন্দরী মেয়ের লোভ আমার মধ্যে নেই। কোন মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজেদের কাছে রাখার অনুমতি নেই আমাদের।'

'আমি জানি তুমি ওদেরকে তোমার সালারের কাছে সোপর্দ করবে। তখন তিনি তাদের দু'জনকে অন্য কোন সিপাহীর সঙ্গে বিয়ে করিয়ে দেবেন। কিন্তু এটা কি ভালো হয় না ওদের দু'জনকে তোমার নিজের কাছে রেখে একজনকে তোমার স্ত্রী আরেকজনকে তোমার দাসী বানিয়ে নিলে? এই খাযানার কথা বলেছি ওদের খাতিরে। আমি তো কতল হবোই। কিন্তু আমি ওদেরকে শূন্য হাতে এই দুনিয়ায় রেখে যেতে চাই না।' আবু জান্দাল বললো।

'তুমি কি আমার কথা বুঝনি?'–সুমাইর জিজ্ঞেস করলেন– 'নিজের ইচ্ছায় আমি কোন মেয়ে নিজের কাছে রাখতে পারবো না। তুমি ওদেরকে আমার কাছে সোপর্দ করলে হয় আমার ফৌজ ছাড়তে হবে না হয় ওদেরকে ছাড়তে হবে।'

'এই ফৌজে তুমি কিইবা পাও?'–আবু জান্দাল বললো– 'মুসলমান হয়েই বা কি পেলে তুমি? ভাবছো তুমি তোমার আখেরাতকে সুন্দর করছো? কিন্তু আমি তোমার দুনিয়াও সুন্দর করে দেবো... আগে আমার কথা শোন'...

'তুমি নিজে কেন এই খাযানা নিচ্ছো না?'

'এটা আমার জীবনের শেষ রাত। সকাল পর্যন্ত আমি কতল হয়ে যাবো। তুমি আমাকে বাঁচালেও একা আমি ওখানে পৌছতে পারবো না। আমার সঙ্গীরা সব মারা গেছে। তুমি যদি আমাকে সঙ্গ দাও ও গোপনে ঐ চার সিপাহীকে সঙ্গে নিয়ে নাও তাহলে আমরা ঐ খাযানা পর্যন্ত পৌছে সেখান থেকে খাযানা বের করে নেবো।'

'আর সেখানে নিয়ে আমাকে ও আমার সিপাহীদের খুব সহজে হত্যা করতে পারবে। আর খাযানা যদি তোমার সঙ্গে মিলে উদ্ধারও করি তখন কি আর ফৌজে ফিরতে পারবো?'

'তারপর আর ফৌজে এসে কি করবে? আমরা হিন্দুস্তান বা হিজায চলে যাবো। সেখানে রাজার জীবন কাটাবো। আমার ঘরে গিয়ে আগে আমার ভাতিজীদের দেখে নাও। ভয় পেয়ো না আমাকে। আমি তোমাকে ধোঁকা দেবো না। আমাকে বাতিনী ডাকাত মনে করে কতল করে দাও। কতলের আগে তোমাকে আমি সে জায়গার রাস্তার নকশা ভালো করে বুঝিয়ে দেবো। কিন্তু আমাকে ছাড়া তুমি সেখানে পৌছতে পারবে না।'

'ঐ খাযানা এলো কোত্থেকে? আর সেখানেই বা কেন রাখলে?'

'আজ আমি প্রতিটি কথা সত্যি বলবো।'–আবু জান্দাল বললো– 'আমি পেশাদার ডাকু ও লুটেরা। এটা আমার পূর্বপুরুষের পেশা। এই এলাকায় হাসান ইবনে সবার ফেরকা ছড়িয়ে পড়ে এবং তার লুটেরা দল লুটের রাজত্ব কায়েম করে। বাধ্য হয়ে আমিও ঐ দলে ঢুকে পড়ি। হাসান ইবনে সবার আমি মুরিদও হয়ে যাই। কিন্তু এটা আমার পছন্দ নয় যে, আমরা যত মালামাল লুট করি তার সবই আলমোতে পৌঁছে। এ থেকে আমাদেরকে খুব সামান্য অংশ দেয়া হয়। তাই আমি আমার পুরনো লুটেরা বন্ধুদের বললাম, হাতে প্রাণ নিয়ে লুট করবো আমরা আর মাল নিয়ে নেবে অন্যরা। তাহলে আমরা ইমামকে ধোঁকা দিয়ে কেন অর্ধেকের চেয়ে বেশি মালামাল অন্যত্র সরিয়ে রাখবো না?...

'আমার পুরনো বন্ধুদের আমার কথা খুব মনঃপূত হলো। আমরা কাজ শুরু করে দিলাম। কোন কাফেলা লুট করলে আমাদের দু'তিনজন সেখান থেকে সোনা ও টাকা পয়সা সরিয়ে অনেক দূরে চলে যেতো এবং কোথাও লুকিয়ে রাখতো। তারপর আমরা মিলে আমাদের সেই নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে ঐ মালামাল রাখতাম। আজ পর্যন্ত আমরা কেউ পরস্পরকে ধোঁকা দেইনি। তোমাকে সেখাহে নিয়ে যাবো।'

'এসব না হয় মানলাম। কিন্তু তোমার ওপর বিশ্বাস রাখবো কিভাবে? তুমি বাতিনী। কোন বাতিনীর ওপর বিশ্বাস রাখা মানে তার মৃত্যু মেনে নেয়া।'

'আরে ভাই! আমার কোন মাযহাব নেই। কোন আকীদা নেই। আমি তোমাকে বলেছি হাসান ইবনে সবা আমাদেরকে শুধু মদদ দেয় ও আশ্রয় দেয়। শোন, তুমি মুসলমান বলে এ আশায় কোন মন্দ কাজ করতে চাওনা যে, মৃত্যুর পর খোদা তোমাকে বেহেশতে নিয়ে যাবেন। এজন্য সারা জীবন তোমাকে নেক পাক থাকতে হবে। কিন্তু আকাশে যে বেহেশত আছে সে বেহেশতের যদি কোন অস্তিত্বই না থাকে। তুমি কখনো পাপ করোনি এ দাবী তুমি করতে পারবে? না জেনে মানুষ কত পাপ করে। হাসান ইবনে সবা দুনিয়াতেই বেহেশত বানিয়েছেন। আমি সে বেহেশত দেখেছি। কিন্তু কখনো তাতে যাওয়ার ইচ্ছে হয়নি। কারণ আমি নিজেই তো সে বেহেশত বানাতে পারি। আমার খাযানায় যা আছে তা তিন পুরুষ ফুর্তি করলেও শেষ হবে না।'

সুমাইর একদৃষ্টিতে আবু জান্দালের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার চেহারা দেখে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিলো তিনি আবু জান্দালের মুরিদ হয়ে গেছেন।

'সেলজুকি বন্ধু!'–আবু জান্দাল বললো– 'তোমরা কেল্লা জয় করেছো বলে খুশি হয়ো না। হাসান ইবনে সবার জান কুরবান করা ফেদায়েন লশকর আসছে। তোমাদের একজনও বাঁচতে পারবে না। আর এই কেল্লার পাতাল ঘরে যে খাযানা আছে সেটা তো তোমরা পাবে না। সেটা যাবে মারুতে সুলতানের কোষাগারে। আমার ঘরে চলো। এমন যেন না হয় যে, তোমাদের অন্য সিপাহীরা আমার ভাতিজীদের নিয়ে গেলো। তখন তুমি ঠিকই পস্তাবে।'

'ঠিক আছে চলো। রাখো আগে আমার সিপাহীদের সঙ্গে আলাপ করে আসি।'

সুমাইর আবু জান্দালকে সেখানে রেখে তার চার সিপাহীর সঙ্গে কথা বললেন এবং সব কথা খুলে বললেন। সিপাহীরা যখন দেখলো তাদের অফিসারই এ পথের পথিক হয়ে গেছে তাহলে তাদের সে পথে যাওয়া তো দোষের কিছু হবে না।

'সে যে আমাদের ধোঁকা দেবে না এটা আপনি কি করে নিশ্চিত হলেন?'–এক সিপাহী জিজ্ঞেস করলো।

'সে একা আর আমরা পাঁচজন এবং সে নিরস্ত্র। আমার সঙ্গে থাকো। আর এসব গোপন রাখো'–সুমাইর বললেন।

সুমাইর বুরুজ থেকে আবু জান্দালকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন এবং তাকে বললেন, এমন পথে যেন সে তার ঘরে নিয়ে যায় যে পথে কেউ দেখবে না ওদের। আবু জান্দাল কেল্লার চোরা পথে ওদেরকে তার ঘরে নিয়ে গেলো।

ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। কয়েকবার দরজায় ধাক্কা দেয়ার পর ভেতর থেকে কোন জবাব আসলো না। আবু জান্দাল বুঝলো ভয়ে মেয়েরা দরজা খুলছে না। তারপর যখন উঁচু আওয়াজে ওদেরকে ডাকলো তখন দরজা খুললো।

সুমাইর সিপাহীদের বাইরে দাঁড় করিয়ে ভেতরে ঢুকলো। আবু জান্দাল তাকে একটি কামরায় নিয়ে গেলো। তার দুই ভাতিজীকে ডেকে আনলো। সুমাইর আবলাক যখন মেয়ে দুটিকে দেখলো তার মনে হলো সে যেন বেহেশতের হুর দেখছে।

'দেখো মেয়েরা! ইনি মুসলমান ফৌজের কমান্ডার। আমার প্রাণ ভিক্ষা দিয়েছেন এবং তোমাদের দায়িত্ব তার কাঁধে নিয়ে নিয়েছেন' – আবু জান্দাল ভাতিজীদের বললো।

মেয়ে দুটি সুমাইরের গলার সঙ্গে গলা মেশালো এবং দু'জন তার দু'পাশে বসে গেলো, সুমাইর পুরোপুরি সম্মোহিত হয়ে গেলেন।

এ সময় বাইর দরজায় আওয়াজ হলো ও কেউ আওয়াজ দিলো– 'কোথায় আবু জান্দাল! বাইরে আয় বাতিনী ডাকু!' – মেয়ে দুটি ও আবু জান্দাল এক লাফে অন্য কামরায় চলে গেলো। এ সময় দু'জন সিপাহী ভেতরে ঢুকলো। সুমাইরকে দেখে ওরা যেন কেঁপে উঠলো এবং পেছনে হটে গেল কয়েক পা।

'আমি এই ঘরে তল্লাশি চালিয়েছি'– সুমাইর বললো– 'আমার সঙ্গে চারজন সৈনিক আছে। এখানে কোন বাতিনী বা ডাকু নেই। এ লোক ব্যবসায়ী। কয়েকদিন পর চলে যাবে। তোমরা যাও। আমি একটু সান্ত্বনা দিয়ে আসি।

যারা এসেছিলো তারা চলে গেলো।

'এখন বলো আবু জান্দাল! সে জায়গাটা কোথায়?' – সুমাইর জিজ্ঞেস করলেন।

আবু জান্দাল তাকে বললো, সে জায়গা কোথায়? এখান থেকে কত দূর কিভাবে সেখানে পৌঁছতে হবে।

'মেয়ে দুটিও আমাদের সঙ্গে যাবে'– আবু জান্দাল বললো– 'যাবো ঘোড়ায় করে। দুটি অতিরিক্ত ঘোড়াও সঙ্গে নিতে হবে। দুটি ভারি বাক্সও থাকবে।'

'দু'একদিনের মধ্যেই আমাদের বের হয়ে যেতে হবে'– সুমাইর বললেন– আরো দু'তিন দিন বাইরে থেকে লাশ উঠানোর কাজ চলবে। সবার মনোযোগ থাকবে অন্যদিকে। বের হয়ে যাওয়ার এটাই সময়।'

★★★★

মারু শহরে কেল্লা ওসিমকুহের বিজয় খবর শুনতেই সারা শহর আনন্দে নেচে উঠলো। সুমনা ও তার মা মায়মুনা খুশীতে দৌড়ে সুলতান বরকিয়ারকের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো। 'আমি নিজে ওখানে গিয়ে ওদেরকে মোবারকবাদ জানাবো। এতো কোন সাধারণ বিজয় না।' –সুলতান বরকিয়ারক উচ্ছসিত হয়ে বললেন।

'আমি ও আপনার সঙ্গে যাবো সুলতান মুহতারাম!' – সুমনা আবেগে উঠলো– 'আমি হাসান ইবনে সবার অনুসারীদের লাশ ও রক্তাক্ত হাড়গোড় দেখতে চাই।'

সুলতান বরকিয়ারক মুচকি হেসে তাকে অনুমতি দিয়ে দিলেন।

ওদিকে হাসান ইবনে সবা কেল্লা ওসিমকুহের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলো। প্রায়ই সে বলতো কেল্লা ওসিমকুহের অবরোধ সফল হবে না।

ওসিমকুহে বাতিনীদের ওপর সালার আওরিজী ও মুযাম্মিল আফেন্দীর যৌথ হামলার সময় তিন যখমী হয়েও সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ঐ তিন যখমী বাতিনী খুব দ্রুত কেল্লা আলমোতে পৌঁছে হাসান ইবনে সবাকে জানায় সেলজুকি মুসলমানরা ধোঁকা দিয়ে কেল্লা ওসিমকুহ দখল করে নিয়েছে।

'ইয়া শায়খুল জাবাল!'– এক উপদেষ্টা বললো– 'প্রথমেই যদি আমরা অবরোধের ওপর হামলা করে দিতাম আজ আর এ খবর শুনতে হতো না। এখনই আমাদের রওয়ানা হওয়া উচিত। আমরা ঐ কেল্লা আবার উদ্ধার করবো।

'আমি আমার শক্তি ক্ষয় করবো না'– হাসান ইবনে সবা মুচকি হেসে বললো– 'হামলা করার মতো ফৌজই তো নেই আমাদের হাতে। আর আমি এমন ফৌজ বানাবোও না। আমাদের প্রত্যেকেই লড়তে পারে। কিন্তু ফৌজের মতো লড়বো না আমরা। প্রত্যেক ফেদায়েনের কাছে একটি করে খঞ্জর বা ছুরি থাকলেই যথেষ্ট। এর চেয়ে বেশি কিছু না। আমাদের হাতে চৌদ্দটি কেল্লা আছে। এই যথেষ্ট। সেলজুকি সালার কেল্লা মুনাযখানের কথা বলে আমাকে ধোঁকা দিয়েছে। কিন্তু সেদিকে আমি মনোযোগ দেইনি। আর মনোযোগ দেবোওনা কোনদিন।'

তাহলে কি আমরা এই ক্ষতি মেনে নেবো ইয়া ইমাম!'–উপদেষ্টা জিজ্ঞেস করলো।

'এটা জরুরি নয় যে, এক কেল্লার বদলে আরেক কেল্লা নিতে হবে আমাদের। সেলজুকিদের কাছ থেকে এর চড়া মূল্য উসুল করে নেবো। এখন আমি যা বলবো তা যেন এখন থেকেই পালন করা হয়, এখন আমাদের লুটেরা দল রায় ও শাহদর যাওয়ার প্রধান রাস্তাগুলোতে প্রেরণ করো। আর ওসিমকুহের দাম মুসলিম কাফেলাগুলো থেকে তুলে নাও। ঐ শহরের বড় বড় আমীর জায়গীরদারদের বাড়িতে ডাকাতি করতে হলেও করো মুসলমানদের হত্যাকাণ্ড আরো তীব্র করে তোলো।'

★★★★

সুমাইর আবলাক আবু জান্দাল তার দুই ভাতিজী ও চার সিপাহী নিয়ে এক সন্ধ্যায় ওসিমকুহ থেকে বের হয়ে গেলেন।

'সুমাইর আবলাক!'– পথে আবু জান্দাল বললো– 'আমার ব্যাপারে যদি তোমার সন্দেহ থাকে তাহলে আমার তলোয়ার তোমার কাছে রেখে দাও। এটা মনে গেঁথে নাও আমরা এক মনযিলের মুসাফির, আমাদের পরিণাম ভালো হোক মন্দ হোক তা একজনের জন্য নয় আমাদের সবার জন্যই হবে।

'না আমার ভাই। আমরা মুসলমান, পরস্পরের প্রতি যদি আমাদের মনে সামান্যতম সংশয় থাকে আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছতে পারবো না। আর পৌঁছে গেলেও আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না।

'আরেকটা কথা সুমাইর! যেভাবে তুমি তোমার অন্তর থেকে সবকিছু বের করে দিয়েছো সেভাবে এটাও বের করে দাও যে, তুমি মুসলমান। তোমাকে বলেছি আমি আমার যে ধর্ম বিশ্বাসই থাক না কেন আমি পরিস্থিতির শিকার হয়ে হাসান ইবনে সবার দলে ভিড়েছিলাম। এখন আমি তাকে ধোঁকা দিতে চাচ্ছি। তাই তুমিও তোমার ধর্মকে মন থেকে মুছে ফেলো।'

'আবু জান্দাল! মন থেকে ধর্মবিশ্বাস মুছে ফেলাটা কঠিন ব্যাপার। এর চেয়ে ভালো আমরা পরস্পরকে মুসলমান হিসেবে জানবো।

'নিজেকে নিজে ধোঁকা দিয়ো না সুমাইর, তুমি মনে হয় এখনো টের পাওনি, তুমি এখন নামমাত্র মুসলমান রয়ে গেছো। মন যখন সম্পদ আর সুন্দরী মেয়েদের মুঠোবন্দি হয়ে যায় তখন মনে ধর্মবিশ্বাস থাকে একটি যখমের দাগের মতো। ওসিমকুহ থেকে বের হওয়ার আগে তুমি যে মুসলমান ছিলে এখন আর সেই মুসলমান নেই তুমি। আগেও বলেছি তোমাকে হাসান ইবনে সবার জান্নাত ক্ষণস্থায়ী। সে মরে গেলে তার জান্নাতও মরে যাবে। আর যে জান্নাতের ওয়াদা খোদা দিয়েছেন সেটা আসমানে। কে জানে সেটা আছে কি নেই, জান্নাত গড়তে হয় প্রত্যেকের নিজ হাতে।'

রাতে ওরা বিশ্রাম নিলো না পথে। টিলা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে তারা পথ চলতে লাগলো। ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটে উঠলো। সকাল হতেই ওদের চোখ বিস্ময়ে থ হয়ে গেলো। এত সুন্দর প্রকৃতির সজ্জা, চারধার সবুজের অপার সৌন্দর্যে হাসছে। ছোট ছোট পাহাড়, টিলা, জংলী ঝোপ সবখানেই অপার্থিবতার ছোঁয়া। কোন এক অদৃশ্য শক্তির মমতা মাখানো হাত পুরো প্রকৃতিকে যেন আগলে রেখেছে।

তবে এলাকার মেঝে পাথুরে এবড়ো থেবড়ো। আবু জান্দাল সমতল একটি জায়গা খুঁজে সেখানে তাঁবু ফেলে। হঠাৎ তারা দূর থেকে ফনা তোলা কালো একটি সাপকে তেড়ে আসতে দেখলো। কিন্তু এক সিপাহীর তীর সাপকে আর এগুতে দিলো না। সিপাহীর তীর সাপের ফনাসুদ্ধ মাথা চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলো। কি আশ্চর্য! সাপ মারার সঙ্গে সঙ্গে আচমকা সবকিছু কাঁপিয়ে ফাটিয়ে শুরু হলো পাহাড়ি তুফান– ঝড়। সেই

সঙ্গে শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি। ওরা মনে করলো সাপের প্রেতাত্মা হয়ে এসব ঝড় বৃষ্টি এসেছে। একে তো ভয়ের কাঁপন তারপর অনবরত বৃষ্টির পানিতে ভিজে ওদের অবস্থা হলো উত্তাল ঢেউয়ে লুটোপুটি খাওয়া খড়কুটার মতো। ঘন্টা দেড়েক পর থামলো এই ঝড়-বৃষ্টি।

কাকভেজা হয়েই ওরা পথে ঘোড়া নামালো। এবার ওদের পথ শুরু হলো এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ের মধ্য দিয়ে। কোথাও পাহাড়ের ঢাল বেয়ে কোথাও ঢালবিহীন খাড়া পাহাড়ের কার্নিশ বেয়ে চার পাঁচশ ফুট উঁচু কিনারা দিয়ে আবু জান্দাল ওদেরকে নিয়ে গেলো। তারপর ওরা বড় এক পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছলো। চূড়া থেকে যখন ওরা চারদিকে তাকালো ওদের মনে হলো বেহেশতের কয়েকটা টুকরো যেন এখানে উদাস হয়ে পড়ে আছে।

'সুবহানাল্লাহ!' – সুমাইর তার অজান্তেই বলে উঠলেন– 'এতো বেহেশতের বাগান থেকে খসে পড়া এক টুকরো। খোদা তার অপার সৌন্দর্যের এক বিশাল সম্ভার এই এলাকায় ফেলে রেখেছেন।'

'খোদার দেয়া এই সৌন্দর্য কখনো কখনো ভয়ানক হয়ে উঠে সুমাইর ভাই!'– আবু জান্দাল বললো– 'এখান থেকে দেখতে তো বেহেশতই মনে হয়। কয়েক মাইল জুড়ে রয়েছে এর বিস্তৃতি। কিন্তু এই বেহেশতের মধ্যে বাস করে মানুষখেকো হিংস্র প্রাণী– সিংহ বাঘ ইত্যাদি। যেগুলো দশ বার জনের দলের ওপরও হামলা করে বসে। তাই বর্শা তলোয়ার সবসময় প্রস্তুত রাখতে হবে। দূরদূরান্ত পর্যন্ত কোন আবাদী নেই এখানে। ভয়ে কোন শিকারীও এ দিকে আসে না। এজন্য দিন দিন বাঘের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।'

ওরা তারপর আস্তে আস্তে পাহাড় থেকে নেমে পড়লো। নিচে চার দিকে ছপছপে ভিজে মাটি। এ এলাকা আবু জান্দালের নখদর্পণে। সে ওদেরকে নিয়ে পাহাড় ঘেরা জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়লো এবং একটি গুহা আবিষ্কার করলো।

'ঐ যে দেখছো গুহাটা?'– আবু জান্দাল সঙ্গীদের বললো– ওখানে বাঘ থাকে। এখন ওখানে একাধিক বাঘ থাকাও বিচিত্র নয়।'

'বাঘ কি আমাদের এতজনের ওপর হামলা করে বসবে?'–সুমাইর জিজ্ঞেস করলেন।

'ক্ষুধার্ত হলে। বাঘের যদি পেট ভরা থাকে তাহলে ওর সামনে দিয়ে গেলেও তোমাকে কিছু বলবে না।

বলতে বলতে ওদের পেছন থেকে হুংকার শোনা গেলো। একটি ঘোড়া ভয়ে চিহিচিহি করে উঠলো। সবাই একটু থেমে পেছন ফিরতেই বড়ই ভয়ংকর দৃশ্যের সম্মুখীন হলো। বিরাট একটি বাঘ তাদের তিনটি অতিরিক্ত ঘোড়ার একটির ওপর হামলা করে বসেছে। ঘোড়ার গলা বাঘের মুখে। সুমাইর আবলাক খুব দ্রুত তার ঘোড়া ঘুড়িয়ে এক সিপাহীর হাত থেকে বর্শা নিয়ে বাঘের পাশ দিয়ে গেলো। যাওয়ার সময় পুরো শক্তি দিয়ে একটি বাঘের গায়ে ছুঁড়ে মারলো। বর্শা বাঘের পিঠে গিয়ে বিদ্ধ হলো। ঘোড়ার গলা থেকে বাঘের মুখ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো এবং বাঘ পড়ে গেলো। সুমাইর জানেন আহত বাঘ কতটা ভয়ংকর। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বর্শাটি বাঘের পিঠ থেকে

খুলে আরো কয়েকবার তার ঘাড়ে পিঠে ও পেটে আঘাত করলেন। বাঘও কয়েকবার পাল্টা হামলার চেষ্টা করে। কিন্তু ততক্ষণে সিপাহীরা বাঘের ওপর একের পর এক আঘাত করে তাকে চিরদিনের জন্য মাটিতে শুইয়ে দেয়।

রাতের জন্য ওরা ওখানেই থেকে যাওয়ার জন্য বাঘের গুহাকে আশ্রয় হিসেবে বেছে নেয়। অন্যান্য হিংস্র প্রাণী যাতে এ দিকে রুখে না যায় এজন্য গুহার সামনে বড় করে মশাল জ্বালিয়ে দেয়। 'একটা কথা বলো তো আবু জান্দাল!'– সুমাইর জিজ্ঞেস করলেন– তোমাদের এ খাজানা এমন জায়গায় রাখলে যেন যেখানে পৌঁছতে বার বার মৃত্যুর মুখে পড়তে হয়।'

'খাজানা রাখার জন্য এমন জায়গাই নিরাপদ। এত সোনা রুপা, টাকা পয়সা আবাদীর কাছে রাখা হলে ডাকাতরা সেটা টের পেয়ে যায়। তখন খাজানার মালিক হয়ে যায় দু'চারদিনের মেহমান।'

রাতটা সেখানে কাটিয়ে পরদিন সকালে ওরা আবার পথ চলা শুরু করলো। সন্ধ্যার দিকে ওদের একটি খরস্রোতা নদী অতিক্রম করতে হলো। নদী পার হয়ে ওরা প্রবেশ করলো এক ঘন জঙ্গলে। 'সুমাইর ভাই'– আবু জান্দাল বললো– 'এসব জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ বানিয়ে কাফেলা লুট করা মালামাল নিয়ে গভীর জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার এত বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, বাতাস থেকেও আমি বিপদের গন্ধ শুঁকে নিতে পারি। অনেক বিপদের মধ্য দিয়ে গিয়েছি। কিন্তু এবারের মতো বিপদ হয়নি কখনো। কোন সাপের প্রেতাত্মা ঝড় তুফান হয়ে পথ আটকায়নি। না কোন বাঘ হামলা করেছে। ঐ নদীটিও এর আগে কখনো খর স্রোতা হয়নি।'

'তাহলে আমাদের কি করতে হবে? আমরা কি ফিরে যাবো, না এই বিপদের মধ্যেই পথ চলবো?'

'আগেই তোমাদের বলেছি, আমি পেশাদার ডাকাত, পেশাদার ডাকাতদের অনেক ধরনের কুসংস্কার বিশ্বাস থাকে। আমরা যখন বড় ধরনের বিপদে পড়ি তখন কোন কুমারী মেয়েকে বলি দেই। কিন্তু এখানে এমন বলি দেয়া যাবে না, এরা দুজন যদি আমার মরা ভাইয়ের ছেলে না হতো ওদের একজনকে আমি বলি দিতাম। এর চেয়ে ভালো আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে প্রয়োজন হলে নিজেদেরকেই বলি দেবো... এজন্য সব সময় সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে আমাদের। কখন কি হয় বলা যায় না। এই জঙ্গলের সৌন্দর্যে হারিয়ে যেয়োনা। এর ভেতরের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক থাকো। রাতে ঘুমুবে এক চোখ খোলা রেখে। রাতে আমাকে নির্ভরযোগ্য মনে করো না। তোমার জানা নেই রাতে আমি হাশীষ পান করে ঘুমাই। তখন আমার কোন হুশ জ্ঞান থাকে না।

কাফেলা সে রাতে খোলা জায়গায় কয়েকটি গাছের নিচে ছাউনি ফেললো। মাঝরাতে সুমাইরকে দুই মেয়ের একজন এসে জাগালো। সুমাইর হড়বড় করে উঠে বসলো। মেয়ে ফিসফিস করে বললো ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমার সঙ্গে আসুন। মেয়েটি তাকে দূরের এক গাছ তলায় নিয়ে গেলো। সেখানে তার আরেক বোন গাছের নিচে একটু ডালে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। সুমাইরকে দু'বোন সেখানে বসিয়ে তার দু'পাশে দুজন বসলো। তারপর দুজনের দখলে চলে গেছে তার হাত দুটি।

'আমাদের চাচাকে ভয় পেয়ো না'– একটি মেয়ে বললো– 'তিনি হাশীষ পান করে ঘুমান। সকালের আগে উঠতে পারবেন না। আমরা শুধু তোমাকে বলতে চাই, বাকী জীবন আমরা তোমার সঙ্গে থাকবো। আমাদের দাসী করে রাখলেও কোন আপত্তি নেই। চাচাকে আমরা দায়িত্ব থেকে মুক্ত করতে চাই। আসলে তুমি আমাদেরকে পাগল করে দিয়েছো।

'তোমরা হয়তো জানো না তোমাদের জন্য আমি তোমাদের চাচার সাথে বের হয়েছি, আর না হয় এমন লোকের ওপর নির্ভর করা যায় না'– সুমাইর বললো।

'কিন্তু একটাই ভয় হয়, তুমি যদি খাজানা পেয়ে যাও তাহলে না আবার আমাদের ভুলে যাও'– দ্বিতীয় মেয়েটি বললো।

'এমন কখনো হবে না। আমি ভয় পাই, না-জানি তোমরা আমাকে ধোঁকা দাও।'

মেয়ে দুটি সুমাইরের সঙ্গে এমন অঙ্গভঙ্গি শুরু করে দিলো যেন দুজন নিজেদেরকে সপে দিয়েছে সুমাইরের কাছে। এক স্ত্রী ও তিন সন্তানের জনক চল্লিশ বছরের সুমাইর এই দুই মেয়ের উন্মত্তকর যৌবনে প্রায় যাদুগ্রস্ত হয়ে পড়লো। অনেক্ষণ পর তারা আবার শুতে চললো।

একটু বেলা করে কাফেলার সবাই উঠলো। ঝটপট সবকিছু গুছিয়ে ঘোড়ায় জিন বেঁধে চলতে শুরু করলো। তখন তাদের পথঘাট আশপাশের আবহ ক্রমেই শুষ্ক হতে লাগলো। আশপাশের লম্বা লম্বা গাছগুলো কেমন পত্রশূন্য নির্বাক মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে। এভাবে তিন চার মাইল যাওয়ার পর তারা পড়লো খোলা মরুভূমিতে। একটু পর পর বড় বড় বালির ঢিবি দিয়ে কুদরত মরুতে এমন গোলক ধাঁধা তৈরি করেছে যে, পথচারীদের অধিকাংশই হারিয়ে যায় এখানে পথ চলতে গিয়ে।

'এটাই মরুভূমির আসল ভয়'– আবু জান্দাল তার সঙ্গীদের বললো– 'অজ্ঞাত মুনাফিকরা এসব ঢিবির জগতে ঢুকে মনে করে এর থেকে সহজেই বেরিয়ে পড়বে কিন্তু এর ভিতরের গোলক ধাঁধায় তারা ঘুরতে শুরু করে। আর ভাবে অনেক পথ এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু দিন শেষে দেখে সেই আগের জায়গাতেই রয়েছে সে। এভাবে মরুর উত্তপ্ত বালিয়াড়ি কয়েকদিনেই তার দেহের সবকিছু শুষে নেয়– এ কারণেই আমি এদিকে এলে এই গোলকধাঁধার ফাঁদ থেকে অনেক দূরে থাকি।'

আবু জান্দাল ওদেরকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। উঁচু উঁচু বালির ঢিবির টিলাগুলো দূর থেকে তো মনে হয় পাথুরে দেয়াল। কিন্তু ওগুলোতে চড়তে গেলে তা দেবে যায় আর চূর চূর করে বালি খসে পড়তে থাকে। আস্তে আস্তে সূর্য ওদের মাথার ওপর উঠে এলো। মরুর গনগনে উত্তাপ অল্পক্ষণের মধ্যেই ওদের মশকগুলো শুষ্ক করে দিলো। তৃষ্ণায় ওদের বুকের ছাতি ফেটে যাবার উপক্রম হলো।

সূর্যাস্তের সময় নজরে পড়লো দূরের এক খেজুর উদ্যান। ওখানে গিয়ে পানির ছোট একটা জলাশয় পাওয়া গেলো। ওরা তৃপ্তিভরে পানি পান করলো এবং কিছু খেয়ে অল্প সময় বিশ্রাম করলো। তারপর আবার যাত্রা শুরু করলো। কয়েক মাইল যাওয়ার পর দূরে সবুজের পটভূমিকা দেখা যেতে লাগলো। হঠাৎ আবু জান্দাল তীক্ষ্ণ চোখে

মাটির দিকে তাকিয়ে ঘোড়া থামিয়ে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে সবাই ঘোড়া থামিয়ে ফেললো। সে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো এবং মাটি পরীক্ষা করতে লাগলো। সুমাইরও ঘোড়া থেকে নেমে এলো। 'এই যে দেখো সুমাইর! একি ঘোড়ার পায়ের দাগ নয়!'– আবু জান্দাল সুমাইরকে জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ নিঃসন্দেহে এটা ধোড়ার পায়ের চিহ্ন এবং এটা মাত্র দু'একদিন আগের – সুমাইর বললো।

আবু জান্দাল ও সুমাইর ঘোড়ায় চড়ে পদচিহ্ন অনুসরণ করে একটু গিয়ে বললো, 'সাধারণ কেউ এখান দিয়ে যায় না। কোন ফৌজও এদিকে আসবে না। সুলতান বাদশাহ ও হাসান ইবনে সবার এলাকা থেকে অনেক দূরের দুনিয়া এটা, আমি বলি এ এলাকায় সবসময় খোদার কহর গজব পড়ে। আমার মতো ডাকাতরাই এদিক দিয়ে যাতায়াত করে। এখন আরো হুশিয়ার হয়ে চলতে হবে।

আরেকটু এগিয়ে গিয়ে এক টিলা ঘেরা এলাকায় রাতের জন্য ছাউনি ফেললো। সতর্কতার জন্য চার সিপাহী সারারাত পালা করে পাহারা দিলো। ভোরের আলো ফুটতে সর্বশেষ সিপাহী এক টিলার ওপর থেকে নিচে নামতে যাবে ওমনি ওদের ছাউনির দিকে তার চোখ পড়লো। যে দৃশ্য দেখলো তাতে সে হতভম্ব হয়ে গেলো। কালো আলখেল্লা ও কালো মুখোশ পরা আটজন সশস্ত্র লোক ওর কাফেলার লোকদের তলোয়ারের মুখে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। দু'জন ধরে রেখেছে তাদের দুই মেয়েকে। মেয়ে দুটি ওদের হাতে পড়ে ছটফট করতে লাগলো।

প্রহরী সিপাহী তার ধনুকে তীর ভরলো। দূরত্ব মাত্র বিশ বাইশ গজ মাত্র। সে একজনকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়লো। লোকটির ঘাড়ে গিয়ে বিঁধলো। লোকটি একটি মেয়ে ধরে রেখেছিলো, লোকটি সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটিকে ছেড়ে লুটিয়ে পড়লো। সিপাহী বড় দ্রুত ধনুকে তীর ভরে দ্বিতীয় মেয়েটিকে যে ধরে রেখেছে তাকে তীর মারলো। তার নিশানা লক্ষ্যভেদ করলো এবং সেও উপুড় হয়ে পড়ে গেলো। সিপাহী এভাবে আরো দু'জনকে কাবু করলো। ডাকাতদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেলো। তীর কোত্থেকে আসছে সেটা বুঝে উঠার সময় পেলো না তারা। এর মধ্যে কাফেলার লোকেরাও তলোয়ার উঠিয়ে নিয়েছে। এর মধ্যে সেই সিপাহী পঞ্চমজনকেও ধরাশায়ী করে ফেললো। বাকি তিন ডাকাত যখন দেখলো তখন তারা কাফেলার লোকদের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ছে, দৌড়ে নিজেদের ঘোড়ায় চড়ে উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটালো। সুমাইর ও আবু জান্দাল চেষ্টা করেও ওদের ধরতে পারলো না।

'বন্ধুরা!– আবু জান্দাল বললো– 'আমরা আমাদের গন্তব্যের কাছে পৌঁছে গেছি। মনে হয় কেউ ওখানে পৌঁছে গেছে। কি হবে এখন জানি না। তবে ভয়েরও প্রয়োজন নেই। তবে পূর্ণ সতর্ক থাকতে হবে। হাতিয়ার সব সময় প্রস্তুত রাখতে হবে। আর মেয়েরা শোন! তোমরা কোন মুসলমান শাহজাদী বা হেরমের মেয়ে নয়। তোমাদের বাবা ছিলেন একজন বীর পুরুষ। তোমরা তীরন্দাজীও জানো। তাই বিপদে পড়লে তোমাদেরও পুরুষদের মতো লড়তে হবে।

'আমাদেরকে ওরা ঘুমের মধ্যে ধরেছে'– একটি মেয়ে বললো– 'আমরা যদি সজাগ থাকতাম তাহলে দেখতেন আমরা কি করতে পারি।'

কাফেলা তখনই কোচ করলো। সূর্যাস্তের পূর্বে ওরা পৌঁছলো তৃণশূন্যহীন এক ধূসর পাহাড়ি এলাকায়। যেন কোথাও কোন প্রাণের চিহ্ন নেই। এটাই আবু জান্দালের গন্তব্য। এ যেন এক ভুতুড়ে এলাকা। ওদের পা যখন পাথরের সঙ্গে ঘষ্টাতে লাগলো তখন কেমন যেন হালকা হালকা চিৎকার শোনা যেতে লাগলো। মনে হচ্ছিলো পাহাড়গুলোর ভেতর থেকে বিপদগ্রস্ত কোন শিশু বা মহিলার চিৎকার ভেসে আসছে। সবার মধ্যেই ভীতি ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু আবু জান্দালের মুখে দেখা গেল প্রশান্তির ছোঁয়া।

'এখন একটু হুশিয়ার থাকতে হবে। আশ পাশ ভালো করে দেখে ভেতরে ঢোকা উচিত। কিন্তু এত সময় নেই। রাত হয়ে গেলে মশাল দিয়ে ওকাজ করা যাবে না। আর সব কিছুর মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে'– আবু জান্দাল বললো।'

'কথা পরিষ্কার করে বলোতো আবু জান্দাল! তুমি যেভাবে বলবে সেভাবে আমি আমার সিপাহীদের তৈরি থাকতে বলবো– সুমাইর বললো।

'বিপদ আকাশ থেকে নেমে আসবে না। মানুষই বিপদ হয়ে আসবে। ঐ ডাকাতদের যে দু'তিনজন পালিয়েছিলো ওরাও এখানে আসতে পারে।

'আসতে দাও......দাও আসতে......আমরা এখন ঘুমন্ত নই। চলো সামনে।'

আবু জান্দাল সবাইকে নিয়ে পাহাড়ের গোলক ধাঁধায় ঢুকে পড়লো। সবাই তার পেছন পেছন চলছে। এখন তাদের কাছে ঐ ডাকাতদের ঘোড়াসহ অতিরিক্ত ঘোড়া সাতটি। আবু জান্দাল কখনো ডানে মোড় ঘুরছে কখনো বায়ে মোড় ঘুরছে। সে যে কতবার মোড় ঘুরেছে এটা কেউ বলতে পারবে না। তারা কোত্থেকে এসেছে কোথায় যাচ্ছে সেটাও ওরা ভুলে গেলো। আবু জান্দাল অবশেষে ওদেরকে দুই পাহাড়ের এমন স্থানে নিয়ে এলো যেখানে সামনে সমতল কোন পথ নেই। পথ সিঁড়ির মতো নিচের দিকে চলে গেছে। সবাই নিচের দিকে চলে গেলো। আট দশ গজ নিচে গিয়ে দেখা গেলো পাতাল ঘরের মতো বিশাল এক গুহা। ছাদ দেয়াল মেঝে সব পাথুরি এবং চারদিক আশ্চর্য ধরনের আকিঝুকি দ্বারা সাজানো। ভেতরে গিয়ে মশাল জ্বালাতেই অসংখ্য বাদুর ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে চলে গেলো।

মশাল জ্বালানোর পর দেখা গেলো সেখানে লোহার ডানাওয়ালা কাঠের তিনটি বাক্স পড়ে আছে। 'এই নাও সুমাইর ভাই! এই আমার বাবা ও আমার কামাই করা খাজানা। এই খাজানা শুধু আমার নয় আমাদের সবার। মশালগুলো মেয়েদের হাতে দিয়ে সবাই মিলে চলো বাক্সগুলো উঠাই'– আবু জান্দাল বললো।

সবাই যেই বাক্সগুলোয় হাত দিলো তখনই গুহার ওপর থেকে কেউ ধমকে উঠলো– বাক্সগুলোর সামনে থেকে সরে যাও।

চমকে উঠে সবাই পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলো, কালো পাগড়ি ও মুখোশ পরা এক লোক তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে। সবাই যার যার তলোয়ার কোষমুক্ত করে দাঁড়ালো। দেখতে দেখতে একই পোষাকে তলোয়ার হাতে দশ বারজন লোক গুহায় এসে দাঁড়ালো।

'বন্ধুরা! সবাই পেছনে সরে দাঁড়াও। তোমরা জীবিত ঐ বাক্সগুলোর কাছে পৌঁছতে পারবে না' আবু জান্দাল এগিয়ে এসে বললো।

'আবু জান্দাল!'– তাদের একজন বললো– 'তুমিও আমাদের একজন। আমরা চাই না তুমি আমাদের হাতে মারা পড়ো। বাক্সগুলো ও মেয়ে দুটি রেখে এখান থেকে কেটে পড়ো এবং নিজের ও নিজেদের সঙ্গীদের প্রাণে বাঁচাও।'

'উহ্ তোমরা! আমি তো ভেবেছি তোমরা সবাই মারা গেছো। শোন! তোমরাও আমাদের হাতে মরো না আমরাও তোমাদের হাতে মরবো না। চলো বাক্সের ভেতর যা আছে সব আমরা ভাগ ভাটোয়ারা করে নিই।'

'না, যার কাছে শক্তি আছে সেই মালের মালিক হবে। তোমাদেরকে আমি কথা বলার সুযোগ দেবো না। আমরা সব খাজানা নিয়ে যেতে এসেছি।'

আবু জান্দাল সুমাইরকে ইংগিত করতেই তারা দু'জন, চার সিপাহী ও মেয়ে দুটিসহ্ সবাই এক সঙ্গে ডাকাতদের ওপর হামলা করলো। ডাকাতরাও প্রস্তুত ছিলো। তারাও পাল্টা হামলা চালালো।

উভয়পক্ষের মশালগুলো মাটিতে পড়ে জ্বলতে লাগলো। আর পুরো গুহা জুড়ে আহত নিহতদের আওয়াজে ভারী হয়ে উঠতে লাগলো। কয়েকজন যখমী গিয়ে পড়লো মশালগুলোর ওপরে। তারা উঠে আগুন নেভানোর জন্য এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে শুরু করলো। কিন্তু জায়গা সংকীর্ণ হওয়াতে আগুন ওদের কাপড় থেকে অন্যদের কাপড়েও ছড়িয়ে পড়লো। এরপর গুহার মধ্যে কিছুক্ষণ অগ্নিদগ্ধ কতগুলো মূর্তি ছুটাছুটি করলো এবং মূর্তিগুলো ধীরে ধীরে জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো মাটিতে ছিটকে পড়লো।

★★★★

গুহার অগ্নিকুণ্ড থেকে একজনই জীবিত বের হতে পারলো। সে হলো আবু জান্দালের বড় ভাতিজী পঁচিশ বছরের শাফিয়া। সে তার নিজ চোখে চাচাকে বড় মন্দভাবে যখমী হয়ে মরতে দেখেছে। ছোট বোনকে দুই ডাকাত ধর্ষণ করতে গিয়ে প্রথমে নিজেরা লড়াই করে মরেছে তারপর তার বোনকে তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করেছে।

শাফিয়া গুহা থেকে বের হয়েই ছুটতে শুরু করে। কোন পথ দিয়ে কিভাবে এখানে এসেছিলো তার কিছু মনে নেই ওর। কখনো ডানে কখনো বামে মোড় ঘুরতে ঘুরতে সে দৌড়াতে লাগলো। এক জায়গায় এসে দেখলো ত্রিমুখী একটি রাস্তা। সে আকাশের দিকে হাত তুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললো, "হে আল্লাহ! তুমিই তো বাঁচিয়েছো আমাকে। তাই তুমিই আমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও। আমার চাচা বাতিনী ইবলিসের পূজারী ছিলো, তার শাস্তি আমাকে দিয়ো না। যে আজ পর্যন্ত সতীত্বের গায়ে দাগ লাগাতে দেয়নি পাপিষ্ঠ চাচার ভাতিজী নিজেকে পাপ থেকে পবিত্র রেখেছে।.....ইয়া আল্লাহ! .....ইয়া আল্লাহ!' নিস্তব্ধ কালো রাতে তার চিৎকার হো হো করে ইথারে বিথারে ছড়িয়ে পড়লো।

আল্লাহ আল্লাহ করতে করতে সে আবার চলতে শুরু করলো। হঠাৎ তার কানে কয়েকটি ঘোড়ার চিহি চিহি শব্দ এলো। শব্দের উৎস লক্ষ্য করে সে হাঁটতে লাগলো,

কুদরতের কি কারিশমা এক সময় সে গোলক ধাঁধা থেকে বেরিয়ে গেলো। বেরিয়ে তার চোখ পড়লো অনেকগুলো ঘোড়ার ওপর। গোলক ধাঁধায় ঢোকার আগে ওরা এগুলো এখানে রেখে গিয়েছিলো, ঐ ডাকাতরাও তাদের ঘোড়া এখানে রেখে যায়।

সে তাগড়া দুটি ঘোড়া নিলো। অন্য ঘোড়া থেকে খাদ্যের থলি ও পানির মশকগুলোও খুলে নিলো। তারপর একটি ঘোড়ার ওপর চড়ে আরেকটি ঘোড়া তার লাগামের জন্য বেঁধে নিলো। আগ থেকেই তার সঙ্গে একটি তলোয়ার ও একটি খঞ্জর ছিলো।

কোন দিক থেকে কোন রাস্তা ধরে এখানে এসেছিলো কিছুই মনে নেই শাফিয়ার। অনেক ভেবেচিন্তে একদিকে সে ঘোড়া ছুটালো। ভয় আর অসহায়ত্ব তাকে তীক্ষ্ণ সতর্ক রাখলো সারা রাত। সে অনুভব করলো, ক্রমে ক্রমে সে বৃক্ষলতাহীন মরুতে ঢুকে পড়ছে।

সারা রাত সে পথ চললো, সকালেও সে থামলো না। ক্লান্তিতে তার দেহের প্রতিটি অংশ ঝরে পড়তে চাইছে। কিন্তু তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মন তাকে থামতে দিলো না। সূর্য যখন মাথার ওপর চলে এলো সুবিধাজনক এক জায়গায় ঘোড়া থেকে নেমে কিছু খেয়ে নিলো। ঘোড়াকেও পানি পান করালো। এরপর আবার চলা শুরু করলো। সে বুঝতে পারছিলো কাফেলার সঙ্গে এ পথে সে আসেনি। সে ভুল পথে যাচ্ছে। চারদিকে শুধু বালি আর বালি। যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই বালির ধূ ধূ আস্তরণ। তার চিন্তা করার ক্ষমতাও অনেক আগে লোপ পেয়েছে।

তবুও শাফিয়া আল্লাহকে স্মরণ করে তার পথ চলা অব্যাহত রাখলো। সূর্যাস্তের সময় মরুর একদিকে টিলার সারি দেখতে পেলো সে। টিলার সারিতে ঢোকার পর হঠাৎ তার ঘোড়া নিজেই নিজের গতি বাড়িয়ে দিলো। শাফিয়া লক্ষ্য করলো এখন মাঝে মাঝে টিলার গায়ে ছোট ছোট চারাগাছ উঁকি ঝুকি মারছে। সে বুঝলো, ঘোড়া সম্ভবত পানির গন্ধ পেয়েছে। তাই লাগাম ঢিল করে দিলো। ঘোড়া নিজেই আঁকাবাঁকা পথ ধরে ছুটলো। তারপর ছোট একটি জলাশয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ঘোড়া। এর আশপাশে রয়েছে ছাড়া ছাড়া সবুজ ঝাড়। ঘোড়া অনেক সময় ধরে পানি পান করলো। শাফিয়াও খেয়ে নিলো পেট ভরে। তারপর পানি থেকে বেশ খানিক দূরে ঘোড়া নিয়ে একখানে শুয়ে পড়লো। কারণ এ ধরনের জলাশয়ে রাতে মরুর হিংস্র প্রাণীরা পানি পান করতে আসে। তাই সে অনেকটা দূরে গিয়ে শোয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আর শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ ঘুমে জড়িয়ে এলো।

ভোরের আলো ফুটতেই তার চোখ খুলে গেলো। উঠে দেখলো ঘোড়াগুলো গায়েব। তার বুক ধড়ফড় করে উঠলো। দৌড়ে পানির কাছে গিয়ে দেখলো ওখানে ঘোড়াগুলো ঝাড় পাতা খাচ্ছে। শান্ত হয়ে নিজেও নাস্তা করে নিলো। তারপর এক ঘোড়ার লাগামের সঙ্গে আরেক ঘোড়া বেঁধে ঘোড়ায় চড়ে টিলার সারি থেকে এক দিক দিয়ে বের হয়ে এলো। এবার উদিত সূর্যের পূর্ণ অবয়বটা তার চোখে পড়লো। দিগন্ত প্রদীপ্ত করে সূর্য সগর্বে মাথা তুলছে। সূর্যোদয়ের এ অভাবনীয় দৃশ্য তার ভেতর যেন এক অপার্থিব আলোড়ন তুললো! আকাশপানে হাত তুলে সে বলতে লাগলো,

রাতের আঁধারকে সরিয়ে আলোকোজ্জ্বল করা সূর্যোদয়ের মালিক হে আল্লাহ! আমার জীবনকে এত অন্ধকার করে তোলনা। আমি যে আঁধার দেখছি তা তোমার নূরের শুধু একটি ঝলক দিয়ে দূর করে দাও। আমার প্রাণ গেলেও যেন আমার আবরু হেফাজতে থাকে।'

দু'আ দ্বারা তার আত্মিক প্রশান্তি ফিরে এলো। ভঙ্গুর মনোবল আবার ফিরে এলো। সে অনুভব করলো অদৃশ্য কোন হাত এখন থেকে তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। সে এবার দিক বদল করে ঘোড়া ছুটালো। দ্বিপ্রহরের সময় মরু অঞ্চল অতিক্রম করে শাফিয়া সবুজ বনভূমিতে প্রবেশ করলো। সন্ধ্যার দিকে সে ঘন বন-জঙ্গলে ঢুকলো। এখন আর ঘোড়ার অভুক্ত থাকার ভয় নেই। তবে একজন রূপবতী মেয়ের জন্য এমন ঘন জঙ্গলে ভয়ের অনেক কিছুই আছে। আড়াল মতো একটা জায়গা বেছে নিয়ে সে ঘোড়া থেকে নেমে খাবারের থলে খুলে বসলো। ঘোড়াগুলোও ছেড়ে দিলো। খাওয়ার পর একটু ঘুমিয়েও নিলো সে। ঘণ্টা দেড়েক ঘুমিয়ে আবার রওয়ানা করলো। অন্ধকার নামা পর্যন্ত সে দুটি মরা নদী পার হলো। জংলী ও হিংস্র প্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে রাতে জঙ্গলে কোথাও থাকার সাহস পাচ্ছিলো না। কারণ এখন জঙ্গলেই কাফেলার সঙ্গে যাওয়ার সময় প্রথমে সাপ পরে বাঘ দ্বারা আক্রান্ত হয় তারা। তবুও আল্লাহ ভরসা করে একটি টিলার নিচে পাশাপাশি দুটি গাছের সঙ্গে ঘোড়া দুটি বেঁধে নিজের তলোয়ার কোষমুক্ত করে একখানে শুয়ে পড়লো।

রাতে একবার শাফিয়া ঘোড়ার আওয়াজে ধড়ফড় করে উঠে দেখলো চার পাঁচটি চিতাবাঘ একটি হরিণকে দৌড়িয়ে ধরে চিড়ে ফেড়ে খাচ্ছে। হরিণ খাওয়া শেষ হলে ওগুলো শান্তভাবে চলে গেলো। শাফিয়া প্রথমে ভয় পেলেও পরে ভয় কেটে গেলো। তলোয়ার ও খঞ্জর তার হাতের কাছে রেখে শুয়ে পড়লো।

সকালে আবার চলা শুরু করলো। অর্ধ দিন পর এক টিলার কাছে সে থাকবে কিনা ভাবছিলো। এ সময় সামনে থেকে ছুটন্ত ঘোড়ার খুরধ্বনি তার কানে এলো। শাফিয়া এদিক ওদিক লুকানোর জায়গা খুঁজতে লাগলো। কিন্তু দুটি ঘোড়া লুকানো অসম্ভব কাজ। সে একা হলে যে কোন ঝোপের পেছনে লুকোতে পারতো। তার ভাবনা শেষ হওয়ার আগে সামনে দিয়ে পিঠে তীরবিদ্ধ একটি হরিণ দৌড়ে গেলো। হরিণের পেছন পেছন এক ঘোড়াসওয়ারও ছুটে আসতে লাগলো। শাফিয়াকে দেখে শাফিয়ার সামনে এসে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলো।

ঘোড়াসওয়ার শাফিয়ার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। তার চোখে যেমন বিস্ময় তেমনি লুলুপতাও খেলা করছে। যেন এমন সুন্দরী মেয়ে সে জীবনে আর দেখেনি। শাফিয়া মনে মনে ভীষণ ভয় পেলেও মুখে নির্ভীকতার ছাপ ধরে রাখলো।

'তুমি কি মানুষ? বিশ্বাস হয় না'– ঘোড়াসওয়ার জংলী ভাষায় প্রশ্ন করলো।

'হ্যাঁ আমি মানুষ'– শাফিয়া দৃঢ় গলায় বললো।

'কে তুমি, এই জঙ্গলে একা তুমি কি করছো? মনে হয় তোমার সঙ্গে আরো কিছু লোক ছিলো! 'মানুষ হলেও মানবাত্মা ধরে নাও আমাকে। হাসান ইবনে সবার নাম তো শুনেছো?'

'শায়খুলজাবাল ইমাম! তার সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছি আমি। তিনি আকাশ থেকে আগুন কোলে করে মাটিতে নেমেছেন। তিনি আসমানী ফেরেশতাকেও মাটিতে নামিয়ে এনেছেন।'

'আমি তার বেহেশতের হুর, তুমি কি ইমামের হাতে বায়াত হওনি?'

'না, আমাদের নিজস্ব ধর্ম আছে। আমাদের রীতি হলো যে কাবীলার সরদার হবে সেই ধর্মীয় নেতা। আমি আমার কাবীলার সরদার ও ধর্মীয় গুরু...... তুমি একা কেন?'

'শিকার করতে এখানে এসেছি। একটি হরিণের পিছু ধাওয়া করে এখানে এসেছি। ইচ্ছা করেই আমি লুকিয়ে পড়ি যাতে আমার সঙ্গীরা আমাকে খুঁজতে খুঁজতে না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যায়। আসলে আমি স্বাধীনভাবে একটু ঘুরাফেরা করতে চাই। এখন ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু পথ ভুলে গেছি। শাফিয়া ইচ্ছা করে মিথ্যা বললো।

'এই জঙ্গলে আমি অন্য কাউকে দেখিনি, ওরা কি তোমাকে একা ছেড়ে চলে গেছে?'

'হয়তো বা, আমি একা যেতে চাই, কিন্তু ফিরে যেতে চাই না। অন্য একস্থানে যেতে চাই। আমি পথ না হারিয়ে ফেললে এতক্ষণ এখান থেকে বের হয়ে যেতাম।

'কোথায় যেতে চাও?'

'কেল্লা ওসিমকুহ; তুমি কি ওখানকার পথ বলে দেবে আমাকে?'

'শায়খুল জাবালের কি এমন রুহানী শক্তি নেই? আমি শুনেছি তার এমন রুহানী শক্তি আছে যে, সাতস্তর যমীনের সবকিছু তিনি দেখতে পান।'

'তাকে কেউ বললে তো তিনি আমার খোঁজ লাগাবেন, কিন্তু তাকে কেউ আমার কথা বলবে না। আমি জঙ্গলে একা রয়ে গেছি.... তুমি কি আমাকে পথ দেখাতে পারবে?'

'তা পারবো, তবে এখানে নয়। এটা আমার এলাকা, তাই তুমি আমার মেহমান। আমি তোমাকে আমার বস্তিতে নিয়ে যাবো না। বস্তি অনেক দূর। এখানে আমি এক জায়গায় তাঁবু গেড়েছি। সেখানে তোমাকে নিয়ে রাস্তা বুঝিয়ে দেবো।'

'তোমার তাঁবুতে যদি আমি না যাই?'

'তাহলে এই জঙ্গলে পথ খুঁজে মরবে। এখন থেকে বের হওয়া সহজ কাজ নয়। এখানে বড় বড় অনেক বাঘ, চিতা, এবং মানুষ খেকো অতি ভয়ংকর কালো বর্ণের একটা বাঘও আছে। তাঁবুতে তোমাকে নিয়ে যেতে চাই। মুখে মুখে কেল্লা ওসিমকুহের রাস্তা বুঝাতে পারবো না। সাদা কাপড়ে পথের চিত্র একে তোমাকে বুঝাতে হবে, তাই আমার সঙ্গে যাওয়াটাই তোমার জন্য ভালো হবে।

ঝুঁকি নেয়া হলেও শাফিয়া তার সঙ্গে যাওয়াটাই ভালো মনে করলো। শাফিয়া তার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সরদারের সঙ্গে রওয়ানা দিলো। পথে যেতে যেতে সরদার তার নামধাম জানালো শাফিয়াকে।'

'আমার নাম যরতুশ, আমি আরো তিন চার দিন এই জঙ্গলে থাকবো। যাওয়ার সময় আমার সাথে দু'তিনটি হরিণ এবং সম্ভবত একটি বাঘও থাকবে।'

কিন্তু সরদারের চেহারা দেখে বুঝা যাচ্ছিলো শিকারের ব্যাপারে তার আগ্রহের চেয়ে শাফিয়ার প্রতিই তার সব আগ্রহ।

'আমার লোক দিয়ে তোমাকে পাঠাবো। ওরা তোমাকে বিপদজনক পথ সহজে পার করে দেবে'– যরতুশ বললো।

যরতুশের তাঁবু এখান থেকে অনেক দূর। দেড় দুই ঘণ্টা লেগে গেলো ওখানে পৌঁছতে। ওখানে চার পাঁচটি তাঁবু ফেলা আছে। পাঁচ সতজন লোক বাইরে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত। এরা হয়তো তার নওকর। একটি বড় ধরনের তাঁবুর সামনে যরতুশ ঘোড়া থেকে নামালো শাফিয়াকে। এক নওকর দৌড়ে এসে ওদের ঘোড়া নিয়ে গেলো।

যরতুশ তাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে দারুণ সজ্জিত একটি ফরাশে বসালো। সঙ্গে সঙ্গে খাবার এলো। শাফিয়া দেখে হয়রান হয়ে গেলো। বিভিন্ন ধরনের পাখির বুনা গোশত। প্রায় দশ বারজন লোকের খাবার ওদের দুজনকে দেয়া হয়েছে। এর সঙ্গে কোন রুটি নেই।

'শিকারে এসে আমি শুধু শিকারের জিনিসই খাই। তোমার খাবারও এই পাখির গোশতই। রুটি পাবেনা। রুটির প্রয়োজনও অনুভব করবে না'– যরতুশ বললো।

একটু পর নওকর এক সুরাহী শরাব ও দুটি পেয়ালা আনলো। যরতুশ পেয়ালা দুটিতে শরাব ঢেলে এক পেয়ালা শাফিয়ার দিকে ঠেলে দিলো। শাফিয়া সেটা প্রত্যাখ্যান করলো।

কেন? শায়খুল জাবালের হুর আর তুমি শরাব পান করতে অস্বীকার করছো?

'এর কারণ আছে একটা। এক বুযুর্গ আমাকে বলেছেন, শরাব চেহারার সতেজতা নষ্ট করে দেয়। বয়সকালেও আমি আমার যৌবন ধরে রাখতে চাই।'

যরতুশ তবুও অনেক পীড়াপীড়ি করলো শরাব পান করার জন্য। কিন্তু শাফিয়া শরাব নিলো না। খাওয়া শেষ হওয়ার পর শাফিয়া তাকে রাস্তা বুঝিয়ে দিতে বললো।

'এত তাড়া কিসের?'– যরতুশ জিজ্ঞেস করলো।

'এখনই আমি রওয়ানা দিতে চাই। সকাল পর্যন্ত আমার গন্তব্যের কাছে পৌঁছে যেতে চাই।'

'আমার মেহমানদারীর দাবি অন্য কিছু। আমি আমার কবীলার রুসম প্রথার পূজারী। আমার নওকর সারা কবীলায় ছড়িয়ে দেবে মেহমানকে আমি রাতে বিদায় করে দিয়েছি। তখন সবাই আমার প্রতি লানত করবে আমি এক নারীকে রাতে বিদায় করলাম।'

'ঠিক আছে তুমি তাহলে পথের নকশাটা বানিয়ে ফেলো।'

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিলো, তাঁবুতে আলো জ্বালানো হলো, আর নওকরকে দিয়ে একটি কালির দোয়াত, কঞ্চি ও সাদা একটা কাগজ আনালো। যরতুশ অনেক সময় নিয়ে শাফিয়ার পথের দীর্ঘ নকশা আঁকলো। আঁকা শেষ হলে শাফিয়া তার কাছে নকশাটা চাইলো। যরতুশ সেটা দিতে অস্বীকার করলো।

'এক শর্তে এই নকশা তোমাকে দিতে পারি আমি। সঙ্গে দু'জন লোকও দেবো এবং এমন খাবার দেবো যা হাসান ইবনে সবার বেহেশতেও কখনো খাওয়ানো হয় না।'

শাফিয়া বুঝতে পারলো সরদার তার কাছে কি চাচ্ছে। তবুও জিজ্ঞেস করলো,

'কী শর্ত?'

'আজ ও কাল রাতে তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। এখন নিজেই বুঝে নাও কী শর্ত আমার।'

'আমি বুঝে গেছি, তুমি আমার আবরু কিনতে চাচ্ছ। আমি রাজী না হলে?'

'তাহলে সারা জীবন থাকতে হবে আমার সঙ্গে, আমার দাসী করে রাখবো, যদি পালাতে চাও তাহলে বড় করুণ মৃত্যু হবে তোমার।'

'আমি কে তুমি কি ভুলে গেছো? আকাশ থেকে নেমে আসা হাসান ইবনে সবা আমার মালিক। আমাকে তিনি আর কিছু সময় অনুপস্থিত দেখলেই জেনে যাবেন আমি কোথায় আছি। তোমার কি পরিণাম করবেন তুমি তা জানো না। রক্তপায়ী কুকুর তোমার ওপর ছেড়ে দেবেন। তোমার কবীলার সব মেয়েকে উঠিয়ে কেল্লা আলমোতে নিয়ে যাবে।'

'এসব ভালো করেই জানি আমি। হাসান ইবনে সবা আল্লাহর নয় ইবলিসের পাঠানো ইমাম। ইবলিসের শক্তিই তার শক্তি। আর তুমি যে আবরু ইজ্জতের কথা বলছো সেটা তো তোমার মধ্যে নেই। তোমার মতো এমন সুন্দরী মেয়ের গায়ে কখনো হাত লাগাইনি আমি। জীবনে এই প্রথম এমন সুন্দরী মেয়ে আমার হাতে এসেছে। তুমি কি আমার এই সম্মান মূল্যায়ন করবে না যে, শুধু দু'রাত তোমাকে আমার সঙ্গে রাখতে চাইছি? তারপর তো তুমি সারা জীবনের জন্য মুক্ত।'

'তোমার চেয়ে অনেক বড় বড় বদ ও শয়তানের পাল্লায় পড়েছি। কিন্তু কারো জালে আমি পা দেইনি। তুমিই প্রথম এক বদলোক যার জালে আমি ফেঁসে গেছি। দু'রাত তো দূরের কথা দুই মুহূর্তও আমি তোমার এখানে থাকবো না।'

যরতুশ বিদ্রূপাত্মক হাসি হেসে শাফিয়ার কাঁধে হাত রেখে বললো,

'তোমাকে প্রথমবার দেখে আমি বিশ্বাস করতে পারিনি যে, তুমি মানুষ। না, তোমাকে আমার শর্ত মানতেই হবে। তুমি আত্মহত্যা করতে চাইলেও আমি তা করতে দেবো না।'

শাফিয়া গভীর ভাবনায় ডুবে গেলো। সে ভাবতে লাগলো তার আসল পরিচয় বলে দেবে কিনা। তার চাচা ও খাজানার কথা বলে দেবে কিনা। খাজানার লোভ দেখালে হয়তো সে গলতে পারে। এই ভেবে সে ওসিমকুহ থেকে সেই খাজানার গ্রামে পর্যন্ত যা ঘটেছে পুরো ঘটনা সরদারকে শোনালো। কিন্তু সরদারকে এই লোভে লোভী করা গেলো না। তার বিশ্বাস এসব খাজানার লোভে যারা যায় তারা নানান ধরনের হিংস্র প্রাণী ও মানববেশী প্রেতাত্মার শিকার হয়ে মারা যায়।

'আমি সেখানে খাজানা আনতে কখনো যাবো না'– যরতুশ শাফিয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললো– 'যে হাসান ইবনে সবাকে তোমরা আল্লাহর প্রেরিত ইমাম বলো তার বড়ই আকর্ষণীয় প্রস্তাব আমার কবীলা পর্যন্ত পৌঁছেছে। আমাকে অনেক সুন্দরী মেয়ে ও এমনই খাজানার লোভ দেখানো হয়েছে। আমার কবীলা দারুণ যুদ্ধপ্রিয়। হাসান ইবনে সবা আমার কবীলাকে তার শক্তি বানাতে চায়। কিন্তু আমরা এসব গ্রহণ করিনি। তবে ইসলামের প্রতি কিছু আগ্রহ আমার কবীলার আছে। কারণ ইসলাম কোন লোভ দেখায় না এবং কোন লোভে লোভীত হয় না। মুসলমানদের সুলতানের মধ্যে ক্ষমতার লোভ ঢুকেছে বলেই তো হাসান ইবনে সবার মতো শয়তানরা মাথাচারা দিতে পেরেছে। আমরা জংলী বর্বর হতে পারি। কিন্তু হাসান ইবনে সবার শয়তানীকে গ্রহণ করবো না।'

শাফিয়ার নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করলো। কেন সে নিজেকে হাসান ইবনে সবার হুর বলে পরিচয় দিতে গেলো। সে এবার নিজের প্রভূত ধর্মীয় পরিচয় দিলো যে, সে মুসলমান। কিন্তু যরতুশ এটাকেও একটা ধোঁকা বলে ধরে নিলো। হতাশ হয়ে শাফিয়া গভীর ভাবনায় ডুবে গেলো। অনেক ভেবে একটা আলোর পথ দেখতে পেলো সে। দেখা যাক তার পরিকল্পনা কাজে লাগে কিনা।

'ঠিক আছে যরতুশ! শুধু আজকের রাতটাই। আমার শর্ত মেনে নাও। সকালে আমাকে ছেড়ে দিয়ো'– শাফিয়া অনুনয়ের সুরে বললো।

'ঠিক আছে মেনে নিলাম।'

তাহলে নকশার কাপড়টা দাও।'

'রাতে এটা আমার, সকালে হবে তোমার'– যরতুশ তার পকেটে রেখে বললো।

যরতুশ কথা বলছে আর দু'এক ঢোক করে শরাব পান করছে। শাফিয়াকে রজী হতে দেখে তার শরাব পানের মাত্রা দ্বিগুণ করে দিলো। শাফিয়াকে বড় আদরে বিছানায় শোয়ালো। একদিকে পেয়ালারপর পেয়ালা মদের নেশা অন্যদিকে শাফিয়ার জীবন গ্রাসী যৌবনের নেশায় তখন সে প্রায় বেহুশ। শাফিয়ার হাত যে তার নাভীর কাছে চলে গেছে সেটা যরতুশের এ অবস্থায় লক্ষ্য করার বিষয় নয়। যরতুশ যেই হেলেদুলে শাফিয়ার ওপর ঝুঁকলো। শাফিয়া তখন এক ঝটকায় তার নাভীর নিচের কাপড়টা থেকে খঞ্জর বের করে পুরো শক্তিতে যরতুশের বুকে গেঁথে দিলো। যরতুশ বুকে দু'হাত রেখে কাটা কলাগাছের মতো চিত হয়ে পড়লো। তার মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের হলো না। হতভম্বে বড় বড় হয়ে যাওয়া চোখ দুটি খোলা রেখে নিথর হয়ে গেলো।

শাফিয়া দ্রুত তার আলখেল্লার পকেট থেকে নকশাটা বের করে আলোতে ধরে কোনদিকে কিভাবে যাবে সেটা মুখস্থ করে নিলো। পড়া হয়ে গেলে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে অতি সন্তর্পণে তাঁবু থেকে বের হয়ে গেলো। বাইরে কারো কোন শব্দ পাওয়া গেলো না, অন্যান্য তাঁবুগুলোও অন্ধকার। অর্থাৎ তার নওকররা সব গভীর ঘুমে এখন।

ঘোড়ার জিন কাছেই রাখা ছিলো। জিন হাতে সে ঘোড়ায় চড়ে বসলো। তারপর কেউ যাতে ঘোড়ার শব্দে জেগে না উঠে এজন্য বিনা শব্দে ঘোড়াকে অনেক্ষণ হাটিয়ে চললো। যথেষ্ট দূরে আসার পর গতি আরো বাড়িয়ে দিলো।

১৯

সুলতান বরকিয়ারক ছোট দু'ভাই মুহাম্মদ ও সাঞ্জারকে নিয়ে ওসিমকুহ বিজয়ের কয়েকদিন পরই সালার আওরিজী ও মুযাম্মিল আফেন্দীকে মোবারকবাদ জানানোর জন্য ওসিমকুহ পৌঁছেন। পৌঁছেই তিন ভাই সালার আওরিজী, মুযাম্মিল আফেন্দী ও ইবনে ইউনুসকে ইসলামের বীর শ্রেষ্ঠের খেতাবে ভূষিত করেন।

'কিন্তু সালার আওরিজী।'– সুলতান বরকিয়ারক সেদিনই বলেন– শুধু কেল্লা জয় করলেই আমাদের কাজ হবে না। আমাদের লক্ষ্য হলো, হাসান ইবনে সবা ও তার ছড়িয়ে দেয়া আকীদাকে খতম করা। এজন্য আলমোত দখল করা জরুরি। না হয় আমরা সফল হবো না।'

'পুরো সালতানাতের লশকর যদি আপনি আলমোতে পাঠান তবুও সে কেল্লা উদ্ধার করা যাবে না।'– মুসলিম বললো– 'কারণ বাতিনীরা বড়ই যবরদস্ত যুদ্ধবাজ। তাছাড়া কেল্লা অনেক উঁচুতে নির্মিত। এর তিন দিক নদী বেষ্টিত। আপনি নিজে একবার গিয়ে দেখলে বুঝতে পারবেন এ কেল্লা কতটা অজেয়।'

'আমি ঐ কেল্লা খুব ভালো করে দেখেছি'– সালার আওরিজী বললেন– 'ঐ কেল্লা জয় অসম্ভব না হলেও অত্যন্ত মুশকিলের ব্যাপার তো বটেই। কিন্তু ভাবনার বিষয় হলো আসল শক্তিটা কোথায়? সেটা হলো হাসান ইবনে সবা। এই একটা লোককে খতম করলে শুধু আলমোতই নয় সমস্ত বাতিনী ও তাদের উত্থানের রহস্য আমাদের পায়ের তলায় পিষ্ট হবে। আমাদের তিন চারজন এমন জানবায প্রয়োজন যারা কেল্লা আলমোতে ঢুকে হাসান ইবনে সবাকে এমনভাবে কতল করবে যেমন করে ফেদায়েনরা আমাদের বড় বড় আলেম ও হাকীমদের হত্যা করেছে এবং করছে।'

'আমি এত দিন কি বলে এসেছি। সেই জানবায তো এখানেই আছে। একজন আমি আরেকজন ইবনে ইউনুস। জানি, আমরা সরাসরি গিয়ে হাসান ইবনে সবাকে হত্যা করা যাবে না। আমাদের চালবাজি করতে হবে। আপনি অনুমতি দিলে আমি আরো কিছু জানবায তৈরি করবো'– মুযাম্মিল আফেন্দী বললো।

অনেক আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো হাসান ইবনে সবাকে হত্যা করলে এভাবেই ধোঁকা দিয়ে করতে হবে। এরপর সুলতান বরকিয়ারক আরেকটা বিষয় উত্থাপন করলেন। তিনি বললেন, সালতানাতের দায়িত্ব শাসন করার মতো শারীরিক সক্ষমতা আমার ফুরিয়ে আসছে। তিনি আরো বললেন–

'আমাদের তিন ভাইয়ের জন্য সালতানাতকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছিলো। আমার প্রত্যাশা ছিলো এতে সালতানাতের আভ্যন্তরীণ ও প্রতিরক্ষা শক্তি সুসংহত হবে। এটা হচ্ছিলোও। কারণ আমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে সবসময় পারস্পরিক প্রীতি ও সৌহার্দ বজায় ছিলো। তারা আমার ফয়সালাকে সব সময় মেনে চলেছে। কিন্তু এখন আমি কঠিনভাবে অনুভব করছি। সালতানাতের দায়িত্বভার এখন আর বইতে পারবো না। সেই ধৈর্যক্ষমতাও আমার মধ্যে অবশিষ্ট নেই। আমি তোমাদের সবার পরামর্শ নিচ্ছি না বরং ফয়সালা শোনাচ্ছি। আজ থেকে আমার দু'ভাই মুহাম্মদ ও সাঞ্জার সালতানাতের সুলতান হবে। সালতানাত তিন অংশে নয় দু' অংশে বিভক্ত হবে এবং কেন্দ্রীয় শাসন ক্ষমতা থাকবে মারুতে।

সবার ওপর নিঃশব্দতা নেমে এলো। এই আচমকা কথাটার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিলো না। আওরিজী বরকিয়ারকের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু বললেন। অন্যরাও সেটা সমর্থন করলো। কিন্তু বরকিয়ারক তার সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। এ ব্যাপারে সবাইকে আবেগ পরিত্যাগ করে বাস্তবতা মেনে নিতে বললেন।

'সালতানাতের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেবো না আমি'– বরকিয়ারক বললেন– 'যেখানেই আমার প্রয়োজন হবে সেখানে আমি পৌঁছে যাবো। আমার জানমাল সালতানাতের জন্য ওয়াকফকৃত।'

এই সিদ্ধান্তের কারণে বরকিয়ারকের চেহারায় কোন হতাশা বা ভ্রান্তির ছাপ দেখা গেলো না। চোখে মুখে একটুকরো নির্মল মিষ্টি হাসি ঝুলছে। মুচকি হেসে তিনি মুযাম্মিল আফেন্দীর দিকে তাকালেন।

'মুযাম্মিল!'– বরকিয়ারক রহস্যময় গলায় ডাকলেন– 'সুমনা আমার সঙ্গে এসেছিলো। তবে ফেরা আমার সঙ্গে হবে না, পথে সে আমাকে এমন কথাও বলেনি যাতে প্রকাশ পায়, সে এখনই তোমার সঙ্গে প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে চায়। ওর কথা একটাই, সে জিহাদ করতে চায়। কিন্তু সে এর সুযোগ পাচ্ছে না। তুমি কি এটা পছন্দ করবে না ওসিমকুহের এই বিজয় মুহূর্তে তোমাদের শুভ বিবাহ আজই এখানে সম্পন্ন হোক।

নিরানন্দ জলসায় এতক্ষণ পর সবাই আনন্দে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলো। সুমনা ও মুযাম্মিল তাদের অমর প্রেমের ওপর হাসান ইবনে সবা ও বাতিনীদের ধ্বংস সম্পর্কে সর্বপ্রাধান্য দিয়ে রেখেছিলো। কিন্তু যৌবনের বসন্তকাল তো কোন প্রতিজ্ঞা সমাপ্তির অপেক্ষা করে না। লজ্জা রাঙা হলেও বর কন্যা মুখফুটে কিছু বললো না তাই। তাদের নীরবতা যেন ফুলশয্যার প্রেমময় ডাক শোনার অধীর প্রতীক্ষার কথা ঘোষণা করলো।

সেদিন সন্ধ্যাতেই ওসিমকুহে সুমনা ও মুযাম্মিলের বিয়ে হয়ে গেলো। দক্ষিণা একটি কামরা ওদের বাসর সজ্জার জন্য মনোলোভা করে সাজানো হলো। এশার নামাযের পর পরই বর কনের হাসিতে বাসর ঘর হয়ে উঠলো প্রাণময়।

পরদিনই বরকিয়ারক মারু ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। দুপুরের খাবারের পরই তিনি রওয়ানা হলেন। খাবার খাচ্ছেন এমন সময় দারোয়ান এসে জানালো একটি মেয়ে এসেছে। বড় মন্দ অবস্থা তার। অনেক পথ সফর করে নাকি এসেছে। বরকিয়ারক তখনই তাকে এখানে আনার নির্দেশ দিলেন।

দারোয়ান ধরে ধরে নিয়ে আসলো একটি যুবতী মেয়েকে। সবাই আঁতকে উঠলো তাকে দেখে। এ যেন কবর থেকে উঠে আসা একটা নারী – লাশ। চোখ দুটি ভেতরে ঢুকে গেছে। মুখ খোলা। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো।

'আমার নাম শাফিয়া'– মেয়েটি কোনক্রমে বললো– আমি এখানকারই মেয়ে। আবু জান্দালের ভাতিজি।'

এতটুকু বলেই মেয়েটির দেহ এলিয়ে পড়লো। বেহুশ হয়ে গেলো শাফিয়া। 'তাড়াতাড়ি ওকে উঠিয়ে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও'– বরকিয়ারক নির্দেশ দিলেন– 'এ অসুস্থ এবং ভীষণ ক্ষুধার্তও। জ্ঞান ফিরে এলে যত্ন করে খাওয়াবে ওকে। তারপর আমি এখানে থাকলে আমাকে জানাবে। না হয় সালার আওরিজীকে জানাবে।'

শাফিয়া ১৬/১৭ দিন পর ওসিমকুহে পৌঁছে।

★★★★

মারু পৌঁছেই বরকিয়ারক প্রথমে ঘোষণা করলেন এখন তিনি সুলতান নন, মুহাম্মদ ও সাঞ্জার এখন থেকে সেলজুকি সুলতান। বরকিয়ারক এত দিনে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাই লোকেরা এই ঘোষণা খুশি মনে নিলো না। অনেকে মনে করলো, ভাইদের বিরোধের জের ধরে বোধহয় সুলতান এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বরকিয়ারক তাই সরকারি ঘোষকদের নির্দেশ দিলেন সারা সালতানাতে যাতে ঘোষণা করে দেয় অসুস্থতার কারণে তিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং সবাই যেন মুহাম্মদ ও সাঞ্জারের আনুগত্য মেনে নেয়।

বরকিয়ারক আসলেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাই মসজিদে মসজিদে তার সুস্থতার জন্য দুআ হতে লাগলো। সারা সালতানাতে এবং ইস্পাহানেও এ খবর পৌছলো। ইস্পাহানের সর্বাধিক জনপ্রিয় আলেম কাজী আবুল আলা এ খবর পেয়ে মারুতে ছুটে এলেন। সুলতান বরকিয়ারক তাকে আধ্যাত্মিক গুরু বলে মান্য করতেন। তিনি এসে দেখলেন বরকিয়ারকের মধ্যে কোন প্রাণোচ্ছলতা নেই। কিন্তু শারীরিকভাবে তার কোন অসুখ ছিলো না। বরকিয়ারককে জিজ্ঞেস করলে বরকিয়ারক আবুল আলাকে বললেন, তিনি বলতে পারবেন না তার কেমন বোধ হয়। সবকিছু কেমন ছাড়া ছাড়া লাগে। আর সবসময় ভয় হয় কখন না জানি কি ঘটে যায়।

বরকিয়ারককে শাহী হাকিম দেখলেন। আবুল আলা জিজ্ঞেস করলেন, বরকিয়ারকের অসুখটা কি?

'এটা বলতে পারলে তো এতক্ষণে তাকে সুস্থ করে তুলতাম'– হাকিম বললেন– 'আমি আমার সব চিকিৎসা বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করেও তাকে সুস্থ করতে পারবো না। মনে হয় তার মন মগজে এমন কোন বোঝা চেপে বসেছে সেটা তিনি বলতেও পারছেন না কাউকে বোঝাতেও পারছেন না।'

বরকিয়ারককে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এমন কি বোঝা আপনার মনে চেপে বসেছে যাতে আপনার এ অবস্থা হয়েছে। বরকিয়ারক তাকে কিছু বুঝাতে পারলেন না।

'আমার ভালো করে মনে আছে'– কাজী আবুল আলা বললেন– 'আমার ওয়ালেদে মুহতারামকে বাতিনীরা ধোকা দিয়ে এমন বিষ প্রয়োগ করে যে, তিনি আস্তে আস্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। মনে হয় আপনার অজান্তে আপনাকেও বাতিনীরা কিছু খাইয়েছে।

'এই সন্দেহেও উনাকে ঔষধ দিয়েছি'– ডাক্তার বললেন– 'এধরনের কোন কিছু যদি তাকে প্রয়োগ করতো তাহলে আমার ঔষধেই সব দূর হয়ে যেতো, ব্যাপার অন্যকিছু হবে।'

'আজ রাতে আমি কাশফে বসবো, আল্লাহ তাআলা আমাকে এ শক্তি দান করেছেন। আমার সন্দেহ এটা কোন তাবিজের প্রতিক্রিয়া। হাসান ইবনে সবা এসব জাদুটোনা তার শত্রুদের বিরুদ্ধে আগেও ব্যবহার করেছে। ঘটনা এমন হলে আল্লাহ চাহে তো আজ রাতেই তা জানা যাবে। আবুল আলা বললেন।

তার শয্যার জন্য বিশেষ একটা কামরা দেয়া হলো। এশার নামাযের পর গিয়ে তিনি সে কামরায় ঢুকলেন এবং ফজর পর্যন্ত জায়নামাযে বসে কাটালেন। সূর্যোদয়ের পর তিনি বরকিয়ারকের কাছে গেলেন। 'আমার সন্দেহই ঠিক হয়েছে– আবুল আলা জানালেন– 'এটা জাদুকৃত তাবিজের প্রতিক্রিয়া। কিন্তু হাসান ইবনে সবা নয় এখানকার কেউ আপনাকে খতম করতে চায়। আমি এর আছর তুড়ি দেবো। তবে এখানে নয়। তিন চার রাত একাধারে জাগতে হবে। আমার তাবীজ হলে আপনার কাছে পৌঁছে দেবো।'

কাজী আবুল আলা পরদিন ইস্পাহান চলে গেলেন। ইস্পাহান পৌঁছার পর লোকজন তাকে ঘিরে ধরে সুলতান বরকিয়ারকের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলো। তিনি বললেন, কাল যেহেতু জুমা। কালই সবাইকে জানাবো।

পরদিন জুমুআর নামাযের সময় মসজিদে লোকে ভরে গেলো। তিল ধারণের জায়গা রইলো না আর। খুতবার আগে তিনি সুলতান বরকিয়ারকের অসুস্থতা সম্পর্কে উঁচু আওয়াজে বললেন,

'সুলতান বরকিয়ারকের শরীরে কোন অসুখ নেই। আমি মুরাকাবা করে কাশফের মাধ্যমে জানতে পেরেছি, বাতিনীরা তাকে তাবীজ করেছে। আমি তিন চার দিনের মধ্যে এর ব্যবস্থা করছি।

আবুল আলা মসজিদে নামায পড়াতে দাঁড়ালে তার পেছনে তার দেহরক্ষী শিষ্যরা থাকতো। যাতে কোন হামলাকারী হামলা করতে না পারে। পরদিন ভোরে আবুল আলা ফজরের নামাযের সময় মেহরাবে গিয়ে দাঁড়ালেন। একামত দিচ্ছেলো। এ সময় দ্বিতীয় কাতার থেকে এক লোক সামনের কাতারের দু'জনকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিলো। দু'জনে হুড়মুড় করে গিয়ে পড়লো ইমাম সাহেবের ওপর। ইতিমধ্যে লোকটি খঞ্জর বের করে ফেলেছে। আবুল আলা ঘটনার আকস্মিকতায় চমকে উঠে পেছন ফিরতে যাচ্ছিলেন। ততক্ষণে তার বুকে খঞ্জর বিদ্ধ হয়ে গেছে। মুসল্লীরাও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কিছু বুঝে উঠার আগেই হত্যাকারী মিম্বরে উঠে 'শায়খুল জাবাল ইমাম হাসান ইবনে সবার নামে'– ঘোষণা দিয়ে খঞ্জরটি তার বুকে বিদ্ধ করে দিলো।

বাতিনীরা আরেকজন শ্রেষ্ঠ আলেমকে হত্যা করলো। এ ঘটনা পঞ্চম হিজরীর শেষ বর্ষে।

কাজী আবুল আলার মৃত্যুর খবর মারুতে পৌঁছতেই সুলতান বরকিয়ারক চরম আঘাত পেলেন। এ আঘাতে তিনি প্রায় নির্বাক হয়ে গেলেন। আর অন্যরা তো জ্বলে উঠলো আগুনের মতো। সবচেয়ে বেশি ক্রোধ প্রকাশ করলো সুলতানের ছোট ভাই সাঞ্জার সে ঘোষণা দিলো, বাতিনীদের কেল্লাগুলোর ওপর হামলা করা হবে। আর মারুতে ফেরা হবে তখনই যখন বাতিনীদের পরিবারের নাম নিশানা মুছে যাবে।

সেলজুকি সালতানাতের ওজীরে আজম তখন ফখরুল মিলক আব্দুল মুজাফফর আলী। তিনি তিন বছর আগে বাতিনীদের হাতে নিহত হওয়া ওজীরে আজম নেযামুল মুলকের ছেলে। বাবার মতোই তিনি অত্যন্ত প্রাজ্ঞ ও অতি দূরদর্শী ছিলেন। তিনি কাজী আবুল আলার হত্যার প্রতিক্রিয়ায় সাঞ্জারের এই ঘোষণায় চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি আশংকা করলেন, এই প্রতিক্রিয়ার কারণে যদি অতি ভাবাবেগ প্রকাশ হয়ে যায় তাহলে ভুল হওয়ার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যাপারটা নিয়ে তিনি তাদেরকে কিছু পরামর্শ দিলেন।

'এখন আমরা ভাবনা-চিন্তার মধ্যে বেশি সময় ব্যয় করবো না'– মুহাম্মদ বললেন–'এখন আমাদের কেল্লা আলমোত বা বাতিনীদের আরেকটি বড় আস্তানা কেল্লা শাহদরে হামলা করা উচিত। আমি এই ফয়সালার সমর্থন চাই। কেল্লায় হাসান ইবনে সবার উস্তাদ মালেক ইবনে গুতাশ থাকে।

ওযীরে আজম আবুল মুযাফফর শুধু ওযীরে আজমই ছিলেন না। তিনি রণাঙ্গনের একজন সেনানায়কও ছিলেন। তিনি মুহাম্মদ ও সাঞ্জারকে বললেন তাকে যাতে অনুমতি দেয়া হয় যে, তার তত্ত্বাবধানে সৈন্যদের প্রস্তুত করা হবে।

'আপনি অবশ্যই প্রস্তুত করবেন'– মুহাম্মদ বললেন–'কিন্তু তিন চার দিনের বেশি যেন না লাগে। এই হামলার নেতৃত্ব আমি নিজে দেবো।'

ওদিকে পরদিন শাফিয়ার জ্ঞান ফিরে। ডাক্তারের নির্দেশে তাকে ফোটা ফোটা করে মুখে দুধ ও মধু পান করানো হলো। তারপর সালার আওরিজীকে খবর দেয়া হলো, রুগীর জ্ঞান ফিরেছে। কিন্তু তিনি এসে রুগীর সঙ্গে কথা বলতে পারলেন না। কারণ শাফিয়া তখন জীবন্ত লাশ। তিনি অনুভব করলেন এর সঙ্গে কোন অভিজ্ঞ মেয়ে মানুষ সার্বক্ষণিক থাকা উচিত। আওরিজী তাই মুযাম্মিলের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করলেন। মুযাম্মিল তখনই শাফিয়ার কাছে পাঠিয়ে দিলো সুমনাকে।

সেদিন সারা দিনই তাকে সামান্য সামান্য করে মধু আর দুধ পান করানো হলো। সেদিন শাফিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা কিছু শব্দ মাত্র মুখ দিয়ে বের করতে পারলো। পরদিন সকালে উঠে সুমনা দেখলো, আজ শাফিয়া অনেকটা চাঙ্গা বোধ করছে এবং ভালো করে কথাও বলতে পারছে। সুমনা তাকে জিজ্ঞেস করলো, সে কোথায় থাকে এবং এই দুরবস্থা নিয়ে কোত্থেকে এসেছে। শাফিয়া বললো, সে এখান থেকে গিয়েছিলো এবং এখানেই ফিরে এসেছে।

'আমি যখন এখান থেকে যাই তখন আমার সঙ্গে ছিলো আমার চাচা ও ছোট বোন। কিন্তু ফিরতে হলো আমাকে বড্ড একা হয়ে'– শাফিয়া বললো।

শাফিয়া সুমনাকে পুরো ঘটনার খুঁটিনাটি শোনালো। সেই ডাকু সরদার যরতুশকে হত্যা করে সেখান থেকে এ পর্যন্ত তার অনেক বিপদ সরাতে হয়েছে। তবে যরতুশের পথের চিত্র শাফিয়াকে সঠিক পথই দেখিয়েছে। কিন্তু পথের প্রতিটি বাঁকেই তার জন্য ওঁৎ পেতেছিলো মৃত্যুদূত। এক জঙ্গলে তো শাফিয়া ও তার ঘোড়া কয়েকটি ক্ষুধার্ত নেকড়ের কবলে পড়ে। একাধারে পাঁচটি ঘোড়া তাঁর ঘোড়াকে ধাওয়া করে। ঘোড়াও শাফিয়াকে নিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটলো। কিন্তু একটু পরেই নেকড়েগুলো ঘোড়ার একেবারে কাছে চলে আসলো। ব্যবধান মাত্র দুই আড়াই হাত। এ সময় শাফিয়া দেখলো একটি গাছ থেকে লতার মতো ডাল ঝুলছে সেটার নিচে পৌঁছতেই শাফিয়া ডালে ধরে ঝুলে পড়লো। নেকড়েগুলো শাফিয়ার দিকে তাকালোও না। তাদের শিকার তো ঘোড়া, পলকা দেহের শাফিয়াকে দিয়ে তাদের কি হবে। এভাবে শাফিয়া দৈবক্রমে আরো কয়েকবার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায়। তবে সফরের শেষ আট দশ দিন ছিলো তার জন্য কেয়ামতের বিভীষিকার চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক। খাবারও পানি সব ফুরিয়ে গিয়েছিলো। এক সময় তার সর্বশেষ ঘোড়াটিও বিষধর সাপের দংশনে মারা পড়ে। এরপর শাফিয়ার পথচলা শুরু হয় পায়দল। এবং একদিন জীবন্ত লাশ হয়ে এখানে পৌঁছে।

সুমনার কাছ থেকে সালার আওরিজী এ ঘটনা জানার পর শাফিয়াকে সরাসরি মেহমান করে নেয়ার নির্দেশ দিলেন।

★★★★

মারু এখন লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে সরগরম। ওযীরে আজম আবুল মুজাফফরের নেতৃত্বে বাতিনীদের কেল্লাগুলো পুনরুদ্ধারের জন্য সৈন্যদের নতুন করে ঝালিয়ে নেয়া হচ্ছে। আরো দলে দলে লোক সেনাবাহিনীতে যোগ দিচ্ছে। বাতিনীদের কোমর ভেঙ্গে দিতে সারা শহর এখন জেগে উঠেছে।

এর মধ্যে মুহররম মাস চলে এলো। মুহররমের দশ তারিখে আবুল মুজাফফর রোযা রাখলেন। পরদিন সকালে তার সঙ্গে মুজাফফর বাইরে বের হলে সুলতান মুহাম্মদ, সাঞ্জার ও তার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো, তাদেরকে জানালেন, গত রাতে তিনি হযরত হুসাইন (রাঃ) কে দেখেছেন। স্বপ্নে তাকে হযরত হুসাইন (রাঃ) বলছিলেন– 'তাড়াতাড়ি আসো, আজকের রোজার ইফতার করবে তুমি আমার সঙ্গে।

'ফকরুল মালিক'– আবুল মুজাফফরের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু বললেন– 'আল্লাহ যা মঞ্জুর করেন তাই তো হয়। আপনার স্বপ্ন তো খুবই নেয়ামতময়। কিন্তু আমার একটা কথা শুনুন। আজ ও কাল আপনি ঘর থেকে বের হবেন না। আমি কেমন যেন ভয় পাচ্ছি।'

'হযরত হুসাইন (রা) আমাকে ডেকেছেন'– আবুল মুজাফফর মুচকি হেসে বললেন– ' আর আমি ঘরে লুকিয়ে থাকবো? এই ডাকের সাড়া তো আমাকে দিতেই হবে।'

আবুল মুজাফফর তার নিজ কার্যালয়ে গেলেন না। ঘরে বসে নফল নামায ও কুরআন তেলাওয়াত করে দিনটা কাটালেন। আসরের পর কি মনে করে ঘর থেকে বের হলেন। তার মহলের সামনেই এক অসহায় দীন-হীন লোককে দেখে তার বড় মায়া হলো। তিনি তার কাছে এগিয়ে গেলেন।

মুসলমান যেন আজকে খতম হয়ে গেছে। মজলুমের ফরিয়াদ কে শুনবে এমন কাউকেই পাওয়া যায় না– লোকটি কাতর কণ্ঠে বললো।

'ভাই আমার! আমি শুনবো তোমার কথা। কে তোমার ওপর জুলুম করেছে, আগে তার কথা বলো– আবুল মুজাফফর তার আরেকটু কাছে গিয়ে বললেন।

লোকটি তার পকেট থেকে একটি কাগজ বের করে আবুল মুজাফফরের হাতে দিয়ে বললেন এতে তার ফরিয়াদ লেখা আছে। আবুল মুজাফফর কাগজটি পড়তে শুরু করলেন। লোকটি বড় দ্রুত তার কাপড়ের ভেতর থেকে ছুরি বের করে আবুল মুজাফফরের পেটে ঢুকিয়ে দিয়ে পুরো পেট চিড়ে ফেললো। আবুল মুজাফফরের পেটের নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়লো। তিনিও পড়ে গেলেন। কিন্তু এই প্রথম এক বাতিনী হত্যাকারী হত্যার পর সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যা করতে পারলো না। কারণ পথচারী এ ঘটনা দেখে তাকে এসে ধরে ফেললো এবং তার হাতের ছুরিটি নিয়ে নিলো।

এ হত্যার খবর সারা শহরে ছড়িয়ে পড়লো বিদ্যুৎবেগে। লোকজন জমা হতে শুরু করলো সেখানে। মুহাম্মদ ও সাঞ্জারও পৌঁছে গেলো সেখানে। আবুল মুজাফফরের দেহ ততক্ষণে নিথর হয়ে গেছে।

'এই বাতিনী কাফের!'– মুহাম্মদ তাকে জিজ্ঞেস করলো– 'অন্যান্য বাতিনীদের মতো কেন তুমি সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যা করলে না?'

'আমি জানি আমাকে হত্যার বদলে হত্যা করা হবে'– সেই হত্যাকারী বললো– 'তার মৃত্যুর আগে আমি তোমাদের সঙ্গে একটি ভালো আচরণ করতে চাই। সেটা হলো, তোমাদের আশেপাশে এমন এমন লোক আছে যাদেরকে তোমরা নিজেদের হামদর্দ মনে কর কিন্তু আসলে ওরা বাতিনী এবং ওরাও একেক জনকে হত্যা করবে।'

বাতিনী সাত আটজনের নাম বললো। এরা সবাই সরকারি কর্মচারী ছিলো। মুহাম্মদ ও সাঞ্জার তখন খুনের নেশায় বুঁদ হয়ে আছেন। কোন কিছু যাচাই বাছাই করার প্রয়োজন মনে করলেন না। হুকুম দিয়ে দিলেন ঐ সাত আটজনকে এখানে ধরে এনে জল্লাদের হাতে ছেড়ে দিতে। তাই করা হলো। জল্লাদ তাদের হত্যা করলো, কিন্তু ওরা মৃত্যুর আগে চিৎকার করে বলছিলেন এসব মিথ্যা, ষড়যন্ত্র। জল্লাদ যখন সর্বশেষ লোকটি হত্যা করলো তখন আবুল মুজাফফরের হত্যাকারী হো হো করে হেসে উঠলো। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো কেন এভাবে সে হাসছে।

'হাসবো না তো কি করবো?"– হত্যাকারী বললো– 'এরা সবাই নিরপরাধ ছিলো। আমার মৃত্যুর আগে আরো কিছু নিরপরাধ মুসলমানদের রক্ত দেখে যাওয়ার বড় খাহেশ ছিলো। খাহেশ পূর্ণ হলো। তোমরা আসলে সব মূর্খ গোঁয়ার। বুদ্ধি খাটিয়ে কোন কাজ করতে যেয়ো না।'

সুলতানের হুকুমে সেই বাতিনীকে জল্লাদ তখনই দ্বিখণ্ডিত করে ফেললো। 'এখন আমরা কেল্লা শাহদর অবরোধ করবো।–'সাঞ্জার জনসমক্ষে চরম ক্রোধে বললেন – কাল সকালেই কোচ করবো।

এ ঘোষণায় লোকদের মধ্যে তপ্ত সীসার মতো উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে মৃত্যু হুংকার হয়ে শ্লোগান উঠতে লাগলো। এর মধ্যেই আবুল মুজাফফরের জানাযা ও দাফন সম্পন্ন হলো। এরপর এক বিশেষ সভায় সৈন্য কোচ করার দিনও নির্ধারিত হলো। কেল্লা কিভাবে অবরোধ করা হবে, কিভাবে হামলা চালানো হবে এসবের কৌশল ওজীরে আজম আবুল মুজাফফরেই ঠিক করে দিয়েছিলেন। ঠিক হলো, এ অভিযানের নেতৃত্ব দেবেন মুহাম্মদ। চার দিক ঘোষণা করে দেয়া হলো যারা ফৌজে শরীক হতে চায় তারা যেন অতি সত্বর ফৌজে ভর্তি হয়ে যায়। অসংখ্য শহরবাসী সৈনিক হিসেবে ফৌজে যোগ দিলো এবং তাদেরকে দিনরাত অনবরত প্রশিক্ষণ দিয়ে উপযুক্ত করে তোলা হলো।

তারপর এক সকালে সমস্ত ফৌজকে একটি ময়দানে একত্রিত করে সুলতান মুহাম্মদ তাদের উদ্দেশ্যে উত্তাল কণ্ঠে বললেন–

'ইসলামের মুজাহিদরা! আমরা কোথায় যাচ্ছি এবং কেন যাচ্ছি এটা বলার প্রয়োজন নেই। কোন দেশ জয় করতে যাচ্ছি না আমরা। যাচ্ছি ইবলিসের শিকড় উপড়ে ফেলতে। কোন সুলতান বা সালতানাতের যুদ্ধ নয় এটা। আমাদের ব্যক্তিগত যুদ্ধ এটা। আমাদের সবার আল্লাহ এক রাসূল (সঃ) এক এবং ঈমানও এক। আমরা সবাই একই জায়গায় উদ্দীপ্ত হয়ে একই উদ্দেশ্যে চলেছি। কোন দেশ জয় করার জন্য নয়। জয় হলে হবে ইসলামের জয়। আল্লাহ না করুন যদি পিছু হটি আমরা আল্লাহ লানত

করবেন আমাদের ওপর। আমি তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, হাসান ইবনে সবার শয়তানী ফেরকাকে খতম করতে হবে আমাদের। নিতে হবে নিরপরাধ খুনের প্রতিশোধ। বন্ধ করতে হবে দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়া রক্তপাত। ভুলে যেয়ো না এটা সেই শয়তানী ফেরকা যারা ভাইয়ের হাতে ভাইয়ের রক্ত ঝরিয়েছে। ওরা আমাদের শ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরাম হত্যা করেছে। নেযামুলমুলকের মতো মহান ব্যক্তিত্ব ও তার ছেলেকেও তারা রেহাই দেয়নি।

'ওরা ইস্পাহান ও শাহদরসহ অনেক স্থানে মুসলমানদেরকে নির্বিচারে হত্যা করেছে। তোমাদের লড়তে হবে এবং কোন প্রতিদানের মোহমুক্ত হয়ে লড়তে হবে। তোমরা তো জানো মহান আল্লাহ্ কারো ত্যাগ ও কুরবানীকে উপেক্ষা করেন না। আমি তোমাদেরকে একটা কথা বলে দিচ্ছি। এই অভিযানের প্রতি যদি কেউ দ্বিধান্বিত থাকো বা কেউ এই জিহাদের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত না থাকো তাকে আমি লশকর থেকে বের হয়ে যেতে অনুরোধ করছি। কোচ শুরু হওয়ার পর কেউ যদি পিঠ দেখাতে চেষ্টা করো তাকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হবে।'

★★★★

কেল্লা আলমোতে হাসান ইবনে সবাকে আবুল মুজাফফরের হত্যার খবর ও সেলজুকি লশকরের শাহদরের দিকে কোচ করার সংবাদ জানানো হলো। প্রথম সংবাদটিতে সে কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলো না। তবে দ্বিতীয়টি শোনার পর তার মুখ গম্ভীর হয়ে গেলো। অথচ এর আগে মুসলমানদের বিজয় সংবাদ ও বাতিনীদের পরাজয়ের সংবাদেও তার মধ্যে কোন ভাবান্তর দেখা যেতো না। বাতিনীদের চরম বিপর্যয়ের খবরেও তার চেহারায় সামান্যতম কুঞ্চন দেখা যেতো না। কিন্তু এবার শুধু সেলজুকিদের অভিযানের সংবাদ শুনেই তার চোখে মুখে সূক্ষ্মতম ভাজ পড়লো কয়েকটা।

'শাহদর কেল্লাবেষ্টিত খুবই মজবুত শহর'– হাসান ইবনে সবা বললো– 'তাই বলে আমাদের আত্মতুষ্টিতে ভোগা ঠিক হবে না। আমাদের একের পর এক আঘাতে সেলজুকির সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এখন ওরা আহত বাঘের মতো প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বেরিয়েছে। ভুলে যেয়োনা কেল্লা শাহদর আমার কাছে আলমোতের চেয়েও বেশি পবিত্র। আমার পীর মুরশিদ আবদুল মালিক ইবনে গুতাশ সেখানে থাকেন। যে কোন মূল্যে শাহদর বাঁচাতে হবে। সেলজুকিরা এ কেল্লা জয় করলে আমার উস্তাদকে বড় অপদস্থ করবে। আমাদের এমন নিয়মিত লশকর নেই যারা কোচ করে গিয়ে ওদের অবরোধকে অবরুদ্ধ করে রাখবে। তাই আমাদের পদ্ধতি আমরা প্রয়োগ করবো।

এখান থেকে আহলে সুন্নতের মুবাল্লিগা হিসেবে দশজন ফেদায়েনকে পাঠিয়ে দাও। ওরা সুলতান মুহাম্মদ ও সিপাহসালারকে হত্যা করবে। আরো যদি দু'তিনজন সালার কতল করতে পারা তাহলে শুধু অবরোধই ভাঙ্গবে না পুরো লশকর পালিয়ে যাবে।'

'এর চেয়ে ভালো কোন পদ্ধতি আর হতে পারে না'– তার এক বর্ষীয়ান উপদেষ্টা বললো– 'সুলতান নিহত হলেই সেলজুকিরা নিষ্প্রাণ হয়ে পড়বে। আমি আমার

নির্বাচিত ফেদায়েনকে পাঠাচ্ছি। আমার পীর ও মুরশিদ আবদুল মালিক ইবনে আতাশ সেলজুকিদের এমনিই ছেড়ে দেবেন না। তিনি ওদেরকে ঠিকই বেওকুফ বানাবেন। তবুও বাইরে থেকে তাকে মদদ পৌঁছানো আমি ফরজ মনে করেছি। আমি অন্য দশটি কেল্লা দিতে রাজী কিন্তু শাহদর নয়... ফেদায়েনকে এখনই পাঠাইও।

শাহদর কেল্লা হিসেবে অত্যন্ত সুরক্ষিত। এর পেছনে ও এক পাশে রয়েছে উঁচু উঁচু পাহাড়। সেখান দিয়ে কেল্লায় হামলা করাটা আত্মহত্যার নামান্তর। অন্যদিকে কেল্লার প্রাচীরের ওপর ছোট ছোট বুরুজে সবসময় বর্শাধারী ও তীরন্দাযরা থাকে প্রস্তুত। এখান দিয়ে কেল্লার কাছে যাওয়া মানে মৃত্যুর ঝুঁকি নেয়া। এই ঝুঁকির মধ্যেই সেলজুকিরা এ কেল্লা অবরোধ করলো। শাহদর আগে মুসলমানদের আবাদীন হলেও আবদুল মালিক ইবনে আতাশ এখানে এসে সব মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা করে। পরে বাতিনীদের এখানে নিয়ে আসে। তাই কেল্লার ভেতরের সাধারণ মানুষরাও মুসলমানদের জন্য হুমকি। তাই ভেতর থেকে কোন ধরনের সাহায্য পাওয়ার আশা করা বোকামি।

২০

কেল্লা ওসিমকুহে সালার আওরিজী আলমোতে হামলার কৌশল নির্ধারণ করছিলেন। এ সময় তিনি শাহদর অবরোধের খবর পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুযাম্মিল আফেন্দী ও ইবনে ইউনুসকে ডাকালেন।

'আমি তোমাদের দু'জনের সাহায্যে ওসিমকুহ জয় করেছি। আওরিজী বললেন– 'কিন্তু আমার আফসোস হচ্ছে আমি এখানে। আমার এখন শাহদর থাকার কথা ছিলো। নিজ হাতে আমি ঐ কেল্লা ধ্বংস করতে চাই। বাতিনীরা সেখানকার একজন মুসলমানকে জীবিত থাকতে দেয়নি। যারা পালাতে পেরেছে তারাই শুধু বাঁচতে পেরেছে।'

'আলমোতে হামলার প্রস্তুতি আপনি অব্যাহত রাখুন'– মুযাম্মিল বললো–' আলমোত জয় করতে পারলে কেয়ামত পর্যন্ত আপনার এ কৃতিত্বের ইতিহাস মানুষ স্মরণ করবে। আর এ হবে ইসলামের ইতিহাসের নবদিগন্তের এক অধ্যায়। কিন্তু চিন্তার বিষয় হলো, আলমোত এমন এক বন্ধ শহর যে, অপরিচিত কেউ সেখানে ঢুকলে কোত্থেকে কোথায় যাচ্ছে এর কোন হদিসই পাবে না সে। শুনেছেন তো এখন এর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো মজবুত করে দেয়া হয়েছে। শহর এখন দু' অংশে ভাগ করা হয়েছে। একটা শহরের উপরিভাগ, আরেকটা পাতাল ভাগ। পাতাল ভাগটা তো যেন সম্পূর্ণ গোলক ধাঁধা। তাই আমার মতে, সেখানে হামলার আগে দেখে নেয়া উচিত শহরে কি অস্ত্র দ্বারা আর কিভাবে আক্রমণ করলে তা কার্যকর হবে। 'সেখানে তোমরা যাবে কি করে?'

'ভালোই হলো ঘটনাক্রমে আজই এসব কথা উঠেছে। আমি ও ইবনে ইউনুস আলমোত যাবো। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হবে হাসান ইবনে সবাকে হত্যা করা।

জানি এটা প্রায় অসম্ভব কাজ। তবুও দ্বিতীয় প্রধান কাজ শহরের পাতাল ভাগে কি আছে সেটা দেখবো আমরা। এবং শহরের চারপাশ ঘুরে দেখবো কিভাবে এবং কোন দিক দিয়ে শহরে লশকর ঢুকানো যায়। এটা না জানতে পারলে যত বড় লশকরই আমরা নিয়ে যাই না কেন সফল হতে পারবো না আমরা।'

'কোন ছদ্মবেশ নিয়ে তোমরা ওখানে যাবে?'

'আমরা দু'জন হাসান ইবনে সবার ফেদায়েন হয়ে যাবো।'

'এসব কিছু আমাদের ওপর ছেড়ে দিন'– ইবনে ইউনুস বললো– 'কি করতে হবে না করতে হবে সবকিছু আমরা ভেবে রেখেছি। বেশির থেকে বেশি হলে আমরা মারা যাবো। আপনি যদি ঐ শয়তানিয়াতের ঝড় রুখতে চান কারো না কারো প্রাণ বিসর্জন দিতেই হবে– সেই হাজার হাজার প্রাণের কথা স্মরণ করুন যারা হাসান ইবনে সবার হুকুমে বাতিনীদের হাতে নিহত হয়েছে। যেদিন আমরা ঐ শহীদ প্রাণগুলোর কথা ভুলে যাবো সেদিন ইসলামের পতন শুরু হয়ে যাবে।'

মুযাম্মিল ও ইবনে ইউনুস এ কৌশল ঠিক করলো, বাতিনীরা যেভাবে মুসলমান সমাজে নানান ছদ্মবেশ নিয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে তেমনিভাবে একদল তৈরি করতে হবে যারা নানান বেশে হাসান ইবনে সবার দলের একেবারে ভেতরে ঢুকে শিকড় কাটার কাজ শুরু করে দেবে। মুযাম্মিলের মানসী সুমনাও এ পরিকল্পনার অন্যতম একজন।

যা হোক ঠিক হলো, আলমোতে এখন মুযাম্মিল ও ইবনে ইউনুসের সঙ্গে সুমনাও যাবে। এ শুনে শাফিয়াও যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। ওর মনে সুমনা এতখানি জায়গা করে নিয়েছে যে, এক মুহূর্তও সুমনাকে ছাড়া শাফিয়া কল্পনা করতে পারে না। তাছাড়া ওর যুবা বয়স হলেও ওর ওপর দিয়ে যে ঝড় গিয়েছে এতে সে অভিজ্ঞতাপুষ্ট ও পরিণত হয়ে গেছে এ বয়সেই। দুনিয়াটা এখন তার কাছে পরিষ্কার আয়নার মতো। সুমনা ভাবলো ওর এই পরিণত অভিজ্ঞতা ও রূপ যৌবন তাদের এ মিশনে ভালোই কাজ দেবে। তাই সুমনা ওর জন্য মুযাম্মিলের কাছে সুপারিশ করলে মুযাম্মিল রাজি হয়ে গেলো। তবে সুমনা শাফিয়াকে সাবধান করে দিলো। এ মিশনে ওদের বেঁচে আসার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ, তাই যেন সে আরেকবার ভেবে দেখে। 'আমি তো মৃত্যুর স্বাদ নিতেই যাচ্ছি'– শাফিয়া পরম আত্মবিশ্বাস নিয়ে সুমনাকে এর জবাব দিলো।

★★★★

কেল্লায় ঢোকার কয়েকবার ব্যর্থ হামলা চালিয়ে মুহাম্মদ ও তার সালাররা বুঝতে পারছেন এ কেল্লা তাদের ধারণার চেয়েও আরো অনেক মজবুত। শহরের প্রাচীরের ওপর সবসময় অসংখ্য বর্শাধারী ও তীরন্দাজরা মজুদ থাকে। শাহদরে আগ থেকেই সেলজুকিদের গোয়েন্দা লাগানো ছিলো। তারা এসে জানালো, শহরে সুশৃংখল সৈন্য না থাকলেও শহরের প্রত্যেকেই লড়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে এবং তাদের আত্মবিশ্বাস ও জযবা আকাশচুম্বী।

আরেকটি খবর হলো, কয়েকদিন আগে শাহদরের বাতিনীরা এক কাফেলা লুট করে অর্থকড়ি সোনা রুপা ছাড়াও কয়েকটি মেয়ে অপহরণ করে। এর মধ্যে নুর নামে একটি মেয়ে অসম্ভব রূপবতী। তার মা ও ভাই বাতিনী ডাকাতদের হাতে মারা গেছে। তার বাবা মেয়ের সঙ্গে চলে এসেছে। এসব রূপবতী মেয়েকে হাসান ইবনে সবার বেহেশতের হুর বানানো হয়। অনেককে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে অন্য এলাকায় পাঠানো হয় বড় বড় শিকার ধরার জন্য। নুরকেও শয়তানের বেহেশতের হুর বানানোর জন্য নির্বাচন করা হয়। কিন্তু আবদুল মালিক ইবনে আতাশের ভাই আহম্মদ ইবনে আতাশ নুরের রূপে পাগল হয়ে তাকে বিয়ে করে ফেলে। আর নুরের বাপ হয়ে যায় আহম্মদ ইবনে আতাশের কর্মচারী। তিনি সবসময় সুযোগ খুঁজেন কিভাবে তার মেয়েকে এখান থেকে বের করা যায়। কিন্তু তিনি কোন পথ খুঁজে পান না।

তারপর একদিন তারা জানতে পারে সেলজুকিরা এ কেল্লা অবরোধ করেছে। নুর তখনই নফল নামাযে দাঁড়িয়ে যায়। নামাযের পর সে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে দুআ করে, হে আল্লাহ! আমি যে ঘরের হজ্ব করে এসেছি আপনি তার ইযযত সম্মান অক্ষুণ্ন রাখুন । এই বদমাশদের ধ্বংস করে দিন। তার গলা ক্রমেই উচ্চকণ্ঠ হতে থাকে। এ সময় আহম্‌দ ইবনে আতাশ কামরায় ঢুকে নুরের এ দুআ শুনে ফেলে।

'যে ঘরে তুমি আছো আল্লাহ তো সে ঘরের সম্মান রাখছেন। উঠো এখনই...এই দুআ বন্ধ করো... তুমি আমার স্ত্রী... তুমি ছাড়া পাবে না'– আহমদ ইবনে আতাশ বললো।

'যদি আমার আল্লাহ সত্য হন তুমি অপদস্থ হয়ে মরবে.... তুমি আমার ইবাদতে বাঁধা দিয়েছো, ...আমি তোমাকে লাঞ্ছিত হয়ে মরতে দেখবো'– নুর রাগে ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বললো।

আহমদ ইবনে আতাশ তার মুখে সজোরে একটি থাপপর মেরে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো। নুর একেবারে নীরব হয়ে গেলো।

শহরের প্রশাসনিক সব দায়-দায়িত্ব এখন আহমদ ইবনে আতাশের কাছে। কারণ আবদুল মালিক ইবনে আতাশ অনেক বৃদ্ধ হয়ে গেছে। সে শুধু জাদুটোনা ও মন্ত্রজপের মধ্যেই সময় কাটায়। তার একটি কামরা আছে। সেখানে কেউ ঢুকলে প্রায় অচেতন হয়ে পড়ে। কারণ ভেতরে শত শত মরার খুলি ও কংকাল এবং মরার হাড় রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন বাক্স ভরে রাখা আছে সাপ, পেচা এবং আরো অনেক কিছু। কেল্লা সেলজুকিদের দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়ার পর আবদুল মালিক সে কামরায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে একটি পেচা বের করলো একটি বাক্সের ভেতর থেকে। কামরার বাইরে তার খাস কর্মচারী নুরের বাপ সবসময় দাঁড়িয়ে থাকতো। প্রয়োজন হলেই ভেতরে তার ডাক পড়তো।

আবদুল মালিক ইবনে আতাশ তিন দিন কামরা থেকে বের হলো না। এ কয়দিন নুরের বাবার হাতে সে শুধু দুধ পান করেছে। তারপর নুরের বাবাকে আদেশ দিলো অমুকের মাধ্যমে একজন অন্ধ লোক যেন ধরে আনে। একটু পর এক অন্ধ ভিখারীকে তার কামরায় ঢুকিয়ে দেয়া হলো। তাকে দুই দিন দুই রাত সে কামরায় রাখা হলো এবং তার দেহের বিভিন্ন জায়গা কেটে কেটে রক্ত বের করে সে রক্ত পান করানো

হলো পেঁচাকে। এরপর সেই অন্ধ ভিখারীকে তার কর্মচারীর মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয়া হলো ডাক্তারের কাছে।

নুরের বাবা ডাক্তারের কাছ থেকে ফিরে এলে তার হাতে আবদুল মালিক পেচাটিকে দিয়ে বললো, এর মুখ জোর করে খুলে রেখো। নুরের বাবা পেচার মুখ হা করিয়ে রাখলো। আর আবদুল মালিক পেচার মুখের ভেতর ভাজ করে একটি কাগজ ভরে দিলো। নুরের বাপকে বললো কালো একটি সুতা দিয়ে এর মুখ বেঁধে দাও। মুখ বাঁধা হয়ে গেলে আবদুল মালিক পেচাটিকে বাক্সে ভরে রাখলো এবং নুরের বাবার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিলো। নুরের বাবার প্রতি তার পুরোপুরি আস্থা ছিলো। নুরের বাবাও তার মেয়েকে উদ্ধারের জন্য কৌশলে এতটুকু বিশ্বস্ততা অর্জন করে নিয়েছে।

এদিকে মুহাম্মদ তার তীরন্দাযদের প্রাচীরের ওপরের দিকে তীর ছোঁড়ার জন্য দেয়ালের কাছে পাঠালেন। কিন্তু ওপর থেকে আসা অবিরাম তীর বৃষ্টির কারণে তীরান্দাযরা বার বার ফিরে আসতে বাধ্য হলো। মুহাম্মদ কেল্লার আশ পাশে ঘুরছিলেন আর খুঁজছিলেন কোন দিক দিয়ে প্রাচীর ভাঙ্গা যায়। তার ডানে বামে সামনে পেছনে মুহাফিজ সালাররাও তার সঙ্গেই রয়েছে। তিনি সুলতান এবং সিপাহসালার হওয়ার কারণে দুশমনের আসল টার্গেট ছিলেন তিনিই। কারণ তাকে মারতে পারলে এবং তার ঝাণ্ডা ফেলে দিতে পারলে বাকী লশকর পিঠ দেখাতে দেরি করবে না। তাই তিনি যেদিকে যেতেন সেদিকেই তীর নিক্ষেপ বেশি হতো। তবে তীরের নিশানা থেকে তিনি নিরাপদ দূরত্ব থাকাতে, তার কোন ক্ষতি হওয়ার আশংকা ছিলো না।

ঘুরতে ঘুরতে তিনি একটি গাছের কাছে পৌঁছলেন। হঠাৎ একটি তীর গাছের ওপরের দিকের ডালে এসে বিঁধলো। মুহাম্মদের নজর সেদিকে আটকে গেলো। তীরের সঙ্গে সাদা একটা কাগজ বাঁধা দেখতে পেলেন তিনি। এক সওয়ারের মাধ্যমে তিনি ডাল থেকে তীরটি খুলালেন এবং কাগজটি তীর থেকে আলাদা করলেন। কাগজের ভাঁজ খুলে দেখতে পেলেন তাতে লেখা– 'আজ বা কাল যে কোন সময় শহর থেকে একটি পেচা পুরো ফৌজের ওপর দিয়ে উড়ে আসবে। পুরো ফৌজের ওপর দিয়ে চক্কর কেটে তারপর কোথাও অদৃশ্য হয়ে যাবে। পেচাটিকে দেখামাত্র তীর মেরে ফেলে দিতে হবে এবং যেখানে সেটি পড়বে সেখানে গিয়ে শুকনো ঘাস তার ওপর রেখে সেটা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। না হয় সম্মুখীন হতে হবে কঠিন বিপদের। পুরো লশকরের সবাই অন্ধ হয়ে যাবে।'

মুহাম্মদ এটাকে নিরর্থক মনে করে ফেলে না দিয়ে সৈন্য বাহিনীর সবাইকে জরুরী নির্দেশ দিয়ে দিলেন। এরপর থেকে লশকরের সবার তীরের রুখ হলো শহরের প্রাচীরের দিকে। ক্ষণে ক্ষণে সবার চোখ উঠে যেতে লাগলো আকাশের দিকে। সেদিন আর কিছু হলো না। পরদিন সকালে এক দিক থেকে আওয়াজ উঠলো পেচা উড়ছে, কয়েক'শ তীরের ঝাঁক সেদিকে ছুটে গেলো। এমন তীর বৃষ্টির মধ্যে একটি সুইও অক্ষত থাকার কথা নয়। পেচাটি দেহে অনেকগুলো তীর নিয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। সুলতান মুহাম্মদ সেখানে দৌড়ে গিয়ে দেখলেন, পেচাটির মুখ কালো সুতা দিয়ে বাঁধা। মুহাম্মদের হুকুমে তখনই এর ওপর শুকনো ঘাস রেখে পুড়িয়ে দেয়া হলো।

★★★★

মুযাম্মিল সুমনা ইবনে ইউনুস ও শাফিয়া আলমোতের উদ্দেশ্যে সকালে রওয়ানা দিয়ে সন্ধ্যার দিকে চমৎকার টিলা বেষ্টিত এক জায়গায় তাঁবু ফেললো। অন্ধকার ঘন হয়ে আসতেই চারজন দস্তরখানায় বসে গেলো। মুযাম্মিল খাওয়ার ফাকে এমনিই সামনের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো, তাদের সামনে সাদা জুব্বা ও পাগড়ি পরিহিত এক যুবক এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। তার পোষাক বলে দিচ্ছে সে একজন অভিজাত মানুষ।

'এসো ভাই! খাবার প্রস্তুত। আমাদের সঙ্গে বসে খাও'– মুযাম্মিল তাকে বললো।

'আমি মুসাফির নই'– লোকটি অনুচ্চ হেসে বললো– 'আমি আগ থেকেই এখানে আছি। তোমরা এই মাত্র এখানে এলে। এজন্য তোমরা মেহমান আমি মেজবান। আমরা এক সঙ্গে দশজন আছি। ঐ টিলার অন্য দিকে তাঁবু ফেলেছি। খাবার তো আমার খাওয়ানো উচিত।'

মুযাম্মিল ও সুমনা গভীর চোখে তাকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। ওরা দু'জনেই ছদ্মবেশ ধরেছিলো। কারণ হাসান ইবনে সবার লোকেরা ওদেরকে চিনে। যদিও ওরা এখন যৌবনের শেষ প্রান্তে। সহসা ওদেরকে দেখে অনেক আগের পরিচয়ের কেউ চিনতে পারবে না। তবুও সাবধানের মার নেই।

'আমি এখনই আসছি'– এই বলে লোকটি টিলার উল্টো দিকে চলে গেলো। একটু পর আবার ফিরে এলো হাতে একটি মশক নিয়ে। মুখে তার মন ভোলানো হাসি। মশকটি দস্তরখানার ওপর রেখে বললেন, 'মশকটির ভেতর বিশেষ ধরনের শরবত আছে। এটা পান করে দেখবেন আপনারা। দেখবেন আপনাদের খুব ফুরফুরে লাগবে। ক্লান্তিও দূর হয়ে যাবে। আপনাদের খাবারে আমি আর ডিষ্টার্ব দিতে চাই না।'

লোকটি উঠে চলে গেলো। মুযাম্মিল বড় দ্রুত গিয়ে টিলার ওপর উঠলো। দেখলো, বিশ পঁচিশ কদম দূরে তিনটি মশাল জ্বলছে। সে লোকের পোষাকে দশজন লোক বসে খাবার খাচ্ছে। মুযাম্মিল ছোট ছোট গাছের আড়ালে আড়ালে থেকে অতি সন্তর্পণে ওদের কাছাকাছি এক জায়গায় লুকিয়ে পড়লো। এখান থেকে ওদের কথাবার্তা ভালো করে শোনা যাবে।

'ভাইয়েরা দারুণ মাল ভাই'– সে লোকটি সঙ্গীদের বললো– 'দ্বিতীয়টাও খারাপ নয়। তবে ওর বয়স ত্রিশ বছরের একটু বেশিই হবে। তবুও দারুণ জিনিস।'

'আসলে এটা শায়খুল জাবালেরই কারামতি। এই সফরে তিনি আমাদেরকে দারুণ জিনিস দিয়েছেন'– একজন বললো।

'এখন বের করো ওদেরকে কিভাবে এখানে উঠিয়ে আনবে?' আরেকজন বললো।

'এটা এখন নিজেদের জিনিস মনে করো ভাই, ওদেরকে উঠিয়ে আনার ব্যবস্থা আমাদের বন্ধু করে এসেছে। এক মশক শরবত ও গোশত দিয়ে এসেছে। একটু পরেই ওদের দুনিয়ার প্রতি আর কোন হুশ থাকবে না– আরেকজন বললো।

মুযাম্মিলের আর কোন কথা শোনার প্রয়োজন হলো না। তার সন্দেহ দূর হয়ে গেছে। যেভাবে লুকিয়ে এসেছিলো সেভাবেই সে আবার তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে এলো। ইতিমধ্যে সুমনাও মশক খুলে নিশ্চিত হয়েছে যে, এতে হাশীষ মিশানো আছে। কাছেই একটি নদী ছিলো। নদীতে সে ওগুলো ফেলে দিয়ে আসলো। গোশতগুলোও ফেলে দিলো।

এরা বাতিনী। এখন দেখতে হবে হাসান ইবনে সবার কোন স্তরের লোক এরা। আর যাচ্ছেই বা কোথায়?'– মুযাম্মিল বললো।

'আমাদের সন্দেহই ঠিক হয়েছে। শরবতে হাশীষ মেশানো ছিলো। নদীতে ওগুলো ফেলে দিয়েছি আমি। এবার আসলে বলতে হবে, আমরা শরবত খেয়ে শেষ করে ফেলেছি। দারুণ জিনিস ছিলো– সুমনা বললো।

সুমনার কথা শেষ হতেই সাদা পোষাকধারী তিনজন লোক এসে ওদের কাছে বসে গেলো।

'মশকের শরবত পান করেছো ভাইয়েরা?'– একজন জিজ্ঞেস করলো।

'পান করেছি, এই শরবত বলে দিচ্ছে তোমরা আমরা ভাই ভাই। আরো পারলে দুটি মশক দিয়ে যেয়ো'– মুযাম্মিল বলতে বলতে ওদের কানের কাছে ফিস ফিস করে বললো– 'আমরা শাহদর থেকে এসেছি। শায়খুল জাবালের কাছে যাচ্ছি। আমরা দু'জন ফেদায়েন, মেয়ে দুটিকে শায়খুল জাবালের খেদমতে পেশ করবো।'

'তোমরা অবরোধ ভেঙ্গে কি করে বের হলে?'

'আমরা অবরোধের একদিন আগে বের হয়েছি। ইমামের উস্তাদ আবদুল মালিক ইবনে আতাশ আমাদেরকে একটি পায়গাম দিয়ে ইমামের কাছে পাঠিয়েছেন।'

'পায়গামটা কি?'

'জানোই তো এ তথ্য তোমাদেরকে দিতে পাবো না আমরা। আশা করি আর জিজ্ঞেসও করবে না। আমাদের পরিচয় তো প্রকাশ করেছি তোমরা আমাদের লোক বলে।'

'শাহদরের ফেদায়েনরা কি হামলাকারী সালারদের খতম করতে পারবে না?'

'কেন পারবে না? তবে আমাদেরকে অন্য এক হুকুম দিয়েছে। কতলের হুকুম পেলে আমরাও মুহাম্মদ ও সাঞ্জারকে খতম করতে পারবো।'

'সেটা আমরাই করবো, দেখা যাক অবরোধ কি করে ওটুট থাকে–' ওদের একজন আসল কথা বেফাস বলে ফেললো।

তিন ফোদায়েন আরো কিছুক্ষণ কথা বলে ওদের পরিচয় ফাস করে দিয়ে চলে গেলো। ওরা চলে যাওয়ার পর মুযাম্মিল সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বললো, আজ রাতে ঘুমানো যাবে না, সবাই ঘুমের ভান করে পড়ে থাকবে।

মাঝ রাতের দিকে চুপি চুপি দুই ফেদায়েন এসে মুযাম্মিল ও ইবনে ইউনুসের ওপর ঝুঁকে অনেক্ষণ পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলো, এরা অঘোর ঘুমাচ্ছে। মুযাম্মিল ও ইবনে ইউনুস নাক ডাকছিলো। দুই ফেদায়েন চাপা পায়ে শাফিয়া ও সুমনার কাছে গিয়ে ফিস ফিস করে বললো, 'একজনেরও হুশ নেই। আরামে উঠিয়ে নাও।

দু'জনে ধরে শাফিয়াকে উঠাতে লাগলো ওমনিই একজনের পিঠে মুযাম্মিলের আরেকজনের পিঠে ইবনে ইউনুসের খঞ্জর বিঁধে গেলো। আরো দু'বার বিদ্ধ হলো খঞ্জর। বিনা শব্দে লাশ দুটি পড়ে গেলো মাটিতে। ওরা খুব দ্রুত লাশ দুটি নদীতে ফেলে দিয়ে আবার আগের মতো শুয়ে নাক ডাকতে লাগলো।

বেশিক্ষণ গেলো না। আরো তিন ফেদায়েন এলো। প্রথমে তাদের সঙ্গীকে খুঁজলো। তারপর সবাইকে অঘোরে ঘুমুতে দেখে শাফিয়াকে উঠানোর জন্য ঝুঁকলো এবং কিছু বুঝার আগেই মুযাম্মিল ও ইবনে ইউনুসের খঞ্জরের আঘাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। ওদের তিনজনের লাশও ফেলে দেয়া হলো নদীতে।

'মুযাম্মিল ভাই?'– ইবনে ইউনুস বললো– 'আর বাকী আছে পাঁচজন। ওদের জন্য এখানে থেকে অপেক্ষা করা যাবে না। তখন ঘটনা আঁচ করে ওরা কিন্তু সশস্ত্র ও প্রস্তুত হয়ে আসতে পারে। ওদের দু'জনকে তলোয়ার দিয়ে দিন। এতক্ষণে ওরা আগে এসেছে। এখন আমরা যাব আগে।'

সুমনা ও শাফিয়াকে তলোয়ার দেয়া হলো, আর মুযাম্মিল ও ইবনে ইউনুসের কাছে রইলো খঞ্জর। চারজন নিঃশব্দ পায়ে ফেদায়েনদের তাঁবুর এত কাছে গিয়ে পৌঁছলো যে, এখান থেকে ওদের কথাও শোনা যাবে এবং ওদের বের হতে হলে মুযাম্মিলদের কাছ দিয়ে যেতে হবে।

'আরে আমাদের ভাইয়েরা দেখি এক মেয়ের পেছনে পড়ে আমাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে'– ওদের একজনকে বলতে শোনা গেলো।

'চলো আমরা গিয়ে দেখি। যদি কোন গণ্ডগোল দেখি আগে ওগুলোরে শেষ করবো– আরেকজন বললো।

পাঁচজনে তাঁবু থেকে বের হয়ে হাঁটা দিলো। মুযাম্মিলরা এক ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে ওঁৎ পেতে রইলো। পাঁচজন হাঁটতে হাঁটতে ওদের কাছে চলে এলো। মুযাম্মিলের ইশারায় তখনই সবাই ফেদায়েনদের ওপর হামলা করে বসলো। কিন্তু মুযাম্মিলের দুর্ভাগ্য ওর পা একটি গাছের গুড়িতে আটকে গেলো। মুযাম্মিল উঠতে যাচ্ছে তখনই এক ফেদায়েন মুযাম্মিলের ওপর খঞ্জর দিয়ে আঘাত করলো। মুযাম্মিল আঘাত বাঁচিয়ে সরে গেলো। কিন্তু তার ডান কাঁধ বাঁচাতে পারলো না। সেখানে যখম গভীর হয়ে গেলো। তবুও মুযাম্মিল তা খঞ্জর দিয়ে এমন জবাব দিলো যে, সেই ফেদায়েনের আর দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা রইলো না। ইতিমধ্যে ইবনে ইউনুসরাও বাকী চারজনকে ফেলে দিয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যেই পাঁচ ফেদায়েনের জাহান্নাম নিশ্চিত হয়ে গেলো।

'এই দশ ফেদায়েন যদি ওখানে পৌঁছে যেতো তাহলে সুলতান মুহাম্মদসহ সব সালার মারা পড়তেন এবং এই অবরোধের পরিণাম হতো খুবই দুঃখজনক'– মুযাম্মিল বললো।

ওদিকে শাহদর অবরোধে সেলজুকিরা এখনো সফলই বলা চলে। তবে বাতিনীরা দমবার পাত্র নয়। শহরের দুদিকে যে পাহাড় আছে সে পাহাড়েও মুজাহিদরা চড়তে চেষ্টা করেছে। কিন্তু শহরের প্রাচীরের সঙ্গে পাহাড়ের দূরত্ব এত কম যে, মুজাহিদরা

পাহাড়ে চড়তে গেলেই ওরা তীর আর বর্শা ছুড়তে শুরু করেছে। তারপর মিনজানীক ব্যবহার করা হলো, একেকটা মিনজানীক এক এক মন ওজনের পাথর ছুঁড়তে পারে। মিনজানীক দিয়ে প্রাচীরে আঘাত করা হলো গোলার মতো। কিন্তু প্রাচীর এত পুরো যে মিনজানীক প্রাচীরের কোন ক্ষতিই করতে পারলো না।

এদিকে হাসান ইবনে সবা তার পাঠানো সেই দশ ফেদায়েনের সাফল্যের সংবাদ শোনার জন্য অস্থির হয়ে উঠলো। এতদিনে তো মুহাম্মদ ও তার সালারদের কতল করে ওদের ফিরে আসার কথা ছিলো। অথচ এক মাসেরও অনেক বেশি হয়ে গেছে এখনো এ ধরনের কোন সংবাদ আসলো না। শেষ পর্যন্ত সে তার গুপ্তচর লাগালো দশ ফেদায়েনকে খুঁজে বের করতে। ওরা আলমোত থেকে শাহদর পর্যন্ত সম্ভাব্য সব জায়গায় খুঁজেও দশ ফেদায়েনের কোন হদিস করতে পারেনি। তবে এক জঙ্গল দিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষিপ্ত অনেকগুলো মানুষের হাড় গোড়, সাদা জুব্বা ও অন্যান্য কিছু আলামতে নিশ্চিত হলো যে, এ তাদেরই দশ ফেদায়েনের শেষ বিশ্রাম এখানে হয়েছে।

এভাবে চার মাস চলে গেলো অবরোধের। এক দিন শাহদরবাসী দারুণ সাহসিকতার পরিচয় দিলো। রাতের বেলা হঠাৎ করে শহরের একটি দরজা খুলে গেলো। প্রায় দু'তিনশ লোক বর্শা ও অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ক্ষিপ্রগতিতে বাইরে এসে সেলজুকিদের ওপর টুটে পড়লো। সেলজুকিদের বেশ ক্ষতি করে আবার ফিরে গেলো। ওদের কয়েকজন আহত হলেও সেলজুকিরা সংখ্যায় আরো বেশি আহত হলো, দেড় দু'মাস এভাবে প্রায়ই তারা রাতের বেলা আক্রমণ করতো এবং ফিরে যেতো। কিন্তু এই দীর্ঘ অবরোধে শহরের ভেতরে দারুণ খাদ্য সংকট দেখা গেলো। প্রয়োজনীয় রসদপত্র ক্রমেই ফুরিয়ে এলো।

একদিন সকালে শহর থেকে সাদা ঝাণ্ডাধারী এক লোক মুসলিম শিবিরে এসে জানালো সুলতানের জন্য সে এক পয়গাম নিয়ে এসেছে। এক সালার তাকে সুলতান মুহাম্মদের কাছে নিয়ে গেলো। সে সুলতানের কাছে পয়গাম পেশ করলো। পয়গাম লেখা হয়েছে কেল্লার হাকিম আহমদ ইবনে আব্দুল মালিকের পক্ষ থেকে। তাতে লেখা, আমরা তোমাদের এক আল্লাহ, এক রাসূল ও এক কুরআনকে মানি। এও মানি যে মুহাম্মদ (সঃ) আখেরী রাসূল আমরা। তরিকতের পূর্ণ অনুসরণ করি। তারপরও কেন আমাদেরকে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার দেয়া হয় না। আমাদের দ্বিমত শুধু ইমামতি বা নেতৃত্ব নিয়ে। আপনারা আমাদের ইমামকে মানেন না। এতে কোন কিছু যায় আসে না। কারণ ইমাম নবী রাসূল নন। আমরা শুধু তার আনুগত্য করি। শরীয়তে কি জায়েয আছে, একই ধর্মের ভিন্ন এক ফেরকাকে অনুগত করার জন্য জুলুম ও জোর জবরদস্তি করা এবং জীবন থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা?"

মুহাম্মদকে 'আনুগত্য' শব্দটা নরম করে দিলো। তাছাড়া ধর্মের ব্যাপার এসে যাওয়াতে তিনি এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ফতোয়া তলব করাটা সমীচীন মনে করলেন। তিনি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আলেমদের কাছে ফতোয়া তলব করলেন।

দু'একজন আলেম ভিন্ন ফতোয়া দিলেও নির্ভরযোগ্য আলেমরা বাতিনীদের বিপক্ষে ফতোয়া দিলো। দেশের একজন মুফতী শায়খ আবুল হাসান আবদুর রহমান সাম্বানী ফতোয়া দিলেন। বাতিনীরা ইসলামের কোন ফেরকা তো নই; বরং তাদের কর্মকাণ্ড এতই ইসলাম বিদ্বেষী যে, ওদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব। কারণ, মানব হত্যা ও শয়তান পূজা ছাড়া বাতিনীদের আর কোন ধর্ম নেই। ওরা শরীয়ত মানে না। মানে ওদের ইমামকে। শরীয়ত যা হারাম সাব্যস্ত করেছে সেগুলোকে ওরা হালাল বলে মানে। ইসলাম ওদেরকে বেঁচে থাকার অধিকার দিতে পারে না।

মুহাম্মদ এই ফতোয়া আহমদ ইবনে আবদুল মালিকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আহমদ জবাব পাঠালো, হাকিমে কেল্লা সুলতানের কাছে আবেদন করছে, তিনি যেন সেলজুকি উলামাদের কেল্লার ভিতর পাঠিয়ে দেন। বাতিনী উলামাদের সঙ্গে তারা 'বহছ' বিতর্ক করবে।

ইস্পাহানের শ্রেষ্ঠ আলেম কাজী আবুল আলা সায়িদ ইবনে ইয়াহইয়াকে সুলতান নিয়ে এসে তাকে 'বহছের' জন্য চারজন মুহাফিজসহ ভেতরে পাঠালেন। সুলতান ভাবছিলেন এমন জটিল একটি বিষয়ের বিতর্ক দীর্ঘ সময় ধরে চলবে। কিন্তু কাজী আবুল আলা খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন এবং সুলতানের সাথে সাক্ষাত করলেন।

'সুলতান মুহতরাম'– কাজী আবুল আলা হতাশার সুরে বললেন– 'সময় নষ্ট না করে এ শহর জয় করার চেষ্টা করেন, এদের মতো এমন প্রতারক জাতি নেই পৃথিবীতে। হাকিমে শহরের চেহারায় আমি স্পষ্ট শয়তানির ছাপ দেখেছি। এরা বহছ বা বিতর্ক কিছুই চায় না। এরা নতুন করে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য কিছু সময় চায়।'

মুহাম্মদের সামনে বসে থাকা সালাররাও তার কথার সমর্থন করলেন।

'মাননীয় কাজীয়ে ইস্পাহান'– মুহাম্মদ বললেন– আপনার তুলনায় আমি পাঠশালার শিশু। আমি ভয় পাচ্ছি, আমার কোন উদ্যোগ না আবার শরীয়তের বিরোধী হয়ে যায়। আপনি বলুন ওরা যে নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করছে সেটা কতটা সঠিক? শরীয়তের হুকুম কি, ওদেরকে ক্ষমা করে দেয়া না শেষ করে দেয়া?'

'একমাত্র ফয়সালা হলো বাতিনীরা শয়তানের পূজারী। ওদেরকে ক্ষমা করা অনৈসলামিক কাজ। ওরা কুরআনেরও বিকৃতি করিয়েছে। ওদের বিরুদ্ধে আপনার লড়াই অব্যাহত রাখুন।' কাজী বললেন, 'আরেকটা কথা, শহরের কি অবস্থা এবং শহরবাসীর কি প্রতিক্রিয়া সেটা কি আপনি দেখার চেষ্টা করেছেন?'

'হ্যাঁ সুলতান!' শহরের অবস্থা খুবই নাজুক। আর শহরবাসী হাকিমের কাছে দাবী তুলছে, যে ভাবেই হোক এ অবরোধ বন্ধ করে দেয়া হোক। হাকিমে শহরের কথায়ও আমি এটাই বুঝেছি। সে বলেছে আপনারা শহর ঘুরে ফিরে দেখুন, অনবরত পাথর বর্ষণ করে কতগুলো বাড়িঘর গুড়িয়ে দিয়েছেন। লোকজন ঘরে শোয়া বসা ছেড়ে দিয়েছে। আগুনের তীর ছুড়ে দেখুন কতগুলো বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছেন। তবে হাকিমের কথায় বুঝেছি একটু সময় পেলে সে বাইরে থেকে সাহায্য পাবে। অবরোধ আপনি আরো জোরদার করুন। জয় ইনশাআল্লাহ আপনারই হবে।

★★★★

মুহাম্মদ তীরন্দাজীর মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিলেন। মিনজানীক দ্বারা পাথর বর্ষণও আরো তীব্রতর করে তুললেন। এর ফলে শহরবাসীদের মনোবল ভেঙ্গে গেলো। প্রাচীরের উপর থেকে অর্ধেকের চেয়ে বেশি বাতিনী তীরান্দাজ কমে গেছে। এর অনেকে তীরবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে, অনেকে আহত হয়েছে, অনেকে হতাশ হয়ে লড়াই ছেড়ে দিয়েছে। কয়েকদিন পর আবদুল মালিক ইবনে আতাশের কাছ থেকে সুলতান মাহমুদের কাছে আবেদনমূলক একটি পয়গাম এলো। সে এতে আবেদন জানিয়েছে, তাকে যেন কেল্লা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। দ্বিতীয়ত: তাকে কেল্লা মুলাযখানে চলে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হয়। কেল্লা মুলাযাখান বাতিনীরা একবার দখল করেছিলো। সুলতান মালিক শাহের সময় সেটি বাতিনীমুক্ত করা হয়।

সুলতান মুহাম্মদ এক্ষেত্রে পরম উদারতার পরিচয় দিলেন। শাহদরের হাকিমের আবেদন মেনে নিলেন এবং হুকুম দিলেন, এক মাসের সময় দেয়া হলো, যারা শহর ছেড়ে চলে যেতে চায় তারা যেন শহর ছেড়ে দেয় এ সময়ের মধ্যে।

কিন্তু বাতিনীরা যেখানে আছে সেখানে বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা একটা ঘটবেই। একজন সালারসহ কয়েকজন সৈন্য শহরের ভেতর পাঠানো হলো। যারা শহর থেকে বেরিয়ে যাবে তাদেরকে সৈন্যরা নিরাপদে বের করে দেবে। কিন্তু এক অফিসার এক গলি দিয়ে যাচ্ছিলো। হঠাৎ তিন চারজন বাতিনী তার ওপর হামলা করে বসলো। অফিসারও বীরত্বের সঙ্গে মোকাবেলা করলো তারপরও খুব যখমী হলো। বাতিনীরা এর দ্বারা তাদের স্বরূপ প্রকাশ করে দিলো।

মুহাম্মদ এ ঘটনা জানতে পেরে তার সৈন্যদের ভেতর থেকে নিয়ে এসে আবার মিনজানীক হামলা শুরু করে দিলেন। এবার হাকিমে শহর আহমদ ইবনে আবদুল মালিক স্বয়ং কয়েকজন মুহাফিজসহ সাদা একটি ঝাণ্ডা নিয়ে মুহাম্মদের কাছে ক্ষমা চাইতে আসলো। সে মাফ চেয়ে বললো, এ ঘটনার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। মুহাম্মদ প্রথমে তার এই ক্ষমা চাওয়াতে গললেন না। বললেন, তিনি এই শহর গুড়িয়ে দেবেন এবং এদেরকে নির্বংশ করে ছাড়বেন। কিন্তু যখন আহমদ ইবনে আবদুল মালিক তার পায়ে পড়ে কান্না শুরু করলো তখন মুহাম্মদ মোমের মত গলে পড়লেন। সে আবেদন করলো তাকে খালজান না দেয়া হলেও 'নাযিরওয়াতবাস' নামক অতি ছোট্ট কেল্লাটি যেন দিয়ে দেয়া হয়। সে সেখানে কোন অশান্তি সৃষ্টি করবে না।

মুহাম্মদের ভেতর দয়ার সাগর উথলে উঠলো। তিনি তার আবেদন মঞ্জুর করলেন। তবে হুকুম দিলেন কেল্লার প্রাচীর ও বুরুজগুলো অক্ষুণ্ন রেখে ভিতরের বাড়ি ঘরগুলো গুড়িয়ে দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো গুড়িয়ে দেয়ার কাজ শুরু হয়ে গেলো।

হঠাৎ এক সৈন্য দেখলো প্রাচীরের একটি বুরুজে কে যেন লুকিয়ে আছে। সে তার সালারকে জানালে সালার কয়েকজন মুজাহিদ নিয়ে বুরুজ থেকে লোকটিকে টেনে বের করলেন। দেখা গেলো সে আব্দুল মালিকের ভাই আহমদ ইবনে আতাশ। তাকে পাকড়াও করা হলো, তারপর সমস্ত বুরুজে তল্লাশি চালিয়ে আরো চল্লিশজন লুকিয়ে থাকা বাতিনীকে বের করা হলো। আহমদ ইবনে আতাশের এক ছেলেও এর মধ্যে ছিলো। সবগুলোকে হাজির করা হলো সুলতানের সামনে।

'ইবনে আতাশ!'– সুলতান মুহাম্মদ আহমদ ইবনে আতাশকে জিজ্ঞেস করলেন– 'এখানে লুকিয়ে কি করছিলে তুমি? সত্য বললে এখনো আগের মতো আমার মনে দয়ার উদ্রেক হবে। মিথ্যা বলার চেষ্টা করলে কি শাস্তি যে পাবে তা নিজেই তো বুঝতে পারছো।'

'সুলতানের কি এতটুকু বুঝার ক্ষমতা নেই?'– আহমদ ইবনে আতাশ রূঢ় গলায় বললো– 'তোমার পিঠে খঞ্জর মারার জন্য আমার রয়ে গিয়েছিলাম। এত তাড়াতাড়ি আমরা পরাজয় মেনে নেয়ার পাত্র নই।'

'তোমার এক ভবিষ্যতবাণী শুনেছি আমি, ইস্পাহানে নাকি তোমার বিজয় ঘণ্টা বেজে উঠবে। কোথায় গেলো তোমার বিজয় ঘণ্টা?' মুহাম্মদ বললেন।

'আমার ভবিষ্যতবাণী ভুল হয়নি। ইস্পাহান গিয়ে দেখুন। লোকেরা আমার নাম নেয় পরম শ্রদ্ধা নিয়ে। ইস্পাহানে আমার রাজত্ব হবে একথা বলিনি আমি। আমার ইচ্ছা হলো মানুষের অন্তরজগতে আমার রাজত্ব চলবে। ইস্পাহানের যেদিকেই যাবো আমি সবাই সিজদায় পড়ে যাবে আমার সম্মানে।'

'তোমার গলায় শিকল পরিয়ে ইস্পাহানের অলিগলিতে তোমাকে ঘুরাবো'– মুহাম্মদ দুই সালারকে হুকুম দিলেন– 'ওকে ও ওর ছেলেকে হাতে পায়ে শিকল দিয়ে এবং মুখে কালি মাখিয়ে ইস্পাহানের অলিগলিতে ঘুরাও। তারপর জনসমক্ষে ওদের মাথা কেটে বাগদাদের খলীফার কাছে পেশ করো।'

মুহাম্মদ হুকুম দিচ্ছেন আর শত শত মুজাহিদ ও শহরবাসী ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। ভিড়ের ভেতর থেকে তখন এক যুবতী মেয়ে বেরিয়ে এলো। এসেই নুর। সে সোজা আহমদ ইবনে আতাশের কাছে এসে দাঁড়িয়ে ঘৃণায় উপচে পড়া গলায় বললো,

'এই শয়তানের পূজারী! তুই আমাকে ইবাদতে বাঁধা দিয়েছিলে। আমি বলেছিলাম, তুই অপমাণিত হয়ে মরবি... বল এখন আল্লাহ তোর না আমার?'

এ সময় ভীর থেকে নুরের বাবাও বেরিয়ে এসে সুলতান মুহাম্মদের কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন এবং পেঁচা নিয়ে আবদুল মালিক ইবনে আতাশের যাদু করার কথাও বিস্তারিত জানালেন। এও জানালেন তীরের মাধ্যমে সেই চিরকুটটি তিনিই পাঠিয়েছিলেন।

নুর ও তার বাবাকে রাষ্ট্রীয় অতিথির মর্যাদা দেয়ার হুকুম দিয়ে দিলেন মুহাম্মদ। এর পর আহমেদ ইবনে আতাশ ও তার ছেলেকে ইস্পাহান নিয়ে গিয়ে চরমভাবে অপদস্থ করে শহরের মাঝখানে জনসমক্ষে তাদের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করা হলো। এবং তাদের মস্তক পাঠিয়ে দেয়া হলো বাগদাদের খলীফার দরবারে। বাগদাদের খলীফা ভয়ংকর দুই শয়তানের মস্তক পেয়ে দারুণ খুশি হলেন এবং সেগুলো কুকুরের ভোগ বানানোর নির্দেশ দিলেন।

বাকী চল্লিশজন বাতিনীকেও এভাবে হত্যা করা হলো, তারপর শাহদরে পর্যাপ্ত পরিমাণ সৈন্য রেখে মুহাম্মদ মারুতে ফিরে এলেন। মারুতে বিজয়ী সেনাবাহিনীকে বরণ করা হলো উষ্ণ সংবর্ধনা দিয়ে।

★★★★

মারুতে এসে প্রথমেই তিনি প্রশাসকের দায়িত্ব দিয়ে সাঞ্জারকে শাহদর পাঠিয়ে দিলেন। তাকে বলে দিলেন। ভেঙ্গে গুড়িয়ে যাওয়া স্থাপনা ও বাড়িঘরগুলো সংস্কার করতে হবে প্রথমে।

'ভাই আমার শোন!' – মুহাম্মদ সাঞ্জারকে বললেন– 'শাহদরের প্রায় অর্ধেক আবাদী সেখানে রয়ে গেছে। মনে রাখবে তারা সবাই বাতিনী। এদের মধ্যে ফেদায়েনও থাকতে পারে। আর হাসান ইবনে সবার গোয়েন্দা তো এদের মধ্যে অবশ্যই আছে। তাই আমি এখান থেকে কিছু অভিজ্ঞ গুপ্তচর শাহদর পাঠিয়ে দেবো। ওরা সেখানকার প্রতিটি ঘরের প্রতি নজর রাখবে। সন্দেহজনক কাউকে মনে হলেই তোমার সামনে তাকে দাঁড় করিয়ে দেবে..... আমাদের উদ্দেশ্য হলো হাসান ইবনে সবা ও তার পীর আবদুল মালিক ইবনে আতাশ যেমন করে শাহদরকে তাদের এক মজবুত আড্ডা বানিয়ে ছিলো। আমরাও শাহদরকে আমাদের দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় শহর বানাবো। সেদিকে সহীহ ইসলামের তাবলিগও হবে। এখানকার অনেক অধিবাসীকে শাহদর পাঠিয়ে সেখানে আবাদ করবো। ওরা তাবলিগ করে বাতিনীদের আবার ইসলামের পথে নিয়ে আসবে।'

সাঞ্জার পরদিন সকালে রওয়ানা হয়ে গেলো।

এর তিন দিন পর সুলতান মুহাম্মদ ঘটা করে একটা উৎসবের ব্যবস্থা করলেন। এতে শাহদরের মুজাহিদদের অসাধ্য বীরত্বের জন্য পুরস্কৃত করা হয়েছে। এতে নুর ও তার বাবাকেও পুরস্কৃত করা হলো। মুহাম্মদ সবাইকে তাদের কৃতিত্বের কথাও শুনালেন। অনুষ্ঠানে বর্তমান ওযীরে আজম সাদুল মালিকও ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর সবাই যখন মঞ্চ থেকে চলে গেলো নুরের বাবা তখন ফিসফিস করে মুহাম্মদকে বললেন, তার সঙ্গে গোপনে কিছু কথা আছে। সুলতান তাকে বললেন, আপনি আমার কামরায় যান আমি সেখানে আসছি। তাহলে আর কেউ সন্দেহ করবে না।

একটুপর সুলতান মুহাম্মদ নুর ও তার বাবা কামরায় প্রবেশ করলেন।

'সুলতান আলি মোকাম– নুরের বাবা বললেন– 'দরবারে আপনার বাম দিকে অত্যন্ত সম্মানিত একজন লোক বসা ছিলেন। তিনি নাকি সালতানাতের ওযীরে আজম। সত্যিই কি তাই?'

'হ্যাঁ তিনি আমার ওজীরে আজম। তার নাম সাদুল মালিক।'

'তাহলে তো আমাকে সতর্ক হয়ে কথা বলতে হবে। হয়তো আমার চোখ ধোঁকা খেয়েছে কিন্তু'... নুরের বাবার ঘাবড়ানো গলা।

'তোমার চোখ ধোঁকা খাক বা না খাক তুমি যা বলার বলে দেখো তোমার ওপর আমার আস্থা আছে।'

'ভুল হলে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। আপনার ওযীরে আজমকে আমি তিনবার আব্দুল মালিক ইবনে আতাশের কাছে দেখেছি। প্রতিবার সারা রাত তিনি আব্দুল মালিকের সঙ্গে কাটিয়েছেন।'

‘তাকে তো আমিও ওখানে দেখেছি’– নুর বলে উঠলো– ‘মেহমানদের শরাব পান করানোর দায়িত্ব ছিলো আমার। ঐ লোককে আমি ইবনে আতাশের সঙ্গে বসা দেখেছি। তিনিও আমার হাত থেকে শরাব নিয়ে পান করেছেন।’

‘সেই দিন কি করেছিলো সেটা বলতে পারবে? এটা না পারলেও বলো কতদিন পরপর তাকে দেখেছো ওখানে?’ – মুহাম্মদ জিজ্ঞেস করলেন।

নুরের বাবা একটু ভেবে বললেন, তিন চার মাসের ব্যবধানে এই সাক্ষাত ঘটেছে। সুলতান মুহাম্মদ গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন।

‘তোমার সংবাদ ভুল নয়। তিনবার তিনি আমাকে বলেছেন, তিনি সালতানাতের বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন। তিনবারই তিনি মারুতে অনুপস্থিত ছিলেন’– মুহাম্মদ বললেন।

‘এখন আমি নিশ্চিত হয়ে গেছি এ সে লোকই। উনাকে যদি আমার ও নুরের সামনে দাঁড় করিয়ে দিন তবুও আমি একথা বলতে পারবো’– নুরের বাবা বললেন।

‘না, তোমাদের কথাই যথেষ্ট হবে না। হাসান ইবনে সবার সঙ্গে যদি আমার ওযীরে আজমের সম্পর্ক থাকে তাহলে সে নিশ্চয় অতি ধুরন্ধর লোক। সে সহজেই প্রমাণ করতে পারবে তোমরা মিথ্যা বলেছো। তাকে আমি অন্যভাবে শায়েস্তা করবো। আমাদের এসব কথা যেন কেউ না জানে, খবরদার!’

সুলতান মুহাম্মদ তার বড় ভাই বরকিয়ারক ও ছোট ভাই সাঞ্জারের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করলেন। তিনজন মিলে অতি গোপনে একটা সিদ্ধান্ত নিলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় ওযীরে আজম আব্দুল মালিক অপ্রত্যাশিতভাবে নুর ও তার বাবার কামরায় গিয়ে হাজির হলেন। দু'জনেই তাকে দেখে ঘাবড়ে গেলো। এ লোক অনায়াসেই তাদেরকে গায়েব করে দিতে পারে।

‘আজকের পুরস্কারের জন্য তোমাদেরকে মোবারকবাদ’– সাদুল মালিক ফুর্তির গলায় বললেন– ‘এর অর্থ এই নয় যে, আমি এ কথা বলে তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করছি এবং আমার কথাতেই তোমাদেরকে পুরস্কার দেয়া হয়েছে। এমনি এমনি শাহদরের বিজয় অর্জিত হয়নি। তোমরা আমাকে দু'তিনবার আবদুল মালিক ইবনে আতাশের কাছে দেখে আবার এখানে ওযীরে আজম হিসেবে দেখে নিশ্চয় হয়রান হচ্ছো। আসলে সেখানে আমি গুপ্তচর হিসেবে যেতাম, ইবনে আতাশের কাছে প্রকাশ করতাম, আমি আসলে বাতিনী এবং শায়খুলজাবালের জন্য কাজ করছি। আমি ঐ বুড়োর খুব বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠলাম এবং এমন কিছু তথ্য উদঘাটন করলাম যা তার পরাজয়ের বড় কারণ হলো।’

‘সুলতান তো জানেন আপনি সেখানে গুপ্তচর হয়ে যেতেন, তাহলে তো আপনার অনেক পুরস্কার পাওয়া কথা’– নুরের বাবা বললেন।

‘ন, আমি যা করেছি সুলতানের জন্য করিনি। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এসব করেছি। আমার পুরস্কার ও সম্মান পাওয়ার প্রয়োজন নেই। তোমরা যেন আবার সুলতানের কাছে আমার ওখানে যাওয়ার কথা বলে দিয়ো না। যে জন্য আমি যেতাম সেটা তো পেয়ে গেছি। সুলতান জানতে পারলে ভুল বুঝে আমার বিরুদ্ধে সন্দিহান হয়ে উঠতে পারেন।’

'না মুহতারাম ওযীরে আজম সুলতানের সাথে কথা বলার মতো যোগ্যতা কি আমাদের আছে? আমার মেয়েকে ঐ বুড়োর কবল থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলাম, তা করেছি আমি। এখন আমার বেঁচে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, আমার মেয়েকে উচ্চবংশীয় কোন যুবকের হাতে সোপর্দ করে যাওয়া।'

'আমি সেটার ব্যবস্থা করবো। তুমি যেমন চাও তেমন ছেলের সঙ্গেই তোমার মেয়ের বিয়ে হবে। এ আমারও মেয়ে! সাদুল মালিক বললেন।

নুরের বাবা হাতজোড় তার শুকরিয়া আদায় করে বললেন, এই মেয়ের একটা গতি হলে তার আর কোন কিছুর প্রয়োজন হবে না।'

সাদুল মালিক সেদিন রাতের খাবার শেষ করে নিজের কামরায় বসতেই তার এক গোলাম এসে জানালো এক ঘোড়সওয়ার দীর্ঘ সফর করে এসেছে। তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে চায়। সাদুল মালিক তখন তাকে ভিতরে আসতে বললেন।

'মনে হচ্ছে অনেক দূর থেকে এসেছো। কোথেকে এসেছো?'– সাদুল মালিক জিজ্ঞেস করলেন।

'কেল্লা নাজিরওয়াতবাস থেকে'– লোকটি জবাব দিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। যেন গোপন কিছু বলতে চাচ্ছে – 'ইমামের পীর ও মুরশিদ আবদুল মালিক ইবনে আতাশ পাঠিয়েছেন– আমি কি এখানে মুখ খুলে কথা বলতে পারবো?

'অবশ্যই। আস্তে আস্তে বলো, পীর ও মুরশিদ কি এখন নাজিরওয়াতবাসে?'– সাদুল মালিক জিজ্ঞেস করলেন।

'দু'একদিন পর সেখান থেকে আলমোত চলে যাবেন। তিনি আপনাকে এ পয়গাম দিয়েছেন যে, আপনি নিশ্চিন্তে শাহদর যেতে পারেন। কারণ শাহদর আপনার সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত এখন। আর আপনি এই সালতানাতের ওযীরে আজম। তিনি সেখানে নিজের প্রয়োজনে লোক রেখে এসেছেন। আপনি সেখানে গেলে তারা নিজেরাই আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করবেন। পীর ও মুরশিদ বলেছেন, মুহাম্মদ ও সাঞ্জারকে তাড়াতাড়ি খতম করতে হবে। কিন্তু সেটা আপনি নয় শাহদরের লোকেরাই পারবে এ কাজ।'

'ওদের নাম জানো?'

'আপনি কি জানেন না নাম বলা হয় না? বেশিক্ষণ এখানে থাকতে পারবো না আমি। এ শহরে আমি অপরিচিত। এখানে আমাদের কোন লোক থাকলে তার ঘরের ঠিকানা বলে দিন, বা সেখানে আমাকে পৌঁছানোর বন্দোবস্ত করুন। কাল সকালে আমি ফিরে যাবো।'

'একজন নয় তিন জন আছে আমার লোক। আমি একজনের ঘরের ঠিকানা বলে দিচ্ছি।'

সাদুল মালিক একজনের ঘরের ঠিকানা দিয়ে দিলেন এবং সেখানে পৌঁছার রাস্তাও বুঝিয়ে দিলেন।

'আরেকটা কথা শোন!'– সাদুল মালিক বললেন– 'দরজায় তিনটি টোকা দেবে। ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করবে কে? বলবে মিলকুল মালিক। তারপর দরজা খুললে তোমার পরিচয় দেবে।'

★★★★

সকাল বেলা সাদুল মালিক নিয়ম মাফিক নিজ দফতরে গেলেন। সুলতান মুহাম্মদের সঙ্গে সাক্ষাত করে প্রয়োজনীয় কিছু কথা বললেন। সুলতানের চেহারায় অস্বাভাবিক কিছু দেখলেন না। তবে অন্যদিনের চেয়ে আজ একটু বেশি হাস্যোজ্জ্বল মনে হলো।

দ্বিপ্রহরের একটু পর সুলতানের দফতরে তার ডাক পড়লো, সাদুল মালিক সুলতানের দফতরে ঢুকতেই তার ভেতর কেঁপে উঠলো, তার মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেলো। সুলতানের এক পাশে নুর ও তার বাবা বসা। আরেক পাশে গত রাতের সেই লোকটি বসা, যে আবদুল মালিক ইবনে আতাশের পয়গাম নিয়ে তার কাছে গিয়েছিলো, আরেক দিকে শিকলবন্দী তিনজন লোক।

'এসো সাদুল মালিক।'– সুলতান বললেন– 'ভয় পেয়ো না। এরা সবাই তোমার লোক এবং এদেরকে ভালো করেই চিনো। আর তুমি আবদুল মালিকের দূতের কাছে যে তিনজনের ঘরের ঠিকানা দিয়েছিলে এই শিকলবন্দীদের সেই ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। রাতে আমরা অভিযান চালিয়ে ওদেরকে পাকড়াও করেছি।'

সাদুল মালিকের সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করতে লাগলো। সে মুখ দিয়ে কোন শব্দ করতে পারলো না।

'ঐ দু'জনকে তুমি আরো ভালো করে চেনো'– সুলতান নুর ও তার বাবার দিকে ইংগিত করে বললেন– 'এই মেয়ের হাতে তুমি কয়েকবার শরবত পান করেছো। ওকে তুমি কখনো ভুলতে পারবে না। তোমার আরেক পীর মুরশিদের স্ত্রী ছিলো সে.....আমি কি ভুল বলছি?'

'আমি সেখানে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য যেতাম'.....তার কম্পিত গলা দিয়ে আর শব্দ বের হলো না।

'তুমি তো সেই গুপ্তচরবৃত্তির কথা আমাকে বলোনি?'– মুহাম্মদ যেন বজ্র কণ্ঠে বললেন– 'তুমি সেই বিষধর সাপ যে এই সালতানাতের আস্তিনে প্রতিপালিত হয়েছো। সালতানাতকে তুমি ধ্বংসের অতলে নিয়ে গেছো। তুমি কি দেখোনি জয় সত্যেরই হয় মিথ্যার হয় না? তোমার এই মিথ্যা যদি মেনেও নিই যে, তুমি সেখানে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য যেতে, তাহলে ঐ তিন ফেদায়েনকে জেনেও কেন তুমি ওদের গ্রেফতার করলে না? বরং আমার এক গোয়েন্দাকে নিজেদের লোক মনে করে তাকে ওদের কাছে রাত কাটাতে পাঠিয়েছো। শাস্তির জন্য এখন প্রস্তুত হয়ে যাও।'

পরদিন সকালে সালতানাতের সমস্ত লশকর ও শহরবাসী ঘোড় দৌড়ের ময়দানে জমায়েত হলো। সাদুল মালিক ও তিন ফেদায়েনকে হাজির করা হলো সেখানে। একটু পর সুলতান মুহাম্মদ তার বড় ভাই বরকিয়ারক, ছোট ভাই সাঞ্জার ও বিশিষ্ট কয়েকজন হাকিম ঘোড়ায় চড়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। মুহাম্মদ তার ঘোড়া সামনে নিয়ে গেলেন। তারপর সমবেতদের উদ্দেশ্যে বললেন,

'সবাই নিজেদের ওযীরে আজমকে শিকলবন্দী দেখে নিশ্চয় হয়রান হচ্ছো। একে আমি ওযীরে আজম বানিয়েছিলাম। কিন্তু গোপনে সে হাসান ইবনে সবার কাজ

করতো। বিজয়ের আগে চুরি করে হাসান ইবনে সবার গুরু আহমদ ইবনে আতাশের কাছে যেতো। তার হুকুম ও তার হাতে কতজন এ পর্যন্ত নিহত হয়েছে সেটা তার কাছ থেকে বের করা সম্ভব না। সে যে আমাদের অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। আমারই আস্তিনে এই দুমুখী সাপ প্রতিপালিত হচ্ছিলো। এর অর্থ হলো বাবা তার সন্তানকে, সন্তান তার বাবাকে, মেয়ে তার মাকে এবং মা তার মেয়েকে যেন বিশ্বাস না করে। কিন্তু আমি এ অবস্থা সৃষ্টি হতে দেবো না। সবাইকে আমি স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি, আমরা শাহদর জয় করেছি। এখন আলমোত জয় করবো এবং শয়তানের পূজারীদের খতম করে ছাড়বো। নিজের অপরাধ নিজের সঙ্গীর কাছে লুকানো যায়। কিন্তু ভুলে যেয়ো না আল্লাহ তায়ালা সর্বত্রই আছেন এবং তিনি অপরাধীদের ঠিকই চিহ্নিত করে দেন। আসামী সাদুল মালিককে তার তিন ফেদায়েন সহযোগীসহ গ্রেফতার করা হয়েছে এখন তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।'

সুলতান ইশারা করতেই জল্লাদ কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে চারজনের দেহ থেকে ধর পৃথক করে ফেললো।

এরপর সুলতান ঘোষণা করলেন, এখন সালতানাতের ওযীরে আজম হবেন সাবেক ওযীরে আজম নেযামুল মুলক খাজা হাসান তুশী (র) এর ছোট ছেলে আবু নসর আহমদ।

আবু নসর আহমদ সেখানেই ঘোষণা করলেন, এখন আমাদের ফৌজি অভিযান হবে কেল্লা আলমোতের দিকে। এর নেতৃত্ব আমি নিজে দেবো। শাহদরের মতোই কেল্লা আলমোত আমরা উদ্ধার করবো।

পুরো লশকরের তাকবীর ধ্বনিতে কেঁপে উঠলো পুরো মারু শহর।

২১

ঐতিহাসিকদের মতে, সুলতান মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবনে আতাশকে কেল্লা নাযিরওয়াতবাস দিয়ে চরম একটি ভুল করেছেন। তিনি যদি শাহদরের একজন বাতিনীকেও ক্ষমা না করতেন তাহলে ইসলামের ইতিহাসের মোড় ঘুরে যেতো অন্য দিকে। তারপরও শাহদর বিজয় খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। কারণ এ বিজয়ের খবরে হাসান ইবনে সবাকে এমনভাবে বিচলিত করলো যেন তার পিঠে কেউ খঞ্জর মেরে দিয়েছে।

ওদিকে আবদুল মালিক ইবনে আতাশ কেল্লা নাযিরওয়াতবাসের পথে থাকতেই সংবাদ পেলেন তার ভাই আহমদ ইবনে আতাশ ও তার ছেলে এবং চল্লিশ বাতিনী ফেদায়েনকে হত্যা করা হয়েছে, সে তখন চোখে সর্ষে ফুল দেখতে লাগলো। তারপর যখন শুনলো, এই শোকে আহমদ ইবনে আতাশের প্রথমা স্ত্রী কেল্লার ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করছে তখন যেন তার সমস্ত দুনিয়া অন্ধকার হয়ে এলো।

যা হোক, কেল্লা নাযিরওয়াতাবাসে পৌঁছলে আবদুল মালিককে জানানো হলো, সুলতান মুহাম্মদ এখন অল্প সময়ের জন্য ইস্পাহান আছেন। আবদুল মালিক তখনই সুলতানের কাছে দরখাস্ত করে পয়গাম পাঠালো, তার ছোট ভাই আহমদ ও তার ছেলে এবং ভাইয়ের স্ত্রীর লাশ যেন দিয়ে দেয়।

ওদের লাশ মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়েছিলো। তবুও মুহাম্মদ এই দরখাস্ত কবুল করে লাশ উঠিয়ে নেয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন।

একদিন লাশ তিনটি নাযিরওয়াতবাসে পৌঁছলো, আবদুল মালিক যখন দেখলো তার ভাই ও ভাতিজার লাশ মস্তকবিহীন সে প্রায় অচেতন হয়ে পড়লো। সে তার কাল জাদুর কথা ভুলে গেলো। তারপর লাশ তিনটি অতি সম্মানের সঙ্গে দাফন করা হলো।

ওদিকে হাসান ইবনে সবা ঠিক করলো সে তার বৃদ্ধ পীর মুরশিদকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য কেল্লা নাযিরওয়াতবাসে যাবে। শত শত অস্ত্র সজ্জিত ফেদায়েনের প্রহরায়, রাজকীয় পাল্কিতে চড়ে মহা সাজ সাজ রব তুলে হাসান ইবনে সবা কেল্লা নাযেরওয়াতবাসে রওয়ানা দিলেন। যেন পৃথিবীর কোন রূপ মহাধিরাজ সারা বিশ্ব জয় করতে যাচ্ছে। সব সময় তাকে শত শত ফেদায়েন পরিবেষ্টন করে রাখলো। একটি সুইও গলে ভিতরে ঢুকতে পারবে না।

কেল্লার কাছে পৌঁছার পর এক ঘোড়সওয়ার কেল্লায় গিয়ে আবদুল মালিককে জানালো, শায়খুল জাবালের সওয়ারী আসছে। সঙ্গে সঙ্গে সারা কেল্লায় এ খবর ছড়িয়ে পড়লো। আবদুল মালিক হুকুম দিলো, কেল্লার সবই যেন বাইরে গিয়ে তাদের ইমামকে স্বাগত জানায়। তবে আবদুল মালিক নিজ কামরাতেই রয়ে গেলো।

হাসান ইবনে সবা কেল্লায় পৌঁছলো। তার দু'দিকে সারিবদ্ধ হয়ে সবাই শ্লোগান দিতে লাগলো 'বন্ধ করো এ শ্লোগান'– পাল্কি থেকে হাসান ইবনে সবার আওয়াজ গর্জে উঠলো–'এসব বুযদিল কাপুরুষদের জিন্দাবাদ বা মুরদাবাদ বলার অধিকার কে দিলো। ওদের চুপ করতে বলো।'

সবার মধ্যে মৃত্যুর নিস্তব্ধতা নেমে এলো। কারণ সবাই জানে হাসান ইবনে সবার কাছে পরাজয়ের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। একটু পর সে আবদুল মালিকের কামরায় প্রবেশ করলো। আবদুল মালিক তাকে দেখে উঠতে চেষ্টা করলো। কিন্তু হাসান ইবনে সবা তার কাছে গিয়ে তাকে উঠতে দিলো না। আবদুল মালিকের চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগলো। মাঝে মধ্যে তার হেচকিও উঠতে লাগলো। হাসান ইবনে সবা তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো।

'ইবনে সবা!'– আবদুল মালিক নিজেকে সামলে নিয়ে বললো–'তুমি ধোঁকা দিয়ে মানুষকে হত্যা করতে জানো। কিন্তু কেল্লার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দিকে খেয়াল রাখো না। আমাদের নিয়মিত এক ফৌজ তৈরি করা উচিত। নইলে দেখো একদিন কেল্লা আলমোতও ছিনিয়ে নেবে।'

'পীর ও মুরশিদ'– হাসান ইবনে সবা আত্মবিশ্বাসের সুরে বললো– 'ঐ সময় কখনো আসবে না। তবে ঐ সময় অবশ্যই আসবে তখন আমাদের পায়ের তলায় থাকবে সালতানাতে সেলজুজি। আর এই সুলতান সপরিবারে আমাদের হাতে বন্দী হবে। জানি আহমদ, তার ছেলে ও স্ত্রী মৃত্যুর শোক আপনাকে কাবু করে ফেলেছে। তবে শাহদর আমাদের হাত থেকে ছুটে গেছে বলে এত হতাশ হবেন না। আমাদের কেল্লা নয়। মানুষ প্রয়োজন। মানুষের মনে আমরা রাজত্ব করি।

'সজাগ হও ইবনে সবা! আমি তোমাকে শায়খুলজাবাল ও ইমাম বানিয়েছি। মনে হচ্ছে তুমি আমার শক্তি ও জনপ্রিয়তা নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভুগছো। আত্মতুষ্টি থেকে বেরিয়ে এসো। আমাদের এ হাল হলে তো আমাদের ফেরকা ক্রমেই সংকুচিত হয়ে যাবে। সেলজুকিদের এ বিজয় সাধারণ কোন বিজয় নয়। শাহদরকে আমরা অপরাজেয় মনে করতাম। কিন্তু আহলে সুন্নাতের কাছে কোন একটা শক্তি এসে গেছে। আমি আমার সে যাদু চালিয়েছি যা কখনো ব্যর্থ হয়নি। কেল্লা থেকে উড়ে একটি পেঁচা পুরো সেলজুকি লশকরের ওপর দিয়ে ঘুরে আসার কথা ছিলো। কিন্তু আমি পেঁচাটি ছাড়তেই ওরা তীর মেরে ওটাকে ফেলে দিলো... বলো আমি এখন কি বুঝবো?

'না পীর মুরশিদ! এই পরাজয়কে আমি বিজয়ে রূপান্তরিত করে দেখাবো। আপনার এই শোককে শক্তিতে বদলে দিন এবং আগে থেকেও আমাকে যেভাবে পথ দেখাতেন সেভাবে আমাকে পথ দেখিয়ে যান। আচ্ছা সেখানে কি রেখে এসেছেন আপনি?

'কিছু জানবায ফেদায়েন রেখে এসেছি। ওরা বেশ বিচক্ষণ। ওরা কাউকে কতল করে আত্মহত্যা করবে না। আমি কিছু হেদায়েত ওদেরকে দিয়ে এসেছি। ওরা মসজিদের ইমাম হবে, বাচ্চাদের কুরআন হাদীসের শিক্ষা দেবে। সমাজের বিশিষ্ট লোক হিসেবে পরিচিত হবে। কতগুলো ভয়ংকর বিষধর সাপ রেখে এসেছি। ওরা সেলজুকিদের এমন ছোবল মারবে যে, শাহদর থেকে পরিমরি করে পালাবে। তোমাদের প্রতি আমার অভিযোগ, এতদিন আমরা অবরুদ্ধ ছিলাম অথচ তুমি একজন ফেদায়েনও পাঠালে না।'

'আমি দশজন ফেদায়েন পাঠিয়েছিলাম, সুলতান মুহাম্মদ ও তার সালারদের হত্যা করার কথা ছিলো ওদের। কিন্তু আপনি শুনে হয়রান হয়ে যাবেন ঐ দশ ফেদায়েন কোথায় যেন গায়েব হয়ে গেলো। পরে ওদের ক্ষতবিক্ষত লাশ জঙ্গলে পাওয়া গেলো।'

'তুমি এখনো ক্ষতির পরিমাণ আন্দাজ করতে পারছো না ইবনে সবা! আমাদের আয়ের সবচেয়ে বড় ভাণ্ডারটি হাতছাড়া হয়ে গেছে। যে অপূরন্ত সম্পদ আমরা কাফেলা লুট করে পেতাম সেটা আর পাবো না। শাহদর বড়ই উপযুক্ত জায়গা ছিলো। সর্বশেষ যে কাফেলাটি লুট করেছিলাম তা থেকে আশাতীত অর্থকড়ি পেয়েছি। আর শাহদরে অগণিত সম্পদের মজুদ রেখে এসেছি আমি। কিভাবে সেগুলো উদ্ধার করবো এই ভেবে আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি।'

'সেগুলো কোথায়?'

'এমন জায়গায় রেখেছি যেখানে কেউ পৌঁছতে পারবে না। শাহদরে যাদের রেখে এসেছি ওদের দু'একজন মাত্র তা জানে। আগে আমি একটু সামলে নিই তারপর তা উদ্ধারের চেষ্টা চালাবো। এখন খুব তাড়াতাড়ি সৈন্য বানানো দরকার। না হলে আলমোতও ঝুকির মধ্যে থাকছে। মনে রেখো, এ জয়ে সেলজুকিদের মনোবল অনেক উঁচুতে উঠে গেছে।'

দু'একদিন পর হাসান ইবনে সবা আলমোত চলে গেলো।

ও দিকে সাঞ্জার শাহদরে যাওয়ার একদিন পর সেখানকার সব আবাদীকে এক ময়দানে জমা করলেন। তাদেরকে ঘিরে দাঁড়ালো সেলজুকি সৈন্যরা। সংখ্যায় তারা পাঁচ হাজার হওয়া সত্ত্বেও সবার চেহারায় শংকার ছায়া দেখা গেলো।

সাঞ্জার সমবেতদের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন। লোকদের মধ্যে নিস্তব্ধতা নেমে এলো।

'তোমাদের চোখেমুখে এমন ভীতির ছাপ কেন?'– সাঞ্জার উঁচু আওয়াজে জিজ্ঞেস করলেন– 'তোমরা কি আমাকে ও এই ফৌজকে অপরিচিত মনে করছো? আমরা কোন কেল্লাও জয় করিনি এবং তোমাদেরকে জয় করিনি। আমি না বিজয়ী আর তোমরা না বিজিত। আমাদের বিজয় হলো এ শহর থেকে আমরা বাতিল বের করে দিয়েছি। তোমরা কি খুশি হওনি যারা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলো তারা হয় মারা গেছে বা এখান থেকে চলে গেছে। তোমাদের আরেকটি ভয়ের ব্যাপারেও আমি জানি। তোমরা তোমাদের যুবতী মেয়েদেরকে নিয়ে পেরেশান। ওদের আবরু নিয়ে খেলার লোক নই আমরা। বরং ওদের আবরু ইজ্জত হেফাজত করতে এসেছি। মেয়েদেরকে বলো এটা তাদের নিজেদের শহর। অলিগলিতে যেন ওরা নির্ভয়ে চলাফেরা করে। তোমাদের ইজ্জতের ওপর কোন ফৌজ বা অন্য কেউ হাত তুললে আমার দরজা সবসময় খোলা। আমি ফরিয়াদ শুনবো তারপর তাকে জল্লাদের হাতে তুলে দেবো...

'দীর্ঘদিন তোমাদের অবরুদ্ধ থাকতে হয়েছে। তোমাদের ওপর আগুন আর পাথর বর্ষণও হয়েছে। তোমরা আমাকে ও আমার ফৌজকে মনে মনে অভিশাপ দিচ্ছো। কিন্তু বুঝতে চেষ্টা করো। এই শহরে পাথর বর্ষণ ও আগুনের তীর নিক্ষেপ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে। আমরা এর মাধ্যম মাত্র। কেন এমন হলো? শুধু এজন্য যে, আল্লাহর পথ থেকে তোমাদেরকে দূরে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। আর তোমরা একে দীন মনে করে নিয়েছো। শয়তানের রাজত্ব ছিলো এখানে। তোমাদের ইমাম কোথায়?... কোথায় তোমাদের ইমামের পীর মুরশিদ? যে তোমাদেরকে দুনিয়াতেই বেহেশত দিয়ে দিয়েছে.... পালিয়ে গেছে কোথায়?"

সাঞ্জার সবাইকে আবদুল মালিক ইবনে আতাশের জাদু ও তা ব্যর্থ হওয়ার কাহিনী শোনালেন।. তারপর হযরত মূসা (আ) ও ফেরাউনের কাহিনী সোনালেন। যেখানে ফেরাউনের জাদুকররা পরাজিত হয়ে মূসা (আ) এর প্রতি ঈমান এনেছিলো এবং ফেরাউনের শেষ পরিণাম হয়েছিলো নীলনদের মৃত্যু।

'এরা ছিলো একেকটা আস্ত শয়তান এবং তোমাদেরকে বানিয়ে ফেলেছিলো শয়তানের পূজারী। তোমাদের সৌভাগ্য যে, এ শহর আমাদের শাসনে এসে গেছে। আমরা রাজা নই এবং তোমরাও প্রজা নও। আমরা আল্লাহর সে পয়গাম নিয়ে এসেছি যাতে বলা হয়েছে সব মানুষ সমান। এখন আমি আশা করবো তোমরা মুখ খুলবে... এটা কি মিথ্যা যে, এখানে কাফেলার লুটেরারা থাকতো এবং লুট করা মাল এখানে আসতো?'

সাঞ্জার পুরো সমাবেশের ওপর তার চোখ ঘোরালেন।

'বলো, কোন কথা লুকিয়ে রেখো না। বলো আমি কি মিথ্যা বলেছি না সত্যি বলেছি?'

'হ্যাঁ সুলতান'– অবশেষে একটি আওয়াজ উঠলো– 'এখানে কাফেলা লুটের মাল আসতো।'

'এবং এখানে শিশু-কিশোর ও যুবতী মেয়েদের ধরে আনা হতো।'

'আমাদের মেয়েদেরকে এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদেরকে বিয়ের নামে গায়েব করে দেয়া হতো।'

‘তোমাদের মেয়েরা ও এসব সম্পদ কোথায় যেতো জানো’– সাঞ্জার বললেন– ‘সব আলমোতে হাসান ইবনে সবার কাছে যেতো। যাকে তোমরা ইমাম বা ওলী বলো। আর কাফেলা থেকে লুট করা মেয়ে ও তোমাদের মেয়েদেরকে তার বেহেশতের হুর বানানো হতো।’

‘আমাদেরকে একটা কথা বলুন সুলতান!’– অতি বৃদ্ধ এক লোক ভিড় ভেঙ্গে এগিয়ে এসে বললো– কাফেলা তো আমরা লুট করিনি। মেয়েদেরকে তো আমরা অপহরণ করিনি। তারপরও কি অপরাধে আমাদেরকে শাস্তি দেয়া হলো? আপনার ফৌজের অগ্নিবিদ্ধ তীর কেন আমাদের ঘর জ্বালিয়ে দিলো। শহর ঘুরে ফিরে দেখুন আমাদের কত ঘরবাড়ি পুরে গেছে। আর পাথরের আঘাতে আমাদের কত বাচ্চা মারা গেছে।’

‘শহর আমি ঘুরে ফিরে দেখেছি। যাদের ঘর জ্বলে গেছে বা পাথরের আঘাতে ভেঙ্গে গেছে তাদেরকে অক্ষত বাড়ি ঘরগুলো দিয়ে দেয়া হবে। আর ধ্বংস হয়ে যাওয়া সব বাড়ি ঘর সরকারি ব্যবস্থাপনায় আবার নির্মাণ করে দেয়া হবে। পুনর্গঠনের কাজ যতদিন চলবে ততদিন কারো কর পরিশোধ করতে হবে না।’

সাঞ্জার যখন এসব বলছিলেন তখন সমবেত লোকের পেছনে দাঁড়িয়ে দু’জন মানুষ অন্য কথা বলছিলো।

‘এ লোক তো দেখি আমাদের জন্য ভালো সমস্যা সৃষ্টি করছে”– তাদের একজন বললো–‘এখানকার লোকেরা যদি এই সুলতানের কথায় প্রভাবান্বিত হয় তাহলে তো আমরা বিপদেই পড়বো।

‘এই লোক কোন সমস্যা সৃষ্টি করতে পারবে না’– তাদের একজন বললো– ‘কারণ সেই আমাদের শিকার। লোকজন আমাদের টার্গেটে নেই, সুলতান সাঞ্জারকে মারাই আমাদের কাজ।’

‘অত্যন্ত জরুরি আরেকটা কথা বলছি আমি’– সাঞ্জার বললেন– ‘আমি জানি হাসান ইবনে সবা ও আবদুল মালিকের অনেক সন্ত্রাসী গ্রুপ আছে। ওরা মসজিদেও থাকবে এবং সবখানে ওরা তোমাদের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে। ওদেরকে পাকড়াও করা ও চিহ্নিত করে দেয়া তোমাদের জন্য ফরজ কাজ। এই ফরজ পালনে যদি অবহেলা করো তাহলে আরেকবার ধ্বংসের মুখোমুখি হতে হবে তোমাদের। তোমরা যদি এ ধনের কাউকে ধরিয়ে দিতে পারো বা চিহ্নিত করে দিতে পারো অজস্র পুরস্কার পাবে।’

★★★★

সেই জঙ্গলে ভয়ংকর দশ ফেদায়েনকে মারতে গিয়ে মুযাম্মিল যে যখমী হয়েছিলো তা থেকে সেরে উঠতে তার অনেক সময় লাগে। সুমনা, ইবনে ইউনুস ও শাফিয়া অবশ্য তখন অক্ষতই ছিল। মুযাম্মিলকে ওরা কেল্লা ওসিমকুহে এনে সার্বক্ষণিক শুশ্রূষার মধ্যে রাখে। সালার আওরিজীও সবসময় ওদেরকে সঙ্গ দেন। ওসিমকুহে বসেই ওরা খবর পায় শাহদর বিজয় ও আবদুল মালিক ইবনে আতাশের কেল্লা নাযিরওয়াতবাসে চলে যাওয়ার কথা। এ খবর শুনেই মুযাম্মিল ও ইবনে ইউনুস ছুটে আসে সালার আওরিজীর কাছে।

'সালারে মুহতারাম!'– মুযাম্মিল বললো– 'আপনি তো এখন কেল্লা নাযিরওয়াতবাস উদ্ধার করতে পারেন।'

'কিভাবে?'– আওরিজী জিজ্ঞেস করলেন।

'কয়েকদিন আগে মাত্র আবদুল মালিক ওখানে গেছে। তার সঙ্গে শাহদরের কিছু আবাদী আছে মাত্র। ফৌজ তো নেই তার কাছে। এত তাড়াতাড়ি এরা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে পারবে না। তাই কেল্লা অবরোধ করার প্রয়োজন নেই। আমরা একটা প্লান করেছি।'

ওরা আওরিজীকে তাদের গোপন প্লানের কথা জানালো। আওরিজী তাদের প্লান বাস্তবায়নের অনুমতি দিয়ে দিলেন।

'আরেকটা দিক লক্ষ্য করুন'– ইবনে ইউনুস বললো– 'সুলতান মুহাম্মদের অনুমতি নিয়ে আবদুল মালিক নাযিরওয়াতবাসে গিয়েছে। সুলতান তার সঙ্গে মুহাফিজ বাহিনীও দিয়েছেন। এর অর্থ সুলতান তার প্রাণ ভিক্ষা দিয়েছেন। এ অবস্থায় আপনি কেল্লার ওপর চড়াও হলে সুলতান সম্ভবত সেটা পছন্দ করবেন না। তিনি এটাকে তার হুকুমের খেলাপ তৎপরতা ধরে নিতে পারেন।'

'আমি সুলতানের হুকুম নয়– আল্লাহর হুকুমের পাবন্দ। আমাদের লক্ষ্য হলো হাসান ইবনে সবার শয়তানী ফেরকাকে খতম করা। কেল্লা আমার নিজের জন্য নিচ্ছি না। তোমরা তোমাদের প্লান মতো কাজ করে যাও। আমি তোমাদের সঙ্গে আছি।'

ওদিকে আবদুল মালিক ইবনে আতাশ তার লোকদের একদিন খুব গরম বক্তৃতা দিলো, এখনই লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু করতে হবে। তার সামনে কেউ কিছু বলবে এমন সাহস কারো ছিলো না। তবুও দু'একজন মিনমিনে গলায় বললো আমাদের কাছে তো এখন কোন হাতিয়ার নেই এমনকি ঘোড়াও নেই। কিভাবে.....

'সবকিছু এসে যাবে'– আবদুল মালিক তখন গর্জে উঠে– 'হাতিয়ার ও ঘোড়া আলমোত থেকে এসে যাবে। আজই আমি আলমোতে কাসেদ পাঠিয়ে দেবো। তোমরা এখন সুশৃংখল এক সৈন্যদল হয়ে লড়বে।

এর পরদিন দুপুরের দিকে দু'জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা কেল্লা নাযিরওয়াতবাসে চারটি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে প্রবেশ করলো। সওয়াররা হলো মুযাম্মিল আফেন্দী ইবনে ইউনুস, সুমনা ও শাফিয়া। কেল্লায় ঢোকার পর লোকজন তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, ওরা কোত্থেকে এসেছে?

'লোকেরা তৈরি হয়ে যাও'– মুযাম্মিল ঘাবড়ানো গলায় বললো– 'কেল্লা ওসিমকুহ থেকে সেলজুকি ফৌজ আসছে। এই ফৌজই কেল্লা ওসিমকুহ জয় করেছে। সুলতান ওদেরকে হুকুম দিয়েছেন কেল্লা নাযিরওয়াতাবাসের কাউকে যেন জীবিত রাখা না হয়। পীর উস্তাদ আবদুল মালিক ইবনে আতাশ কোথায়?... আমরা বড় কষ্টে সেখান থেকে বের হয়ে এসেছি। আমাদেরকে পীরের কাছে নিয়ে যাও। উনাকে আরো কিছু খবর দেয়ার আছে আমাদের।'

লোকজনের মধ্যে দৌড় ঝাপ শুরু হয়ে গেলো। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সবাই যার যার ঘরের দিকে ছুটতে লাগলো। ইতিমধ্যে আবদুল মালিকের কাছে খবর পৌঁছে গেলো

বাইরে থেকে কয়েকজন লোক এসে লোকদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। আবদুল মালিক বাইরে বের হয়ে দেখতে লাগলো লোকজন চারদিক ছুটাছুটি করছে। এর মধ্যে মুযাম্মিলরা তার সামনে গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে তার হাতে পা ছুয়ে সালাম করলো। আবদুল মালিক রাগত স্বরে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কোত্থেকে এসে আমাদের মধ্যে এমন বিশৃংখলা ছড়িয়ে দিয়েছো?

'ইয়া পীর মুর্শিদ! আমরা আপনার মুরীদ'– মুযাম্মিল মাথা ঝুকিয়ে অতি আদবের সঙ্গে বললো– 'ইমামের কথায় আমরা জান দিতেও প্রস্তুত। এ আমার স্ত্রী আর সে আমার বোন এবং এই ছেলে আমার ভাই। ওর স্ত্রী ও দুই সন্তান ও ওসিমকুহে রয়ে গেছে। সেলজুকিরা ওসিমকুহ নেয়ার পর আমরা অনেক চেষ্টা করেও সেখান থেকে বের হতে পারিনি। আর এই দীর্ঘদিন আমরা সেখানে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের পরিচয় দিয়ে থেকেছি। এখানকার হাকিম আওরিজীর কাছ থেকে একটা চাকুরিও বাগিয়ে নিয়ে তার বিশ্বস্ত হয়ে উঠি।'

'যা জিজ্ঞেস করেছি তার উত্তর দাও। কী বলে লোকদেরকে এমন ভীত করে তুলেছো?'– আবদুল মালিক অধৈর্য গলায় বললো।

'গোস্তামী মাফ ইয়া পীর। ওরা তো সৌভাগ্যবান যে আমরা আগেই ওদেরকে জানিয়ে দিয়েছি ওদের ওপর কোন কেয়ামত নেমে আসছে। সুলতান ওসিমকুহের ফৌজকে হুকুম দিয়েছেন কেল্লা নাযিরওয়াতাবাসের কেউ যেন রেহাই না পায়।'

আবদুল মালিক তাদেরকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলো। এখানেও তার শাহী ব্যবস্থা। ওদের সামনে রাজকীয় মদ পরিবেশন করলো।

'সুলতান তো আমাদেরকে 'আমান' (নিরাপত্তা) দিয়ে দিয়েছিলেন'– আবদুল মালিক বললো– 'আমরা যেমন চেয়েছি ঠিক তেমনই করে দিয়েছেন। কিন্তু এখন কি করে আবার আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর নির্দেশ দিলেন।'

'শুধু অভিযান নয় কতলেরও হুকুম দিয়েছেন'– ইবনে ইউনুস বললো– 'আমরা দু'ভাই-ই সালার আওরিজীর কর্মচারী ছিলাম। আমার ভাই তো আরো বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠেছিলো। তার উপস্থিতিতেই সুলতানের এ হুকুম এসেছে। বলা হয়েছে আবদুল মালিককেও যেন জীবিত রাখা না হয়।'

'আচ্ছা এটা কি আমাদেরকে ধোঁকা দেয়া হচ্ছে না? আমি সুলতানের প্রতি খুশি ছিলাম তিনি আমাদের সঙ্গে উদারতার পরিচয় দিয়েছেন....

'আপনি তার এই চাল বুঝতে পারেননি ইয়া পীর!'– মুযাম্মিল তাকে বাঁধা দিয়ে বললো– 'তিনি আমাদেরকে দুভাগে ভাগ করে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন। ভুল করেছেন আপনিই এবং তার কাজ সহজ করে দিয়েছেন। আপনি সুলতানকে বলেছিলেন আপনাদের লোক অর্ধেক আলমোতে যাবে আর অর্ধেক আসবে এখানে। তাই তিনি আপনার এ শর্ত মেনে নিয়েছিলেন।'

'ফৌজ কবে পৌঁছবে এখানে?'

'দু'দিন পর। আপনি এখান থেকে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিন। আমরা আপনার সঙ্গে আলমোত যাবো। এখানকার স্থানীয়দের কাছ থেকে আমরা প্রয়োজনমত উট ঘোড়া নিয়ে নিবো। তবে এখন থেকে রাতে এবং গোপনে বের হতে হবে। না হয় লোকজন জানতে পারলে সবাই আপনার বিরুদ্ধে চলে যাবে।'

সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছু লোক তাদের স্ত্রী সন্তান নিয়ে কেল্লা থেকে বেরিয়ে গেলো। আবদুল মালিকও গভীর রাতে তার পরিবারের মেয়েদের নিয়ে মুযাম্মিলদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো। মুযাম্মিলদের সঙ্গে যেতে আবদুল মালিক নিশ্চিন্তবোধ করছিলো। কারণ ওদের চারজনই ছিলো সশস্ত্র।

কেল্লা থেকে মাইল খানেক দূরে গিয়ে মুযাম্মিল হঠাৎ মশাল জ্বালালো এবং মশালটি উঁচু করে ধরে তিনবার ঘুরালো। আবদুল মালিক বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো। চাঁদের আলোতে মশাল জ্বালানোর প্রয়োজন কি? মুযাম্মিল কোন উত্তর দিলো না। শুধু মুচকি হাসলো। তখনই সামান্য দূর থেকে তীব্রবেগে ধাবমান ঘোড়ার খুরধ্বনি শোনা গেলো। দেখতে দেখতে একদল ঘোড়সওয়ার এসে ওদেরকে ঘিরে ফেললো। মুযাম্মিল আবদুল মালিককে ঘোড়া থেকে নামতে বললো। আবদুল মালিকের পা মাটিতে পড়ার আগেই এক ঘোড়সওয়ার তলোয়ার বের করে তার ধর দেহ থেকে পৃথক করে ফেললো।

তার পরিবারের মেয়েরা ভয়ে চিৎকার শুরু করে দিলো। মুযাম্মিল তাদেরকে বললো, তাদের ওপর হাত উঠানো হবে না। তাদেরকে কেল্লায় ফেরত পাঠানো হবে। তার পরিবারের আরো দু'জন পুরুষ সঙ্গে এসেছিলো। ওদেরকেও হত্যা করা হলো।

আবদুল মালিকের লাশ উঠিয়ে এবং তার খণ্ডিত মস্তক একটি বর্শার ফলায় বিদ্ধ করে এ দল কেল্লায় ফিরে এলো। আবদুল মালিকের পরিবারের ছেলেদের কেল্লায় ঢুকিয়ে সবাই কেল্লা ওসিমকুহের দিকে রুখ করলো। মুযাম্মিলের ইচ্ছা ছিলো আবদুল মালিকের মস্তক আলমোতের দরজায় রেখে আসবে। কিন্তু সওয়ার কমাণ্ডার বললো এর ফয়সালা করবেন সালার আওরিজী। পরে সালার আওরিজী জানালেন। কাপড়ে পেচিয়ে এই মস্তক সুলতান মুহাম্মদের কাছে পাঠানো হবে।

কয়েকদিন পর সালার আওরিজী কেল্লা নাযিরওয়াতাবাস হেফাজতের জন্য একদল সৈন্য পাঠালেন। তারপর তিনি সেখানে গিয়ে সেখানকার সমস্ত আবাদীকে একত্রিত করে একটি ভাষণ দিলেন। তিনি সবার নিরাপত্তা ও নারীদের ইজ্জত আবরু হিফাজতের নিশ্চয়তা দিলেন। তিনি এমন ভাষায় ভাষণ দিলেন যে, সবার মধ্যেই বেশ নিশ্চিন্তবোধের ছায়া দেখা গেলো। শাহদরে তাদের অনেক কঠিন সময় কেটেছে। তারপর এখানে এসে দু'দণ্ড যাওয়ার আগেই আবার মৃত্যুর বিভীষিকার সামনে পড়তে হয়েছে তাদের। এখন তো তাদের লক্ষ্য শুধু নিজেদের ও নিজের পরিবারের প্রাণভিক্ষা। সেটা পেয়ে এখন তারা সালার আওরিজীর প্রতি বেশ কৃতজ্ঞচিত্ত।

ওদিকে সুলতান মুহাম্মদ কেল্লা নাযিরওয়াতাবাস জয়ের পায়গাম পেয়ে সালার আওরিজীকে দূত মারফত শুভেচ্ছা বার্তা পাঠালেন।

★★★★

হাসান ইবনে সবা যখন তার পীর মুর্শিদ আবদুল মালিক ইবনে আতাশের নিহত হওয়ার ঘটনা শুনলো প্রথমে সে যেন বোকা বনে গেলো। তারপর প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়লো। তার দরবারীরাও তার এই ভীষণ মূর্তি দেখে থর থর করে কাঁপতে লাগলো। তারা কখনো তার এমন ভয়ংকর মূর্তি দেখেনি। তারা দেখে এসেছে, বাতিনীদের কোন বিপর্যয়ের খবর পেলে প্রথমেই তার মুখে বিদ্রূপের হাসি খেলে যেতো। তার চোখ মুখ আরো ফুরফুরে হয়ে উঠতো।

রাগে সে উল্টাপাল্টা বকতে লাগলো। এ সময় তাকে জানানো হলো, আব্দুল মালিক ইবনে আতাশের দুই স্ত্রী, দুই মেয়ে ও দুই নাতি এসেছে। হাসান ইবনে সবা দৌড়ে বাইরে চলে এলো এবং আবদুল মালিকের বৃদ্ধ স্ত্রীর পায়ে গিয়ে পড়লো। তারপর নিজেকে সংযত করে দ্বিতীয় স্ত্রীকে ভেতরে পাঠিয়ে দিলো এবং বৃদ্ধ স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো।

'সেলজুকিরা কি আপনাকে ছেড়ে দিয়েছে না আপনি নিজেই কোনভাবে সেখান থেকে বের হয়ে এসেছেন ঃ

'সেলজুকি সালার নিজে আমার কাছে এসে আদব বজায় রেখে বলেছে'– বৃদ্ধা স্ত্রী জবাব দিলো– এখানে থাকতে চাইলে থাকতে পারেন। আপনার হেফাজতের যিম্মাদারী আমাদের ওপর থাকবে। আর আলমোত যেতে চাইলে মুহাফিজ দিয়ে আলমোত পৌঁছে দেবো... আমি আলমোতের কথা বললাম। সবচেয়ে বেশি ভয় ছিলো যুবতী মেয়েগুলোকে নিয়ে। এমন সুন্দরী মেয়েকে বাগে পেলে কে ছেড়ে দেয়। কিন্তু সালার আওরিজী যা বলেছে তা করে দেখিয়েছে। তার মুহাফিজরা আমাদেরকে আলমোত রেখে গেছে।'

হাসান ইবনে সবা তখনই হুকুম দিলো তার এক বিশেষ ফেদায়েন প্রয়োজন, যে সালার আওরিজীকে কতল করতে পারবে। ঘোষণা দেয়ার একটু পর ছাব্বিশ সাতাশ বছরের এক যুবক হাসান ইবনে সবার সামনে এসে সিজদায় পড়ে গেলো। হাসান তার মাথায় হাত রাখতেই সে উঠে দাঁড়ালো।

'চিরদিনের জন্য বেহেশতে থাকতে চাও?– হাসান মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলো।

'ইয়া ইমাম! অবশ্যই, আপনার হুকুম হলে সারা জীবন বেহেশতে থাকবো এবং আপনি চাইলে দোযখেও থাকতে রাজী। সেখানেও আমার মুখে আপনার নাম থাকবে'– যুবকটি বললো,

'না, দোযখে তোমাকে পাঠাবো না। তোমাকে সেই বেহেশতে পাঠাচ্ছি যেখানে তুমি চিরদিন যুবক থাকবে।'

কি করতে হবে না করতে হবে হাসান ইবনে সবা তাকে বুঝিয়ে দিলো। তাকে বলা হলো, সেখানে দু'জন লোক তাকে আশ্রয় দেবে এবং আওরিজীকে হত্যার ব্যাপারে সাহায্যও করবে। এত বড় একটি দায়িত্ব দেয়াতে যুবকটি তার ইমামের প্রতি বেশ কৃতজ্ঞ হলো।

ওসিমকুহে মধ্যবয়সী দু'জন সবজি বিক্রেতা আছে। সমাজে ওরা বেশ জায়গা করে নিয়েছে। এরা ভয়ংকর রকমের বাতিনী। এদের মতো আরো তিন চার জন বাতিনী আছে। সমাজে যাদেরকে সম্মানের চোখে দেখা হয়। একদিন এক সবজি বিক্রেতার কাছে উবাইদ আরাবী নামে এক সুদর্শন যুবক মেহমান হয়ে এলো। সবজি বিক্রেতা তার ভাতিজা বলে পরিচয় দিলো এবং বললো, এর বাবা মরে গেছে। এজন্য চাচার সঙ্গে থাকতে এসেছে। ক'দিনেই যুবকটি সদালাপী ও অত্যন্ত ভদ্র ছেলে হিসেবে সবার নজর কাড়তে সমর্থ হলো। এই উবাইদ আরাবীকেই হাসান ইবনে সবা পাঠিয়েছে সালার আওরিজীকে হত্যা করতে। ওসিমকুহে বিশাল একটি ঘোড়দৌড়ের ময়দান আছে। সেখানে দিনের বেলায় সৈনিকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। শহরের লোকেরা প্রতিদিন সেখানে ভীর করে সৈনিকদের প্রশিক্ষণ দেখে। সালার আওরিজীও প্রতিদিন সেখানে গিয়ে পরিদর্শন করেন।

একদিন উবাইদ আরাবীও দর্শকদের কাতারে গিয়ে দাঁড়ায়। আওরিজী তাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলো। এ সময় উবাইদ আরাবী আওরিজীর দিকে হাঁটা দেয়। কিন্তু এক সৈনিক তার পথরোধ করে জিজ্ঞেস করে সে মাঠে কেন ঢুকলো।

'আমি ফৌজে ভর্তি হতে চাই। তাই সিপাহসালারের সঙ্গে দেখা করতে চাই'– উবাইদ বলে।

'না ভাই, ফৌজ যেখানে ভর্তি করানো হয় সে জায়গা আমি বলে দিচ্ছি। তুমি সেখানে চলে যাও।'

'শুধু ভর্তির জন্যই সিপাহসালারের সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই না, সিপাহসালারকে আমার খুব ভালো লাগে। আমি তার হাতে একটু চুমু খেতে চাই।'

'খুব শক্ত হুকুম দেয়া আছে। বাইরের কেউ সিপাহসালারের সামনে যেতে পারবে না।'

'কেন ভাই?'

'সেটা তো তোমার জানা উচিত'– সৈনিক বললো– 'তুমি কি জানো না হাসান ইবনে সবার ফেদায়েনরা কত অসংখ্য মুসলমান ধোঁকা দিয়ে হত্যা করেছে। তুমিও তো তেমনি একজন হতে পারো।'

উবাইদ সেখান থেকে চলে গেলো। সে আসলে দেখতে যাচ্ছিলো আওরিজীর সামনে যাওয়াটা কতটা সহজ বা কঠিন।

সেদিন সন্ধ্যায় শাফিয়া কেল্লা ওসিমকুহের এক ছাদে পায়চারী করছিলো। তার ফেলে আসা জীবনের স্মৃতিচারণ করছিলো। সে তো এখন একা, মুযাম্মিল সুমনা ছাড়া তার আর কেউ নেই। দিগন্তে মিলিয়ে যাওয়া সূর্যের লালিমার দিকে তাকিয়ে সে হারিয়ে যাচ্ছিল সুদূর কোন অতীতে। হঠাৎ তার কানে পেছন থেকে পদধ্বনি আসলো। ঘুরে দেখলো এক যুবক তার দিকে এগিয়ে আসছে। যুবকের চেহারা দেখে সে চমকে উঠলো। চেহারাটি বড় চেনা চেনা লাগছে। কোথায় দেখেছে ভাবতে ভাবতে যুবকটি তার কাছে চলে এলো এবং যুবকটি তাকে দেখে চমকে উঠলো। তার চোখে মুখেও দ্বিধাদ্বন্দ্ব।

'তুমি কি আমাকে চেনার চেষ্টা করছো?'– শাফিয়া সসংকোচে জিজ্ঞেস করলো– 'চেষ্টা করে যাও আমাদের আগে মনে হয় কোথাও সাক্ষাত হয়েছে। মনে হচ্ছে শুধু সাক্ষাতই নয় আমরা কোথাও এক সঙ্গে ছিলাম।'

'তুমি যে আমাকে মন্দ জানোনি এতেই আমি খুশী। আমিও তোমার মতোই অনুভব করছি।'

'তুমি কি নাসির নও? খোদার কসম তুমি নাসির। আমার স্মৃতি আমাকে ধোঁকা দিতে পারবে না। তুমি আমার শৈশবের সাথী। মহল্লার অলিগলিতে আমরা ছুটাছুটি করতাম। তুমিই একমাত্র আমার খেলার সাথী ছিলে... ভুল বলছি আমি?– শাফিয়ার কণ্ঠে আবিষ্কারের উত্তেজনা।

'না ভুল বলছো না তুমি; আর আমার নাম হয়তো তোমার মনে নেই। শৈশবে হয়তো আমার নাম নাসিরই ছিলো। পরে আমার নাম হয়ে গেছে উবাইদ আরাবী। হ্যাঁ মনে পড়ছে তুমি আমার শৈশবের সাথী ছিলে। এরপর তুমি সেখান থেকে চলে এসেছিলে। এরপর আরো দু'একবার হয়তো তোমাকে দেখেছি। তা আজ তোমাকে দেখে আমার খুব ভালো লাগছে'– উবাইদ আরাবীর কণ্ঠে উষ্ণতা ফিরে আসছে।

'তুমি কি বিয়ে করেছো?'

'না শাফিয়া! জীবনে অনেক মেয়ে এসেছে। কিন্তু আমার মনের মতো হয়ে কেউ আসেনি। আমি দেহ চাইনি কোন দিন। চেয়েছি হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসা ভালোবাসা আর প্রেমের উত্তাল তরঙ্গ।'

শাফিয়ার মরচে ধরা হৃদয়ে এই যুবকটি যেন আবেগের উচ্ছ্বাস এনে দিয়েছে, এক লাফে সে চলে গেছে সুদূর অতীতে। যেখানে উবাইদরা শাফিয়াদের প্রতিবেশি ছিলো। কচি দুটি ছেলে মেয়ে তখন ছিলো খেলার সাথী। শাফিয়ার মা এবং কয়েক মাস পর তার বাবা মরে যাওয়ার পর উবাইদ আরাবীই ছিলো তার সান্ত্বনার আশ্রয়। কিন্তু এর কিছুদিন পর চাচা আবু জান্দাল সেখান থেকে শাফিয়াকে ওসিমকুহে নিয়ে আসে।

'না না, তোমার নাম নাসিরই ছিলো, উবাইদ আরাবী নয়। আমার হৃদয়ে সেই নাসির আবার ফিরে এসেছে'– শাফিয়া উবাইদ আরাবীর কাঁধে হাত রেখে বললো।

দু'জনই তখন অথৈ আবেগে ভাসছে।

'শাফিয়া! আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন তো তুমি সুন্দরী ছিলে কিন্তু এখনকার মতো সুন্দরী ছিলে না'– উবাইদ আরাবী বললো।

এ কথায় কি মজা পেলো কে জানে, খিলখিল করে হেসে উঠলো শাফিয়া। 'তোমার নিশ্চয় বিয়ে হয়েছে'– উবাইদ ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'না'। বিয়ের কথা উঠলেই মনে হয় নিজেকে কারো কাছে বিক্রি করে দিচ্ছি। মনে হয় এ হৃদয় হারানো কোন প্রেমিকার সন্ধানে আছে'– শাফিয়ার সলজ্জ কণ্ঠ।

'সে সেটা পেয়ে গেছে। আমাদের দু'জনের হৃদয়ই সেটা পেয়ে গেছে। এখানে কার কাছে থাকো?'

'আমার আর কেউ নেই এখন। মহান আল্লাহ এমন দু'জন মিলিয়ে দিয়েছেন যাদের কাছে আমি মা বাবার চেয়েও বেশি আদর পাই।'

'বেশি সময় তোমার তাহলে এখানে থাকা ঠিক হবে না। রাত হয়ে আসছে, উনারা চিন্তা করবেন। তোমাকে সন্দেহ করতে পারেন।'

'আগে তোমার কথা বলো। ওসিমকুহে তো তোমাকে কোনদিন দেখিনি।'

'আমারও বাবা মা মরে গেছেন। তোমার ইস্পাহান থেকে চলে আসার বছরখানেক পরই উনারা গত হন। এতদিন থাকতাম অন্য এক জায়গায়। এখানে আমার চাচা থাকেন। তিনি সবজি বিক্রেতা। উনার কাছেই থাকি।

....ঠিক আছে এখন চলো–'কাল কোথায় এবং কখন দেখা হবে?'

যেখানে বলবে সেখানে। যখন বলবে তখনই আসবো।'

'কেল্লার বাইরে আসতে পারবে? কেল্লার সঙ্গে একটি চমৎকার সবজি বাগান আছে। নানান ধরনের ফুলের গাছের সমাহার সেখানে। বাগানের মালিক তোমার চাচার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সুতরাং কোন ভয় নেই।'

'আরে ঐ বাগানে তো কয়েকবার আমি গেছি। খুব সুন্দর জায়গা ওটা।'

ঘরে ফেরার আগে মনে মনে শাফিয়া ঠিক করে নিলো, মুযাম্মিল ও সুমনার কাছে মিথ্যা বলবে না। যা ঘটেছে সব বলবে।

ঘরে ঢুকেই সে সুমনার পেরেশানী মুখ দেখতে পেলো। মুযাম্মিল বললো, এখনই সে তার খোঁজে বের হচ্ছিলো।

'শৈশবের এক সাথীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো, কেল্লার ছাদে বসে শৈশবের কথা বলছিলাম আমরা– শাফিয়া বললো দৃঢ় গলায়।

'কে সে?'– সুমনা জিজ্ঞেস করলো।'

কয়েক দিন হলো এখানে এসেছে। ছেলে বেলায় আমরা এক সঙ্গে খেলাধুলা করতাম। আজ দেখা হতেই পরস্পরকে আমরা চিনে ফেলেছি।'

'তুমি যদি ওকে ভালো ছেলে হিসেবে জানো তাহলে তো কোন কথা নেই। কিন্তু শুধু যদি তার ছেলেবেলার কথাই জেনে থাকো তাহলে ওর ব্যাপারে সতর্ক থেকো। আজকাল কারো প্রতি ভরসা রাখা যায় না'– মুযাম্মিল বললো।

'মেলামেশা ওর সঙ্গে না করাই ভালো'– সুমনা বললো।'

'না, মিশবে না কেন? অবশ্যই মেলামেশা করবে। কিন্তু ওর ব্যাপারে অন্ধ থাকলেই চলবে না। ওকে ভালো করে যাচাই বাছাই করে দেখো.... ও কোন ভুল লোক না তো? হাসান ইবনে সবার পাঠানো ফেদায়েনও হতে পারে। কেল্লা নাযিরওয়াতাবাস আমরা যেভাবে নিয়েছি হাসান ইবনে সবা এর প্রতিশোধ অবশ্যই নেবে। সে সিপাহসালার আওরিজীকে হত্যাও করতে পারে... তাই অপরিচিত কাউকে শহরে দেখলে তাকে চোখে চোখে রাখতে হবে'– মুযাম্মিল বললো।

রাতের খাওয়া দাওয়ার পর সুমনা শাফিয়াকে বললো,

'শাফিয়া! বয়স তো কম হয়নি। এখন কাউকে বেছে নাও নিজের জন্য।'

'আমি একদিন উবাইদকে নিয়ে আসবো। আপনারাই তখন বলতে পারবেন আমার পছন্দ কেমন'– শাফিয়া বললো।'

'তোমার পছন্দ নিশ্চয় ভালো হবে'– মুযাম্মিল বললো–'কিন্তু আমরা শুধু এটা দেখবো না যে, উবাইদ কতটা সুদর্শন আর তোমাকে কতটা ভালোবাসে। আমরা ওর ভেতরটা দেখতে চাই। কোন ধোঁকাবাজের কবলে আমরা তোমাকে পড়তে দেবো না।'

রাতটা শাফিয়ার কাটলো বড় অস্থিরতার মধ্যে। সকালে সময় হতেই শাফিয়া ঐ সবজি বাগানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো।

'আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। কোন চিন্তা করবেন না'– শাফিয়া সুমনার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিলো।

'তারপরও সাবধানে থেকো। ওকে যেমন পারো বাজিয়ে দেখো। আর এখানে ওকে অবশ্যই আনবে।'

শাফিয়া ও উবাইদ বসলো বাগানের একটি ঝোপের তলায়।

'আগে এটার ফয়সালা হোক। আমি তোমাকে উবাইদ বলবো না নাসির বলবো?'– শাফিয়া উবাইদকে বললো।

'উবাইদই বলো, নামকে এত গুরুত্ব দিচ্ছো কেন? ভালোবাসায় নামের কি ভূমিকা, প্রেম না থাকলে অতি সুন্দর নামও বেখাপপা ও অসুন্দর মনে হয়'– উবাইদ আরাবী বললো।

ওরা সেদিন অনেক কথা বললো। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত এবং অনেক স্বপ্ন-সাধের কথা ওরা বললো। বলতে বলতে ওরা কখনো কখনো একে অপরের মধ্যে হারিয়ে যেতে লাগলো। প্রায় অর্ধেক দিন যাওয়ার পর কোন একটা আওয়াজ ওদের প্রেমের অধ্যবসায় ভাঙ্গলো।

'একদিন আমি তোমাকে আমাদের ঘরে নিয়ে যাবো। উনাদের সঙ্গে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেবো'– শাফিয়া উঠতে উঠতে বললো।

'শাফিয়া! ওদের কাছে নিয়ে যাওয়ার আগে আমাকে বুঝে নাও। আমি আর কিছু চাই না। শুধু তোমার প্রেমের কাঙ্গাল'– উবাইদ আরাবী বললো।

এভাবে আট দশ দিন ওদের সাক্ষাত ঘটলো। একদিন শাফিয়া উবাইদকে তার ঘরে নিয়ে গেলো। সুমনা মুযাম্মিল দু'জনই ওকে খুব পছন্দ করলো। মুযাম্মিল ওকে কয়েকটা জরুরী প্রশ্ন করলো। উবাইদ তাকে হতাশ করলো না।

'আমি সিপাহসালার আওরিজীর সঙ্গে সাক্ষাত করতে চাই। উনার হাতে চুমু খেতে চাই। তিনি যা করে দেখিয়েছেন সেটা আর কেউ করতে পারতো না। আমাকে ওর সঙ্গে সাক্ষাত করিয়ে দিন'– উবাইদ মুযাম্মিলকে বললো।

'আমি সাক্ষাত করিয়ে দেবো'– মুযাম্মিল বললো।

'আমি আসলে সৈনিক হতে চাই। সিপাহসালার আওরিজীর অধীনে থেকে আমি ইসলাম ও সালতানাতের খেদমত করতে চাই।'

সুমনা ও মুযাম্মিলের মোটেও সন্দেহ হলো না যে, উবাইদ আরাবী হাসান ইবনে সবার পাঠানো ঘাতক। মুযাম্মিল তাকে জানালো, সালারের সঙ্গে দেখা করানো যাবে তবে তোমার জামা তল্লাসি করবে, তোমার কাছে কোন হাতিয়ার আছে কিনা।

'আমি শুধু উনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। হাতিয়ারের প্রদর্শনী উনার সামনে দেবো না। - উবাইদ বললো।

শাফিয়া একদিন লক্ষ্য করলো, উবাইদ আজ বেশ অস্থির এবং তার কথাবার্তা কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। শাফিয়া জিজ্ঞেস করতেই উবাইদ তা হেসে উড়িয়ে দিলো। কিন্তু কথায় কথায় তার অস্থিরতা ক্রমেই অস্বাভাবিক হয়ে উঠতে লাগলো।

শাফিয়ার এক হাত তখন উবাইদের হাতের মুঠোয় পুরু। একবার উবাইদ তার আঙ্গুল খুব জোরে চেপে ধরলো। শাফিয়া অনেক কষ্টে তার হাত ছাড়িয়ে ঘাবড়ানো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো সে কেন এমন হয়েছে।

'কিছুই না শাফিয়া! আমার কিছুই হয়নি। মাঝে মধ্যে আমার এ রকম হয়'– উবাইদ বললো ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দে– 'তারপর আমি আবার নিজের মধ্যে ফিরে আসি। তুমি ভয় পেয়ো না.... ঘরে চলো, সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি ঠিক হয়ে যাবো। তখন আমাকে স্বাভাবিক দেখতে পাবে।'

দু'জনে দু'জনের ঘরে চলে গেলো।

'ইমামের কসম দিয়ে তোমাকে বলছি, একটা ব্যবস্থা করো'– উবাইদ ঘরে ফিরেই তার চাচা সব্জিওয়ালাকে বললো–' আজ তো আমার অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। হায়! মেয়েটি যদি আবার কোন সন্দেহ করে, আজকে 'হাশীষ' না পেলে আমি পাগল হয়ে যাবো, আর তখন দেখো তোমার ঘাড়ও মটকে দিতে পারি।'

'আজ সন্ধ্যায় তোমার নেশার জিনিস পেয়ে যাবে'– সবজিওয়ালা বললো– 'তবে এখানে যত মালপত্র আসে সব আগে খুলে দেখা হয়। সালার আওরিজীর বড় শক্ত হুকুম হাশীষের একটা কণাও যেন কেল্লায় না ঢুকতে পারে। হাশীষ বা এ ধরনের অন্য কোন দ্রব্যসহ কেউ ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে তাকে কয়েদখানায় ভরে দেয়া হবে।'

সেদিন সন্ধ্যায় শাফিয়া বাইরে বের হচ্ছিলো এ সময় মুযাম্মিল হন্তদন্ত হয়ে কামরায় প্রবেশ করলো। শাফিয়াকে ডেকে সুমনার কাছে নিয়ে গেলো।

'বড় দুঃসংবাদ আছে তোমার জন্য শাফিয়া!'– মুযাম্মিল বললো– 'এখন তোমার কাছে এটি দুঃসংবাদ মনে হবে কিন্তু বড় একটা বিপদ সম্পর্কে আগেভাগে জানা হয়ে গেলো।'

খবর হলো, সালার আওরিজী জানেন, কেল্লায় এখনো বাতিনীরা আছে। আর ওরা হাশীষ সেবন ছাড়া বেশি দিন থাকতে পারে না। তাই তিনি হুকুম জারী করেছেন। এ কেল্লায় যে কোন ধরনের মালের চালানই আসুক তার চুলচেরা তল্লাশি না করে যেন কেল্লায় ঢুকতে দেয়া না হয়। আজ বিকেলের দিকে কেল্লায় এক ব্যবসায়ী কাফেলা আসে। আওরিজীর এক গোয়েন্দা তখন লক্ষ্য করলো, কাফেলার ভেতর থেকে এক লোক একটি থলে হাতে বের হয়ে এলো এবং তখনই তার কাছে এই উবাইদ ও সবজিওয়ালা ছুটে গেলো। লোকটি থলেটি সবজিওয়ালার কাছে দিলো। সবজিওয়ালা সেটা তার আলখেল্লার ভিতর ঢুকিয়ে একদিকে হাঁটা ধরলো, উবাইদও তাকে অনুসরণ করলো। একটু পর সেই গুপ্তচরের মাধ্যমে ওদের দু'জনকে পাকড়াও করে সেই থলে পরীক্ষা করে পাওয়া গেলো শুকনো হাশীষ। কতোয়াল তখন ওদেরকে কয়েদখানায় পাঠিয়ে দিলেন।

শাফিয়া কাঁদতে শুরু করলো। মুযাম্মিলকে সে হাতজোড় করে বলতে লাগলো, উবাইদ আরাবী এমন লোক নয়। হয়তো ওর চাচা এ দিয়ে নেশা করে। মুযাম্মিল ও সুমনা ওকে বুঝাতে চেষ্টা করলো, মানুষের বিশ্বাস নেই। সে ওপরে ভালো হয়ে ভেতরে ভেতরে তো খারাপও হতে পারে। কিন্তু শাফিয়া উবাইদের বিরুদ্ধে কোন কথা

শুনতে রাজী নয়। মুযাম্মিল তাকে এ বলে শান্ত করলো যে, সে কয়েদখানায় গিয়ে জেনে আসবে উবাইদ কি আসলে হাশীষ সেবী কিনা।

মুযাম্মিল ও ইবনে ইউনুস কয়েদখানায় চলে গেলো। উবাইদ আরাবী যখন মুযাম্মিলকে দেখলো তখন দৌড়ে গারদের কাছে এসে শিক ধরে চিৎকার করতে লাগলো।

'আল্লাহর দিকে চেয়ে আমাকে একটু হাশীষ দাও'– উবাইদ চিৎকার করে বলতে লাগলো– 'আমি মরে যাবো.... আমাকে এত কষ্ট দিয়ে মেরো না... হাশীষ দাও। না দিলে আমাকে মেরে ফেলো।'

মুযাম্মিল তাকে বললো, কেল্লায় তো হাশীষ ঢোকা নিষেধ। তাকে কোত্থেকে হাশীষ দিবে। এটা শুনে উবাইদ লোহার গারদে তার মাথা পেটাতে লাগলো। এতে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগলো তার কপাল থেকে। ওদের সঙ্গে প্রধান দারোগা ছিলেন। তিনি দু'তিনজন প্রহরীকে হুকুম দিলেন ওর হাত পা এক সঙ্গে বেঁধে কুঠুরীর এক কোণে ফেলে রেখো। তার হুকুম তামিল করা হলো।

'ওকে সামান্য হাশীষ দিয়ে দেখুন ও হয়তো হাসান ইবনে সবা সম্পর্কে মুখ খুলবে'– মুযাম্মিল দারোগাকে বললো– 'দেখাই যাচ্ছে সে নেশায় বুঁদ হয়ে আছে।'

'তারপরও যে মুখ খুলবে না। এদের ব্যাপারে আমাদের অনেক অভিজ্ঞতা আছে। সামান্য হাশীষ পেলেই দেখবেন ও বাঘের মতো হুংকার দিচ্ছে'– দারোগা বললেন।

মুযাম্মিল ও ইবনে ইউনুস চলে এলো। কিন্তু শাফিয়া ওদের কথা বিশ্বাস করতে রাজী হলো না। খুব করুণভাবে কাঁদতে লাগলো এবং বলতে লাগলো, আমাকে সালার আওরিজীর কাছে নিয়ে চলো। উবাইদকে আমি কয়েদখানা থেকে বের করে নিয়ে আসবো। কিন্তু মুযাম্মিল জানে সালার আওরিজী কখনই এটা মেনে নেবে না। বাতিনীদের প্রতি তার সামান্যতম করুণাও নেই।

পরদিন শাফিয়ার অবস্থা আরো বিগড়ে গেলো। খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিলো। অনবরত কান্নাই তার কাজ হয়ে দাঁড়ালো। ওদিকে উবাইদের অবস্থাও আরো অনেক খারাপ হয়েছে। মাথা থেকে অনর্গল রক্ত বেরোচ্ছে, সে এতই দুর্বল হয়ে গেছে যে, তার গলা দিয়ে চিৎকারের শব্দ বের হচ্ছে না। কিন্তু গলাভাঙ্গা কুকুরের মতো সে ফ্যাস ফ্যাস করেই যাচ্ছে। এ খবর শুনে শাফিয়া পাগলের মতো আচরণ শুরু করে দিলো। শাফিয়ার এ অবস্থা দেখে সুমনাও কেঁদে ফেললো। মুযাম্মিল সুমনাকে বললো, চলো আমরা একবার সালার আওরিজীর কাছে গিয়ে দেখি।

'তিনি কি ওকে ছেড়ে দেবেন?'– সুমনা জিজ্ঞেস করলো।

'ছাড়বে না ঠিক'– মুযাম্মিল বললো– 'তবে সালার আওরিজীর কাছে আমি আবেদন করবো, তিনি যেন একজন ডাক্তার কয়েদখানায় পাঠিয়ে দেন। ডাক্তার উবাইদের নেশার প্রতিক্রিয়া দূর করে তাকে সুস্থ করে তুলবেন। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা যাবে হাশীষ কোত্থেকে এসেছিলো। এই এক পদ্ধতিতেই উবাইদকে আমরা বাঁচাতে পারি। আর সে যদি মুখ না খুলতে চায় তাহলে আমরা তাকে সাহায্য করবো না। তখন আমরা নিশ্চিত হয়ে যাবো যে হাসান ইবনে সবার পাঠানো কোন গুপ্তঘাতক। এটা প্রমাণ হলে শাফিয়া মরে গেলেও আমাদের কিছু করার থাকবে না।'

মুযাম্মিল ও সুমনা সালার আওরিজীর কাছে গিয়ে সব খুলে বললো এবং তাদের এই নতুন অনুরোধটিও তার কাছে রাখলো। তাদের কথা শেষ হয়েছে এ সময় ঝড়ের বেগে দাড়োয়ানকে ধাক্কিয়ে শাফিয়া কামরায় প্রবেশ করলো এবং সালার আওরিজীর পায়ে পড়ে ফুঁপাতে ফুঁপাতে বললো, ওকে যেন কয়েদখানায় যেতে দেয়া হয়। সে উবাইদের কাছ থেকে আসল কথা নিতে পারবে এবং তাকেই সে সত্য কথা বলবে। শাফিয়ার ব্যাপারে আওরিজী ভালো করেই জানেন। তাই তিনি তার মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে দিলেন। সান্ত্বনাও দিলেন এবং বললেন, তোমাকে এদের সঙ্গে কয়েদখানায় যেতে দেয়া হবে।

আওরিজীর হুকুমে কয়েদখানায় একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার পাঠানো হলো। ডাক্তারের সঙ্গে মুযাম্মিল, সুমনা ও শাফিয়াও কয়েদখানায় গেলো। উবাইদ তখন বাঁধা হাত পা নিয়েই মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিলো আর তার গলা দিয়ে কেমন ভয় ধরানো ঘরঘর আওয়াজ বের হচ্ছিলো। এক প্রহরী কুঠুরীর দরজা খুলে দিলো। ডাক্তারসহ ওরা ভিতরে প্রবেশ করলো।

শাফিয়ার দিকে উবাইদের চোখ পড়তেই তার ঘরঘর শব্দ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলো। শাফিয়ার দিকে সে ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে রইলো। সে তখন মাটিতে কুন্ডলীর মত পড়েছিলো। শাফিয়া দৌড়ে গিয়ে তার পাশে বসলো এবং পরম মমতায় তার মাথা নিজের কোলে নিয়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

'শাফিয়া! শাফিয়া!' – উবাইদ হাপধরা কণ্ঠে বললো– আমাকে বাঁচাও।... ওদের কাছ থেকে আমাকে বাঁচাও... তোমার কাছে একটু জায়গা দাও আমাকে শাফিয়া... শাফিয়া।'

ডাক্তার এগিয়ে আসলে শাফিয়া উবাইদের মাথাটি তার কোলে আরো জোরে চেপে ধরলো। এখানে যে ওদের ছাড়া অন্যরাও আছে সেটা যেন সে ভুলেই গেলো।

'তুমি আমার সঙ্গেই আছো আমার সঙ্গেই থাকবে'– স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললো শাফিয়া– 'আমাদের দু'জনের আশ্রয় আল্লাহ। আর যারা এখানে এসেছেন উনারা সবাই তোমার আমার ভালো চান। ডাক্তারকে তোমার যখমের চিকিৎসা করতে দাও। তারপর তোমার কাছে আমি এসে বসবো।'

ডাক্তার তাকে ভালো করে ধুয়ে মুছে তার ক্ষতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। উবাইদ কোন বাঁধা দিলো না। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়ে গেলে একটি মাত্র সামান্য তরল ঔষধ ঢেলে পাত্রটি ডাক্তার শাফিয়ার হাতে দিলেন উবাইদকে সেটা পান করিয়ে দিতে। শাফিয়ার হাত থেকে উবাইদ ঔষধটুকু পান করলো। সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ কাজ করতে শুরু করলো এবং উবাইদের মাথা একদিকে ঢলে পড়লো, সে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলো। ডাক্তারের ইশারায় সবাই কুঠুরী থেকে বের হয়ে এলো।

হাকিম সাহেব! আমি তো হয়রান হচ্ছি'– দারোগা বললেন– 'গতকাল এ লোকই গারদে আঘাত করে নিজের মাথা ফাটিয়েছে। ওর হাত পা বেঁধে না দিলে এতক্ষণে সে লাশ হয়ে যেতো। আর আজ সে এই মেয়েকে দেখে আগুন থেকে পানি হয়ে গেলো।'

'আমি ওকে খুব গভীরভাবে দেখেছি'– ডাক্তার বললেন– 'গতকাল সে যা করেছে সে সম্পর্কে আমাকে আগেই জানানো হয়েছে। কিন্তু আজ দেখলাম সে মেয়েটির স্পর্শ পেয়ে সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। এখন আমি ওকে ঘুমের ঔষধ দিয়েছি। এটা তার মানসিক অবস্থা সুস্থির হতে সাহায্য করবে। তবে এটাকে কেউ চিকিৎসা মনে করবেন না। এর

চিকিৎসা একমাত্র শাফিয়া। শাফিয়া সবসময় ওর কাছে থাকলে ওর মানসিক ভারসাম্যতা ফিরে আসবে।'

ডাক্তারের এই পরামর্শ নিয়ে সবাই গেলো সালার আওরিজীর কাছে। ডাক্তারও উবাইদ আরাবী সম্পর্কে পূর্ণ রিপোর্ট পেশ করে সুপারিশ করলেন শাফিয়াকে এখন উবাইদের কাছাকাছি রাখা হোক।

'সালার মুহতারাম!'– শাফিয়া সবার সমর্থন পেয়ে আশান্বিত গলায় বললো– আপনি এজাযত দিলে আমি ওর সঙ্গে কয়েদখানায় ঐ কুঠুরীতেও থাকতে রাজী আছি। তবে ওর জন্য যদি আরো ভালো জায়গার ব্যবস্থা করেন তাহলে আপনাদের কাজ আরো সহজ হয়ে যাবে.... আমি মেনে নিয়েছি উবাইদ এখন নেশায় কাবু হয়ে পড়েছে। কিন্তু এর আগে ওকে নিয়ে আমি কখনো এ ব্যাপারে সন্দেহও করতে পারিনি। আপনি যদি ওর কাছ থেকে কোন তথ্য আদায় করতে বলেন তাও আমি পারবো। কিন্তু আমি নিশ্চিত সে বাতিনী নয়।'

'আবেগকে এতো প্রশ্রয় দিয়োনা শাফিয়া!'– আওরিজী বললেন– 'আমি এখন প্রায় নিশ্চিত উবাইদ ও ঐ সবজিওয়ালা হাসান ইবনে সবার পাঠানো লোক। উবাইদ তো তোমাকে প্রেমের নামে ধোঁকা দিচ্ছে। দেখবে এরা তোমাকে আলমোতে নিয়ে হাসান ইবনে সবার পায়ে নজরানা দিবে। এরা এদের পেশায় অত্যন্ত দক্ষ। সবজিওয়ালাকে এত কষ্ট দেয়ার পরও সে মুখ খুলেনি। সে তুলনায় উবাইদ এখনো এত পাকা হয়নি। তোমার কথামতো ওকে চমৎকার সাজানো একটি কামরায় স্থানান্তরিত করা হবে। কামরার বাইরে নিয়মিত প্রহরা থাকবে। তুমিও নিয়মিত ওর কাছে যাবে। তোমার প্রেম দিয়ে তাদের আসল তথ্য বের করে আনবে।'

কেল্লার অভিজাত একটি কামরায় উবাইদকে স্থানান্তরিত করা হলো। দিনের প্রায় পুরোটা সময় শাফিয়া সে কামরায় কাটতে লাগলো। শাফিয়ার হৃদয় উজাড় করা যত্ন ডাক্তারের ঔষধে উবাইদ ধীরে ধীরে স্বাভাবিকতায় ফিরে আসতে লাগলো। মানুষ অতি প্রিয়জনের কাছে নিজের প্রকৃত পরিচয় বেশি দিন লুকিয়ে রাখতে পারে না। উবাইদও পারলো না। শাফিয়ার প্রেম স্নাত কথার ফুলঝুরিতে সে নিজেকে সপে দিলো। সে যে একজন ফেদায়েন ও হাসান ইবনে সবার পাঠানো গুপ্তঘাতক এবং স্বয়ং সালার আওরিজীকে হত্যার জন্য পাঠানো হয়েছে তাকে– ইত্যাদি সব বলে দিলো। সবকিছু বলার পর উবাইদ অনুভব করলো তার নিজেকে এখন খুব হালকা মনে হচ্ছে। তার ভেতর যেন এতদিন কুট কুট করে পাপে দানা ভরা ছিলো। সে তার ফেলে আসা বাতিনী জীবনকে খোদার গজব বলে মেনে নিলো। সংকল্প বদ্ধ হলো নিজেকে নতুন করে গড়ে তোলার। নারী, মদ গাজা ও হাশীষের পাপে বোঝাই জীবন থেকে তাকে যে, শাফিয়া উদ্ধার করলো এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো।

'আমি আমার এই অভিশপ্ত জীবনের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই শাফিয়া!'– উবাইদ আরাবী বললো–' সিপাহসালার আওরিজীকেও আমি এসব কথা জানাবো এবং তাকে বলবো তিনি আমাকে যে শাস্তিই দেবেন হাসিমুখে মাথা পেতে নেবো।'

সালার আওরিজী উবাইদকে কোন শাস্তি দিলেন না।

তবে সবজিওয়ালাকে জনসম্মুখে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো।

★★★★

হাসান ইবনে সবার পীর ও গুরু আবদুল মালিক ইবনে আতাশ ও তার ভাই আহমদ ইবনে আতাশ অনেক আগেই নিহত হয়েছে। তবে রয়ে গেছে আহমদ ইবনে আতাশের ষোড়শী বিধবা স্ত্রী নুর। নুর ও তার বাবার কারণেই সুলতান মুহাম্মদ শাহদর জয় করেন। এজন্য সুলতান মুহাম্মদ ওদেরকে মারুতে ডাকিয়ে এনে পুরস্কৃতও করেন। কিন্তু নুরের মারুতে মন টিকে না। শাহদরে তার মন পড়ে আছে। নুর আহমদ ইবনে আতাশের স্ত্রী থাকলেও তার অবস্থা ছিলো সেখানে কেনা কৃতদাসীর মতো। যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে আহমদ ইবনে আতাশ তাকে ব্যবহার করতো। তাই সে ওখানে গিয়ে মুক্ত জীবনের স্বাদ কেমন সেটা উপভোগ করতে চায়। নুর তার মনের বাসনার কথা তার বাবাকে জানায়। বাবা সুলতান মুহাম্মদের কাছে গিয়ে আরজ করলেন, তাকে যেন শাহদরের কোন একটা বাড়ি দিয়ে দেয়া হয়, আর কিছু জায়গা জমি। বৃদ্ধ হলেও ফসল ফলিয়ে জীবিকা অর্জনের শক্তি আল্লাহ তায়ালা এখনো তার মধ্যে রেখেছেন।

সুলতান মুহাম্মদ সঙ্গে সঙ্গে তা মঞ্জুর করে শাহদরের গভর্ণর সাঞ্জারের কাছে লিখিত পয়গাম পাঠালেন নুর ও তার বাবার মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য। সাঞ্জার তাদের জন্য শাহী ব্যবস্থা করলেন। নুর ও তার বাবাকে দিলেন আহমদ ইবনে আতাশের পুরো শাহী মহলটি এবং শহরের বাইরে নুরের বাবার জন্য দিলেন বিশাল এলাকার উর্বর জমি। প্রতিদিন সকালে তিনি মাঠে চলে যান। নওকরদের জমি কর্ষণের কাজের তদারকি করেন। দুপুর হলে নুর তার বাবার জন্য খাবার নিয়ে যায় মাঠে। মাঠে যেতে নুরের কাছে যেন ভালো লাগে। বাবা ওকে কত নিষেধ করেন খাবার আনার জন্য, কত নওকর আছে তুমি কেন মা অযথা কষ্ট করো। কিন্তু নুরের জন্য এ জীবনটা মুক্ত বিহঙ্গের মতো।

একদিন নুর খাবার নিয়ে যাচ্ছিলো মাঠে। হঠাৎ তার সামনে এক যুবক থমকে দাঁড়ালো। নুরও চমকে জায়গায় দাঁড়িয়ে গেলো। দেখেই তাকে চিনতে পারলো নুর।

'আপনি নাকি বিধবা হয়ে গেছেন? আল্লাহ করুন এ খবরটি যেন ভুল হয়'– যুবকটি বললো– 'আব্দুল মালিক ইবনে আতাশকেও কতল করে দেয়া হয়েছে এবং...

তুমি যা শুনেছো ঠিকই শুনেছো'– নুর মুচকি হেসে বললো– 'তবে এজন্য আমার একটুও দুঃখ নেই। এখন আমি স্বাধীন... আর তুমি নিশ্চয় হাযিক.... আমাকে 'আপনি' করে বলতে হবে না। তোমার চেয়ে তিন চার বছরের ছোটই হবো আমি। 'তুমি' বললেই আমি খুশি হবো।'

শাহদর পতনের পূর্বে হাযিক এ শহরে একজন অভিজাত লোক ছিলো। সপ্তায় দু'তিনবার আবদুল মালিকের কাছে আসতো। এবং সেই একমাত্র ব্যক্তি যার সবসময় অন্দর মহল পর্যন্ত যাতায়াত ছিলো। ওদের সঙ্গে তার বার কয়েক দেখাও হয় তবে কোন কথা হয়নি। হাযিক এমনিতে বেশ সুদর্শন। কিন্তু নুর যখন তার বুড়ো স্বামী আহমদ ইবনে আতাশের বিপরীতে হাযিককে কল্পনা করতো তখন তাকে তার কাছে

রাজপুত্র বলে মনে হতো। কিন্তু নুর আহমদের কারণে কখনো তার মনের কথা ব্যক্ত করতে পারেনি। আজ নুর ও হাযিকের সামনে কোন বাঁধা নেই।

'আমার ধারণা ছিলো তুমি এখানে নেই'– নুর হাযিককে বললো এবং তার অজান্তে হাযিকের হাতটি তার হাতে নিয়ে নিলো।

'আমি আর যাবো কোথায়?'– হাযিক নুরের হাতটি শক্ত করে ধরে বললো– 'এরা ছিলো হাসান ইবনে সবার শয়তানী ফেরকার লোক। আর আমি পাক্কা আহলে সুন্নত। আল্লাহর মহীমা শয়তানদের তখত উল্টে গেছে এবং আরেকবার এখানে ইসলাম কায়েম হয়েছে।

'এই শহরেই থাকো তুমি?'

'না, আমি ঐ গ্রামে থাকি এবং একলা থাকি'– একদিকে ইঙ্গিত করে বললো।

'একা কেন?'

'বৌ ধোঁকা দিয়ে পালিয়েছে। পালিয়েছে আলমোতে। অনেক পর জানতে পেরেছি সে বাতিনীদের জালে পা দিয়েছে। এজন্য কোন দুঃখ নেই। শয়তানের চ্যালা শয়তানের কাছে চলে গেছে। বেঁচে গেছি আমি।'

নুররা কিভাবে আবার শাহদর এলো এবং কিভাবে কি পেলো সব হাযিককে জানালো নুর।

'চলো আমার বাবার সঙ্গে দেখা করে যাবে'– নুর বললো।

হাযিককে দেখে নুরের বাবা চমকে উঠলেন। তিনি ভালো করেই জানতেন এ লোক আবদুল মালিক ইবনে আতাশ ও হাসান ইবনে সবার পাক্কা মুরিদ। কিন্তু হাযিক নুরের বাবাকে জড়িয়ে ধরে তার সঙ্গে কুলাকুলি করলো।

'কিন্তু আমি কিভাবে বিশ্বাস করবো তুমি বাতিনী নও?'– নুরের বাবা তার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে বললো।

'এটা কি কোন কঠিন ব্যাপার হলো?'– হাযিক হেসে বললো–' আমার এখানে উপস্থিতিটাই সবচেয়ে বড় প্রমাণ আমি পাক্কা মুসলমান এবং ঐ বাতিনীদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই আমার। নুরকে আমি বলেছি, আমি জানতাম না আমার স্ত্রী ছিলো বাতিনী। সে আমাকে ধোঁকা দিয়ে আলমোত চলে গেছে। আবদুল মালিক ও তার ভাই এবং ছেলেকে আমি এত দিন ধোঁকা দিয়ে এসেছি। ঐ যে দেখুন আমার জমি কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। ওদের সঙ্গে আমি লাগতে গেলে ঘটনা অন্যরকম হতো। আমাকে মেরে কেটে ওরা সবকিছু ছিনিয়ে নিতো। এ এলাকায় যারা আমাকে চিনে জানে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন আমি কতটা নিষ্ঠাবান মুসলমান। ওদের হত্যার খবর শুনে আমি যতটা খুশি হয়েছি সম্ভবত আর কেউ এত খুশি হয়নি।

হাযিক আরো অনেক কথা বললো। তার মুখে জাদু ছিলো। নুরের বাবা তাই নিশ্চিত হলো, হাযিক বাতিনী নয়। তারপর হাযিক সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলো। নুর তাকে অনেক পথ এগিয়ে দিলো। হাযিক তাকে বললো, কাল যেন সে শহরের অমুক বাগানে থাকে। সেখানে ওদের সাক্ষাত হবে।

'এমন বিত্তশালী এক যুবক একা থাকে।'– নুর ফিরে এসে বললো তার বাবাকে– 'দেখো কতদূর পর্যন্ত তার জায়গা জমি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।'

'নুর! তুই কি বলতে চাচ্ছিস আমি জানি, তুই কি সিদ্ধান্ত নিয়েছিস তাও কিন্তু জানি আমি। তবে কারো প্রতি খুব দ্রুত প্রভাবান্বিত হওয়া যায় তাকে ঘিরে ভবিষ্যত জীবনের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে ফয়সালা করাটা ভালো কাজ নয়। তোকে নিয়েই তো আমার সব ভাবনা চিন্তা। আমাকে এখন ভাবতে দে তোর জন্য কি হাযিককে বেছে নেবো না অন্য কাউকে'– নুরের বাবা একথা বলে বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলেন।

নুর তো সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছে হাযিক হবে তার ভবিষ্যৎ জীবন সঙ্গী।

পরদিন থেকে শুরু হলো নুর ও হাযিকের মধ্যে প্রেম-পরিণয় খেলা। প্রতিদিন সকালে নুরের বাবা চলে যাওয়ার পর হাযিক সেখানে এসে উপস্থিত হতো। আবার নুরও যেতো হাযিকের ওখানে। তবে সেটা হাযিকের নিজের বাড়িতে নয়। হাযিকের এক বন্ধুর বাড়িতে। তার বন্ধু সে বাড়িতে একা থাকতো। কিন্তু নুরের মনে কখনো এ প্রশ্ন আসতো না যে, হাযিক কেন তাকে নিজের বাড়িতে না নিয়ে এক বন্ধুর বাড়িতে নিয়ে যায়। হাযিক যেন তাকে সম্মোহন করেছে।

এর সঙ্গে সঙ্গে হাযিক প্রতিদিনই নুরের বাবার সঙ্গে দেখা করতো। কৃষি কাজে নুরের বাবা এতটা অভিজ্ঞ নয় এবং প্রয়োজনের তুলনায় তার নওকরও কম। হাযিক তাকে কিছু নওকর এবং বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে প্রতিদিনই নানা সহযোগিতা করতে লাগলো। নুরের বাবা এতে ক্রমেই হাযিকের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়লেন। কয়েকদিন তাকে দাওয়াত করে খাওয়ালেনও। এবং নুরের বাবা একদিন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন হাযিকই নুরের উপযুক্ত পাত্র। পরদিন হাযিক নুরের বাবার কাছে নুরকে বিয়ে করার প্রস্তাব রাখলো। নুরের বাবা সঙ্গে সঙ্গে তাতে সম্মতি জানালেন। এখন শুধু বিয়ের দিন ধার্য করা বাকি।

সেদিন সন্ধ্যায় হাযিকের ঘরে এক ঘোড়সওয়ার এলো। হাযিক তাকে দেখে দারুণ পুলকিত হলো। তাকে জড়িয়ে ধরে ঘরে এসে বসলো। ঘোড়সওয়ার আলমোত থেকে হাসান ইবনে সবাকের পয়গাম নিয়ে এসেছে।

'হাযিক ভাই!'– সওয়ার বললো– 'তুমি তো জানো পীর উস্তাদ আবদুল মালিককে হারিয়ে এবং বাতিনীদের এই পর্যুদস্ত অবস্থা দেখে শায়খুল জাবালের অবস্থা এখন কেমন। এসব বলেও এখন তেমন ফায়দা নেই। শায়খুল জাবালকে এখন আরেকটা চিন্তা অস্থির করে তুলেছে। তার পীর ও মুরশিদ তাকে বলেছিলেন শাহদরের কাছে তিনি একটি খাযানা লুকিয়ে রেখেছেন। সেটা সম্পর্কে অন্য কেউ জানে না। ইমাম আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন শাহদরে নাকি দুজন মাত্র লোক খাযানা সম্পর্কে জানে। খাযানা এমন জিনিস যা নিয়ে ভাই ভাইয়ের গলা কাটতে দ্বিধা করে না। তাই ইমামের নির্দেশ প্রথমে ঐ দুই লোককে খুঁজে বের করো। এখানকার আমাদের সবাইকেই তুমি চেনো। শায়খুলজাবালের আশংকা ঐ দুই লোক এখানকার যুদ্ধের সময় পালিয়ে গেছে।'

'আমার ভাই!'– হাযিক ঘোড় সওয়ারকে বললো– 'তুমি তো জানো হাসান ইবনে সবার জন্য আমি কতটুকু উৎসর্গপ্রাণ। যে দু'জন খাযানা সম্পর্কে জানে তাদের

একজন আমি আরেকজন শাহ্দরেই থাকে। সেও আমার মতো অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন। আমরা এখানে রয়েছি এজন্য যে, ইমামের হুকুম আসবে কখন আর আমরা খাযানা বের করে তার পদ মোবারকে রেখে আসবো।'

'তাহলে ইমামকে গিয়ে আমি কি বলবো?'

'বলবে কিছু দিনের মধ্যেই খাযানা আলমোতে পৌঁছে যাবে। কাল সকালে তুমি রওয়ানা হয়ে যাও।'

'ইমাম এত বলেছেন তোমাদের কারো যদি আমাকে প্রয়োজন হয় তাহলে আমি এখানে রয়ে যেতে পারবো।

'না, তুমি চলে যাও। আমার অন্য কারো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। দু'জনই আমরা যথেষ্ট। আমি ইমামের জন্য এক হুরও নিয়ে যাবো।'

'কে সে? কোথায় পেলে তাকে?'

'শাহ্দরের আমীর আহ্মদ ইবনে আতাশের ষোড়শী স্ত্রী ছিলো সে। শাহ্দর পতনের ব্যাপারে এই মেয়ে ও তার বাবার অনেক বড় ভূমিকা ছিলো। কিন্তু আমার ভাই! আমাকে একটা পরামর্শ দাও। এই প্রথমবার একটি মেয়েকে আমি হৃদয় থেকে ভালোবেসে ফেলেছি। ইমামের বেহেশতের অনেক হুরকেও তো আমি ভোগ করেছি, অনেক মেয়েও এসেছে আমার জীবনে। কিন্তু ওসব ছিলো শারীরিক ব্যাপার। কিন্তু এই মেয়ে এখন আমার পুরো অস্তিত্বকেই কেড়ে নিয়েছে। আমি ওকে বিয়ে করতে চাই। তবে ইমামের অনুমতি নিয়ে।'

'হাযিক ভাই! তুমি এই খাযানা যখন ইমামের কাছে পাঠাবে তখন বলে দেবে এই মেয়েকে যেন তোমাকে পুরস্কার স্বরূপ দিয়ে দিন। ঐ মেয়েকে কি তুমি সঙ্গে নিয়ে যাবে?'

'মেয়ে ও মেয়ের বাবাকেও সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। না হয় এই মেয়েকে সেলজুকিরা কব্জা করে নেবে।'

'ইমামকে আমিও আগ থেকে জানিয়ে রাখবো। তোমার ব্যাপারে সুপারিশও করবো'– সালার বললো।

★★★★

পরদিন সকালে শহরের দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে হাযিক নুরদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলো। নুরের বাবা তখনো ঘর থেকে বের হয়নি। এত সকাল সকাল হাযিককে দেখে তো ওরা হয়রান হয়ে গেলো। হাযিক তাদেরকে বললো জরুরি একটা খবর বলতে এসেছি।

'তোমরা তো জানো আবদুল মালিকের সঙ্গে আমার কত গভীর সম্পর্ক ছিলো। এখন যে কথাটা বলবো সেটা যেন অন্য কেউ তো দূরের কথা কাকপক্ষীও না জানে। তাহলে আমরা তিনজন কতল হয়ে যাবো। খবরটি হলো আবদুল মালিক তাদের থেকে একটু দূরে অনেক বড় এক খাযানা রেখে গেছেন। আমি ও আমার এক বন্ধু সেটা

জানি, আবদুল মালিক আমাকে অতি বিশ্বস্ত এক বাতিনী বলে জানতো। এখন সে ও তার বংশের কেউ আর জীবিত নেই। তাই এখন সেই খাযানা যদি আমি উদ্ধার করি তাহলে কেমন হয়।'- হাযিক বললো।'

'তুমি তো এর বৈধ প্রাপক' নুর বললো- 'তবে এই খাযানার সঙ্গে আমার মনের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু এটা যেহেতু বাতিনীদের পীর মুরশিদের ছিলো তাই এটা উদ্ধার করা একটা নেকীর কাজ হবে এবং তিনি এর বৈধ হকদার।'

'আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমিও এ কথাই বলবো। খাজানা বের করে নিজের কাছে রাখো'- নুরের বাবা বললেন।

'কিন্তু এই খাযানার মালিক আমি একা হতে চাই না'- আপনি আপনার মেয়েকে যেহেতু আমার কাছে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাই এই খাযানার হকদার আমার মতো আপনারাও। নুরের ওপর ওরা যে জুলুম অত্যাচার করেছে আমি এর মূল্য স্বরূপ পুরো খাযানা ওর পদতলে এনে রাখবো। খাযানা উদ্ধারে আপনাদেরকেও আমি সঙ্গে রাখতে চাই।

'আরেকটা কথা ভেবে দেখো'- নুরের বাবা বললেন- 'এই খাযানার সব মালই তো লুটের মাল। না জানি কত মানুষকে লুট করে ওরা এই খাযানা গড়েছে। তাই যত দ্রুত সম্ভব এই খাযানা বের করে নেয়া উচিত।'

'আপনাদেরকেও তো লুট করা হয়েছিলো। আল্লাহর লীলা দেখুন। আপনাদের কাছ থেকে যা লুট করা হয়েছিলো এর চেয়ে কয়েক গুণ বেশি আল্লাহ দিয়েছেন.... মনে করেন খাযানা আমরা উদ্ধার করে ফেলেছি... জরুরী কথাটা হলো, খাযানা আমরা সবাই মিলে বের করবো। এরপর আর আমরা এখানে ফিরে আসতে পারবো না। খাযানা এখানে লুকানো মুশকিল হবে। সেখান থেকে আমরা চলে যাবো ইস্পাহান। সেখানকার কেউ আমাদেরকে চিনবে না। সেখানে আমরা শাহেনশাহী জীবন পাবো- হাযিক বললো।

হাযিক ওদেরকে জানালো, খাযানা রাখা হয়েছে শাহদর থেকে এক দিনের দূরত্বে এক ঝিলের মাঝখানে। ঝিলের মাঝখানে উঁচু একটি জায়গা আছে সেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তবে জায়গাট খুবই ভয়ংকর। সেখানে অনেকগুলো কুমির আছে। তাই সেখানে যাওয়ার আগে সর্বাত্মক সতর্কতা গ্রহণ করতে হবে। তাও কুমিরের হাত থেকে রক্ষার জন্য সে অন্য ব্যবস্থা নেবে।

কবে কিভাবে এখান থেকে বের হবে সবকিছু ঠিকঠাক করা হলো। হাযিক জানালো, খাযানার ব্যাপারে যে আরেকজন জানে সে তারই এক বন্ধু। নুর যে ওর ঘরে কয়েকবার গিয়েছে হাযিকের সঙ্গে মিলিত হতে তার সেই বন্ধুর ঘরেই গিয়েছে।

দুদিন পর বিকেল বেলায় হাযিকের ঘর থেকে একটি ঘোড়ার গাড়ি বের হলো। ঘোড়ার লাগাম হাযিকের হাতে। গাড়ির ভেতর রয়েছে হাযিকের সেই বন্ধু, নুর ও তার বাবা। গাড়ির আরেক পাশে রাখা হয়েছে পাঁচটি ভেড়ার বাচ্চা। ঝিল পাড়ি দিতে যখন ওরা নৌকায় উঠবে তখন কুমিররা আক্রমণ করবে সে সময় এই ভেরা ছেড়ে ওদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা হবে।

শাহদর থেকে বের হয়ে হাযিক ঘোড়া ছুটালো তীব্র গতিতে। মাঝরাতের দিকে ওরা ওদের গন্তব্যে পৌঁছলো। গাড়ি রাখলো ঝিলের কিনারা থেকে একটু দূরে। সবাই গাড়ি থেকে নেমে গেলো। তারপর চারটি মশাল জ্বালিয়ে প্রত্যেকের হাতে একটি করে মশাল দেয়া হলো।

ঝিলের কিনারায় চার পাঁচটি নৌকা রাখা আছে। বড় সড় একটি নৌকাই মোটামুটি ত্রুটিমুক্ত। আর সবগুলো ভাঙ্গা। সবাই নৌকায় চড়ে বসলো। হাযিকের বন্ধু ভেড়া পাঁচটিকেও নৌকায় উঠিয়ে নিলো। নৌকা ঝিলের কিনারা থেকে একটু দূরে যেতেই মশালের আলোয় দেখা গেলো একদিক থেকে নৌকার দিকে কয়েকটি কুমীর আসছে। হাযিকের বন্ধু একটি ভেড়া উঠিয়ে পানিতে ছেড়ে দিলো। কুমীরগুলো সঙ্গে সঙ্গে ভেড়ার ওপর ঝাপিয়ে পড়লো। ভেড়ার মুখ দিয়ে তখন সবার অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে এক চিৎকার বেরিয়ে এলো। নৌকা সামনের দিকে এগিয়ে গেলো। একটুপর আবার আরেকটি ভেড়া পানিতে ফেলতে হলো।

অবশেষে নৌকা ঝিলের মাঝখানের সেই উঁচু জায়গায় গিয়ে পৌঁছলো। উঁচু জায়গাটি আসলে একটি নেড়া টিলার মতো। পুরোটাই পাথরের। কী আশ্চর্য! পানির মাঝখানে থেকেও এর কোথায়ও ছোট একটি চারা গাছও নেই। ওরা নুড়ি পাথর মাড়িয়ে বহু কষ্টে মশালের আলোয় টিলার ওপর উঠে গেলো। এক জায়গায় স্তূপাকারে অনেকগুলো পাথর দেখা গেলো। হাযিকের ইংগিতে সবাই সেখান থেকে পাথর সরাতে শুরু করলো। নুরও এদের সঙ্গে হাত লাগালো। পাথর সরানোর পর সুদৃশ চারটি বাক্স বেরিয়ে এলো।

হাযিক ও তার বন্ধু বাক্স চারটির তালা খুললো। তালা খুলতেই নুর ও তার বাবার চোখ কপালে উঠে গেলো। ওদেরকে যেন এক রঙ্গীন দুনিয়া আচ্ছন্ন করে ফেললো। ভেতরে শুধু সোনা রুপা আর হীরা ও মণি মুক্তার অজস্র অলংকার। দুর্লভ মূল্যের পাথর এবং অতি মূল্যবান আরো অনেক কিছু। হাযিক ও তার বন্ধুর অবস্থা এমন হয়ে গেলো যেন ওরা কোন নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। আনন্দে উৎফুল্লে ওরা যেন সব ভুলে গেলো। মুখ দিয়ে নানান ধরনের দুর্বোধ্য শব্দ করতে লাগলো। হাযিকের বন্ধু একবার দু'হাত প্রসারিত করে বলে উঠলো–

'ইয়া শায়খুল জাবাল! এসব তোমার সম্পদ। আমরা এই খাযানা তোমার পদ মোবারকেই রাখবো।'

'পীর উস্তাদ আবদুল মালিকের আত্মাও খুশী হয়ে যাবে। যখন আমরা আলমোতে... হাযিক বলতে বলতে থেমে গেলো এবং সুর পাল্টিয়ে বলে উঠলো– বাক্সগুলো জলদি উঠাও। আমাদের দ্রুত ইস্পাহান পৌঁছতে হবে।'

নুরের বাবা এসব শুনেও না শোনার ভান করলে। তিনি নিশ্চিত হয়ে গেলেন এ খাযানা আলমোত যাবে এবং তার মেয়েকেও তারা শয়তানের বেহেশতের 'হুর' বানাবে। তিনি খুব দ্রুত ঠিক করে ফেললেন এখন তাকে কি করতে হবে।

বাক্সের ডালাগুলো বন্ধ করে দেয়া হলো। একটি বাক্স হাযিক ও তার বন্ধু উঠিয়ে হাঁটা দিলো। আরেকটি বাক্স নুর ও তার বাবা উঠিয়ে তাদের পেছন পেছন হাঁটা দিলো।

বাক্সগুলো অসম্ভব ওজনী। খুব কষ্টে ওরা ওগুলো নিয়ে নৌকায় রাখলো। হাযিক বাক্স রেখেই অন্য বাক্স আনার জন্য রওয়ানা দিলো। এই ফাকে নুরের বাবা পুরো নৌকা পানিতে ভাসিয়ে দিলো। রশিতে বাঁধা থাকায় নৌকা পানিতে ভেসে গেলো না। তারপর নুরকে নিয়ে খুব দ্রুত হাযিকদের আগেই গিয়ে আরেকটি বাক্স উঠিয়ে নিয়ে নৌকার দিকে আসতে লাগলো। এবার হাযিকরা পেছনে আর নুররা আগে আগে।

নুর ও নুরের বাবা বাক্স নৌকায় রেখেই নৌকায় উঠে পড়লো। একটু পর যখন হাযিকরা সর্বশেষ বাক্সটি নিয়ে এলো তখন নুরের বাবা ও নুর এগিয়ে গিয়ে ওদের কাছ থেকে বাক্সটি নিয়ে দ্রুত নৌকায় নামিয়ে রাখলো এবং ওদেরকেও ইশারায় তাড়াতাড়ি নৌকায় উঠতে বললো। ওরা যেই নৌকায় উঠতে গেলো নুরের বাবা তার হাতের মশালটি প্রথমে হাযিকের শরীরের সঙ্গে লাগিয়ে দিলেন। তারপর সঙ্গে সঙ্গে হাযিকের বন্ধুর গায়েও মশালটি লাগিয়ে দিলেন।

দু'জনের কাপড়ে আগুন লেগে গেলো। নিমিষেই সে আগুন ওদের পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়লো। এদিকে নুরের বাবা নুরকে বললো, তাড়াতাড়ি নৌকার রশিটি জ্বালিয়ে দাও। রশিটি জ্বালিয়ে দিতেই নৌকা পানিতে নেমে গেলো। আর নুর ও তার বাবা দু'দিক থেকে পানিতে বৈঠা মারতে লাগলো, ওদিকে ওরা যন্ত্রণায় আতংকে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ওদের শরীরের অনেকখানি যদিও পুড়ে গেছে তবুও যেহেতু ওরা বলবান যুবক ছিলো তাই সে অবস্থাতেই তলোয়ার বের করে নৌকার দিকে সাঁতার শুরু করলো। নৌকার কাছে পৌঁছতেই নুরের বাবা এবার মশাল দিয়ে ওদের মুখে মারলো। সঙ্গে সঙ্গে মরণ চিৎকার বেরিয়ে এলো ওদের মুখে থেকে। কয়েকটি কুমীর নৌকার দিকে আসছিলো। সেগুলো হাযিক ও তার বন্ধুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এরপর আর ওদেরকে দেখা গেলো না। ক্রমেই ঝিলের পানি রক্তবর্ণ হয়ে উঠতে লাগলো।

নিরাপদেই পৌঁছলো নুররা ঝিলের কিনারায়। নুরের চোখ দিয়ে তখন অঝোর ধারা অশ্রু ঝরছিলো। হাযিকের জন্য তার বুক ফেটে যাচ্ছিলো ঠিক; কিন্তু নিজের প্রতিও তার ভেতর থেকে ধিক্কার উঠে এলো। এক বুড়ো শয়তানের কবল থেকে মুক্ত হয়ে আবার আরেক বাতিনীকেই সে ভালোবাসলো কি করে?

'কাদিসনে মা!' – মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন বাবা– 'আমরা এত বড় ধোঁকা থেকে বেঁচে গেলাম এজন্য কি আমাদের খুশি হওয়া উচিত নয়?... এরা ভয়ংকর কিসিমের বাতিনী ছিলো। যাচ্ছিলো এরা সোজা আলমোত। আমাকে তো পথেই এরা কতল করতো। আর তোমাকে ওখানে নিয়ে হাসান ইবনে সবার বেহেশতের 'হুর' বানিয়ে দিতো, আজ তুমি একজন স্বামীর খুঁজে আছো আর ওখানে প্রতিদিন তোমার নতুন একজন স্বামী আসতো... আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো। তিনি বড় লাঞ্ছনার জীবন থেকে আমাদেরকে মুক্ত করেছেন। খোদার কসম! এই খাযানা পাওয়ার জন্য আমি মোটেও আনন্দিত নই। আমার আনন্দ হলো তোমাকে শেষ পর্যন্ত আমি বাঁচাতে পেরেছি।

দুপুর গড়িয়ে গেছে অনেক্ষণ হলো। এখন প্রায় বিকেল। সাঞ্জার তার দফতরে বসে জরুরী একটা কাজ করছিলেন। এ সময় দারোয়ান এসে জানালো, হুজুর! কিছু দিন

আগে আপনি এক বাপ বেটিকে একটি মহল ও কিছু জমি দিয়েছিলেন, ওরা আপনার সাক্ষাত প্রার্থী হয়ে এসেছে। সাঞ্জার ওদেরকে জলদি ভেতরে পাঠিয়ে দিতে বললেন।

দারোয়ান ওদেরকে গিয়ে জানালো হুজুর আপনাদেরকে ভেতরে যেতে বলেছেন। কিন্তু নুরের বাবা এই বলে তাকে আবার ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন যে, কষ্ট করে সুলতানকেই আসতে হবে বাইরে। সাঞ্জারকে একথা বলতেই সাঞ্জার তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। শত হলেও তিনি সুলতান মুহাম্মদের ভাই এবং শাহদরসহ এর পরের বিস্তীর্ণ এলাকার সুলতান। কোন সাধারণ লোক এসে কোন সাহসে তাকে এভাবে বিরক্ত করার হিম্মত পেলো, তিনি রাগে গজ গজ করতে করতে বাইরে এসে ঝাঁঝালো কণ্ঠে নুরের বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার?

নুরের বাবা কিছু না বলে উনাকে একটি ঘোড়ার গাড়ি পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। তারপর বাক্স চারটির ডালা খুলে সুলতানকে গাড়ির ওপরে আসার ইংগিত করলেন। তিনি রাগে বিড় বিড় করতে করতে গাড়ির ওপরে গিয়ে উঠলেন এবং বাক্সের দিকে নজর যেতেই তার মুখ হা হয়ে গেলো।

'আরে... এই.... এই সব পেলে কোথায়?' – তোতলাতে তোতলাতে এবং হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন– এতো বিশাল এক ধন ভান্ডার!

'এই খাযানা কোত্থেকে কিভাবে এলো সেটা সুলতানকে পরে বলবো। তবে এতটুকু বলতে পারি, এ মাল না আপনার, না আমার বরং এ সেলজুকি সালতানাতের। বাতিনী ডাকুরা অগণিত মানুষের রক্তের বিনিময়ে এই খাযানা গড়েছে' – এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন নুরের বাবা।

সাঞ্জার তখনই বাক্স চারটি লোকদের মাধ্যমে ভেতরে নিয়ে এলেন। তারপর বাপ বেটিকে জিজ্ঞেস করলেন, এই খাযানা কিভাবে তারা পেলো। নুরের বাবা তাকে পুরো কাহিনী শোনালেন।

'আমি তোমাকে অফুরন্ত পুরস্কার দেবো' – সাঞ্জার সব শুনে বললেন।

'আমি এখান থেকে এক কড়িও নেবো না' – নুরের বাবা বললেন – 'এটা সালতানাতের সম্পদ ও আল্লাহ প্রদত্ত আমানত মনে করে গ্রহণ করতে হবে। আমি আমার পুরস্কার পেয়ে গেছি। চমৎকার একটি বাড়ি পেয়েছি এবং অনেকখানি জমি পেয়েছি। আমার জন্য এই যথেষ্ট।'

২৩

উবাইদ আরবী সুস্থ হয়ে সে তার বাতিনী জীবন থেকে খাঁটি মনে তাওবা করে নেয়। একদিন সে তার অতীত জীবনের পূর্ণ কাহিনী সালার আওরিজীকে শোনায়।

'হে সেলজুকি সালার!' – তার কাহিনী শেষ করে বলে উঠলো উবাইদ আরবী– 'আমি এখন মনে প্রাণে বিশ্বাস করি এক আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন একক শক্তি নেই। আমি তো আপনাকে কতল করতে এসেছিলাম। কিন্তু আজ আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি নিজ হাতে আমাকে কতল করুন। আমাদের খোদা বলুন রাসূল

বলুন সব ছিলো হাসান ইবনে সবা। তার মুখ থেকে বের হওয়া সব কিছুকেই আমরা আসমানী বাণী বলে বিশ্বাস করতাম। ভালো মন্দের কোন বোধ আমাদের ছিলো না। হাসান ইবনে সবা বলতো, তোমার কাছে যেটা ভালো লাগবে সেটাই 'পুণ্য' মনে করবে আর যেটা খারাপ লাগবে সেটাকে 'পাপ' মনে করবে। কিন্তু এখানে এসে আমি আসল সত্যকে পেয়েছি।'

'আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এর পুরস্কার দেবেন' – আওরিজী বললেন – 'আর যাদেরকে তুমি ধরিয়ে দিয়েছো– ঐ সজিওয়ালা ও তার বন্ধু তাদের পরিণাম দেখে নিয়ো। আর তুমিও যে প্রতিদান পাবে তাও সবাই দেখতে পাবে। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, এদেরকে ছাড়া কি তুমি ওসিমকুহের অন্য কোন বাতিনীকে চেনো না?'

'না সালার মুহতারাম! ওসিমকুহে আরো বাতিনী অবশ্যই থাকতে পারে। কিন্তু এক বাতিনী সব বাতিনীকে চিনতে পারবে এটা কিন্তু জরুরী নয়। আমি শুধু আপনাকে হত্যা করতে এসেছি। এজন্য যে দু'জনের সঙ্গে আমাকে সম্পর্ক রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছি এবং তারা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে। আপনাকে হত্যা করার পর আমার একমাত্র কাজ ছিলো নিজে নিজে আত্মহত্যা করা।... যা হোক, আমি আমার মতো করে তল্লাশি চালাবো। আর যাদেরকে আমি ধরিয়ে দিয়েছি তাদেরকে তো আপনি হত্যা করবেনই। কিন্তু আমিও আর নিরাপদে থাকতে পারবো না। আমি হাসান ইবনে সবার অতি অভিজ্ঞ দু'জন লোককে ধরিয়ে দিয়েছি। তার লোকেরা সুযোগ পেলেই এর প্রতিশোধ নেবে। তারপরও আমি প্রাণ বাজি রেখে অন্য বাতিনীদের খুঁজে বের করতে চেষ্টা করবো।'

'যেভাবেই হোক তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা আমি নেবো। আচ্ছা! ওই দুই বন্দী বাতিনীর কাছ থেকে তো মনে হয় কোন কথা আদায় করা যাবে না।'

'কখনোই না। ওদেরকে আপনি লোভ দেখাতে পারেন কিন্তু কোন মূল্যেই তারা তা গ্রহণ করবে না। কিংবা কঠিনতর শাস্তি দিতে পারেন কিন্তু মুখ খোলার চেয়ে ওদের কাছে মৃত্যু অনেক প্রিয়। দেখবেন মৃত্যুর সময় এদের মুখে কেমন গর্বের হাসি ঝুলে থাকে।'

'ঠিক আছে, সারা শহরে ঘোষণা দেয়া হবে আগামীকাল কেল্লার বাইরে দুই বাতিনীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। সবাই যেন সেখানে একত্রিত হয়ে যায়।

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। কাল যখনই ঐ দু'জনকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন তখন লুকিয়ে থাকা বাতিনীরাও কিন্তু শহরবাসীর সঙ্গে দর্শক হয়ে আসবে। তারপর ওদের দু'একজন অবশ্যই আলমোতে খবর দেয়ার জন্য আলমোতের দিকে রুখ করবে। তাই আপনি গুপ্তচর লাগিয়ে দেবেন। ওরা আলমোতের পথের দিকে নজর রাখবে। ওরা আলমোতের পথে যাদেরকেই উঠতে দেখবে পাকড়াও করে আপনার কাছে নিয়ে আসবে।'

'হ্যাঁ তোমার পরামর্শটা খুব সুন্দর। আমি এটা বাস্তবায়ন করবো।'

আমার আরেকটা পরামর্শ থাকবে, আপনি হুকুম জারী করবেন। মৃত্যুদণ্ড দেয়ার সময় কেউ যেন কেল্লায় না থাকে। সবাই কেল্লার বাইরে এসে জল্লাদের হত্যাকাণ্ড দেখে। তাহলে কোন বাতিনী আর ঘরে লুকিয়ে থাকতে পারবে না।

'সত্যিই তুমি ও শাফিয়া অনেক বড় পুরস্কারের হকদার হয়ে গেছো। আমি বুঝতে পারছি না কোন পুরস্কার তোমাদের জন্য উপযুক্ত হবে।'

'পুরস্কারের সবচেয়ে হকদার তো শাফিয়া। আপনি যদি একান্তই আমাদের কিছু দিতে চান তাহলে আমাদের একে অপরকে পুরস্কার স্বরূপ দিয়ে দিন... বলতে বলতে উবাইদ আরবীর মুখ লাল হয়ে গেলো।

'অবশ্যই অবশ্যই। ঐ দুই বাতিনীকে জাহান্নামে পাঠানোর পরই তোমাদের বিয়ে পড়াবো আমি।'

পরদিন সকাল সকাল ঘোড়দৌড় ময়দান লোকে লোকারণ্য হয়ে গেলো। সবার চোখে মুখে বিরাজ করছে দুই বাতিনীর হত্যাকাণ্ড দেখার চাপা কৌতূহল। এর মধ্যে সালার আওরিজী সবার সামনে দাঁড়িয়ে একটি বক্তৃতা দিলেন।

'ইসলামের জানবাজ ভাইয়েরা! – 'সালার আওরিজীর কণ্ঠ গমগম করে উঠলো' – এরা দু'জন শুধু আমার ও সেলজুকি সালতানাতেরই গাদ্দার নয়, এরা আল্লাহ্ রাসূল ও দীন ইসলামের গাদ্দার। এরা শয়তানের বড় পান্ডা। হাসান ইবনে সবার দুই কুখ্যাত অনুসারী। কেল্লায় থেকে এরা ভয়ংকর খুনী ফেদায়েনদের আশ্রয় দিতো। শেষ পর্যন্ত এমন এক ফেদায়েনকে আশ্রয় দিয়েছে যে আমাকে হত্যা করতে এসেছিলো। কিন্তু আল্লাহর কুদরতের লীলা দেখো ওরা আজ মৃত্যুর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। হাসান ইবনে সবার হাতে যদি খোদায়ী শক্তি থেকে থাকে সে ওদেরকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাক। কিন্তু তার হাতে যে শক্তি আছে সেটা হলো শয়তানী শক্তি। কেউ যেন মনে না করে ওদের কাছ থেকে আমি আমার ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছি। আল্লাহর পথে তো আমি সবসময়ই প্রাণ দিতে প্রস্তুত। সবাই জেনে রেখো। বাতিনী হওয়া অনেক বড় পাপ। যার শাস্তি মৃত্যুদন্ড। এই শহরে এখনো অনেক বাতিনী আছে। তোমাদের প্রত্যেকেরই ফরজ দায়িত্ব হলো, যাকেই বাতিনী বলে সন্দেহজনক মনে হবে তার ব্যাপারে প্রশাসনে এসে গোপনে সংবাদ দেয়া...

হ্যাঁ, হাসান ইবনে সবা যদি ঘোষণা দিতো তার ফেরকা ইসলামের কোন ফেরকা নয় তাহলে তার অনুসারীদের ব্যাপারে আমাদের কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু এরা ইসলাম ও মুসলমানকে ধ্বংস করার জন্য যাচ্ছে তাই করে যাচ্ছে। প্রতিটি বাতিনী একাধিক মুসলমান হত্যার দায়ে মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামী। হাজার হাজার নিরপরাধ আলেমকে ওরা হত্যা করেছে। এর মধ্যে এরাও ছিলো। হাজার খুনের অপরাধে মাত্র এই দু'জনকে আজ হত্যা করা হচ্ছে।'

দুই আসামীকে আগেই কালো কাপড়ে মুড়িয়ে মাঠের এক বেদিতে উপস্থিত করা হয়েছিলো। আওরিজীর বক্তৃতা শেষ হতেই জল্লাদ ওদের শরীর থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। ভিড়ের ভেতর থেকে শত শত কণ্ঠ গর্জে উঠলো চিরঞ্জীব ধর্ম ইসলাম ধর্ম।

কেল্লার দেয়ালের ওপর থেকে কয়েকটি ঈগল চোখ সর্বক্ষণ ভিড়ের প্রতি নজর রাখছিলো। দুই বাতিনীর মৃত্যু কার্যকর হওয়ার পর লোকজন যখন শ্লোগান দিতে দিতে চারদিক ছড়িয়ে পড়েছিলো তখন কেল্লার ওপর থেকে ওরা আবিষ্কার করলো দুই ঘোড় সওয়ার আলমোতের পথে উঠতে যাচ্ছে। এদের কমান্ডার ছিলো মুযাম্মিল ও ইবনে ইউনুস। কিন্তু এরা দেয়ালের নিচের দিকে থাকায় ওদেরকে দেখতে পায়নি। ওপর থেকে ওরা এসে জানালো, দু'জন ঘোড়সওয়ার আলমোতের দিকে রুখ করেছে।

মুযাম্মিলরা তখনই ছয়জনের কমান্ডো বাহিনী নিয়ে ওদের পিছু ধাওয়া করলো। মুযাম্মিলরা অনেক সাবধানতা অবলম্বন সত্ত্বেও দুই ঘোড়সওয়ার টের পেয়ে গেলো এবং ওরা পথের পাশের দু'দিকে পাহাড় ও জঙ্গুলে পথে ছড়িয়ে পড়লো। এবার মুযাম্মিলরা ভাগ ভাগ হয়ে দু'জনকে ধাওয়া করলো। প্রথমে একজনকে ওরা খুব সহজেই ঘেরাওয়ের মধ্যে নিয়ে এলো। সওয়ারটি তখন তলোয়ার বের করলো। সবাই ভাবলো এ বুঝি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। কিন্তু ঘোড়সওয়ার তলোয়ার দিয়ে মোকাবেলায় উত্তীর্ণ না হয়ে নিজের বুকে তলোয়ার বিদ্ধ করে দিলো। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে শুধু বললো, কোন ফেদায়েনকে জীবিত ধরতে পারবে না। মুযাম্মিল নির্দেশ দিলো, অন্যটাকে যেভাবেই হোক পাকড়াও করতে হবে এবং জীবিত।

দ্বিতীয় ঘোড়সওয়ার ততক্ষণে অন্য দলের বেষ্টনীতে এসে গেছে। তবে সে তলোয়ার বের করে আত্মহত্যা না করে লড়াই শুরু করে দিলো। মুযাম্মিলরাও ওদের সঙ্গে যোগ দিলো। এই ঘোড়সওয়ারটি চমৎকারভাবে লড়তে লাগলো। প্রতি মুহূর্তে দিক বদল করে করে ছয় সাত জনের আঘাত রুখতে লাগলো এবং নিজেও আক্রমণ চালাতে লাগলো। কেউ তাকে যখম করতে পারছিলো না। অবশেষে এক সৈনিক তার ডান পা যখম করতে সক্ষম হলো। তারপর মুযাম্মিল হঠাৎ করে বিদ্যুৎ গতিতে তার ঘোড়ার সামনে চলে গেলো এবং তার তলোয়ার ধরা হাতে সজোরে এক কোপ বসিয়ে দিলো। সে ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে সবাই এসে তাকে ধরে ফেললো এবং এক সৈনিক তার যখমে শক্ত করে কাপড় বেঁধে দিলো। তারপর সবাই তাকে নিয়ে ওসিমকুহের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলো।

কেল্লার কাছে এসে ইবনে ইউনুস সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বললো, কেল্লায় আরো যেসব বাতিনী আছে তারা নিশ্চয় এদের আলমোত রওয়ানা হওয়ার কথা জানে। তাই ওরা যাতে জানতে না পারে ওদের এক সঙ্গী পথে মারা গেছে আরেকজন যখমী হয়ে ওসিমকুহে ফিরে এসেছে।

মুযাম্মিলের নির্দেশে সবাই সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়লো। একজন ওসিমকুহে গিয়ে বড় একটি ত্রিপল নিয়ে এলো। তখন যখমী বাতিনীকে ত্রিপলে ঢেকে গোপনে কেল্লায় প্রবেশ করলো সবাই।

সালার আওরিজী যখমী বাতিনীকে দেখে সবচেয়ে অভিজ্ঞ হাকিমকে ডাকালেন। তিনি এখন বৃদ্ধ। মারুতে ছিলেন। অনেক বাতিনীকে তিনি এই যখমী অবস্থা থেকে চিকিৎসা দিয়ে সুপথে এনেছেন। হাকিম এলে আওরিজী তাড়া দিয়ে বললেন, জলদি এর রক্ত ঝরা বন্ধ করুন। না হয় সে রক্তপাতে মারা যাবে।

'রক্তপাত হতে দিন' – বুড়ো হাকিম সামান্য হেসে বললেন– 'ওর শরীরে ততটুকু রক্তই রাখা হবে যতটুকুতে সে জীবিত থাকবে। অতিরিক্ত রক্ত বের হয়ে যাবে। কারণ ওর রক্তে শুধু হাশীষ ও নানা ধরনের নেশা জাতীয় দ্রব্যের মিশ্রণ। ওর রক্ত বের হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ওর বাতিনী স্বভাবও বের হয়ে যাবে। তারপর ঔষধ ও প্রয়োজনীয় পথ্য দিয়ে তাকে সারিয়ে তোলা হবে।

'কিন্তু রক্ত অতিরিক্ত বের হয়ে গেলে কি সে মরে যাবে না?' – আওরিজী জিজ্ঞেস করলেন।

'জীবন মরণের গ্যারান্টি আমি দিতে পারবো না। শুধু এতটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারি। একে যদি বাঁচিয়ে তুলতে পারি তাহলে তাকে অন্যরূপে দেখতে পাবেন। আর এখনই যদি ওর যখম ঠিক করে দিই আর ওর এই রক্ত দেহে রয়ে যায় তাহলে হাজারো শাস্তি দিয়েও ওর মুখ থেকে একটি শব্দও বের করতে পারবেন না।

হাকিম যখমীর মুখে ঔষধ মিশ্রিত ফোটা ফোটা পানি দিতে লাগলেন। এরকম কিছুক্ষণ চালিয়ে মধু মিশ্রিত দুধের ফোটা দিলেন অনেক্ষণ। ওদিকে তার রক্তপাত চলতে লাগলো। যখন যখমীর পুরো দেহ সাদা-ফ্যাকাসে হয়ে গেলো হাকিম তার যখম ধুয়ে মুছে ঔষধ দিয়ে ব্যান্ডেজ বেধে দিলেন এবং নিয়মিত বিরতি দিয়ে ঔষধ মিশ্রিত পানি ও মধু মিশ্রিত দুধ দিয়ে গেলেন তার মুখে।

'আপনারা এখন সবাই যার যার কাজে চলে যেতে পারেন। একটু বিশ্রাম করুন গিয়ে। ইনশাআল্লাহ্ আগামীকাল দুপুরের মধ্যে ওর হুশ ফিরে আসবে এবং আল্লাহ্র ইচ্ছায় বেঁচেও উঠবে'– হাকিম আশ্বাসভরা গলায় বললেন।

সারা রাত এভাবে তার চিকিৎসা চললো। একে একে কয়েকজন হাকিম তার জন্য রাত জেগে কাটালেন। পরদিন সকালের দিকে যখমীর ঠোঁট নড়ে উঠলো। 'আমি কোথায়?' – অতি কষ্টে তার মুখ থেকে শব্দ বের হলো।

'তোমার আপনজনদের কাছে'– বৃদ্ধ হাকিম ফিস ফিস করে বললেন– 'মনে কোন দুঃখ কষ্ট পুষে রাখো না। তুমি যেখানে আছো সেখানে তোমার জন্য আছে শুধু প্রেম আর ভালোবাসা।'

আস্তে আস্তে যখমীর চোখ দুটো খুললো। দেখলো তার মুখের ওপর ঝুকে আছে অশীতপর এক বৃদ্ধের শান্ত স্নেহময় একটি মুখ। সে মুখে কিছু বলতে পারলো না। তবে তার শীর্ণ মুখটিতে ভেসে উঠলো কৃতজ্ঞতার কতগুলো সরলরেখা।

আরো একদিন এক রাত পর সে উঠে বসতে পারলো। এবার হাকিম সালার আওরিজী সহ মুযাম্মিল আফেন্দী ও ইবনে ইউনুসকে যখমীর কামরায় আসার অনুমতি দিলেন। যখমী তো সবাইকে দেখে হয়রান হয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলো উনারা কে... অথচ সে আওরিজীসহ অন্য সবাইকে কেল্লায় অনেকবার দেখেছে এবং চিনেও সবাইকে। তারপর যখন উবাইদ আরবী তার সামনে এলো তখন চিন্তায় পড়ে গেলো এ যুবককে জানি কোথায় দেখেছি।

'আমি যেন একটি সুখের স্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছি'– যখমী দুর্বল কণ্ঠে বলে উঠলো – 'স্বপ্নে আমি চমৎকার একটি জায়গা দেখেছি। সেখানে ছিলো কত সুন্দরী

রূপসী মেয়েরা। ওরা বলতো এটা বেহেশত আর আমরা এর হুর... জানিনা সেটা স্বপ্ন না এখন আমি স্বপ্ন দেখছি' বলতে বলতে তার আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে গেলো।

হাকিম তাকে আরেকটি ঔষধ পান করালেন। সে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলো। হাকিম সালার আওরিজীকে বাইরে ডেকে নিয়ে বললেন। কয়েক ঘণ্টা পর সে আস্তে আস্তে জেগে উঠবে এবং জাগতে জাগতে তার সে অতীতের কথা বলতে শুরু করবে।

সন্ধ্যার দিকে সে জাগতে শুরু করলো এবং ক্ষণে ক্ষণে তার মুখ দিয়ে এলো মেলো কথা বের হতে লাগলো। বুঝা যাচ্ছিলো সে অতি কষ্টে ফেলে আসা জীবনের স্মৃতি মন্থর করে যাচ্ছে। হঠাৎ তার চেহারা লাল হয়ে গেলো। রাগে কম্পিত গলায় বলে উঠলো– 'সে আমার বোন ছিলো... ওহ! সে আমার বোন ছিলো। আর আমি তার সঙ্গে না না... আমি ঐ শয়তানকে হত্যা করবো।'

বলতে বলতে সে শোয়া থেকে এক লাফে উঠে বসলো। হাকিম ও সালার আওরিজী তাকে সস্নেহে বসিয়ে দিয়ে বললেন, হাসান ইবনে সবার হত্যার ব্যবস্থা আমরা নিজেরাই করবো। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু কে তোমার বোন? আর তুমি কে?

কিছুক্ষণ চুপ থেকে সে তার অতীত জীবনের কাহিনী শোনালো। বলার সময় কখনো রাগে লাল হয়ে গেলো। কখনো দুঃখে কষ্টে নীল হয়ে গেলো। কখনো আবার লজ্জায় অনুতাপে তার মুখ বিমর্ষ হয়ে উঠলো।

তার নাম ইবনে মাসউদ। ওরা থাকতো বাগদাদে। ওর বাবা ছিলো হাসান ইবনে সবার অন্ধভক্ত। তার বয়স যখন ষোল এবং তার একমাত্র বোনের বয়স যখন তের তখন তাদেরকে হাসান ইবনে সবার কাছে পেশ করে তার বাবা। ইবনে মাসউদ তার বোনকে অসম্ভব ভালোবাসতো। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই হাসান ইবনে সবার ব্রেন ওয়াশিং চিকিৎসায় এবং হাশীমের বদৌলতে ওরা ওদের রক্তের সম্পর্কের পবিত্রতা ভুলে গেলো। ওরা জানতো একে অপরের ভাই বোন তারা। কিন্তু জানতো না ভাইবোনের সম্পর্কটা কি।

সাড়ে চার কি পাঁচ বছর পর যখন ইবনে মাসউদ পাক্কা ফেদায়েন হয়ে উঠলো তখন তাকে বেহেশতে স্থান দেয়া হলো এবং 'হুর' স্বরূপ দেয়া হলো তার আপন বোনকে। তাদের মধ্যে কখনো এ বোধ জাগলো না যে, ওদের সম্পর্ক অতি পবিত্র... নয় বছর পর ওসিমকুহের এই হাকিম তাকে জাগিয়ে তুলেছেন।

'আমি হাসান ইবনে সবাকে হত্যা করবো' – দাঁতে দাঁত পিষে বললো সে– তারপর আমি নিজের খঞ্জর দিয়ে আত্মহত্যা করবো। না না... আমি আর আমার বোনের সামনে যেতে পারবো না। ওকে আগে হত্যা করবো তারপর আমি আত্মহত্যা করবো।'

'শান্ত হও ইবনে মাসউদ!' – হাকিম তাকে বললেন – 'তোমার সব ইচ্ছাই পূরণ হবে। তবে এখন নিজেকে কাবুতে রাখো। এখনো তোমার যখম সারেনি। এখন এত উত্তেজিত হয়ে পড়লে তোমার যখম আরো কাঁচা হয়ে যাবে। তখন তো কিছুই করতে পারবে না।'

অন্যরাও তাকে এভাবে সান্ত্বনা দিলো। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো ফেদায়েন হওয়ার পর তার কি কাজ ছিলো।

'সেটা ছিলো শত শত মানুষকে গোপনে বা ধোঁকা দিয়ে হত্যা করা ও পাপের রাজ্য চষে বেড়ানোর এক লোমহর্ষক কাহিনী। আমাকে কাফেলা লুট করার কাজও দেয়া হয় এক সময়। যেন ইবনে মাসউদের রেকর্ড বাজতে লাগলো– 'আজ প্রথমবার আমি নিজের প্রতি অভিশাপ দিচ্ছি। হিংস্র জানোয়ারের চেয়েও আমি বড় জালিম ছিলাম। অগণিত নিষ্পাপ শিশু ও নারী পুরুষের রক্ত ঝরিয়েছি। কাফেলাগুলোর ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তাম যেমন করে হরিণীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নেকড়ে বাঘরা। কারো ব্যাপারে সামান্য একটু বিরক্ত হলেই তার বুকে আমরা খঞ্জর চালিয়ে দিতাম। কত মায়ের কোল থেকে ফুটফুটে শিশুকে ছিনিয়ে নিয়েছি। আমাদের জন্য হুকুম ছিলো, কোন সুন্দর শিশু দেখলেই তাকে ছিনিয়ে নিতে হবে। কাফেলা লুট করে অনেক সুন্দরী যুবতী পেতাম। ওদের সঙ্গে আমরা যাচ্ছে তাই আচরণ করতাম। যে যেভাবে পারি ভোগ করতাম। মানুষ হত্যা করা ও মেয়েদের ইজ্জত ছিনিয়ে নেয়াটা ঘোর নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। মনে হতো এটা স্বপ্ন। এর কোন বাস্তবতা নেই। এখন আল্লাহ তায়ালা আমাকে সেই ভয়ংকর স্বপ্ন থেকে জাগিয়ে তুলেছেন... এখন আমি প্রতিশোধ নেবো... যারা আমাকে হিংস্র খুনী বানিয়েছিলো তাদেরকে আমি খুন করবো।'

'তুমি একা এ কাজ করতে পারবে না' – আওরিজী বললেন – 'দেখবে তুমি কতল করতে গিয়ে নিজেই কতল হয়ে যাবে। তোমাকে বার বার বলেছি এ কাজ আমাদের। আমরা সেই আড্ডাখানা উপড়ে ফেলবো যেখানে হাজার হাজার খুনী তৈরী করা হয় ও নিষ্পাপ বাচ্চাদের পাপের জগতের বাসিন্দা বানানো হয় এবং ভাই বোনের পবিত্র সম্পর্কে কলুষিত করা হয়... তবে এজন্য ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হবে। এখন শুধু তুমি এতটুকু বলো ওসিমকুহে কে কে ফেদায়েন বা বাতিনী? তুমি নিজে ওদেরকে হত্যা করবে।'

ইবনে মাসউদ তিনটি বাড়ির ঠিকানা দিলো। তখনই সেই তিন বাড়িতে হামলা চালানো হলো। সেখান থেকে সাতজন ফেদায়েনকে পাওয়া গেলো। কিন্তু হাতে নাতে ধরা দিলো না কেউ, ছয়জন সৈনিকদের দেখেই আত্মহত্যা করলো আর একজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো। আরো তিনজন রূপসী মহিলা পাওয়া গেলো। কিন্তু অনেক জেরা করে জানা গেলো এরা কেউ বাতিনী ছিলো না। এরা ছিলো বাতিনী ফেদায়েনদের রক্ষিতা। যারা ওদেরকে দেহমন দান করতো। ওদের কাছ থেকে কোন তথ্যও পাওয়া গেলো না।

২৪

সুলতান মুহাম্মদের কাছে একই দিনে দু'জন কাসেদ এলো। একজন এলো শাহদরের সাঞ্জারের পক্ষ থেকে নুর ও নুরের বাবার খাজানা উদ্ধারের ঘটনা সম্বলিত পয়গাম নিয়ে। আরেকজন এলো ওসিমকুহের সালার আওরিজীর পক্ষ থেকে উবাইদ আরাবী, ইবনে মাসউদের কাহিনী সম্বলিত পয়গাম নিয়ে। সুলতান মুহাম্মদ হয়রান হয়ে গেলেন। সালার আওরিজী কি করে দুই ফেদায়েনকে সুপথে এনে ওদের কাছ থেকে অসম্ভব মূল্যবান তথ্য আদায় করলেন এবং অনেকগুলো কুখ্যাত ফেদায়েনকে পাকড়াও

করলেন। শাহদরের ঘটনায় তার হয়রান হওয়ার অনেকটি কারণ ছিলো, একে তো ওরা এতো বড় এক খাযানা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে তারপর হাসান ইবনে সবার দুই অভিজ্ঞ এবং কুখ্যাত সন্ত্রাসীকে ধোঁকা দিয়ে কুমীরের পেটে চালান করেছে।

সুলতান মুহাম্মদ জানতেন, হাসান ইবনে সবার শয়তানী সাম্রাজ্য অনেক দূরদূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে। তার নিয়মিত সৈন্য না থাকলেও কয়েকহাজার ফেদায়েন তৈরি করেছে সে। যারা প্রাণ দিতে পারে মুখে গর্বের হাসি নিয়ে এর মধ্যে এই গোটা কয়েক বাতিনী ফেদায়েনকে হত্যা করে হাসান ইবনে সবার তেমন ক্ষতি যে করা যায়নি এটা নিশ্চিত। কিন্তু এর দ্বারা স্বয়ং সুলতান মুহাম্মদ নিজের সহ সুলতান সাঞ্জার এবং সেনাদলের সব সালারদের মনোবল যে অনেক বেড়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। সবাই এখন একে খোদায়ী মদদের সূচনা বলে ভাবতে শুরু করেছে।

ওদিকে ওসিমকুহে থেকে পালিয়ে যাওয়া সেই বাতিনী ফেদায়েন দু'দিন পরই আলমোতে পৌঁছে যায় এবং হাসান ইবনে সবাকে ওসিমকুহের উবাইদ আরবী ও ইবনে মাসউদের গাদ্দারীর কথা জানায়। হাসান ইবনে সবা আগে এ ধরনের দু'একটি বিপর্যয়ের খবর শুনে বিচলিত হতো না। তার মুখে বিদ্রূপের হাসি খেলে যেতো। আবদুল মালিক ইবনে আতাশ নিহত হওয়ার পর থেকে তার সেই বিদ্রূপাত্মক হাসি মুছে যায়। তাই ওসিমকুহের খবর শোনার পর তার চেহারায় বিমর্ষতায় ছেয়ে যায়। সে তার উপদেষ্টাদের নির্দেশ দেয় প্রত্যেক শহরে দু'জন করে গুপ্তচর ফেদায়েন পাঠাতে হবে। ওরা সেখানকার বাতিনী ও ফেদায়েনদের ওপর নজর রাখবে। যেখানেই সন্দেহ হবে, অমুকে গাদ্দারী করবে কোন প্রমাণ ছাড়াই তাকে হত্যা করা হবে।

ওসিমকুহের ঘটনা শোনার পর হাসান ইবনে সবার মনে পড়লো তার পীর মুরশিদ আব্দুল মালিক আতাশের কথা। তার কথা মনে পড়লেই নিজেকে তার খুব একা মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে আব্দুল মালিকের খাযানার কথা মনে পড়লো তার। অনেক আগেই হাযিক নামক তার কনিষ্ঠ এক ফেদায়েনের সেই খাযানা উদ্ধার করে নিয়ে আসার কথা ছিলো। বহুদিন হয়ে গেলো হাযিক একটি সংবাদও দিলো না। তাহলে কি হাযিক ও তার বন্ধু খাযানা নিয়ে সরে পড়লো? বলা যায় না সম্পদ পিতা পুত্রকেও পরস্পরের শত্রু বানিয়ে দেয়।

'ইয়া ইমাম!' – তার এক উপদেষ্টা বললো– 'বেশি দেরী করা যাবে না। কারণ এটা খাজানার ব্যাপার। যেকোন একজনকে শাহদরে হাযিকের কাছে পাঠিয়ে দিন। যদি হাযিককে শাহদরে পাওয়া না যায় তাহলে বুঝতে হবে সে খাযানা নিয়ে কোথাও গায়েব হয়ে গেছে।

'আমাদের লোকেরা শাহদরেই যেতে পারবে। কিন্তু আমাদের কেউ তো জানে না সেই খাযানা কোথায় আছে?' – হাসান ইবনে সবা বললো।

'আমি জানি ইয়া শায়খুলজাবাল!' – ওসিমকুহ থেকে পালিয়ে আসা সেই ফেদায়েন বললো– 'আপনি সম্ভবত জানেন না আমি দীর্ঘ দিন শাহদরে ছিলাম এবং থাকতাম হাযিকের সঙ্গে। আমাদের পীর ও উস্তাদ আবদুল মালিক ইবনে আতাশ আমাদের প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখতেন। তাহলে কি আমারই শাহদর যাওয়া উত্তম না?'

অনেক দিন পর হাসান ইবনে সবার মুখে দীর্ঘ হাসি দেখা গেলো। সে কল্পনাও করেনি খাযানা সম্পর্কে ঐ দু'জন ছাড়া আর কেউ জানতে পারে। সে তখনই ঐ লোককে শাহদরে রওয়ানা হয়ে যেতে বললো।

'ইয়া শায়খুলজাবাল!' – তার এক বর্ষীয়ান উপদেষ্টা বললো– 'এর সঙ্গে আরো দু'তিনজনকে পাঠানো দরকার। এরা হাযিককে না পেলে খাযানা যেখানে রাখা আছে সেখানে চলে যাবে। খাযানা পেলে তো নিয়ে আসবে। আর যদি হাযিক ও খাযানা না পাওয়া যায় তাহলে নিশ্চিত হওয়া যাবে এ বিশাল সম্পদ ভান্ডার হাযিক নিয়ে গায়েব হয়ে গেছে।'

তার পরামর্শ মতে হাসান ইবনে সবা তখনই সেই ফেদায়েনের সঙ্গে আরো তিনজনসহ শাহদর রওয়ানা করিয়ে দিলো। এরপর একদল নিয়োজিত করলো। হাযিক কোথায় আছে খুঁজে বের করতে। ওসিমকুহ থেকে পালিয়ে আসা ফেদায়েনের নাম ছিলো হায়দার বাছারী।

★★★★

সেলজুকি সালতানাতের দারুসসালতানাত মারুতে এখন ফৌজ প্রস্তুতির চূড়ান্ত পর্যায়ে। বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা এখনো ফৌজ ভর্তি হচ্ছে সীমাহীন আগ্রহ উদ্দীপনা নিয়ে। এখন শুধু আলমোতে কোচ করার দিন তারিখ বাকি রয়েছে। এ ফৌজ তৈরি হচ্ছে বর্তমান ওযীর এবং সাবেক ওযীরে আজম নেযামুল মুলকের ছোট ছেলে আবু নসর আহমদের। নেতৃত্বে তার ইচ্ছা আলমোতে এখনই হামলা করে দেয়া। যাতে হাসান ইবনে সবা প্রস্তুতির সুযোগ না পায়। হাসান ইবনে সবা তার বাবা এবং বড় ভাইকে হত্যা করেছে, এজন্য সে তার ব্যক্তিগত শত্রুও। এজন্য আবু নসর আহমদ এ হামলার ব্যাপারে সব সময়ই উদ্বেলিত থাকেন। এমনিই তিনি জযবাওয়ালা আবেগী মানুষ। আর এ ব্যাপারে তার আবেগ সবসময় আরো চরমে থাকে। যুদ্ধের ক্ষেত্রে যে অতিরিক্ত আবেগ ভুল ডেকে আনে সেটা তিনি প্রায়ই ভুলে যেতেন।

তিনি যখন ওসিমকুহের উবাইদ আরবী ও ইবনে মাসউদের ফেদায়েনী জীবন থেকে সুপথে আসার ঘটনা শুনলেন তখন ওসিমকুহ থেকে ঘুরে আসার জন্য পাগল হয়ে গেলেন। তার ইচ্ছা ওদের দু'জন থেকে আলমোতের ভেতরের খুটিনাটি সব তথ্য জেনে নেয়। তারপর সেসব তথ্য সেনাবাহিনীকে জানানো। যদিও এখনো আলমোত সম্পর্কে অনেক জরুরী তথ্য প্রতিদিন সৈনিকদেরকে জানানো হচ্ছে।

সুলতান মুহাম্মদের কাছে অনুমতি চাইতেই তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন। দিন থাকতেই আট ঘোড়সওয়ার মুহাফিজ নিয়ে আবু নসর আহমদ ওসিমকুহ রওয়ানা হয়ে গেলেন। পরদিন বিকেলের দিকে ওসিমকুহে পৌঁছলেন। আওরিজী তাকে দেখে দারুণ খুশী হলেন এবং তাকে স্বাগত জানালেন প্রাণভরে। রাতের খাবার শেষে আবু নসর আহমদ আওরিজীকে বললেন, ইবনে মাসউদকে ডাকিয়ে আনুন।

ইবনে মাসউদ এলে আওরিজী আবু নসরকে তার সব ঘটনা জানালেন। আবু নসর সব শুনে দারুণ মুগ্ধ হলেন এবং তাকে বললেন, তোমাকে আমার ফৌজের বড় এক পদ দিয়ে দেবো।

'ছোট বড় কোন পদ পাওয়ার খাহেশ নেই আমার' – ইবনে মাসউদ বললো– 'মুহতারাম সালার তো বলেছেনই আমার কি সংকল্প। আমার বুকে কিসের আগুন জ্বলছে। হাসান ইবনে সবাকে নিজ হাতে আমি খুন করে আমার বোনকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনবো।'

'তুমি বললেই কি তোমার বোন তোমার সঙ্গে চলে আসতে রাজি হবে?'– আবু নসর আহমদ জিজ্ঞেস করলেন। 'না, আমি তো নেশার জীবন থেকে সুস্থ জীবনে ফিরে এসেছি। কিন্তু আমার বোন এখনো সেই ঘোর নেশার জীবনেই আছে। সে তো আমাকে ভাই পরিচয়ে চিনবেই না। তাকে উঠিয়ে আনতে হবে।'

'এ কাজ তুমি একা করতে পারবে না' – আবু নসর বললেন – 'এটা অতি শক্তিশালী ফৌজের কাজ। আমার ফৌজও আমি এমন শক্তিশালী করে তৈরি করেছি। ঐ ফৌজের সঙ্গে তোমাকে আমি নিয়ে যাবো। তুমি আমাকে পথ দেখাও। এখন বলো, আলমোত অবরোধ করে কেল্লায় আমরা ঢুকবো কি করে? আর ঢোকার পর ভেতরে আমরা কেমন মোকাবেলার সম্মুখীন হবো?'

'ভেতরে ঢুকতে পারলেই তো তবে আসল মোকাবেলা হবে। আমি যদি বলি আলমোতে ঢোকা সম্ভব নয়। আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না। আলমোত কেল্লাটি দাঁড়িয়ে আছে একটি খাড়া পাহাড়ের ওপর। বাইরে থেকে দেখার পরই আপনি বুঝতে পারবেন কিভাবে অবরোধ করা যাবে। পাহাড়ের নিচে থেকে অবরোধ করতে হবে। এতে হয়তো কেল্লার ভেতরে বাইরে থেকে আসা রসদের চালান বন্ধ করা যাবে এবং ভেতর থেকে কেউ বাইরে আসতে পারবে না। কিন্তু আপনি তো পাহাড়ের আচলে দাঁড়িয়ে কেল্লার দেয়াল পর্যন্ত তীর পৌঁছাতে পারবেন না।'

'দরজাটি কেমন?'

'অসম্ভব মজবুত। বড় মোটা কাঠের ওপর চওড়া লোহার খোল পরানো। মহামান্য ওযীর! কেল্লা আলমোত কুদরতের এক অলৌকিক কীর্তি। বিশ্বাস হয় না এটা কোন মানুষের তৈরি। আপনি হাসান ইবনে সবার দূরদর্শিতা ও বুদ্ধি পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেন না। তাই অবরোধে আপনিই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। কারণ ওপর থেকে যে তীর আসবে সেটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।'

'কেল্লায় ঢোকার একটা মাত্র পথ আছে'– আওরিজী বললেন– 'ভেতরে যদি আমাদের কিছু লোক থাকে যারা ইবনে সবার বিরোধী ও আমাদের স্বপক্ষের হবে। ওরা ভেতর থেকে দরজা খুলে দেবে।'

'হাসান ইবনে সবার বিরোধী আলমোতে একজনও নেই' – ইবনে মাসউদ বললো – 'তবে আপনাদের কাউকে যদি বাতিনী বেশে আলমোতে ঢুকিয়ে দেয়া হয় তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু সেখানে কোন পাথর হৃদয়ের লোক গেলেও কয়েক দিনের মধ্যেই

তার স্বাভাবিক অবস্থা আর থাকবে না। আলমোতে এমন কিছু লোক আছে যারা কোন সন্দেহজনক লোককে দেখলেই নিমিষে তার ভেতরটা পড়তে পারে। তারা তাকে কতল না করে তাদের বেহেশতে ঢুকিয়ে দেয়। তারপর সে খোদাকেও ভুলে যায়। আর যখন বের হয় তখন সে আপনাকে হত্যা করার সংকল্প নিয়ে বের হয়।'

'তুমি তো আলমোতে অনেক বছর থেকেছো' – আবু নসর আহমদ বললেন – 'তুমি কি এছাড়া আর কোন পথ বের করতে পারবে না? আমাদের কাছে মুহূর্তে জান দেয়ার মতো অনেক জানবায আছে। কিন্তু শুধু জান দিয়ে তো কিছু পাওয়া যায় না। যখন জান দেয়ার পর উদ্দেশ্য হাসিল হয় তখনই আমরা বলি শহীদের রক্ত সার্থক হয়েছে।'

'আগেই তো বলেছি, কেল্লার ভেতর যদি ঢুকতে পারেন আসল লড়াই হবে কেল্লার ভেতর। সাধারণত: বিজয়ী দল কেল্লায় ঢুকলে বিজিত ফৌজেরা হাতিয়ার সমর্পণ করে দেয়। অন্যথায় বিজয়ী দল শহর ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু আলমোতে ব্যাপার ভিন্ন। ভেতর থেকে দরজা খুলে দিলেও আপনি তো খুশিতে ভেতরে ঢুকতেন কেল্লা জয় করে ফেলেছেন বলে। তাহলে ভয়ংকর এক ফাঁকে পা দেবেন। যাতে পড়ে আপনার ফৌজ ধ্বংস হয়ে যাবে। কেল্লার ভেতর এমন গোলক ধাঁধা আছে সেগুলো শুধু তারাই অতিক্রম করতে পারবে যারা সেটা জানে। অপরিচিতরা পথ হারিয়ে মারা পড়বে। কেল্লার ভেতর পাতাল শহর আছে। এর রাস্তা ও গোলক ধাঁধা। আপনার ফৌজ পরস্পর থেকে সেখানে ঢুকলেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। এ সুযোগে বাতিনীরা ওদের লাশ ফেলে স্তূপিকৃত করে ফেলবে...

'আলমোতে আসল লড়াইকারী তো ফেদায়েনরা। এরা সংখ্যায় কয়েক হাজার। একটি মূল লশকর। কিন্তু প্রকাশ্য লড়াই এরা এড়িয়ে চলে। এরা গুপ্তহত্যা ও নিজেরা আত্মহত্যা করতে বেশ দক্ষতা রাখে। এরা জানবাজী রেখে লড়বে। কিন্তু যখনই দেখবে শত্রুর হাতে ধরা পড়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে বুকে ছুরি বসিয়ে দেবে। কিন্তু এ অবস্থা তখনই হবে যখন আপনার ফৌজ জানবাজী রেখে উন্মাদের মতো লড়ে যাবে এবং তাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হবে...

'আলমোতের তিন দিকে নদী। নদীতে কুমীর আছে। তীর তলোয়ার ছুরি কোন কিছু দিয়েই তাকে কাবু করা যাবে না। হ্যাঁ তারও একটা নাজুক স্থান আছে। সেটা হলো তার পেট। সেখানে সামান্য ছুরি দিয়েও তাকে কাবু করা যাবে। কেল্লার পেছন দিকের একেবারে পাহাড়ের নিচ দিকে থেকে কেটে একটা দরজা বানানো হয়েছে। দরজাটি একটা গুহার আদলে বানানো হয়েছে। এর শেষ হয়েছে প্রায় অর্ধেক নদীতে গিয়ে। আরো ভেতরের দিকে আরো একটি মজবুত দরজা লাগানো আছে। সেটা ভেতর থেকে তালা লাগানো থাকে। ভেতরে যাতে পানি না আসে এজন্য দরজা যত এগিয়েছে ততই উঁচু হয়ে এগিয়েছে। সেখানে সব সময় প্রহরীরা ডিউটি দেয়। ঐ দরজা পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তা ও গোলক ধাঁধা দিয়ে তৈরি করা। এই গোলক ধাঁধার পথ যারা না জানবে তারা সে পর্যন্ত পৌছতে পারবে না।'

'এই দরজা বানানো হয়েছে কি জন্যে?' – আওরিজী জিজ্ঞেস করলেন।

'পালানোর জন্য। আমি ফেদায়েন দলের শীর্ষ কয়েকজনের একজন ছিলাম' – ইবনে মাসউদ বললো– সে দরজার গোলক ধাঁধা পথ তাই আমি ভালো করেই চিনি। এই কেল্লা যদি কখনো কোন ফৌজ দখল করে নেয় তাহলে হাসান ইবনে সবা যাতে তার উপদেষ্টাদের নিয়ে পালাতে পারে মূলতঃ এজন্য দরজাটি বানানো হয়েছে।'

'ব্যাস এতটুকুই যথেষ্ট'– আবু নসর বললেন– 'আমি যা জানতে চেয়েছি তুমি এর চেয়ে অনেক বিস্তারিত জানিয়েছো। আচ্ছা আমরা কেল্লা অবরোধ করলে তুমি কি ভেতরে গিয়ে সেই দরজাটি খুলতে পারবে?'

'আপনি একটি কথা ভুলে গেছেন মুহতারাম ওযীর!'– আওরিজী বললেন– আগে তো এটা ঠিক করুন যে, কেল্লায় যেই ঢুকবে সে কি করে ঢুকবে?

'কেল্লায় আমি ঢুকবো' – ইবনে মাসউদ বললো দৃঢ় কণ্ঠে – 'হাসান ইবনে সবা পর্যন্ত নিশ্চয় এখবর পৌঁছে গেছে। আমি ওসিমকুহের সব বাতিনীকে হত্যা করিয়েছি। ওদের মধ্যে যে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলো তার নাম নিশ্চয় হায়দার বাছারী। আমি আলমোতে গিয়ে হাসান ইবনে সবাকে বলবো, ওই বাতিনীদের ধরিয়ে দিয়ে হত্যা করিয়েছে আসলে হায়দার বাছারী। আমি তো সেলজুকিদের হাতে বন্দী হয়ে যাই এবং ওরা নির্যাতন করতে করতে আমাকে বেহুশ করে ফেলে। বহু কষ্টে আমি পালিয়ে এসেছি।

'তোমাকে আমি এমন বিপদে ফেলতে চাই না। হাসান ইবনে সবা উস্তাদের উস্তাদ। সে তোমার কথা বিশ্বাসই করবে না' – আবু নসর বললেন।

'এটা আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন। লোহা যেভাবে লোহা কাটে সেভাবে প্রতারক ও প্রতারকের চোখে ধুলো দিতে পারে। কিভাবে দেবো সেটা বলতে পারছি না এখন। কিন্তু আমি আত্মবিলাসী, হাসান ইবনে সবাকে ধোঁকা দিতে পারবো আমি।'

ওযীর আবু নাসর ও সালার আওরিজী প্রস্তাব দিলেন, মারু থেকে যখন ফৌজ কোচ করবে এর পাঁচ সাতদিন আগে ইবনে মাসউদ আলমোত চলে যাবে। আর আলমোত অবরোধ করার পর ইবনে মাসউদ যদি তার কাজে সফল হয় তাহলে কোন এক রাতে শহরের দেয়াল থেকে আগুনের শিখার মাধ্যমে ইশারা দেবে যে, সে কেল্লার চোরা দরজা খুলে দিয়েছে। তারপর কিছু জানবায কেল্লায় ঢুকে তাদের কাজ শুরু করে দেবে।

'না মুহতারাম ওযীর।' – ইবনে মাসউদ বললো – 'আমার কাজের জন্য কাল সকালেই রওয়ানা হয়ে যেতে হবে। আমি ধোঁকা দিতে সফল হলে আমার কিছু সময় প্রয়োজন হবে। এ সময়ের মধ্যে আমি গোলক ধাঁধার পথগুলো আরো ভালো করে চিনে নেবো এবং সেসব পথের মোতায়েনকৃত প্রহরীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলতে পারবো। ওদেরকে এটা বুঝাবো যে, আমার আসা যাওয়া ইমামের হুকুমেই হয়... আপনারা যখন আলমোত অবরোধ করবেন আমি সময় বুঝে নদীর দরজা খুলে অগ্নিশিখার মাধ্যমে ইংগিত করবো।'

উনারা এ প্রস্তাবটাই গ্রহণ করলেন। পরদিন সকালে ইবনে মাসউদ অদ্ভুত এক বেশ নিয়ে আলমোতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলো।

★★★★

এর পরদিন আবু নসর আহমদ সালার আওরিজীকে নিয়ে মারু রওয়ানা হয়ে গেলেন। সালার আওরিজীকে তিনি নিয়ে গেছেন এজন্য– যাতে তারা দু'জনে মিলে সুলতান মুহাম্মদকে দ্রুত হামলার জন্য রাজি করাতে পারেন।

মারু পৌঁছে উনারা সুলতান মুহাম্মদকে ইবনে মাসউদের অতীত জীবন কাহিনী, তার দেয়া আলমোত সম্পৃক্ত তথ্য এবং সর্বশেষ তার পরিকল্পনার কথা জানালেন। বারবার বললেন, এখন ইবনে মাসউদের পরিকল্পনা মতে সফল হতে হলে তড়িৎ হামলার ব্যবস্থা করতে হবে। তাই হামলার অনুমতি দেয়া হোক।

সুলতান মুহাম্মদ হামলার অনুমতি দিলেন। তবে এক মাস পর। এই এক মাস দিন রাত ফৌজকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। তবে এই হামলায় সালার আওরিজী থাকতে পারবেন না। বরং তিনি ওসিমকুহে গিয়ে নিজের ফৌজ প্রস্তুত রাখবেন এবং ওযীর আবু নসর আহমদের যত সেনা সাহায্য প্রয়োজন হবে সালার আওরিজী ওসিমকুহ থেকে তা পাঠাতে থাকবেন।

আবু নসর আহমদ ও আওরিজী যখন সুলতান মুহাম্মদের সঙ্গে রুদ্ধ দ্বার বৈঠক করেছেন আলমোতে তখন হাসান ইবনে সবাকে সংবাদ দেয়া হলো। ওসিমকুহ থেকে ইবনে মাসউদ নামে এক ফেদায়েন অসম্ভব খারাপ অবস্থায় এসেছে। হাসান ইবনে সবা তখনই তাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিতে বললো।

ইবনে মাসউদ হাসান ইবনে সবার সামনে গিয়ে টলতে লাগলো। তার কাপড় চোপড় অতি জীর্ণ শীর্ণ। নাঙ্গা পা। এক পা থেকে ফোটা ফোটা রক্ত পড়ছে। চোখ মুখ যখমের দাগে ভরা। আস্তে আস্তে তার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেলো। সে পড়ে গেলো। হাসান ইবনে সবা সঙ্গে সঙ্গে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলো।

'একে' – হাসান ইবনে সবা জিজ্ঞেস করলো– 'এ কোন মাসউদ? হায়দার বাছারী যে আমাকে বলেছে এক ইবনে মাসউদ ওসিমকুহের সব ফেদায়েনকে ধরিয়ে দিয়েছে এবং তারা আত্মহত্যা করেছে একি সেই ইবনে মাসউদ?'

লোকেরা বললো, হ্যাঁ এ সেই ইবনে মাসউদ। হাসান খুব হয়রান হয়ে বললো, সে যদি তার সঙ্গীদের ধরিয়ে দিতো তাহলে তো এখানে এ অবস্থায় আসতো না। সেলজুকিরাও এত অমানুষ নয় যে, তাকে বিনা পুরস্কারে এভাবে ছেড়ে দেবে। তার উপদেষ্টারা বললো, এ প্রশ্নের জবাব তার কাছেই পাওয়া যাবে। তার হুশ ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

রাতের শেষ প্রহরে ইবনে মাসউদের জ্ঞান ফিরলো। সকাল বেলা তাকে ভালো করে গোসল করিয়ে নতুন কাপড় পরানো হলো এবং গরম কিছু খাবার দেয়া হলো। তারপর তাকে হাসান ইবনে সবার কামরায় নিয়ে যাওয়া হলো। সে হাঁটতে পারছিলো না। দু'জন ধরে ধরে তাকে হাসান ইবনে সবার কাছে নিয়ে বসালো। হাসান তাকে জিজ্ঞেস করলো এ অবস্থা তার কি করে হলো এবং সে কোত্থেকে এসেছে।

‘ওসিমকুহের সেলজুকি কয়েদখানা থেকে আমি পালিয়ে এসেছি শায়খুল জাবাল!’– ইবনে মাসউদ অতি দুর্বল কণ্ঠে কম্পিত আওয়াজে বললো– ‘ঐ জালিম সেলজুকিরা আমাকে আলমোতের কথা জিজ্ঞেস করতো। আর জিজ্ঞেস করতো এখানে কে কে তোর ফেরকার লোক। কিন্তু আমি এর কোন জবাব দিতাম না। আমাকে ওরা এমন অমানুষিক নির্যাতনের মধ্যে রাখে যে, সম্ভবত কোন মানুষ তা বরদাশত করে জীবিত থাকতে পারবে না। কিন্তু আমি আমার ভেতর শায়খুল জাবালের নাম তাজা রেখেছি। তাই আমার দেহের ওপর দিয়ে যা গিয়েছে তা আমার মনকে স্পর্শ করতে পারেনি। ওদেরকে আমি কিছুই বলিনি।’

‘তাহলে তোমার সঙ্গীদের কে ধরিয়ে দিয়েছে?’ – হাসান ইবনে সবা জিজ্ঞেস করলো – ‘তুমি সম্ভবত জানো না তোমাদের এক সঙ্গী হায়দার বাছারী এখানে এসে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে গেছে।’

‘হায়দার বাছারী! সে তো এখানে পৌঁছে তার মতলবের কাহিনী শোনাবেই। আমি জানিনা এবং জানতেও চাই না হায়দার বাছারী আপনাকে কি শুনিয়েছে। আমি এটা বলতে এসেছি যে, আমাদের সবাইকে মারিয়েছে এই হায়দার বাছারী। এর আগে আমাদের আরেক ফেদায়েন সালার আওরিজীকে হত্যা করতে গিয়ে অতি রূপসী এক মেয়ের জালে পা দিয়ে আমাদের দু’জন লোককে হত্যা করায়। যারা তাকে আপনার হুকুমে আশ্রয় দিয়েছিলো। আওরিজী তাদের দু’জনকে জনসম্মুখে হত্যা করে।’

‘ইয়া শায়খুলজাবাল! উবাইদ আরাবীর কথাতেই হায়দার বাছারীকে পাকড়াও করা হয়। সে নিশ্চয় সেলজুকিদের কাছ থেকে মুঠো মুঠো পয়সা নিয়ে আমাদের সবাইকে ধরিয়ে দেয়। ওরা সর্বপ্রথম আমাকে পাকড়াও এবং জিজ্ঞেস করে এখানে আর কে কে বাতিনী। পরিষ্কার ভাষায় আমি ওদেরকে বলে দিই, আমার দেহ কেটে টুকরো টুকরো করলেও আমার মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের করতে পারবে না। তখন সালার আওরিজী নিজে এসে আমাকে বলেছে, তুমি না বললে কি হবে, হায়দার বাছারী সব কিছু বলে দিয়েছে। তাকে এত পুরস্কার দেয়া হয়েছে যে তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। ওরা তো আমাকে প্রায় মেরেই ফেলেছিলো। সম্ভবত ওরা ধরে নিয়েছিলো আমি এখান থেকে বের হতে পারবো না। শারীরিকভাবে আমি একেবারে অকেজো হয়ে পড়েছিলাম। ওরা আমার জন্য নিয়োজিত প্রহরা ঢিল করে দেয়। সুযোগ বুঝে একদিন আমি পালাতে সক্ষম হই। ইয়া ইমাম! আপনার মহান নামের ওপর ভরসা করে আমার এই শারীরিক অবস্থায় ক্ষুধা তৃষ্ণা নিয়ে এই সফর করি।’

ইবনে মাসউদের আওয়াজ ক্রমেই দুর্বল হতে লাগলো। সে লম্বা লম্বা শ্বাস নিয়ে আবার বলতে লাগলো–

‘আমি এত দূর থেকে কষ্ট করে এখানে মিথ্যা বলতে আসিনি ইয়া ইমাম! আমি যদি ওসিমকুহে থাকতাম তাহলে আমি বেহেশতের হুরের মতো এমন রূপসী এক যুবতীর স্বামী বনতে পারতাম। পালা করে দুই মেয়েকে আমার কাছে দেয়ারও ব্যবস্থা করে ওরা। সেখানে আমার জন্য ছিলো শাহজাদার জীবন। কিন্তু আমি শায়খুলজাবালকে জান দিতে পারবো ধোঁকা দিতে পারবো না।’

'হায়দার বাছারীকে যদি তোমার সামনে বসিয়ে দেয়া হয় এবং সে আগে যে বর্ণনা দিয়েছিলো তা যদি আবার দেয় তুমি তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবে কিভাবে?'

'ইয়া শায়খুলজাবাল! হায়দার বাছারীর তো এখন আমার সামনে থাকার কথা ছিলো। আপনি তাকে ডাকছেন না কেন? আমি হায়দার বাছারীর সামনে সব বলতে চাই।'

'সে শাহদর চলে গিয়েছে। সে আসুক। তার সামনে তোমাকে আবার এসব বলতে হবে।'

'আমার একটি অনুরোধ ইয়া শায়খুল জাবাল! আপনি তাকে এখনই ডাকিয়ে আনুন। আমার জীবনের কোন ভরসা নেই। আমার দেহে আপনি কোন যখম বা চোট দেখতে না পেলেও আপনার অন্তরদৃষ্টি দিয়ে অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন আমার ভেতরের সবকিছু শেষ হয়ে যাচ্ছে। আপনি হয়তো হয়রান হয়ে ভাবছেন আমি কি করে এখনো জীবিত আছি। মৃত্যুর আগেই আমি প্রমাণ করে দিতে চাই হায়দার বাছারী মিথ্যাবাদী ও ধোঁকাবাজ।'

ইবনে মাসউদের ওপর হাসান ইবনে সবার অনেকটা বিশ্বাস যমে গেছে। সে তার উপদেষ্টাদের জিজ্ঞেস করলো হায়দার বাছারী শাহদর থেকে কবে নাগাদ পৌঁছতে পারে। এক উপদেষ্টা বললো, সে তো খাযানা আনতে গেছে তাকে এর আগে ডেকে আনা ঠিক হবে না।

'কিসের খাযানা?' – ইবনে মাসউদ খাযনার কথা শুনে চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলো– 'আপনি যদি ওকে কোন খাযানা বা মূল্যবান কিছু আনার জন্য পাঠিয়ে থাকেন তাহলে এই আশা ছেড়ে দিন যে, সে ফিরে আসবে। বিষাক্ত এক সাপের প্রতি আপনারা বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। তাকে পাকড়ে আনার জন্য এখনই কিছু লোক পাঠিয়ে দিন। যাতে সে খাযানা পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে।'

হাসান ইবনে সবা তাকে বিশ্বাস করতে শুরু করলো। সে ফয়সালা দিলো, ইবনে মাসউদকে হায়দার বাছারী আসার আগ পর্যন্ত কয়েদখানায় দিয়ো না। তবে তাকে চোখে চোখে রাখতে হবে। যাতে সে কেল্লার বাইরে না যায়।

★★★★

হাসান ইবনে সবা যখন হায়দার বাছারী সম্পর্কে কথা বলছিলো হায়দার বাছারী তখন তার সঙ্গীদের নিয়ে শাহদরের বাতিনীদের সঙ্গে বসে আছে। শাহদরে থাকতে হাযিকের সঙ্গে তার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিলো, হাযিকই তাকে এই খাযানার কথা বলে। তখন হায়দার হাযিকের কথা খুব মন দিয়ে শুনেনি। শুধু মনে আছে অনেক দূরের এক ঝিলের মাঝখানে একটি টিলা আছে তার মধ্যে খাযানা রাখা আছে। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পথ তার মনে নেই। শাহদরে আসার পর তার একথা মনে পড়েছে। কি করা না করা যায় এ নিয়ে এখানকার বাতিনীদের সঙ্গে আলাপ করছিলো। কিন্তু কেউ সন্তোষজনক কোন সমাধান দিতে পারলো না। তাই হায়দার বাছারীরা শাহদরে অলস ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

নূরের বাবা একদিন তার জমিনের দেখাশোনা করছিলেন। আচমকা দুই লোক পেছন থেকে তাকে জাপ্টে ধরলো। নুরের বাবা ঘুরে দেখলেন তাদের একজন হায়দার বাছারী। তাকে তিনি ভালো করেই চিনতেন, কারণ সে আব্দুল মালিকের কাছে প্রতিদিনই আসতো।

'আরে হায়দার বাছারী' –নুরের বাবা আনন্দিত গলায় বললেন–'তুমি তাহলে ফিরে এসেছো? তোমাকে দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। কিন্তু দোস্ত! খুব সাবধানে থাকতে হবে। সেলজুকি সুলতান সাঞ্জার এখানেই আছেন এখন। বাতিনী বলে সামান্য সন্দেহ হলেই পাকড়াও হয়ে যাবে।'

'আমাদেরকে ধোঁকা দিয়ো না বুড্ডা!' – হায়দারবাছারী বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বললো– 'আলমোত থেকেই জেনেছি আমি, তুমি ও তোমার মেয়ে পীর মুরশিদ আবদুল মালিককে ধোঁকা দিয়ে তাকে নাজেহাল করেছো।'

'আর এখন সেলজুকিদের সেবাদাস হয়ে গেছে। তার তো দারুণ সুন্দরী একটি মেয়েও আছে' – হায়দারের সঙ্গী টিটকারী মেরে বললো।

নুরের বাবা যথাসম্ভব দৃঢ় গলায় তাদেরকে বুঝাতে শুরু করলেন। আবদুল মালিককে তিনি ধোঁকা দেননি বরং তিনিই এখান থেকে যাওয়ার সময় সেলজুকিদের অনুগ্রহের ওপর ছেড়ে এখান থেকে চলে গেছেন। তিনি এখনো হাসান ইবনে সবার সাচ্চা মুরিদ।

'তুমি জানো না হায়দারবাছারী!' – নুরের বাবা বললেন – 'তোমাকে পেয়ে যে আমার কি খুশি লাগছে। আমি তোমার মতো এক সঙ্গীর অপেক্ষায় ছিলাম যে আমাকে ও আমার মেয়েকে আলমোত পৌঁছে দেবে। এক হাযিক ছিলো। লুকিয়ে ছাপিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতাম। সে ওয়াদা করেছিলো আমাকে ও আমার মেয়েকে সে আলমোত নিয়ে যাবে কিন্তু বহুদিন যাবত তার পাত্তা নেই।

'এখানে নয় আমাদের ওখানে গিয়ে আলাপ হবে' – হায়দার বললো – 'তোমাকে আগেই বলছি, আমরা কিন্তু তোমাকে জীবিত ছাড়বো না।'

'তোমাদের ওখানে নয়। তোমরা আমার ঘরে চলো। সেখানে তোমরা আমার মেয়েকেও পাবে। তারপর তোমাদের বিশ্বাস আসবে যে, আমরা তোমাদেরই লোক। আর এখানে রয়েছি একান্ত বাধ্য হয়েই' – নুরের বাবা বললেন,

ওরা যেতে রাজি হচ্ছিলো না। হায়দার বাছারী বললো, তুমি তো ওখানে নিয়ে আমাদের ধরিয়ে দেবে।

'তোমাদের কাছে তো খঞ্জর আছে'– নুরের বাবা বললেন– 'না থাকলে তো তোমরা ফেদায়েনই নও। যেখানেই তোমাদের সন্দেহ হবে যে, আমি তোমাদের ধরিয়ে দেবো আমার বুকে খঞ্জর মেরে পালিয়ে যাও।'

নুরের বাবার সঙ্গে যেতে ওরা কোন ক্রমেই রাজি হচ্ছিলো না। বহু কষ্টে ওদেরকে রাজি করলেন নুরের বাবা। নুরের বাবা ওদেরকে তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন। নুর হায়দারকে দেখে তো সঙ্গে সঙ্গে চিনে ফেললো। নুরের বাবা তখন নুরকে চোখের ইশারা দিলেন। নুর তার ইংগিত বুঝে ফেললো এবং হায়দারকে উৎফুল্ল গলায় স্বাগত

জানালো। নুরও ওদের সঙ্গে এমনভাবে আলাপ চালিয়ে গেলো যাতে প্রকাশ পায় ওরা হাসান ইবনে সবার মুরিদ। সে হায়দার ও তার সঙ্গীকে খুব আদর যত্ন করে ঘরের ভেতর বসালো।

হায়দার তবুও নুরের বাবাকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না। নুরের বাবা শেষ পর্যন্ত বললেন, হাযিক যদি আজ এখানে থাকতো তাহলে সেই সাক্ষী দিতো আমরা কত বড় বাতিনী। হাযিকের প্রসঙ্গ আসতেই হায়দার বাছারী ফস করে বলে ফেললো তার এখানে আসার উদ্দেশ্য। কিন্তু হাযিককে না পেয়ে সে এখন যে সমস্যায় পড়েছে তাও বললো।

হায়দার বাছারীর কথা শুনে নুরের বাবা যেন আলোর সন্ধান পেলেন।

'এখন আমি তোমাদেরকে বিশ্বাস করাতে পারবো যে, – নুরের বাবা বললেন – 'আমি তোমাদের লোক। তোমাদেরকে আমি সোজা খাযানা পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবো। তোমরা তো খাযানা নিয়ে সোজা আলমোত যাবে। নুর ও আমি সঙ্গে যাবো এবং তোমাদের সঙ্গে আমরাও আলমোত যাবো। হাযিকের সাথে আমার এমন ঘনিষ্ঠতা ছিলো যে, যত গোপন বিষয়ই হোক সে আমাকে না জানিয়ে স্বস্তি পেতো না।'

হায়দার বাছারী যেন ভুলেই গেলো নুরের বাবা সন্দেহজনক লোক। তার চোখ মুখ আনন্দে নেচে উঠলো। সে নুরের বাবাকে জড়িয়ে ধরে বললো। তাকে ও তার মেয়েকে সে অবশ্যই আলমোত পৌঁছে দেবে।

নুরের বাবা বললেন, তাদের সঙ্গে একজন বিশ্বস্ত লোকও যাবে। আর কিছু জিনিসপত্রও যোগাড় করতে হবে। একটি ঘোড়ার গাড়ি ও তিনটি ভেড়া লাগবে। এগুলোর প্রয়োজন সেখানে গিয়ে বলবো। এসব যোগাড়ের জন্য আমার কয়েক জায়গায় যেতে হবে।

নুরের বাবা সোজা সুলতান সাঞ্জারের ওযীরের কাছে চলে গেলেন। তাকে সব খুলে বললেন যে, দুই ফেদায়েন আমার জালে পা দিয়েছে এবং হাসান ইবনে সবার পক্ষ থেকে খাযানার সন্ধানে এসেছে। কিন্তু ওদেরকে এখানে পাকড়াও করা হচ্ছে না। এজন্য যে, ওদেরকে আমি আরো ভয়ংকর শাস্তি দিয়ে মারতে চাই। ওযীর তাকে এজাযত দিয়ে দিলেন।

রাতের প্রথম প্রহর চলে যাওয়ার পর শাহদর থেকে একটি ঘোড়ার গাড়ি বের হলো। এর ভেতর ছিলো নুর ও তার বাবা এবং তাদের একজন লোক ও হায়দার বাছারী ও তার দুই সঙ্গী। গভীর রাতে ওরা এক নির্জন জঙ্গলে তাঁবু ফেলে ঘুমিয়ে নেয়। নুরের বাবা ইচ্ছে করলে ওদেরকে ঘুমের মধ্যেই নিজ হাতে হত্যা করতে পারতেন। কিন্তু তার ভেতরে যে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে এত সহজ মৃত্যু দিয়ে তার মনের সে আগুন নিভবে না।

দুপুরের আগে ঝিলের ধারে গিয়ে ঘোড়ার গাড়ি পৌঁছলো। সবাই নেমে পড়লো। নুরের বাবার ইংগিতে সবাই গিয়ে নৌকায় উঠলো। সাথে করে ভেড়াগুলোও নিয়ে নিলো। নৌকা চলতে শুরু করতেই কয়েকটি কুমীর তেড়ে এলো। নুরের বাবার ইংগিতে হায়দার একটি ভেড়া ঝিলে ফেলে দিলো। কুমীর সেটার ওপর টুটে পড়লো। ঝিলের মাঝখানের টিলা পর্যন্ত পৌঁছতে আরো একটা ভেড়া কুমীরদের পেটে দিতে

হলো। টিলার কাছে পৌঁছার পর নুর ও তার বাবা উঠে দাঁড়ালো যেন নৌকা থেকে নেমে পড়বে। হায়দার বাছারী ও তার দুই সঙ্গীরাও নৌকা থেকে নেমে পড়লো। নুরের বাবা ওদেরকে বললেন তোমরা এগোও আমরা আসছি।

ওরা এগুতে শুরু করতেই নুরের বাবা নৌকায় থাকা তার লোককে জোরে জোরে বৈঠা মারতে বললেন ইংগিতে। নুরের বাবা ও একটা বৈঠা নিয়ে নিলেন এবং দু'জনে মিলে তীব্র বেগে বৈঠা চালাতে শুরু করলেন। বৈঠার আওয়াজে হায়দার বাছারীরা পেছনে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলো– আরে এরা নৌকা নিয়ে যাচ্ছে কোথায়? উঁচু আওয়াজে হায়দার অবশেষে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা যাচ্ছো কোথায়?

'তোমরা তোমাদের খাযানা আনতে চলে যাও। আমাদের খাযানার প্রয়োজন নেই' – নুরের বাবা একথা বলে হো হো করে হেসে উঠলেন।

হায়দার তখনই বুঝে গেলো। তাদেরকে ধোঁকা দেয়া হয়েছে। তিনজনই ঝিলে লাফিয়ে পড়লো এবং নৌকার দিকে সাতরাতে শুরু করলো। নৌকা ততক্ষণে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। ওরা ভেবেছিলো সাতরিয়ে ঐ পারে চলে যাবে। কিন্তু কুমীররা তাদের সবচেয়ে স্বাদের ভোজের আয়োজন দেখে আর বিলম্ব করলো না। নুরের বাবা নিরাপদে নৌকা ওপারে নিয়ে গেলেন। আর ওমনিই আকাশ বিদীর্ণ করা মরণ চিৎকার বেরিয়ে এলো তিন ফেদায়েনের মুখ থেকে।

নুরের বাবা তার সঙ্গী ও নুরকে বললেন, আমরা দু'তিন রাত দেরী করবো। তারপর গোপনে শাহদর ফিরবো।

চতুর্থ দিন ওরা শাহদর ফিরলো রাতের অন্ধকারে। যাতে কোন বাতিনী দেখতে না পায়। নুরের বাবা সোজা সাঞ্জারের ওযীরের বাড়িতে চলে গেলেন এবং তিনি কি করে এসেছেন তাও জানালেন। ওযীর খুব খুশী হলেন। ওযীরকে নুরের বাবা বললেন, আমাদের ঘোড়ার গাড়ি লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করুন। আমরা যে এসেছি সেটা কাউকে জানানো যাবে না। দু'দিন পর্যন্ত আমরা কেউ ঘর থেকে বের হবো না।

★★★★

দু'দিন পর নুরের বাবা ঘর থেকে বের হলেন এবং যেখানে বাতিনীরা একত্রিত হয় সেখানে চলে গেলেন। তিন চারজন বাতিনী সেখানে বসেছিলো তখন।

'আরে এসে গেছো তোমরা?' – সবাই এক সঙ্গে বলে উঠলো– 'ঘোড়ার গাড়ির আওয়াজ শুনলাম না। হায়দাররা কোথায়?'

নুরের বাবা কোন জবাব না দিয়ে একটি চার পায়ার ওপর গিয়ে বসে পড়লেন। যেন ক্লান্তিতে তিনি ভেঙ্গে পড়ছেন। বাতিনীরা ঘাবড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করলেন আজ কি হয়েছে?

'কি বলবো তোমাদের?' –নুরের বাবা বড় কষ্টার্ত গলায় বললেন–' শায়খুলজাবালের বদৌলতে আমি ও আমার মেয়ে বেঁচে আসতে পেরেছি... আর হায়দার বাছারী ও হায়দার বাছারীর সঙ্গীরা খাযানা নিয়ে অন্যদিকে চলে গেছে। আমাদের গাড়ি থেকে

ফেলে দেয়ার আগে ওরা কানাঘুষা করছিলো। আমি শুধু এতটুকু শুনেছি। এই ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে ওরা মিসর চলে যাবে।'

বাতিনীরা জিজ্ঞেস করতে লাগলো এসব হলো কি করে? নুরের বাবা যা বললো তার সারমর্ম হলো, ঝিল-মধ্যকার টিলা থেকে খাযানা উদ্ধার করে ঘোড়ার গাড়ি পর্যন্ত কোন ঘটনা ঘটেনি। ঘোড়ার গাড়িতে উঠার সময় নুরের বাবা ও তার সঙ্গী এবং নুরকে হায়দাররা গাড়ির পেছনে জায়গা দেয়। গাড়ি কিছু দূর আসার পর দুটি রাস্তার মুখে পড়ে গাড়ি। একটি রাস্তা গিয়েছে শাহদরের দিকে আরেকটি অন্য পথে। গাড়ি চালাচ্ছিলো হায়দার বাছারী। শাহদরের পথ রেখে হায়দার গাড়ি অন্য পথে নিয়ে গেলো। আর সঙ্গীরা চলন্ত গাড়ি থেকে নুর, নুরের বাবা ও তার সঙ্গীকে ধাক্কিয়ে গাড়ি থেকে ফেলে দিলো। কারো হাত পা না ভাঙ্গলেও সবাই দারুণ চোট পেলো। এজন্য সামলে নিতে কিছুটা সময় লাগলো। কিন্তু ততক্ষণে গাড়ি তাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছে।

'আমরা শাহদরের পথ ধরে হাছড়ে পাছড়ে চলতে লাগলাম এবং ভয়ংকর এক জঙ্গলে প্রবেশ করলাম' – নুরের বাবা বলে গেলো – 'একে তো হিংস্র প্রাণীর ভয় তার ওপর ডাকাতদের ভয়। আমাদের কাছে কিছু না থাকলেও সবচেয়ে বড় সম্পদ ছিলো আমার নুর। বেঁচে আসার কোন আশাই দেখছিলাম না। জঙ্গলে পাতা পড়ার শব্দ কানে আসলেও ভয়ে কেঁপে উঠতাম। এ বুঝি ডাকাত হবে। কিছু দূর আসার পর পেছন থেকে সাতটি উট আসতে দেখা গেলো। ভয়ে আমাদের পা মাটিতে আটকে যেতে লাগলো। এখন পালানোও বৃথা। কারণ উট সওয়াররা আমাদের সহজেই ধরে ফেলবে'...

আমরা আমাদের ভাগ্য সপে দিলাম তকদীরের ওপর। ওরা কাছে আসার পর দেখা গেলো চার উটের ওপর সামানপত্রের বোঝা। আর তিনটির মধ্যে পাঁচজন সওয়ার। ওদেরকে ডাকাত বা রাহজান মনে হলো না। ওরা মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলো। তোমরা কোথায় যাচ্ছো... আমরা মিথ্যা বললাম, আমরা উটে করে শাহদরে যাচ্ছিলাম। রাস্তায় দুই ডাকাত মালপত্রসহ আমাদের উট দুটো ছিনিয়ে নিয়ে গেলো...

'ওদের একজন বলে উঠলো, তাহলে এত সুন্দরী মেয়েকে কি মনে করে রেখে গেলো, আমি বললাম, তখন সে প্রাত্যকৃত সারতে এক পাহাড়ের আড়ালে চলে গিয়েছিলো। ওদেরকে আরো বললাম, এ আমার একমাত্র মেয়ে। এই বিপদে আপনারা যদি আমাদেরকে শাহদরে পৌঁছে দেন তাহলে আমরা সেখানে পৌঁছে আপনারা যত পারিশ্রমিক চাইবেন দিয়ে দেবো।... ওরা তিন দিনে আমাদেরকে শাহদরে পৌঁছে দিলো। আমরা ওদের পারিশ্রমিকও শোধ করে দিলাম। আমাদের বেঁচে আসাটা আসলে কুদরতের এক অলৌকিক কান্ড।'

'যা হোক এখন আমাদের কি করতে হবে তাই বলো' – এক বাতিনী জিজ্ঞেস করলো।

'এখন তো আর পিছু ধাওয়া করে ওদেরকে তোমরা পাবে না। তাই একজন আলমোতে গিয়ে শায়খুল জাবালকে জানাও যে হায়দার বাছারী খাযানা নিয়ে পালিয়েছে।'

তখনই একজন আলমোতের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলো। নুরের বাবার উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেলো। তিনি চাচ্ছিলেন, হাসান ইবনে সবা খাযানা সম্পর্কে যাতে সঠিক তথ্য না পায়।

★★★★

আলমোতে ইবনে মাসউদকে একদিন হাসান ইবনে সবা ডেকে পাঠালো। ইবনে মাসউদের ভেতরটা কেঁপে উঠলো। সে জানে, সে যদি হাসান ইবনে সবার কাছে মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণিত হয় তাহলে নির্ঘাত মৃত্যু। তাই জামার নিচে সে একটি খঞ্জর নিয়ে নিলো। মৃত্যু নিশ্চিত দেখলে নিজেই নিজের বুকে খঞ্জর ঢুকিয়ে দেবে।

'এসো ইবনে মাসউদ!' – হাসান ইবনে সবা বললো– 'আমি তো এজন্য খুশী যে, তুমি সত্যবাদী বলে প্রমাণিত হয়েছো। আমি তোমার প্রশংসা করছি যে, তুমি সেলজুকিদের কয়েদখানা থেকে পালিয়ে এসেছো। কিন্তু হায়দার বাছারী তার সাথীদের সহযোগে খাযানা নিয়ে পালানো এটা আমাকে দারুণ ব্যথিত করেছে। জানা গেছে, সে মিসর গিয়েছে। এতদিন পর তার খোঁজ লাগানোও বৃথা যাবে।'

'ইয়া শায়খুলজাবাল! মিসরে কি আমাদের কেউ নেই?' – ইবনে মাসউদ জিজ্ঞেস করলো।

'সে ব্যবস্থা তো করবোই আমি। কিন্তু তরঙ্গ বাহিত নদীর তলদেশ থেকে সূচ খুঁজে বের করা কি সম্ভব? মিসর অনেক বড় দেশ। ঐ বদবখতরা কোথায় গেছে কে জানে।'

'ইয়া শায়খুলজাবাল!' আপনাকে আরেকটা কথা বলিনি। হায়দার তো সেলজুকিদের এও বলে দিয়েছে যে, নদীর দিকে আলমোতের একটা চোরা দরজা আছে। সে দরজা পর্যন্ত কিভাবে পৌঁছতে হবে তাও সে বলে দিয়েছে। আলমোত অবশ্যই অবরোধ করবে সেলজুকিরা। তখন ওরা চেষ্টা করবে সে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে।

'ভেতর থেকে দরজা খুলবে কে?'

'ওদের দু'একজন আগেই বাতিনী বেশে কেল্লায় ঢুকে পড়বে এবং সে দরজা পথ চিনে নেবে। হায়দার বাছারী ওদেরকে খুব ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছে।'

'তারা এতে সফল হবে না। আমি এর ব্যবস্থা নেবো।'

'একটা আরজ ইয়া শায়খুলজাবাল! আপনি তো অবশ্যই এর ব্যবস্থা নেবেন। কিন্তু সেই চোরা দরজার যিম্মাদারী আমাকে দিয়ে দিন। তখন সে পর্যন্ত কারো পৌঁছার সম্ভাবনা একেবারে শেষ হয়ে যাবে। আমি ওসিমকুহের ফৌজের পদস্থ সবাইকে চিনি। ওদের কেউ ছদ্মবেশে এলে আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। এর আগে আমাকে মারু যেতে হবে।'

'সেখানে গিয়ে কি করবে? ধরা পড়ে যাবে না?'

'না, শায়খুলজাবাল! ওসিমকুহে আমাকে অনেকে চিনলেও মারুতে কেউ আমাকে চিনে না। মারুতে আমি কিছুদিন থাকলেও সেখানকার লোকদের সঙ্গে তেমন উঠাবসা ছিলো না। সুলতান মুহাম্মদের ওযীর আবু নসর আহমদ আলমোত হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাকে কতল করা যায়। কিন্তু তাকে কতল করে লাভ নেই। তাকে কতল করলে তার স্থলে আরেকজন ওযীর হবে এবং সেও হামলার প্রস্তুতি নেবে এবং সুলতানকে খুশী করার জন্য তখনই হামলা করে দেবে। তাই আমার মতে আবু নসরকে আমাদের দলে ভেড়ানো দরকার। সুলতান মুহাম্মদ তার এই ওযীরকে খুবই মূল্যায়ন করেন। সুতরাং ওযীরকে আমাদের মতে নিয়ে আসা মানে সুলতানকেও একই পথে নিয়ে আসা।'

'এ কাজ কে করবে?'

'আমি করবো ইয়া শায়খুলজাবাল! আপনি আমাকে যেতে দিন এবং যিররীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে দিন।'

'যিররী কে?'

'যিররী আমার ছোট বোন। আপনার মনে নেই, আমার বাবা আমাদের দু'জনকে আপনার খেদমতে পেশ করেছিলেন। যিররী বেহেশতে আছে। আমি তাকে দিয়ে আবু নসর আহমদকে হাত করবো। যিররী অসম্ভব রূপবতী মেয়ে। আবু নসর মেয়ে পাগল বলে শুনেছি। তাকে আমরা বোতলে ভরে ফেলবো।'

হাসান ইবনে সবা গভীর চিন্তায় ডুবে গেলো।

'আপনার হয়তো মনে আছে ইয়া শায়খুলজাবাল' – ইবনে মাসউদ বললো – 'আমরা তাদের এক ওযীরে আজম সাঈফুল মালিককেও এভাবে হাত করেছিলাম। তারপর কি হয়েছে তা তো আপনি জানেনই। তারপর সুলতান বরকিয়ারককেও আমাদের মুঠোয় পুরে নিয়েছিলাম... আপনি যদি আমার পরামর্শ গ্রহণ করেন তাহলে আবু নসরকে এভাবে আমার মুঠোয় পুরতে পারবো।'

হাসান ইবনে সবা অনেক বুড়ো হয়ে গেছে। তার ওপর একের পর এক মানসিক আঘাত তাকে ভেতর থেকে ঝাঝরা করে ফেলেছে। আর সে যে জাদুটোনা জানতো তা তো তার পীর মুরশিদ আবদুল মালিক কবরে নিয়ে গেছে। তাই সে ইবনে মাসউদের কথায় চিন্তায় পড়ে গিয়ে তার উপদেষ্টাদের ডেকে ব্যাপারটা তাদের সামনে উত্থাপন করলো।

কিছুক্ষণ আলোচনার পর সবাই ফয়সালা শোনালো, ইবনে মাসউদ যিররীকে নিয়ে মারুতে যাবে এবং তার বোনের হেফাজতের জন্য দু'জন লোক থাকবে ওদের সঙ্গে।

★★★★

ইবনে মাসউদ তার বোনকে আনার জন্য হাসান ইবনে সবার বেহেশতে চলে গেলো। সে তার বোনকে খুঁজতে লাগলো। আগে সে এখানে আসতো হাশীষ পান করে। তখন এখানকার দুনিয়া রঙ্গীন মনে হতো। কিন্তু এখন তার মধ্যে ঈমানের রঙ্গ। তাই তার ভেতর থেকে আওয়াজ উঠছিলো, এখান থেকে দ্রুত বের হও। হঠাৎ তার কানে আসলো উমর! তার আসল নাম উমর ইবনে মাসউদ। এ নামে তাকে শুধু ডাকতো তার বোন যিররী। যিররী দৌড়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলো। সে নিজেকে যিররী থেকে আলতো করে সরিয়ে চোখমুখ গম্ভীর করে বললো–

'আমি তোমাকে কাল সকালে মারু নিয়ে যাচ্ছি যিররী! মারু খুব চমৎকার শহর। আমরা কিছু দিন সেখানে থাকবো।'

'কেন আমরা মারু যাবো?' – যিররী জিজ্ঞেস করলো।

'সেলজুকি ওযীরে আজমকে আমাদের হাতের মুঠোয় নিতে হবে। আর একাজ করতে হবে তোমাকে। এটা হাসান ইবনে সবার নির্দেশ। সেখানে তোমার বুদ্ধির পরীক্ষা হবে। তুমি যদি সফল হও তাহলে হাসান ইবনে সবা তোমাকে অনেক উঁচুতে নিয়ে যাবে।'

যিররী খুব খুশী হলো। সে তার ভালোবাসার লোকের সঙ্গে কোথাও যাচ্ছে। কারো সঙ্গে কোন 'হুরের' হৃদয় কেন্দ্রিক সম্পর্ক হতো না। কিন্তু ইবনে মাসউদ ও যিররীর ব্যাপার ভিন্ন। ওদের মধ্যে যে রক্তের সম্পর্ক আছে সেটাই তাদেরকে এত ঘনিষ্ঠ করে তুলেছে। কিন্তু যিররীর কাছে এ ঘনিষ্ঠতা কোন পবিত্রতার অর্থে ছিলো না।

পরদিন পাঁচটি ঘোড়া রওয়ানা দিলো মারুর দিকে। একটার ওপর ইবনে মাসউদ। দ্বিতীয়টার ওপর যিররী, অন্য দুটোয় দুই বাতিনী এবং আরেকটার মধ্যে পথের সামান পত্র। বাতিনী দু'জন দারুণ খুশী। কারণ ওদের সঙ্গে এক 'হুর' যাচ্ছে। পথে ওরা দু'তিনবার ইবনে মাসউদকে হাসতে হাসতে বলেও ফেললো, আমরা তিনজন আর হুর একজন। এক ভাইয়ের সামনে এক বোন সম্পর্কে এমন মন্তব্য কে সহ্য করবে। দাঁতে দাঁত পিষে ইবনে মাসউদ নিজেকে সংযত করলো। কিছু বললো না ওদের।

সফরের প্রথম দিনের সূর্যাস্তের পর কাফেলা সুন্দর একটি জায়গা বেছে নিয়ে থেমে গেলো। একটু পর ওরা খাওয়া দাওয়া সেরে শোয়ার বন্দোবস্ত করতে লাগলো। ইবনে মাসউদ তার দুই বাতিনী সঙ্গীকে ডেকে নিয়ে বললো, দেখো আমরা পুরুষ হয়েও আজ কী সাংঘাতিক ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তাহলে মেয়েটির অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে। আজ ওকে আরাম করতে দাও। সে তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না!

ইবনে মাসউদ যিররীকে ভালো একটি জায়গায় শুইয়ে দিলো। তার পাশেই নিজের বিছানা পাতলো। দুই বাতিনী একটু দূরে বিছানা করলো। একজন বলে উঠলো, আজকের রাতটা আমাদের 'হুর' একটু দূরেই থাক, আজ ধৈর্য ধরলে কাল মেওয়ার স্বাদ ভোগ করতে পারবো।

সফরের পরিশ্রান্ত দেহ ওরা বেশিক্ষণ জাগিয়ে রাখতে পারলো না। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলো। কিন্তু ইবনে মাসউদ জেগে রইলো। তার অতীত জীবনের কথা মনে পড়লো। আর ওমনিই ছাই চাপা আগুন ধাউ ধাউ করে জ্বলে উঠলো। কিছুক্ষণ সে এমনিই জ্বলতে থাকলো। এ আগুনে না পুড়লে তার ভেতরের পাপের কোষগুলো শুদ্ধ হবে না।

তার তলোয়ার এক সময় কোষমুক্ত হয়ে গেলো। আস্তে আস্তে সে তার এক বাতিনী সঙ্গীর কাছে গেলো। মাথা ঝুকিয়ে তাকে ভালো করে দেখে নিলো। তারপর তলোয়ার তার গলার শাহরগে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে একবার আগপিছ করলো। এক মুহূর্তে বাতিনীর মস্তক দেহ থেকে আলাদা হয়ে গেলো। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে দ্বিতীয় বাতিনীকেও একই পরিণতিতে পৌঁছে দিলো। কারো মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের হলো না।

ইবনে মাসউদ তলোয়ার ঘাসে ও গাছের পাতায় ভালো করে রগড়িয়ে কোষবদ্ধ করে রাখলো। নিজেকে এখন তার বেশ হালকা মনে হচ্ছে। তার বোনকে সে অতীতের পাপে ভরা জীবন থেকে ধুয়ে মুছে নতুন জীবন দিতে যাচ্ছে সেখানে এই দুই বাতিনী পাপের কাটা হয়ে এসেছিলো। এ কাটা সে উপড়ে ফেলেছে। তাই তার চোখ ভেঙ্গে ঘুম এলো। বিলম্ব না করে নিজেকে সে বিছানায় সপে দিলো।

সকাল বেলা উঠে যিররী তাদের দুই সঙ্গীর কথা জিজ্ঞেস করলো, ওরা কোথায়। এখনো কি জাগেনি ওরা?

'ওরা আর কখনো জাগবে না' – ইবনে মাসউদ উঠতে উঠতে বললো – আমার সঙ্গে এসো। আমি ওদেরকে চিরদিনের জন্য শুইয়ে দিয়েছি।

যিররীকে ইবনে মাসউদ সেখানে নিয়ে গেলো যেখানে তার দুই সঙ্গীর লাশ পড়েছিল। লাশ দেখে যিররী মোটেও ঘাবড়ালো না। আলমোতে সে এ ধরনের শত শত লাশ দেখেছে।

'শায়খুল জাবালের হুকুমে তাদেরকে আমি হত্যা করেছি' – ব্যাখ্যা দেওয়া শুরু করলো ইবনে মাসউদ– শায়খুল জাবাল আমাকে বলেছেন, তোমাদের সঙ্গে একটি মেয়ে যাচ্ছে। তুমিও তার প্রতি হাত বাড়াবে না এবং এরা দু'জন তাকে আনন্দের সামগ্রী বানাবে না। তোমাকে আসলে অন্য এক উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছি। শায়খুল জাবাল বলেছিলেন, পথে যেই এই মেয়েকে আনন্দের সামগ্রী বানাতে চাইবে অন্যজন যেন তাকে হত্যা করে ফেলে... এই দু'জন তোমার দেহের সঙ্গে খেলতে চাচ্ছিলো। পথে তো তুমি ওদের অশ্লীল মন্তব্যও শুনেছো।'

যিররী কিছুই বললো না, এমনই যেন হওয়ার কথা ছিলো। সে ইবনে মাসউদের সঙ্গে ফিরে এলো তাদের জায়গায়। ভালো করে নাস্তা খেলো। তারপর নিজেদের সবকিছু গুছিয়ে ঘোড়ায় তুলে নিলো। দুটি ঘোড়ায় ওরা সওয়ার হয়ে বাকি তিনটি ঘোড়া সঙ্গে নিয়ে নিলো। যিররীকে ইবনে মাসউদ বললো, এখন আমাদের ঘোড়ার গতি আরো বাড়াতে হবে। মঞ্জিলে পৌঁছতে হবে দ্রুত। যিররী ঘোড়ার গতি ক্ষিপ্র করে দিলো।

আরো একটি রাত এলো। রাত কাটানোর জন্য ওরা এক জায়গায় থেকে গেলো। রাতের খাবার শেষে ওরা শোয়ার বন্দোবস্ত করলো। খাওয়ার পর যিররী হাশীষ পান করলো। ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞেস করলো, সে কেন হাশীষ পান করছে না। ইবনে মাসউদ একটি অজুহাত দিয়ে কথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলো, যিররী হাশীষ পান করুক সে চাচ্ছিলো না। কিন্তু এখন তাকে হাশীষ থেকে বিরত রাখলে সে অনেক বিপদজনক হয়ে উঠবে। সে জানে নেশাপ্রিয় মানুষ নেশা করতে না পারলে কী ভীষণ অবস্থায় পৌঁছে।

কিন্তু হাশীষ পান করে যিররী আরো সমস্যা দাঁড় করালো। তার ভেতর ইবনে মাসউদের প্রতি ভালোবাসার ঝড় উঠলো। এই ভালোবাসার প্রকাশ সে দৈহিকভাবে করতে অভ্যস্ত ছিলো। আর সে এই পদ্ধতিই জানতো এবং একে বৈধ মনে করতো। ইবনে মাসউদ তাকে বহু কষ্টে দমিয়ে রেখে বললো, শায়খুল জাবালের হুকুমের খেলাফ সে আদৌ করবে না। তার হুকুমের খেলাফ করেছে বলেই তো দুই বাতিনীকে সে নিজ হাতে হত্যা করেছে। যিররী এটা মেনে নিলো এবং একটু পর ঘুমিয়ে পড়লো।

★★★★

সুলতান মুহাম্মদের ওযীর মাগরিব নামায মসজিদে পড়ে ঘরে এসে ঢুকছিলেন এমন সময় দেখলেন ইবনে মাসউদ ও যিররী ঘোড়া থেকে নামছে। আবু নসর আহমদ দৌড়ে গিয়ে ইবনে মাসউদকে আলিঙ্গন করলেন।

'আমার বোনকে নিয়ে এসেছি' – ইবনে মাসউদ যিররীর দিকে ইংগিত করে বললো– 'আপনি নিশ্চয় হয়রান হচ্ছেন আমার বোনকে আলমোত থেকে কিভাবে বের করে নিয়ে এসেছি। এটা পরে শোনাবো।'

আবু নসর দু'জনকে ভেতরে নিয়ে গেলেন এবং যিররীকে মহিলাঙ্গনে পাঠিয়ে দিলেন। আবু নসর মুহাম্মদকে পেয়ে বারবার তার আনন্দিত হওয়ার কথা বলছিলেন।

'মুহতারাম ওযীরে আজম!' –ইবনে মাসউদ বললো– 'আল্লাহর অশেষ মদদে আপনি এবার আলমোত জয় করে ফেলুন। আমি আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবো। এর বিনিময়ে আপনি আমাকে আমার বোন ফিরিয়ে দিন!'

'বোনকে ফিরিয়ে দেবো? তুমি তো তোমার বোনকে নিয়ে এসেছো' – আবু নসর হয়রান হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যা, আমি আমার বোনকে নিয়ে এসেছি। কিন্তু সে এখন এমন নেশার জগতে বুঁদ হয়ে আছে যে, বোন ও ভাইয়ের পবিত্র সম্পর্কের কথা ভুলে গেছে... ওসিমকুহে যেমন আমাকে ডাক্তার শয়তানের কবল থেকে মুক্ত করে মানুষের মর্যাদা দিয়েছেন সেভাবে আমার বোনকেও যদি মানুষের মর্যাদায় ফিরিয়ে আনা হয় নিজের প্রতি আমি এটাকে বিরাট বড় অনুগ্রহ মনে করবো।'

ইবনে মাসউদ তাকে বিস্তারিত সব জানালো। তার বোন এখন কি অবস্থায় আছে এবং হাসান ইবনে সবার বেহেশতে থাকতে তাদের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিলো... আবু নসর বুঝে গেলেন। তিনি বললেন, কাল সকালেই তিনি যিররীকে তাদের শাহী ডাক্তারের হাতে ছেড়ে দেবেন। কিছু দিনের মধ্যে ইবনে মাসউদ তার বোনকে স্বরূপে ফিরে আসতে দেখবে। তারপর ইবনে মাসউদ আবু নসরকে আলমোত থেকে তার বোনকে নিয়ে মারুতে কিভাবে আসলো পথে কি ঘটলো সব শোনালো।

'আমি এখন একটি কথা শুনতে চাই'– আবু নসর আহমদ বললেন – 'আমি কবে আলমোতের ওপর হামলা করবো? হামলা ও অবরোধের সময় তোমাকে আলমোত অবশ্যই থাকতে হবে।'

'মুহতারাম ওযীরে আজম!' – ইবনে মাসউদ বললো– 'কাল সকালে আমি ওসিমকুহে রওয়ানা হয়ে যাবো। মুযাম্মিল আফেন্দী ও ইবনে ইউনুস আমার সঙ্গে আলমোত যাবে। হাসান ইবনে সবার অবশ্য মুযাম্মিলকে চিনে ফেলার সম্ভাবনা আছে। তবে মনে হয় চিনতে পারবে না। পনের ষোল বছর আগের ঘটনা। তাছাড়া হাসান ইবনে সবা এখন আর আগের মতো নেই... যাহোক, কাল সকালে রওয়ানা হয়ে যাবো আমি। সেখানে গিয়েই আমি আলমোত রওয়ানা হয়ে যাবো।

এর কিছুদিন পর আমি কোচ করে গিয়ে আলমোত অবরোধ করবো।

আমরা নদী পথের চোরা দরজা খুলে দিবো এবং অগ্নি শিখার মাধ্যমে ইশারাও করবো, ভেতরে সুযোগ পেলে হাসান ইবনে সবাকেও কতল করে দিবো। তবে এটা মনে হয় সম্ভব হবে না। কারণ হাসান ইবনে সবা একা বের হয় না।'

★★★★

পরদিন সকালে ইবনে মাসউদ তার বোন যিরজীর কাছে না বলেই ওসিমকুহ রওয়ানা হয়ে গেলো।

সালার আওরিজী, মুযাম্মিল ও ইবনে ইউনুস দারুণ আনন্দিত হয়ে ইবনে মাসউদকে আলিঙ্গন করলো। সবাই হয়রান হয়ে গেলো, সাবেক ফেদায়েন হয়েও

কিভাবে সে হাসান ইবনে সবার হাত থেকে জীবিত ফিরে এলো। আর যখন শুনলো হাসান ইবনে সবাকে একের পর এক ধোঁকা দিয়ে তার আরো বিশ্বস্ত লোক হয়ে ফিরে এসেছে ইবনে মাসউদ তখন ওরা ভেবে পেলো না একজন মানুষকে আল্লাহ তাআলা এতখানি দূরদর্শী কি করে বানালেন। এ আসলে তার ঈমানী শক্তির ফল।

ইবনে মাসউদ সব শেষে মুযাম্মিল ও ইবনে ইউনুসের আলমোতে যাওয়ার কথা তুললো। ওরা তো আগ থেকেই তৈরি ছিলো যাওয়ার জন্য। মুযাম্মিল তার আশংকার কথা জানালো যে, হাসান ইবনে সবা তাকে চিনে ফেলতে পারে। ইবনে মাসউদ বললো, এতদিন পর হাসান ইবনে সবা মুযাম্মিলকে চিনতে পারবে না। তারপরও সে চেষ্টা করবে মুযাম্মিল ও ইবনে ইউনুসের যাতে হাসান ইবনে সবার সামনে যেতে না হয়।

পরদিন সকালে তিনজন রওয়ানা হয়ে গেলো। কয়েক দিন পর ওরা আলমোত পৌঁছলো। মুযাম্মিল ও ইবনে ইউনুসকে ইবনে মাসউদ হাসান ইবনে সবার মেহমানখানায় পাঠিয়ে দিয়ে নিজে চলে গেলো হাসান ইবনে সবার কাছে। হাসান তাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি করে এসেছো?

'ইয়া শায়খুলজাবাল!'–ইবনে মাসউদ বললো–'এখন যা বলবো সেটা শায়খুলজাবালের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আলমোতের ওপর হামলা রুখা যাবে না। আমি সেখানে পৌঁছে দেখি ফৌজকে কোচের প্রস্তুতির হুকুম দিয়ে দিয়েছে। হামলার নেতৃত্ব ওযীরে আজম আবু নসর স্বয়ং দেবেন। আমার বোনকে আমি সেখানকার বিশ্বস্ত এক লোকের দায়িত্বে রেখে এসেছি। সেখানে সে শুধু নিরাপদেই নয় তার কাজ সে স্বাধীনভাবে করে যেতে পারবে। যার কাছে ওকে রেখে এসেছি সে এই অপেক্ষাতেই ছিলো যে, সে যিররীর মতো একটি মেয়ে পেলে সুলতানের সিংহাসন উল্টে দিতে পারবে। সে বলেছে আবু নসর আহমদকে বোতলে ভরা কঠিন কাজ নয়। কিন্তু এখন হামলা রোধ করা যাবে না। কারণ সুলতান মুহাম্মদ কোচ করার হুকুম দিয়েছেন।

'সেলজুকি ফৌজের সংখ্যা কত হবে?'

'চল্লিশ পাঁচচল্লিশ হাজারের মতো। ওদের কাছে মিনজানীকও থাকবে। তবে আমি হিসাব করে দেখেছি ওদের নিক্ষেপ করা পাথর শহরের ভেতর পর্যন্ত পৌঁছবে না। অর্থাৎ এ ফৌজ আলমোতের কিছুই করতে পারবে না। ওদের অবরোধ ব্যর্থ ছাড়া কিছুই হবে না।'

'সুলতান মুহাম্মদ বেকুব লোক' – হাসান বললো– 'তার এই ওযীর আবু নসরকে আরো বেশি বেকুব মনে হয়। এরা মৌসুমের আবহাওয়াগত চক্র বুঝেই না। তুমি বাইরে বের হয়ে দেখো বরফ পড়া শুরু হয়ে গেছে। কয়েক মাস পর্যন্ত চলবে এই বরফপাত। আমরা ভেতরে আরামে বসে থাকবো আর সেলজুকিদের বরফে জমেয়ে মারবে।'

এটা শুনে ইবনে মাসউদ পেরেশান হয়ে গেলো। আবু নসর বড় জযবা নিয়ে এ হামলার প্রস্তুতি নিয়েছেন এবং তিনি কৌশলও নির্ধারণ করেছেন নিখুঁত। কিন্তু তিনি আবহাওয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করেননি। এখন তো মারুতে এ ব্যাপারে পয়গাম পৌঁছালেও মনে হয় কাজ হবে না। তাছাড়া কবে কোচ করবে তাও জানা নেই।

'ইয়া শায়খুলজাবাল!'– ইবনে মাসউদ হাসান ইবনে সবাকে ভড়কে দেয়ার জন্য বললো– 'আমি একটা ভয়াবহ ব্যাপার দেখেছি। আমাদের যারা মারুতে আছে তাদের মানসিকতা আমাদের প্রতি অনেকটা নেতিবাচক হয়ে উঠেছে। সন্দেহ হচ্ছে আমার এদের মধ্যে কেউ কেউ গাদ্দারী করে ওদের দলে ভিড়ে যেতে পারে। যার কাছে যিররীকে রেখে এসেছি সে খুবই বিশ্বস্ত। সে বলেছে, এখানে নিজেদের লোকদের ওপর ভরসা রাখা যায় না।'

ফেদায়েনদের ওপর সর্বোচ্চ বিশ্বাসই ছিলো হাসান ইবনে সবার সবচেয়ে বড় শক্তি। ইবনে মাসউদ তার কথার মারপ্যাচে সেটাই ভাঙ্গতে চেষ্টা করছে। সে বললো–

'অতি জরুরী একটা কথা ইয়া শায়খুলজাবাল।' মারুতে আমি উড়ো উড়ো একটা কথা শুনেছি যে, আলমোতের ভেতর দু'জন এমন লোক ঢুকে পড়েছে যারা অবরোধের সময় সেই চোরা দরজা খুলে দেবে। এর জন্য এই একটা করা যায় যে, ঐ দু'জন কারা এবং কোথায় লুকিয়ে আছে তা বের করা। এটা বের করা খুবই মুশকিল হবে। আমি আগেই বলেছি, ঐ দরজার দায়িত্ব আমাকে দিয়ে দিন এবং সেখানে যারা আছে তাদেরকে অন্যত্র হটিয়ে দিন। আমি মারু থেকে দু'জন নিয়ে এসেছি। ওরা খুবই বিচক্ষণ ও সাহসী। আপনি অনুমতি দিলে ওদেরকে নিয়ে আমি ঐ দরজার দায়িত্ব নিতে পারি।'

তার কথায় হাসান ইবনে সবা কিছুটা পেরেশান হলো। এর অর্থ এই নয় যে, সে এতই কাচা হয়ে গেছে যা তার ভিত নাড়িয়ে দেবে। সে ইবনে মাসউদকে সেই দরজার দায়িত্ব দিয়ে দিলেও তার অজান্তে তার পেছনে গুপ্তচর লাগিয়ে দিলো এবং সেই গুপ্তচরদের বিরুদ্ধে আরো গুপ্তচর লাগালো যে, এরা ওদের দায়িত্বে অবহেলা করে কিনা। তার এই দূরদর্শিতাই তাকে 'শায়খুলজাবাল' বা 'ইমাম' বানিয়েছে।

২৬

৫৫৩ হিজরীতে সুলতান মুহাম্মদের ওযীরে আজম আবু নসর আহম্মদ আলমোত হামলার জন্য তার ফৌজ নিয়ে মারু থেকে কোচ করেন। ফৌজের মধ্যে অধিকাংশ শহরবাসীই যোগ দেয়। তারা এক সময় শুধু শুনতো হাসান ইবনে সবা অমুক শহর দখল করে নিয়েছে, অমুক কেল্লা থেকে মুসলমানদের উৎখাত করেছে, অমুক বড় আলেমকে তার লোকেরা হত্যা করেছে, অমুক শহরে তার লোকেরা অবাধে হত্যাকান্ড চালাচ্ছে। এসব ঘটনার কারণে অনেকে ভাবতো, হাসান ইবনে সবা হয়তো সত্যিই আসমান থেকে নেমে আসা কেউ। কিন্তু যখন কেল্লা ওসিমকুহ ও শাহদর সেলজুকিরা জয় করলো, একের পর এক ফেদায়েন পাকড়াও ও হত্যার খবর মুসলমানরা পেতে লাগলো তখন তাদের ভুল ভাঙ্গলো যে, হাসান ইবনে সবা সাধারণ মানুষই, তবে জঘন্য শঠ ও প্রতারক। সেলজুকিদের পরবর্তী সাফল্যের ঘটনা মুসলমানদের মনোবল অনেক বাড়িয়ে দিলো। যে কারণে দলে দলে লোক সেলজুকি ফৌজে যোগ দেয় বিনা শর্তে ও বিনা বেতনে।

সেলজুকি ফৌজ যখন আলমোত গিয়ে কেল্লা অবরোধ করে তখন সেখানে বরফপাত শুরু হয়ে গেছে। তবে এত বেশি নয় যা সেলজুকি ফৌজের জন্য অসহনীয়। এই অবরোধে আলমোতের ভেতর মোটামুটি ভীত ছড়িয়ে পড়লো। তবে সক্ষম নারী পুরুষ প্রত্যেকেই সব সময় সশস্ত্র হয়ে থাকলো। হাসান ইবনে সবা কেল্লার দেয়ালে দেয়ালে তীরন্দায দাঁড় করিয়ে দিলো। তারপর ফেদায়েন বাহিনীকে এই বলে মনোবল যোগাতে লাগলো যে, এই ফৌজের ওপর আকাশ থেকে গজব নেমে আসবে এবং পালিয়ে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেলজুকি ফৌজে এমন জানবাযও ছিলো যা মুজিযা করে দেখাতে সক্ষম। এদের মধ্য থেকে পাঁচ সাতজনের ছোট ছোট দল হয়ে কয়েকবার পাহাড় বেয়ে কেল্লার দরজা ভাঙ্গার জন্য ওপরে উঠার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা ওপর থেকে উল্টো তীর খেয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ে।

অবরোধ ছিলো আলমোতের তিন দিককে ঘিরে। আরেক দিকে নদী থাকায় সেদিকে কোন ফৌজ মোতায়েন সম্ভব ছিলো না। তবে আবু নসর আহমদ কিছু লোক তৈরি রাখলেন যারা অনেক দূর থেকে ঘুরে নৌকার মাধ্যমে কেল্লার পেছনের ঐ চোরা দরজা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে যেখানে ইবনে মাসউদের সঙ্গে মুযাম্মিল ও ইবনে ইউনুসের থাকার কথা।

ঐ দরজার চাবি ইবনে মাসউদের কাছে দেয়া হয়। যখনই সে দরজা খোলার জন্য আগে বাড়তো কেউ না কেউ সেখানে এসে উপস্থিত হতো, এতে তারা পেছনে সরে আসতে হতো। ইবনে মাসউদ জানতো না তার ওপর নজর রাখার জন্য হাসান ইবনে সবা গোপনে কয়েকজনকে লাগিয়ে দিয়েছে।

দিনের পর দিন চলে যেতে লাগলো। মিনজানীক দিয়ে পাথর নিক্ষেপ চলতে লাগলো নিয়মিতই কিন্তু তা কেল্লার ভেতর পৌঁছতো না। দেয়ালে লেগে ফিরে আসতো, অবশ্য শহরবাসী এর দ্বারা বেশ সন্ত্রস্ত থাকতো। আবু নসর আহমেদ যাদেরকে নদীপথের চোরা দরজার জন্য প্রস্তুত রেখেছিলো তাদেরকে সে পর্যন্ত পৌঁছানো গেলো না। কারণ, নদীর নৌকাগুলো হাসান ইবনে সবা সেই দরজার কাছে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা করে। নৌকা ছাড়া একমাত্র পথ ছিলো সাতরিয়ে যাওয়া। তবে দরজা পর্যন্ত যাওয়ার আগে দেখতে হবে দেয়ালের ওপর থেকে অগ্নিশিখার মাধ্যমে কোন ইশারা পাওয়া যায় কিনা। তাই জানবাযরা নদীর তীরে লুকিয়ে লুকিয়ে দেয়ালের দিকে সবসময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে লাগলো।

অবরোধের এক মাস চলে যাওয়ার পর ইবনে মাসউদ একদিন সেই চোরা দরজা খুলে দিলো। নদীর পানি ভেতরে চলে এলো। তবে সিঁড়ির নিচ দিক উঁচু থাকায় বেশি ভেতরে আসলো না পানি। আচমকা এক লোক এসে সেখানে উপস্থিত হলো। সে দরজা এভাবে খোলা দেখতে পেয়ে উঁচু আওয়াজে জিজ্ঞেস করলো এ দরজা কে খুলেছে? তার আওয়াজ এত উঁচু ছিলো যে, সেখানে যে সাত আটজন ছিলো সবাই দৌড়ে এলো। ইবনে মাসউদ ওদেরকে বললো, দরজা সে খুলেছে পরীক্ষার জন্য। যাতে প্রয়োজনের সময় আটকে না যায়।

ওরা সন্দিহান হয়ে গেলো এটা কোন চালবাজি হবে। একজন বললো, ইমামকে জানানো হোক। এ সময় আরেকজন দৌড়ে এসে বললো, ঐ দরজার দিকে খেয়াল রাখো। কারণ নদীর তীরে কিছু লোককে লুকিয়ে থাকতে দেখা গেছে। ওরা যেন আবার নদীপথে এখানে এসে না পৌঁছে।

কথায় কথায় অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, মুযাম্মিল আফেন্দী ও ইবনে ইউনুস উত্তেজিত হয়ে তলোয়ার বের করে ওদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বসলো। ওরাও তলোয়ার বের করে বসলো। তারপর এই সংকীর্ণ জায়গায় বড় রক্তক্ষয়ী লড়াই হলো। এতে সেখানকার একজন ছাড়া সব ফেদায়েন মারা গেলো এবং আকেজন পালিয়ে গেলো হাসান ইবনে সবাকে খবর দিতে। কিন্তু ইবনে মাসউদ, মুযাম্মিল আফেন্দী ও ইবনে ইউনুসও মারা গেলো ওদের হাতে। হাসান ইবনে সবা এ ঘটনায় আরেকটা নাড়া খেলো। সে বুঝতে পারলো তার বিশ্বস্ত ফেদায়েন বাহিনীতে অবিশ্বাসের চোরাবালি ঢুকেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার বিচক্ষণতার ধার অনেক কমে গেছে।

ঐদিকে আবু নসর আহমেদ দিন দিন পেরেশান ও অস্থির হয়ে উঠছিলেন। এখনো কেন ইবনে মাসউদ দেয়ালের ওপর থেকে ইশারা দিচ্ছে না! অস্থির ও হতাশ হয়ে একদিন তিনি এক জানবাযকে নদীতে নামিয়ে দিলেন। কিন্তু দেখা গেলো, সেই জানবায কয়েক হাত গিয়ে চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। নদীর পানি এতই বরফায়িত হয়ে গেছে যে, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তাকে জমিয়ে তার প্রাণ হরণ করে নিলো। আবু নসর বুঝতে পারলেন, তিনি মারাত্মক একটা ভুল করেছেন। নৌকা ছাড়া নদী পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব নয়।

সেলজুকিদের জন্য অবরোধের একটি রাত এলো যে রাতটি তাদের জন্য শোক গাঁথা রচনা করে দিলো। সে রাতে এমন কঠিন বরফপাত হলো যে, সেলজুকিদের পা উপড়ে গেলো। সকাল হলে দেখা গেলো আলমোতের পুরো দুনিয়া সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বরফপাত বেড়েই চললো। ঘোড়াগুলো পর্যন্ত ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলো।

হাসান ইবনে সবা দারুণ সুযোগ পেয়ে গেলো। সে দেয়ালে চড়ে উভয় হাতে আকাশের দিকে তুলে উঁচু আওয়াজে বললো– 'হে আকাশ! তুমি আমাকে জমিনে নাযিল করেছিলে। এখন এমন গজব ও কহর বর্ষাও যে, তোমার ইমামের এই দুশমনরা ধুকতে ধুকতে খতম হয়ে যায়।'

আবু নসর আহমদ বাধ্য হয়ে অবরোধ উঠিয়ে নিলেন এবং তার ফৌজকে মারু ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু এই নির্দেশ দিয়ে তিনি দেখলেন। তার ফৌজের কিছু লোকের অবস্থা এমন নাজুক হয়ে গেছে যে, ঘোড়ায় সওয়ার হওয়াও তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে গেছে।

বড় ব্যর্থ হয়ে সেলজুকি ফৌজ সেখান থেকে ফিরে এলো।

★★★★

ওযীরে আজম আবু নসর আহমদের অতিমাত্রায় জযবার পরিণামে এত বড় ফৌজ কিছু দিনের জন্য দৈহিকভাবে তো বেকার হলোই মানসিকভাবেও পর্যুদস্ত হয়ে গেলো। ঠাণ্ডার প্রচণ্ডতা তাদের দেহের কোষগুলো পর্যন্ত নাড়িয়ে দিয়েছে। যা হোক ফৌজের দৈহিক অবস্থা তো খুব দ্রতই ঠিক হয়ে গেলো। কিন্তু মানসিক অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হলো না। অনেকে নিজেদের ব্যর্থতা ঘুচানোর জন্য গুজব ছড়িয়ে দিলো। হাসান ইবনে সবা নবী না হলেও তার হাতে এমন শক্তি আছে যার দ্বারা সে বড় বড় ফৌজকেও বিপদে ফেলে পরাজিত করতে পারে। এতে ফৌজের মধ্যে লড়াইয়ের যে মনোবল ছিলো তার কিছুটা হলেও ক্ষতিগ্রস্ত হলো এবং যারা স্বেচ্ছায় ফৌজে যোগ দিয়েছিলো তাদের অনেকে ফৌজ থেকে চলে গেলো।

সুলতান মুহাম্মদ এ অবস্থা দেখে পেরেশান হয়ে গেলেন। তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন। এরা তো আল্লাহর সৈনিক। এদের মধ্যে আল্লাহভীতি ছাড়া আর কারো ব্যাপারে ভয় থাকবে না। সফলতা ব্যর্থতা তো আল্লাহই দিবেন। সুতরাং মানুষের প্রতি এক আল্লাহর সৈনিক কি করে নির্ভরশীল হতে পারে। ওদের মধ্যে আল্লাহর ভয়ের পরিবর্তে হাসান ইবনে সবার ভয় ঢুকে গেছে। তিনি আবু নসর আহমেদকে তার মন্ত্রিত্ব থেকে বাদ না দিলেও সেনা প্রধানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে দিলেন এবং নেতৃত্ব নিয়ে নিলেন নিজ হাতে। তিনি সালারদের ডেকে বলে দিলেন, তারা যেন ফৌজের মধ্যে আগের মনোবল ফিরিয়ে আনে এবং হাসান ইবনে সবার ভয় মন থেকে দূর করে দেয়।

সালাররা তো চেষ্টা চালিয়ে গেলেন। সুলতান মুহাম্মদও কয়েকদিন পরপর সমস্ত ফৌজ সমবেত করে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। অনেক অনলবর্ষী আলেমকেও ফৌজের মধ্যে নিয়োগ দিলেন যারা নিয়মিত ওয়াজ নসীহত করে তাদের অন্তর থেকে হাসান ইবনে সবার প্রভাব বিদূরিত করতে লাগলেন। এর মধ্যে কয়েক বছর কেটে যাওয়ার পর ফৌজের ভেতর বিরাট পরিবর্তন এলো। তাদের মনোবল আগের চেয়ে আরো চাঙ্গা হলো। সোনবাহিনীতে অসংখ্য নৌজোয়ান যোগ দিলো। এতে সেনাবাহিনী নব উদ্যমে তারণ্যদীপ্ত হয়ে উঠলো।

সুলতান মুহাম্মদ আবার আলমোত অবরোধের প্রস্তুতি নিলেন। এবার তিনি অতি দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে সব দিক সামনে রেখে অবরোধের ছক নির্ধারণ করলেন। এর মধ্যে সালারদের বিভিন্নমুখী পরামর্শও বিবেচনায় রাখলেন। এতে তার মৌলিক নীতিমালা ছিলো অত্যন্ত সতর্কমূলক। এর একটা হলো, ফৌজ কেল্লার ওপর চড়ার চেষ্টা তো দূরের কথা আগে বেড়ে দরজা ভাঙ্গারও চেষ্টা করবে না। শহরে প্রবেশ করার কোন ধরনের উদ্যোগ নেবেনা। বরং অবরোধ কিভাবে নির্বিঘ্ন থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। এতে অবরোধের মেয়াদ বছরের পর বছর গড়িয়ে গেলেও অসুবিধা নেই।

একদিন সুলতান মুহাম্মদ তার ফৌজ নিয়ে আলমোত অবরোধ করলেন। এর নেতৃত্বের লাগাম তার নিজের হাতে রাখলেও সিপাহসালার নিযুক্ত করেন আমীর নৌশ শিরগীরকে। আমীর নৌশ অত্যন্ত ধীর ও শান্ত স্বভাবের লোক। তার প্রতিটা পদক্ষেপ হয়

গভীর চিন্তার প্রতিফলন। ফৌজের মধ্যেও তিনি তার এই স্বভাবজাত বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগালেন প্রশিক্ষণ দেয়ার সময়। একজন সফল সিপাহসালারের জন্য এটা খুবই জরুরী।

এদিকে সুলতান মুহাম্মদ ফৌজের মনোবল অটুট রাখার জন্য দিনের মতো রাতেও তিনি বিভিন্ন সেনা তাঁবুতে গিয়ে সৈনিকদের খোঁজখবর নিতেন। এতে তার ঠাণ্ডা লেগে গেলো এবং দেখতে দেখতে তার নিউমোনিয়া হয়ে গেলো।

ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা করলেন তাকে সুস্থ করে তুলতে এবং তাকে মারু ফিরে যেতে বললেন। কিন্তু ফৌজের সঙ্গ ছেড়ে যেতে অস্বীকৃতি জানালেন। পাঁচ ছয় দিন পর সুলতান মুহাম্মদের অসুখ এক রাতে আচমকা এত বেড়ে গেলো যে, ডাক্তাররা কিছুই করতে পারলো না এবং ভোর হওয়ার আগে তিনি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন।

সকালে এ খবর ছড়াতেই ফৌজের মধ্যে আবার হতাশা ফিরে এলো। আমীর নৌশ অবরোধ উঠিয়ে ফৌজ নিয়ে মারু চলে গেলেন। ফৌজের সঙ্গে সুলতান মুহাম্মদের লাশও গেলো।

আলমোত আবার কিছু দিনের জন্য বেঁচে গেলো।

★★★★

সুলতান সাঞ্জার, সালার আওরিজীসহ অন্যান্য আমীররা মারু ছুটে এলেন। সবাই পেরেশান হয়ে গেলেন। এটা কি হলো। সুলতান মুহাম্মদের ইন্তিকাল হয়ে গেলো!

সালার আওরিজী ও আবু নসর আহমদ আরো অধিক হয়রান ছিলেন যে, ইবনে মাসউদ মুযাম্মিল আফেন্দী ও ইবনে ইউনুস আলমোত গেলো। অথচ ওরা কিছুই করলো না এবং ফিরেও আসলো না। একজন বললো, হাসান ইবনে সবা হয়তো ঐ তিনজনকে জাদু করে ফেদায়েন বানিয়ে নিয়েছে। কেউ কোন ফয়সালায় পৌঁছতে পারলো না।

সেলজুকি সালতানাত আবার নাজুক অবস্থায় পড়লো। এর মধ্যে সাঞ্জার পুরো সালতানাতের সুলতান হয়ে গেলেন। তার বড় ভাই বরকিয়ারক অনেক আগেই ইন্তিকাল করেছেন। সাঞ্জার এখন একা, তবুও তিনি নব উদ্যোমে বুক বেধে হুকুম জারী করলেন আলমোত যে কোন মূল্যে জয় করতে হবে।

আরেকবার নব উদ্যোমে ফৌজ তৈরি করার কাজ শুরু হয়ে গেলো। এক বছরের মধ্যে ফৌজ পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে গেলো। সুলতান সাঞ্জার এই ফৌজ নিয়ে আবার আলমোত অবরোধ করলেন।

অবরোধের কয়েক দিন যাওয়ার পর সুলতান সাঞ্জার এক সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলেন, তার বিছানার সামনে লম্বা একটা খঞ্জর গাঁথা। খঞ্জর বাটে একটি চিরকুট ঝুলছে। তাতে লেখা,

'হে সুলতান সাঞ্জার! আমাদেরকে আর কষ্ট দিয়ো না। ইচ্ছা করলে এই খঞ্জর জমিনে না গেড়ে তোমার নরম বুকে বিদ্ধ করাটা অনেক সহজ হতো।'

সাঞ্জার ঘামে গোসল করে ফেললেন প্রায়। সাঞ্জার ভীত লোক ছিলেন না। তার যেমন জযবা তেমনি সাহস। কিন্তু ভয় পেলেন এই ভেবে যে, তার মুহাফিজের মধ্যে

নিশ্চয় দু'একজন ফেদায়েন আছে। না হয় তার তাঁবুতে তো দূরের কথা তাঁবুর কাছে ধারেও কোন প্রাণী ঘেষার সুযোগ নেই। তিনি তখনই সব সালারকে ডেকে হাসান ইবনে সবার পয়গাম দেখালেন। তিনি হুকুম দিলেন, দেখতে হবে আমার মুহাফিজ বা ফৌজের মধ্যে কোন ফেদায়েন আছে কিনা... কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার বললেন, না, এ ধরনের কাউকে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়।

সালাররা তার তাঁবু থেকে বের হতেই তাকে জানানো হলো। হাসান ইবনে সবার এক দূত দেখা করতে এসেছে। তিনি দূতকে ভেতরে ডেকে পাঠালেন। দূত এসে বললেন, শায়খুল জাবাল সন্ধির দরখাস্তের জন্য পাঠিয়েছেন। বলেছেন, আপনার সুবিধা মতো শর্ত আরোপ করতে।

সুলতান সাঞ্জার একটু আগের পয়গামে এতই হতাশ হয়ে পড়েছেন যে, তিনি সন্ধির প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন। তিনি যে শর্ত দিলেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এরকম–

হাসান ইবনে সবা ভবিষ্যতে আর কোন কেল্লা বানাতে পারবে না। কোন কেল্লা দখলেরও চেষ্টা করবে না। দ্বিতীয় শর্ত এই, কোন বাতিনী, সঙ্গে কোন অস্ত্র রাখতে পারবে না। তৃতীয় শর্ত হলো, হাসান ইবনে সবা তার ফেরকায় নতুন কোন মুরিদ অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে না এবং তার ফেরকার প্রচার প্রসার চালাতে পারবে না।

দূত চলে গেলো এবং একটু পর ফিরে এসে ফিরতি পয়গাম দিলো যে, হাসান ইবনে সবা তিনটা শর্তই মেনে নিয়েছে।

তারপর এই সন্ধিপত্রের মধ্যে সুলতান সাঞ্জার মোহরাঙ্কিত করে দিলেন। হাসান ইবনে সবাও তার সিলমোহর করে দিলো।

এর দু'বছর পর ৫১৮ হিঃ তে হাসান ইবনে সবা এক মুসলমানের খঞ্জরের আঘাতে যখমী হয়ে মারা যায়। তার মৃত্যুর পরপরই তার ফেরকা ত্রিশটারও অধিক দলে বিভক্ত হয়ে পড়লো। তারপর বাতিনীরা বিভিন্ন অঞ্চলের ভারাটে খুনী বনে গেলো।

শাহদর থেকে দূরের এক পাহাড়ে নাকি খোদার এক দূতের অবতরণ ঘটেছে। হাজার হাজার মানুষ স্পষ্ট চোখে দেখেছে, আলোর ভেলায় ভেসে ভেসে শুভ্রপোষাকধারী একজন মানুষ এক পাহাড়ে নেমে এসেছে এবং শুনিয়েছে এক দৈববাণী– 'যে তার কথা শুনবে এই দুনিয়াতেই সে পেয়ে যাবে তার কাঙ্ক্ষিত বেহেশত। পরকালের বেহেশতের জন্য আর তাকে অপেক্ষা করতে হবে না।' খোদার সেই দূতের নাম হাসান ইবনে সবা। অথচ খোদার কোন দূত তো দূরের কথা সর্বশ্রেষ্ঠ নবী রাসূলুল্লাহ (স) এর অবতরণও তো এতো বর্ণাঢ্য ও অলৌকিক হয়নি। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (স) এর পরে তো আর কোন নবী বা 'আসমানী দূত' আসবে না।

দেরীতে হলেও টনক নড়লো সেলজুকি প্রশাসনের। কিন্তু ততদিনে হাসান ইবনে সবা তার বিশাল এবং অপ্রতিরোধ্য এক শিষ্যবাহিনী গড়ে তুলেছে। যাদেরকে সে নিয়মিত হাশীষ (এক ধরনের মাদক) পান করায় এবং জাদু প্রয়োগ করে সম্মোহিত করে রাখে। এই জাদু ও হাশীষের প্রয়োগে বিশেষভাবে তৈরি করে শত শত সুন্দরী ও নিঃষ্পাপ মেয়েদের। এদেরকে ব্যবহার করে হাসান ইবনে সবা দেশের বড় বড় ব্যবসায়ী, রঈস, আমীর ও আমলাদের তার অন্ধভক্ত করে তোলে। শুধু তাই নয়, সারা দেশ জুরে তার বাহিনী লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করে। বড় বড় কাফেলা লুট করে সম্পদের পাহাড় গড়তে থাকে। দখল করতে থাকে একের পর এক দুর্গ ও শহর। ইসলামের নামে অনৈসলামিক, অনৈতিক এবং অশ্লীল কথা সমাজে ছড়াতে শুরু করে হাসান ইবনে সবার শিষ্যরা। প্রতিটি কেল্লা ও শহরের যুবক যুবতীদের তারা নারীসক্ত ও মাদকাসক্ত বানানোর ভয়ংকর সব কার্যক্রম শুরু করে। যারাই প্রকাশ্যে এর প্রতিবাদ করে তাদেরকে তারা খুন করে গুম করে দেয়। সেলজুকিরা তাকে ও তার গুরু আহমদ ইবনে গুতাশকে এবং তার বাহিনীকে জীবিত বা মৃত ধরার জন্য পাঠায় একের পর এক সেনাবাহিনী। ব্যর্থ হয় প্রতিটি সেনা অভিযান। একবার তো হাসান ইবনে সবা সেলজুকিদের এক হাজার সেনাবাহিনীর একদলকে কৌশলে হাশীষের পানি পান করিয়ে এবং 'রাম' বানিয়ে ফেরত পাঠায়। অথচ সেলজুকিরা কমও দুর্ধর্ষ ছিলো না। সেলজুকিদের ইতিহাসে ব্যর্থতা বা পরাজয় বলতে কোন শব্দ ছিলো না।

সেলজুকিদের এই ব্যর্থতা দেখে এগিয়ে আসে অসম সাহসী, বীরদীপ্ত, সৌম্য দর্শন এক যুবক মুযাম্মিল আকেন্দী। 'রায়' শহরে গিয়ে পরিচয় হয় অসম্ভব রূপবতী এক মেয়ে সুমনার সঙ্গে। দু'জনের মনেই আলোড়ন তোলে পরস্পরের প্রেম স্নিগ্ধ চোখের ভাষা। তবে সে প্রেমের পবিত্র আলপনায় তারা জুড়ে দেয় রক্ত রঞ্জিত এক শপথ বাক্য- সত্য সুন্দরকে বাঁচানোর জন্য মানুষের মুক্তির জন্যে, মুসলমানদেরকে রক্ষার জন্যে হাসান ইবনে সবা ও তার ফেরকার অস্তিত্ব বিনাশ করতে হবে।

কিন্তু হাসান ইবনে সবার কাছে তার যত বড় শত্রুই থাক তাকে দেখামাত্র তার পরম শিষ্য বনে যায়। তাছাড়া হাসান ইবনে সবা ক'দিন আগে ছদ্মবেশ ধরে সেলজুকি প্রশাসনের এক গুরুত্বপূর্ণ পদ বাগিয়ে নিয়েছে। সে হয়ে গেছে এখন সুলতান মালিক শাহর অন্যতম উপদেষ্টা আর কিছুদিনের মধ্যে সে মুঠোয় পুরে নেবে পুরো সেলজুকি সাম্রাজ্য। তারপর নিশ্চিহ্ন করে দেবে মুসলমানের নাম নিশানা। সেখানে প্রতিষ্ঠা করবে শয়তানের রাজত্ব।